সেরা কালের হাট

অশোক গুহ

প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮

●

প্রকাশক :
শ্রীযোগজীবন চক্রবর্ত্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি :
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

●

প্রচ্ছদ :
অনিল ভট্টাচার্য

●

মুদ্রাকর :
শ্রীমুরারিমোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লি :
৮০, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা-১৪

●

আমার ছোটদিকে—

উপন্যাসের ফর্ম-সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত।

যদি অস্‌বার্ট সিটওয়েল-নামধারী বৈলাতিক মুনির মতবাদী কেউ থাকেন তো, তিনি তাঁরই প্রতিধ্বনি করে বলবেন—উপন্যাস ফর্মহীন, সুটকেশ সদৃশ বা। সে সুটকেশটি সজ্জিত হবে তার মালিকের রুচি এবং তাঁর গন্তব্যস্থান অনুসারে।

এই উপন্যাসখানিকে এই বিধান অনুসারে বিচার করে দেখা যেতে পারে। এর গন্তব্যস্থল দুশো বছরেরও আগেকার বংলা, যখন তার নাম কালাদের মুখে মুখে বাঙ্গালা, এমন কি গৌড়বঙ্গ বলে প্রচারিত হ'লেও বিস্ময়ের কারণ ছিল না; আর ধলাদের মুখে তো সে ছিল—বেঙ্গল-বেঙ্গালা। সেই সাবেক কালে বাংলার নানা জায়গা থেকে বহু মানুষের ধারা এসে মিশেছিল খালকাটা-কালকাতা-ক্যালকাটায়—আবার বিদেশ থেকে ধলা মানুষের ধারাও এসে মিশেছিল—গড়ে উঠেছিল গোরার শ্রীপাট। সেই গন্তব্যগামী হতে সুটকেশ ভরতি করতে হল তখনকার সমাজ আর ইতিহাসের রকমারি সাজ-সরঞ্জামে, রীতিনীতির টুকিটাকি এ-কোণে ও-কোণে গুঁজে দিতে হল। আর তাতে করে এশিয়ার যে কিস্‌সা-কাহিনীর ঐতিহ্য মহাভারত-জাতক-আলিফ লয়লা-ওয়া-লয়লা থেকে বহতা—যা নানা সরিৎসাগর পার হয়ে একালে এসে ঠেকেছে, সেই কিস্‌সা-কাহিনী আর ইতিহাসে জুটি বাঁধবারও একটা লক্ষণ দেখা দিলে। আবার এ-কালীন মন তার উপর কারিকুরি করতেও ছাড়লেনা। এই সব মিলিয়ে-জুলিয়েই সেজে উঠেছে এই উপন্যাসের ফর্ম।

আর-একটা কথা। এ কাহিনীর মুখ্য কুশীলবেরা কেউ ইতিহাসের জমকালো জোব্বা চাপিয়ে আসে নি। তারা ইতিহাস-সম্ভাব্য জীব। ব্যক্তিগত বিপর্যয়ে তারা গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া; নোঙরছেঁড়া। গোরাকালার হাটে তারা স্রোতের শ্যাওলা। এমন সময় এল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তারই মহাবাত্যায় তারা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সঙ্গে ইতিহাসের আসরে এসে বসে গেল নিজেদেরই অজান্তে। তারাও ইতিহাসের শরিক হল।

গোরাকালার হাটে নিজেদের সমাজের ছকে, শ্রেণীর ছকে ইতিহাস তারাও গড়তে পারে—তারই সড়ক পড়ল।

সর্বশেষ কথা। এ-কাহিনী কাল্পনিক ; মুখ্য কুশীলবেরা এর কল্পনার জীব। তবে সে-কল্পনা নিতান্ত ভুয়ো নয়, প্রামাণিক পুঁথির আবহাওয়া তাদের ঘিরে আছে, তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস জোগাচ্ছে। তাই আজকের-কেউ যদি তাদের ভিতরে নিজের বংশলতিকার ঊর্ধ্বতন কোনো পুরুষের সন্ধান পান, তাহলে সেটা নিতান্ত আকস্মিক বলেই জানবেন। আর কোন সম্প্রদায় যদি হঠাৎ কোন কটাক্ষ অনুভব করে পীড়িত হন তো, তাঁরাও সেটা আকস্মিকতার পর্যায়ে ফেললেই বাধিত হব। সে-যুগের বাংলার কাল্‌চার আজকের বাংলায় হয়তো উপহসিত। সে-কালচারে পবিত্রতার শুভ্রতা আর কালিমার মসী দুই-ই ছিল। সেই সাবেক কালকে রূপ দিতে গিয়ে [illegible] এসে দেখা দিয়েছে। লেখকের অনুরোধ, কাল্‌চারের শুভ্রতাটুকুই [illegible]। আর মসী তো এখন আর নেই। সে তো অতীতের মতোই [illegible]ভূত। অলমতি বিস্তরেন।

২৫ শে বৈশাখ, ১৩৬৮
৯৬/১ পার্ক স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৭

অশোক গুহ

এ কি মোহানা ?

না, মোহানা তো নয়।

এ বুঝি সেই মহা খাত, যেখানে এক বেণী, দুই বেণী, শত, সহস্র, অযুত বেণী এসে মিশে যায়। এ বুঝি সেই তীর্থ, সেই সাগর-সঙ্গম।

হাঁ, তাই বটে।

ধারার পর ধারা এখানে ছুটে-ছুটে আসে, মিশে যায়, নিজেকে বি[illegible]-দেয়, উজাড় করে দেয়। আসে সেই ধারার তোড়ে ঝাঁকের [illegible] ঝাঁক।

মহাশোল, মহারোহিত, উঁচা নগরের উঁচ্‌কপালের দল। আবার নীচা নগরের কৈ, সিঙ্গি, চুনোপুঁটিও আসে। তাদের নাম আওড়ানো যায় না, গয়রহ টেনেই ইতি করতে হয়। বলতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঃ বেশ তো ! তবে কি মছলির কিস্‌সা ফাঁদলে ? মৎস্যপুরাণ আওড়াতে বসলে ? না ? ধান ভানতে তাহলে শিবের গীত কেন ?

ধান ভানতে শিবের গীতই তো গাইতে হয়, নইলে চলবে কেন ? আগের যুগের বাঙালী হলে বলতে ধান ভানতে মহীপালের গীত। মহীপালের নাম তো এখন ইতিহাসের পাতায়—তাই শিব দিয়েই কাজ চলুক।

একে মছলি কা কিস্‌সাও বলতে পার, আবার একটু মহাকাব্যের ঝাঁজ মিশিয়ে মৎস্যায়নও যদি বল আপত্তি নেই।

মাছের ঝাঁকের সঙ্গে এদের তফাত তো নেই।

এরাও আসে তোড়ে ভেসে, প্রাণ-চঞ্চলতায় কেউ বা পুচ্ছ নাচাতে-নাচাতে

আসে, কচি-কাঁচার উদ্দামতা নিয়ে সাঁতরায়, ফ্লাল্ দেয়, জল ছেটায়। কাউকে বা ভাসিয়ে আনে। গা এলিয়ে দিয়ে ভেসে ভেসে আসে। কেউ বা আসে খাবি খেতে খেতে। কেউ বা খাবি খেতে খেতে থির হয়ে দাঁড়ায়, কেউ বা পারে না। কেউ বা আসে ভাগ্যের খোঁজে, জটিল আবর্তে পড়ে ভাগ্য তলিয়ে যায়; আবার কারো বা ভাঙা ভাগ্য জোড়া লাগে। তক্ত-তাউসে গিয়েও পৌঁছায়। কেউ বা স্রোতের শেওলা, ভেসে ভেসে চলে যায়, আস্তানা গাড়ে না, ডেরা বাঁধে না। আবার কেউ বা চীন দেশের সেই স্বর্গের মাছের মতো। স্বপ্ন নিয়ে আসে চোখে, জলের বুদ্‌বুদ আর লালা দিয়ে সাতমহলা বাড়ি গড়ে। কেউ বা খড়-কুটো দিয়ে বানায় সুদিনের বাসা। হাওয়াই বুদ্‌বুদ ফেটে যায়, আবার গড়ার পালা।

ইট-কাট-পাথর, লোহা আর কংক্রীট দিয়ে গড়া আকাশী মিনার হয়তো সত্যিই একদিন আকাশ ছোঁয়, আকাশকে মুখ ভেংচায়। ভাঙবে বলে মনে থাকে সন্দেহের খোঁচা, তবু মুখে দর্প। বলে—না, না, এ অটুট, অক্ষয়! কিন্তু উপপ্লবের ঝড়ে নাড়া খায়। বিপ্লবের ঝড়ে চুরমারও হয়ে যায়। তবু আবার গড়ার স্বপ্ন, আবার গড়ার পালা।

মাছের সঙ্গে তফাত না থাকলেও আসমান-জমিন তাদের ফারাক। তারা কোন্ জীব?

তারা মানুষ।

সত্যই এসেছে তারা, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জুটেছে এখানে। কেউ বা এসেছে সাত সাগরের পার থেকে, যেখানে আছে টাওয়ার, যেখানে আছে নদীর তলায় আজব সুড়ঙ্গ। কেউ বা এসেছে সেই যেখানে প্রলয়পয়োধি জলে গোষ্ঠীপতি নোয়ার নৌকা আরারাত পর্বতের উপরে নোঙর করে ছিল—সেখান থেকে। সে স্মৃতি ধূসর হয়ে এসেছে, সেই স্মৃতি নিয়ে এসেছে পারস্যের ইস্পাহান কি জুলফা থেকে। কেউ বা এসেছে আবার সাগর পাড়ি দিয়ে, কেউ বা এসেছে উজবেকী মুলুকের ভিতর দিয়ে সমরকন্দ পার হয়ে, কাবুলকে পেছনে রেখে; কেউ বা এসেছে বাল্টিক সাগরের পার থেকে। আবার কেউ বা অতদূর থেকে আসে নি। এসেছে হিন্দুস্থানের নানা রাজ্য থেকে। পঞ্চবেণীর ধারা ধরে, রাজপুতানার মরুভূমি পার হয়ে; কেউ বা বাঙাল দেশ থেকে বাল্লামে চড়ে, কেউ বা রাঢ়দেশের শুকনো ধুলো উড়িয়ে।

কোথায় এসেছে?

এই সাগর-সঙ্গমে।

এরই আর এক নাম শহর।

শহরের আর এক নাম তো নগর।

তাম্রলিপ্ত কবে ছিল শহর। সেই দামলেপা, দামলিপ্ত। সাগর দূরে সরে গেছে, মরে-হেজে গেছে শহর। এখন সেখানে দামলেপার নাম জাগিয়ে রাখে তমলুক। আর সন্ধানীরা খনিত্র দিয়ে সেখানে খোঁজে শিলীভূত অতীতকে। ছিল রাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্র গুপ্তের সেই কর্ণসুবর্ণ, সে তো এখন রাঙামাটির স্তূপ। ছিল দণ্ডভুক্তি, পৌণ্ড্রবর্ধন, আরও কত কি নাম। সেদিনেরও শহর আছে জাহাঙ্গীরনগর—ঢাকা। আছে পুরানো শহর-বন্দর সপ্তগ্রাম। কিন্তু সরস্বতীর খাত গেছে শুকিয়ে, যমুনাও লুপ্তধারা। তাই সকরুণ স্মৃতি আর টিমটিমে শহর বাতিল করে দিয়ে এই শহর।

কেউ জানত না এর নাম। টিমটিম করত ক'খানি গ্রাম।

জেলে আর মালোদের বসত ছিল এখানে। ছিল কয়েক ঘর ধনী আর তাদেরই তাঁবেদার রণ-পাওয়ালা ডাকাত। আবার এরই মধ্যে দু-এক ঘর দত্তজা-মিত্রজা এসে বাড়িঘর তুলেছিল। দু-এক ঘর শেঠ-শেঠীয়া আমিরচাঁদ, বুলাকিপ্রসাদ আর হুজরীমলদেরও ঠাঁই হয়েছিল। সুন্দরবনের কাঠের লোভে তারা এসেছিল, ব্যাঘ্রতটীর কপিশচোখ বাঘের ভয় তারা করে নি। আর এসেছিল ইস্পাহান আর জুলফার সেই আর্মানীরা, সুতা আর ছুটীর ব্যবসায় তাদের তখন জম-জমাট। পর্তুগিজরাও না এসে পারে নি, এসেছিল তারা। তাদের হার্মাদ বলে ডাকত মানুষ। আবার ইংরেজও এসেছিল। সোরার খোঁজে, নিমকের খোঁজে। মালদার তুঁত বাগিচায় গুটিপোকা যে ঘুরে ঘুরে রেশমের গুটি তৈরী করে তারই খোঁজে। সোনারগাঁ-তীতাবাদী নদে-শান্তিপুরের চরকায় আর তাঁতে সন্ধ্যার শিশিরের মতো স্বচ্ছ শবনম্, জলধারার মতো নির্মল আবরোয়ান আর চোখের সুখ নয়ানসুখ তৈরি হয়—তারই লোভে। এসে গোমস্তা লাগালে, দেওয়ান লাগালে। দূর বাংলার দূর দূর প্রান্তে পাঠালে, আড়ং বসালে। তবু বসতি গড়ে নি তেমন করে। সুন্দরবনের হেতাল সুঁদুরী গেউয়া-গরানের ঢেউ যেখানে বয়ে গেছে, কে গড়বে সেখানে বসত!

তবু সপ্তগ্রাম মজে-হেজে গেছে বলে বসালে এখানে তাদের বাণিজ্যের ঘাঁটি, ফৌজদারের ভয়েও বসালে। যেখানে এখনো হিন্তাল বনে বন্য শ্বাপদেরা ঘুরে বেড়ায়, এখনো হরিণেরা গোল হয়ে পেছন ফিরে বসে জটলা পাকায়; এখনো ঘোঁতঘোঁত করে তেড়ে আসে শুয়োর, গায়ে ডোরা-কাটা বাঘ এখনো ছাডা ভিটের উপরে অঘোরে ঘুমোয়, এখনো তীক্ষ্ণদন্ত গণ্ডার খড়্গনাক তুলে পায়চারি করে—কে গড়বে সেখানে বসত?

ফৌজদারের ভয়ে পালিয়ে এল এক সাহেব। কেউ বলে, হুগলীর ফৌজদার শেকল দিয়ে গঙ্গায় বেড়াজাল দিয়েছিল, শিকলের বেড়াজাল সমশের তলোয়ার দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে চলে এসেছে। কেউ বলে, না না, সাহেবের কাছে ছিল এক মস্ত সূর্যমণিকাচ সেই কাচে সূর্যের তেজে আগুন জালিয়ে গঙ্গার দুপার ছারখার করে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। সাহেব তাই তাদের কাছে রূপকথার বীর। তার উপরে আংরেজ লোক, বিবি তার দিশী, দো-আঁশলা সন্তানের সে জনক। সেই সাহেব প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় গদি খুলে বসলে।

ধলা বেনিয়ার গদি। আর যত কালা বেনিয়া—মল্লিক আর সেন আর শীল, দত্তজা আর বোসজা, যত ঠাকুর আর অ-ঠাকুর সেখানে এসে মাল বেচতে লাগল। তারা বেনিয়ান হয়ে দাঁড়াল সাহেবের, মালে মালে ভরে উঠল তার গুদাম।

সাহেব আলবোলায় তামাক টানে আর বলে, ভেরী গুড্, ভেরী-গুড।

তারপর সন্ধ্যে হতেই সব ভোঁ-ভাঁ। সব সাফ। বট গাছের তলা সুনসান, নিঝ্ঝুম। কেউ বা যায় বাগবাজারে, কেউ বা গড়-গোবিন্দপুরে নিজের ডেরায়; কেউ বা বন-বাদাড় পাড়ি দিয়ে কালীর থান কালীঘাটে। সাবর্ণ চৌধুরীদের টুঙ্গী-কাছারিও নিঝুম হয়ে যায়, সেখানে খেরো-বাঁধানো খাতাগুলো পড়ে থাকে। লালদিঘীর হোরীর রঙে রাঙা খুনের মতো লাল জলে কালো আঁধার নেমে নেমে আসে। ধনসায়রের ঠাকুর আর দত্তদের বাড়ির ঘরে ঘরে মাটির দেরকোয় মাটির প্রদীপ রেড়ির তেলে জলে ওঠে; আবার ঝাড়-দেয়ালগিরিতেও তিমির তেলের চর্বির মোম ঝকমকিয়ে ওঠে। সে বুঝি কখনো-সখনো। তখন ফরাশের কাজ বাড়ে। সাহেবের সওদার হাটের খাঁচাগুলো পড়ে থাকে, অন্ধকারে ভেজে। অন্ধকার।

সাহেব চলে যায় ব্যারাকপুরে। সেখানে বীয়ারের বোতল খুলে বসে। স্কটল্যাণ্ডের খেতের যব আর রাই মিশিয়ে যে ঝাঁজালো সুরা চোলাই হয়, সেই সুরা মিশিয়ে দেয় বীয়ারে, গেঁজলা ওঠে, সাদা ফেনা ওঠে, বুদ্‌বুদে ভরে যায়। তারপরে চুমুকে-চুমুকে খায়।

গানের কলি গুনগুন করে ওঠে মগজে। হয়তো বিবির সঙ্গকামনায় উসখুস করে। হয়তো বা আবার আলবোলার নলে সুখ খুঁজে পায়।

সুরার নেশা আর ধূম্রজাল মিলে স্বপ্নও দেখে হয় তো সাহেব। এক আজব শহরের স্বপ্ন! ইটের পরে ইট গাঁথা হচ্ছে। রাজমিস্ত্রীর হাতুড়ী ঠুকঠাক আওয়াজ তুলছে, কর্নিক মারছে ঘা। দেখতে দেখতে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বাড়ি। বাড়ির পর বাড়ি। আর তার মধ্যে পিলপিল করে এসে ঢুকছে মানুষ-কীট।

কীট?

কীটই তো মানুষ। সাহেব জানে সাদা পিঁপড়ের কথা। সেই যে যাকে বলে বল্মীক। সেই বল্মীকের স্তূপ এই শহর। সাদা পিঁপড়ের স্তূপ—হোয়াইট য়্যাণ্ট-এর ঢীপ।

সেই স্তূপ গড়ছে, গড়ে যাচ্ছে, গড়ার শেষ নেই।

স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকে সাহেব, হয়তো বিবি এসে ডাকে।

সাহেব শুনতে পায় না, স্বপ্নের শরিক সে।

আবার হয়তো শুনতে পায়, জড়িত স্বরে, স্খলিত নলটা চেপে ধরে বলে, ডিয়ারী! ডিয়ারী! ইউ আর ওয়েটিং ফর মি! হামার জন্যে আছে, ডাঁরাইয়া আছে? হামি আসিটেছে! হয়তো অমন ভাঙা বাংলায় বলেও না, হিন্দির সঙ্গে মিলিয়ে দেয় ইংরেজীর খোঁচ্।

নারী অপেক্ষমানা, তার লীলায়িত বাহু দিয়ে কণ্ঠ জড়িয়ে ধরবার জন্য ব্যগ্র। থরথর করে কাঁপে দেহ—যেন বিদ্যুৎগর্ভ। সাহেবের বীয়ারের নেশা মাথায় চড়েছে, তার রক্তে কামনার য়্যালকোহল মিশে যায়। সাহেব সাড়া দেয়, ছুটে যায়। কিন্তু তবু ক্লান্তির পালা গ্লানির পালা যখন আসে, তখন আবার স্বপ্ন দেখে। আবার সেই ইমারতময় শহরের স্বপ্ন। লন্ডন শহরের ছাঁচে, পারীর ছাঁচে এক মহাশহর, মহানগর, এ গ্রেট সিটি!

মধ্যযুগের সেই রাজা আর্থারের জাদুকর মার্লিন জাদুকাঠি ছুঁইয়ে এক

লহমায় গড়ে দিতে পারে সেই শহর, পারে আরব্য কিস্‌সার মঘরিবী মায়াবী। পারে এদেশী ফকির সে শহর বের করে দিতে জাদুই ঝোলা থেকে তার ভানমতীর দোহাই পেড়ে। পারবে কি সাহেব?

পারল সাহেব। বেনিয়া কোম্পানীর লড়িয়ে সাহেব, কুঠিয়াল সাহেব পারল। বাঙালীর রক্তে সে শহর ভিজল। তার ইটে রক্ত মিশে আস্তর লাগিয়ে দিলে। ভিত শক্ত হল। কায়েম হল শহর। সাহেব সেই শহরে দেহ রাখলে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে। সাহেব শহরের নাম রেখে যেতে পারলে না। নিনামা শহরেই সে মরল। আরও কত সাহেব এল, গেল, কত স্বদেশী বিদেশী এসে আস্তানা গাড়ল, ছত্রিশ জাতের মানুষ ছত্রিশ ভাজা হয়ে রইল এখানে। সাড়ে ছত্রিশ-ভাজাও বলা যায়। আর বাঙালীও রইল তাদের সঙ্গে মিলেমিশে। বাংলার শহর হল, কিন্তু একা বাঙালীর শহর নয়। আংরেজের শহর, ফেরঙ্গের শহর, শেঠ-শেঠিয়ার শহর, ধনীর শহর, গরীবগুরবোর শহর। কালা আর গোরা মিলে সে শহর গড়ল। কালা আর গোরার বাঘডোরা-আঁকা আঙিয়াখানি যেন শহর।

আজও সে-শহর গড়া শেষ হয় নি। বল্মীকেরা গড়ছে শহর; দিকে দিকে উইয়ের ঢিবি ভুস করে জেগে উঠেছে। আবার সেই ঢিবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে।

সাহেবের স্বপ্নের ঘোর বুঝি মহা-মৃত্যুও ঘোচাতে পারে নি। সমাধি ফলকের নীচে কফিনে পচে-গলে গিয়ে সাহেব আজও স্বপ্ন দেখছে। আজও সেই স্কচ হুইস্কী আর বীয়ারের নেশা টোটে নি। আজও আছে। আজও তাই আসছে দলে দলে মানুষ। আজও ঢাক-ঢোল-শোহরতে তার সীমা বাড়ছে, অক্টোপাস বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আজও—হাঁ—আজও।

মকরন্দ এসেছে এ-শহরে।

সেও সেই পিলপিলে পিঁপড়ের পালের শামিল। সেও বল্মীক, 'হোয়াইট র‍্যাণ্ট'—সেও চায় স্তূপের ভেতর স্তূপ তৈরি করতে। নিজের ডেরা গড়ে নিতে। সে মহাশোল, মহারোহিতের মিছিলে আসে নি, এসেছে ঝাঁকের-কৈ হয়ে। তাঞ্জামে চড়ে আসতে পারে নি আসাসোঁটাধারী কারপরদাজ আর আট বেহারার জাঁকজমক দেখাতে পারে নি, আসে নি আরবী ঘোড়ার পিঠে টগবগিয়ে সোয়ার হয়ে, আসে নি হাতীর হাওদায় বসে দুলতে দুলতে। সে এসেছে বালামে চড়ে, ব্যাপারীর চালের নৌকায়। তাও সে মালিক নয়, মুনিম নয়, এসেছে যাত্রা নৌকায় অনুগ্রহপ্রার্থী আরোহী হয়ে। এসে ছিটকে পড়েছে এইখানে—এই আজব শহরে। এরই জটিল আবর্তে পড়ে পাক খাচ্ছে, হালে পানি পাচ্ছে না। অথচ যে গঙ্গাস্রোত কুলের কুলপ্রদীপ না হোক, কুলের টেমি তো বটেই।

তার বংশ তো হেঁজিপেঁজি নয়। সেই যে শূররাজা আদিশূর—সেই শূর চাইলেন বৌদ্ধদেশে হিন্দুধর্ম জাঁকিয়ে তুলতে। সংঘারাম ভেঙে তারই ইট-কাট-পাথর দিয়ে মন্দির গড়তে। সে মন্দির গড়তে হলে চাই কনৌজী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। পৈতে-ত্যাগী বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ হলে চলবে না। তাঁদের উপবীত হবে যেমন সাদা, তেমনি ব্রহ্মণ্য তেজ ধিকিধিকি জ্বলবে চোখে। রাজা সেই ব্রাহ্মণদের ডাকলেন, তাঁদের রক্ষক হয়ে এলেন তাঁর বংশধর। ব্রাহ্মণেরা এলেন গোযানে, আর রক্ষকেরা কেউবা পাল্কিতে কেউবা হাতীর হাওদায়। কিন্তু তার পূর্বপুরুষ এসেছিলেন ঘোড়া দাবড়িয়ে। সে বংশের কুলজী আছে তালপাতায় লেখা পুঁথিতে—সে-পুঁথি পড়ে দেখেছে।

ঘটকেরা বিয়ের আসরে সেই পুথি মুখে মুখে আওড়ায়। এই তো তার বোনের বিয়েয় আউড়ে ছিল সেদিন। বল্লাল কুলপালক। কুলপালন করেছিলেন বল্লালসেন। সেই বল্লালসেনের ফরমানধারী কুলীন তারা। বিদ্যা বিনয়ের এক-একটি স্তম্ভ। তাই মকরন্দও গোমুর্খ হয়ে থাকে নি।

সেই যে—পশ্চিমে ঘাঘর নদী
পুবে ঘণ্টেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রীগ্রাম
পণ্ডিত নগর—

সেখানে টোলে পড়বার অধিকার সে পায় নি। ক্ষত্রিয় হলেও সে নিবন্ধকারদের ধাপ্পায় পড়ে কায়স্থ, শূদ্র বলে পরিচিত। তবু সংস্কৃত সে পড়েছে ঘরে বসে, ভাল করেই পড়েছে। আলিফ্-বে-পে-তের তালিম নিয়েছে মৌলভীর কাছে। হাফিজ আওড়াতে পারে সে, গোলেবকাউলির কিস্সা বলতে পারে, আবার সারেঙ্গী বাজিয়ে গজল গাইতে পারে দ্রাক্ষাবনের; আবার রাগ-রাগিনীর আলাপও সেতারে বাদ যায় না।

তাই তো দেহেরগতির বসুকন্যা রাইকামিনীর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, মাথায় নক্সীদার কাবা টুপী, কামদার মলমলের কলিদার পাঞ্জাবি, চুস্ত্ পায়জামার বহর দেখে সখীদের নিয়ে সে পালিয়ে গিছল। সভয়ে বলেছিল,

ওমা—তুর্কী আইছে গো, মুঘল আইছে গো!

সেই এক লহমার দেখায়ই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মকরন্দ। মদন মেরেছিল ফুলশর, কেঁপে উঠেছিল থরথর। মন বলে উঠেছিল, লয়লি, মেরিজান লয়লি। আবার কালিদাস ফুট কেটেছিল মগজে।

ডাগুর মেয়ে, সীঁথায় সিঁদুর নেই। একটু বা খটকা লেগেছিল মনে কিন্তু মেঘডুম্বুর শাড়ির পাছা-পাড়ের বাহার ঝলসে উঠতেই খটকা দূর হয়েছিল।

সাথী-সঙ্গীদের বলেছিল, এই মেয়ে না হলে বিয়ে করব না!

নৈব নৈব চ! কভী নেহী!

সাঙাতেরা মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল,

কুলীনের পোলা, কুলীন-মাইয়া
হবেই হবে এমন বিয়া।

সাহস পেয়েছিল মকরন্দ। বুকে বল পেয়েছিল। সে শহর-মুর্শিদাবাদে যায় নি, কিন্তু গাঁয়ে থেকেও ফারসী কেতা শিখেছে, নাগরালি শিখেছে দরবারী। তাই তুলোট কাগজে খাগের কলম দিয়ে লিখেছিল গোটা গোটা করে পুথি-নকলনবীশের ধরনে এক খরিতা, এক পত্র, এক লিপি।

সমাজ আছে, সমাজে ঘোঁট আছে, তর্জন-গর্জন আছে, সে ভয় করে নি। প্রেমে সে তখন অকুতোভয়। গোরোচনা গোরী কিশোরীকে লিখেছিল চিঠি।

কি লিখেছিল বয়ান আজও মনে আছে।

কন্যা,

তোমারে হেরি উন্মত্ত এ চিত্ত, তোমারে না পাইলে দেওয়ানা হইব। ইতি

আলাপিনী এক যোগাড়ও হয়েছিল। সে শোনায় পাড়ায়-পাড়ায় কাঞ্চনমালা, অরুণ-বরুণ-কিরণমালার কাহিনী, তাকে দিয়ে লিপি পাঠিয়ে দিয়েছিল বসুদুহিতার কাছে, সঙ্গে দিয়েছিল তাজা এক রক্তগোলাপ। বসরাই গুল ফুটেছে বাকলার বাগিচায়, তারই একটি।

লিপিতে আতরদান থেকে এক ফোঁটা আতর বুলিয়ে দিতেও কসুর করে নি।

তারপরে তো প্রতীক্ষা, অন্তর্দাহ, ছটফটানি, কস্তুরী মৃগের জ্বালা। লোকনিন্দার ভয়। মুহূর্ত যেন যুগ। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলাপিনী রসবতী নারী এসে বললে,

কুমার গো কুমার,
কাঞ্চনমালা তোমার হইল এবার।
তারে ভুজে বান্ধ্যা দাও
বুকে তারে তুল্যা লও।

এক টুকরো লেখন তুলে দিল তার হাতে।

গোটা গোটা মেয়েলি ছাঁদে লেখা—যেন মুক্তা বসিয়ে রেখেছে। কোন সম্বোধন নেই। নেই অজ্জউত্ত, আর্যপুত্র, নাথ, পিয়, পিয়ারে সম্ভাষণ—শুধু দু'ছত্র পদ্য।

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন,
লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৈবন।

আর কিছু নেই, শুধু ঐ দুটি ছত্র?

কিন্তু ঐ দুটি ছত্রে দুলে উঠেছে কালিদাসের উমার সেই অবনমিত মুখের কামনা, লয়লার ব্যথা, দুলে উঠেছে সমস্ত শৃঙ্গার তিলকম, শৃঙ্গার অষ্টকমের কামমোহ। কামনার সাগর, প্রেমের সাগর মথন করে, ছেনে-ছেঁকে বুঝি এ অমৃত উঠল। আর সে তারই ভোগ্য। সে পান করবে অমৃত, কিন্তু আছে অনুশাসন।

সে আলাপিনীকে শুধালে, এ কার পদ্য?

আলাপিনী বললে, সেও শুনেছে, কার সে জানে না। পরণকথার নাম জানে। মলুয়া। আর সেই মলুয়ার মনের কথাই বসুদুহিতার মনের কথা। তাই তো এই ছত্র-কটি লিখে দিয়েছে।

আলাপিনী, হেসে-হেসে বললে, আমার বকশিশ কই?

বটুয়া থেকে চাঁদির সিক্কা বের করলে মকরন্দ।

চাঁদিতে কি চান্ পাওয়া যায়, চাঁদিতে মেলে জমির ঘেঁটুফুল, মুখ ঘুরিয়ে, রূপোর চন্দ্রহারে দোলা দিয়ে, নথ নেড়ে বলেছিল ঘটকী-আলাপিনী। চাই আকব্বরী মোহর!

মকরন্দ লজ্জিত হয়েছিল। তাড়াতাড়ি থলিয়ার ফাঁস খুলে সঞ্চিত মোহরের একটি খসিয়ে দিয়েছিল।

ঘুরে ঘুরে কুর্নিশ করে সেলাম বাজিয়ে বলেছিল আলাপিনী, বহুত খুশ, বহুত-বহুত সেলাম! তারপর সুরের ঝঙ্কার তুলেছিল—

চান্ ধরি, চান্ ধরি
আসমানের চান্ আসমানে থাউক
জমিনের চান্ ধরি।
চান্ ধর্য়া আনি চানের কাছে
চানের ফুলঝুরি।
চানের হাট বসাইয়া দিই
চানে চানে চুমকুড়ি।

তারপরে মকরন্দ গাঁয়ে ফিরেছিল।

খায় না দায় না মকরন্দ। চই দিয়ে কৈমাছ রেঁধে দেন মা, মোচার ঘণ্ট রাঁধেন বড়ি দিয়ে, ইলিশ মাছ ভাতে দেন; চিতই পিটে ভাজেন

ফুলের মতো। পঞ্চাশ ব্যান্ননে পঞ্চাশ বাটি থরে থরে সাজিয়ে দেন। খায় না মকরন্দ। এটা নাড়ে, ওটা নাড়ে, নাড়ে-চাড়ে খায় না। সরপোশ সরিয়ে ঝকঝকে খাগড়াই খোরায়-রাখা কর্পূর জলে চুমুক দিয়ে উঠে পড়ে।

মা সাধেন, ভজেন, হাত ধরে বসাতে চান, শোনে না ছেলে। আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। মা হাপুস নয়নে কাঁদেন।

বাপ চন্দ্রকান্ত কলকেয় ফুঁড়ুৎ চড়িয়ে টানেন, চোখ যেন লাল করমচা। তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েন মা-শরৎসুন্দরী।

দম তখন দেওয়া হয়ে গেছে, ফুট্ করে ফেটেছে পেয়ারা পাতার ভেতরের মাল। এখন মগজে তারই বিস্ফোরণে সব ওলট-পালট হয়ে আছে। কেমন ঝিম-ঝিমন্ত ভাব। তাঁকে একবার ডাকতে হয়, দুবার ডাকতে হয়, এবার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে হয়।

সাড়া ছান না ক্যান্?

শিবনেত্র তুলে তাকান চন্দ্রকান্ত, য়্যাঁ!

য়্যাঁ-কি, ছাওয়াল যে ফকির হইয়া যায়!

ফকির! আমার ছাওয়াল ফকির!

হাঁ গো হাঁ, ছাওয়াল খায় না, দায় না।

চন্দ্রকান্তের ঠোঁটে পুষ্ট গোঁফের উপর দিয়ে হাসির ঢেউ বয়ে যায়।

ফকির হবে আমার ছাওয়াল! না, না, ও চায় বিদেশে যেতে, ও চায় আশ-গু হতে।

সে আবার কেডা গো?

চন্দ্রকান্ত হাসেন। স্ত্রী লেখাপড়া জানেন না। কুলীনকন্যা হলেই সাতখুন মাপ, তার উপরে রূপও কিঞ্চিৎ আছে। সেই জোরেই এ বংশে এসেছেন। কলম ধরেন নি কখনো, ধরেছেন জন্ম থেকেই হাতা-বেড়ী-খুন্তি। সৌকালীন গোত্রের ঘোষ-কন্যা। নবাব সরকারে দস্তকের বিলিদার হয়ে দস্তকদার লেজুড় জুড়েছেন বংশের নামের শেষে। লেজুড়ে লেজুড় জুড়ে বাহার খুলেছে। কোঠা-বাড়ি বালাখানা তৈরি হয়েছে। সেই ঘোষ-দস্তিদার বংশের কন্যা তিনি।

চন্দ্রকান্ত বলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষের মতোই একজন মানুষ। সাতগাঁয়ে গিয়েছিল এখান থেকে। তারই বংশে মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

তাই কন! প্রতাপরে চিনি না। আহা, মাইয়াডার কি দুঃখ! রামচন্দ্রর

তো নিল না, সেই হাটের কাছে নৌকায় বইস্যা রইল। বাপের বাড়ি থিকা আসার সময় বৌঠাকুরাইনের হাট তো দেখছি। আমার দাদা তো নিতে চায় ঢাকায়, যাউক না।

না, ও কারো সুপারিশে যাবে না, মহামানী চণ্ডেশ্বর গুহের সন্তান তো!

আর একবার কলকেয় দম দেন, নেশায় আর একটু রং চড়ে।

শরৎসুন্দরী ঢাকার নকসী শাঁখাপরা হাতদুটি নেড়ে কঙ্কণ আর নোয়ার ঝংকার তুলে বলেন, না, না, যাবে না: ওর বিয়া দ্যান, আপনে ঘর লইবে। আমার এক পোলা, কোন দুঃখে বিদেশে যাবে! বিভুঁইয়ে যাবে! ওর বিয়া দ্যান!

ঘটকদলের অমনি ডাক পড়ে। গুহ-বংশাবতংস কন্দর্প-সমান মকরন্দের পাত্রী চাই। ঘটকেরা এসে কন্যার গুণ-ব্যাখ্যানের চাইতে বংশ-গরিমার কথাই বলে। কুল তো রাখতেই হবে, কুলের আঁঠি তো জীইয়ে রাখতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে। গঙ্গাস্রোত-কূলে অন্য কুল এসে হানা দিতে পারবে না। স্রোত আবিল হয়ে উঠবে না। যদিও গঙ্গার ধারায় আবিলতা আছে, কিন্তু কুলের ধারায় কখনো নয়। তাই বাঙাল দেশে কুলের কথা উঠলে বলে, কুলের আঁঠি।

যত সম্বন্ধ আসে, চন্দ্রকান্ত শরৎসুন্দরীর কাছে বংশের কথা বলেন। হয়তো বলেন, এঁরা নথুল্লাবাদের বসুরায় মীরবহর। মেয়েটিও মন্দ নয়। উজ্জ্বল শ্যাম।

নথ নেড়ে বলেন শরৎসুন্দরী, কুলের আঁঠি নিয়া কি আমি ধুইয়া খাব! মাইয়া তো উজ্জ্বল শ্যাম! ঘটকা-ঘটকিরা ওকথা কয়, শেষে উঠানে আইসা যখন দাঁড়ায় তখন তো রক্ষাকালীর মতো দেখায়।

কর্তা হেসে বলেন, তাহলেও কুল ভালো, দেবে-থোবে ভাল। এতো আর দত্তকবেচা আমলা নয়, এ রীতিমত জঙ্গী, নবাবের নৌ-বহরের সর্দার। এদের মেয়ের আয়-পয় খুব।

থাকেন আপনের আয়পয় লইয়া! আমি কালা ম্যাঘ ঘরে আন্যা কালা বাও বহাইতে দিমু না।

গুহজায়া শরৎসুন্দরী রাগে গর্‌-গর্‌ করতে করতে চলে যান।

নথুল্লাবাদ বাতিল হয়, ভাতশালার ঘোষ এসে সে জায়গা দখল করে;

আবার মালখানাগরের বসু-ঠাকুরও এসে দেখা দেয়। কিন্তু গুহ-বিশ্বাস-জায়ার পছন্দ হয় না। আবার গুহজায়ার পছন্দ হয় তো, গুহজার হয় না। কর্তার কোষ্ঠী-বিচারে রাজযোটক হলেও, গিন্নীর ডানাকাটা পরীর স্বপ্ন উড়ে এসে সব তছনছ করে দেয়। ছেলের কপাল লিখন বুঝি আইবুড়ো থাকবে। কনিষ্ঠার পর্বের নীচে নাকি অমনি একটা রেখা পড়ো-পড়ো। এখনো দেখা দেয় নি কিন্তু দেখা দিতে কতক্ষণ।

কি জানি কি আছে কপালে। শরৎসুন্দরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, কিন্তু গোঁ ছাড়েন না। এদিকে কর্তা চন্দ্রকান্তও কুলের আঁঠি বাতিল করতে নারাজ।

কি দশা মকরন্দের?

মকরন্দ যক্ষের মত বিরহী, মজনুর মত দেওয়ানা। শরীর তার শীর্ণ, কনকবলয় তার নেই, তাই স্খলিত হয়ে পড়ে নি, কিন্তু কনকতাবিজ তো ঢলোঢলো। সে হা-হুতাশ করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মেঘ দেখলে আওড়ায় মেঘদূত, বলে,

> সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
> সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য
> হে পয়োদ, হে মেঘ, তুমি তো তাপিতের আশ্রয়,
> তুমি আমার সমাচার নিয়ে যাও প্রিয়ার কাছে।
> প্রিয়ার বাহু থেকে আমাকে তো বিচ্ছিন্ন করে এনেছে ধনপতি কুবেরের ক্রোধ

আওড়ায়; মেঘ সাজে আকাশে, ডম্বরু বাজে তার, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে মকরন্দ। চোখ দিয়ে জল ঝরে, বিশীর্ণ গাল বেয়ে ঝরে পড়ে।

যেখানে যায়, সেখানেই দেখে প্রিয়াকে। ঐ মেঘে তো তার আলুল কেশ, ঐ দীঘির কালো জলে তো, তার আয়ত নিবিড় দুটি কালো কৃষ্ণ চোখ। ঐ যে সরল শিশুগাছ—ও তো প্রিয়তমারই সুঠাম তনুর তনিমা। ঐ গাছ যেমন তিলে তিলে বাড়ছে, তেমনি, তেমনি বাড়ছে ঐ সুন্দরী। শিশুগাছ জাপটে ধরতে যায় মকরন্দ, লজ্জায় পারে না। অথচ শ্রীরামচন্দ্র বুঝি পেরেছিলেন!

ঐ তো কদম ফুটেছে। ওই কদমের কাছে গিয়ে তিনি না বলেছিলেন,

হে কদম্ব, আমার প্রিয়া ছিলেন কদম্বপ্রিয়া, তিনি তোমাকে ভালবাসতেন— তাঁকে দেখেছ? তাঁকে দেখে থাক তো বল। ঐ যে অশোক রক্তরাগে দশদিক আলো করে নত হয়ে পড়েছে স্তবকে-স্তবকে, তার কাছে গিয়ে কি বলেছিলেন?

অশোক শোকাপনুদ শোকাপহতচেতনম।

অশোক, শোকে আমি চেতনাহীন, প্রিয়ার বার্তা বল, আমাকে অশোক কর।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নরদেবতা, তিনি যা পেরেছিলেন বিরহে, তা তো পারে না মকরন্দ গুহ। সে গুমরে মরে।

শেষে মাকে সে বলেই ফেলল, দেহেরগতির বসুকুলকন্যা রাইকামিনীকে সে দেখেছে, মজেছে, তনু-মন তাকে সমর্পণ করেছে। সে কন্যা অন্যপূর্বা নয় তাও জেনেছে।

মা শুনলেন, নিজে ঘটক ডেকে এনে আড়াল থেকে কথা কইলেন। দেহেরগতির মেয়েকে ঘরে আনতে বাধা রইল না। সমান কুল, কন্যা যেমন কুলবতী, তেমনি রূপবতী, আবার বিদুষীও। মৈত্রেয়ী নয়, খনা নয়, কিন্তু কাব্য জানে, শাস্ত্র জানে, মহাজন পদাবলী আখর দিয়ে দিয়ে গায়। এক কথায়, কন্যা অতুলনীয়া।

তবে গৌরী দানের বয়েস পার হয়ে গেছে। একটু বা বেশী ডাগর। তা সবই কি জোটে? একরকম মন-মতো সম্বন্ধ।

কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র যদি বাধা দেয়। যদি কারসাজি ঘটায়?

ঘটালোও তাই।

রাজ-যোটক কোষ্ঠী, কিন্তু কোথায় যেন গ্রহের ষড়যন্ত্র আছে। ধরা যাচ্ছে না। কি যেন হবে।

জ্যোতিষীর মুখ গম্ভীর। চক্রের ভিতরে খাগের কলম ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলেন, আঁক কষলেন। উঁহু বোঝা যাচ্ছে না। তবে কন্যা স্বামীহন্ত্রী নয়, কিন্তু বিপর্যয়-আনয়নকারিণী। কমলবৎ করতলও দেখা হল। পদ্মিনী কন্যা, সুলক্ষণা, কিন্তু ভাগ্যরেখায় পড়েছে ছেদচিহ্ন। বায়সের পদচিহ্নের মতো কাটা-কুটো আছে।

বিয়ে ভেঙে যায়-যায়।

শেষে গিয়ে কুলগুরুকে ধরল মকরন্দ। বাকলার প্রান্তসীমায় হরিখেলের

কোটালিপাড়ায় তাঁর বাস। এ সেই নব্যাবণিকা, সমুদ্রের নাব্য অঞ্চল বিদ্বজ্জন বসতি।

কুলগুরু কোষ্ঠী দেখলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন।

শুধু বললেন, তুমি বাগ্‌দত্ত?

হ্যাঁ, উত্তর দিলে মকরন্দ মুখ নীচু করে।

গুরুদেব আবার যুগ্ম ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, তারপর কোষ্ঠীতে মন দিলেন।
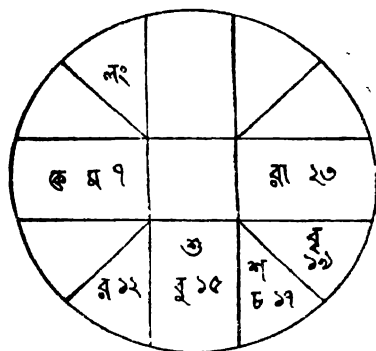
৭ম পতি নীচস্থ এবং ৭ মে—শ, চ; অধিকন্তু ৭ম পতি কেতুগ্রস্ত ও রাহু দৃষ্ট। শুক্র স্বক্ষেত্রী—সুগঠিতদেহা, সুদর্শনা। কিন্তু ২য় পতি ৬ষ্ঠ পতিযুক্ত থাকায় মতিভ্রম এবং শুক্র-মঙ্গল দ্বারা দৃষ্ট। এই কারণে নারীর বিপদগ্রস্তা হবার সম্ভাবনা।

গুরুদেব মুখ তুললেন, মুখ গম্ভীর। তারপরে বললেন, ফলাফল তাঁর হাতে, কিন্তু এ বিবাহ হবে। তবে যজমানের জন্য আমি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করব। আর একটা কথা—একটু বা বিচলিত বোধ করলেন। বিবাহ কর, কিন্তু স্ত্রীতে উপগত হবে না। বৎসর পার হয়ে বক্রী গ্রহ আবার যেদিন ঋজু হবেন, সেদিন আমি গ্রহযজ্ঞ করব, সেদিন শুদ্ধচিত্তে সহধর্মিণী-সংসর্গ করবে।

গুরুদেবকে প্রণাম করে প্রণামী রজত-মুদ্রা দিয়ে চলে এল মকরন্দ।

বিবাহে আর বাধা রইল না। গোধূলি লগ্নে বাজল দেহেরগতির বসুদের ঘরে সানাই, সশীর্ষ-ডাব মঙ্গল কলসে-কলসে সাজানো হল, কদলী বৃক্ষ রোপিত হল। চেলীর জোড় আর চেলীর শাড়ীতে গাঁঠছড়া বাঁধা হল। কামস্তুতি পাঠ করলে মকরন্দ—কাম সম্প্রদান করছেন, কাম করছেন প্রতিগ্রহ, কামই কামকে প্রদান করছেন কামিনী। আমাদের কাম পূর্ণ হোক!

মন্ত্রোচ্চারণ করে রাইকামিনীর পাণিগ্রহণ করলে মকরন্দ। কুশণ্ডিকার প্রজাপতিচক্রের চারিপাশে তারা প্রদক্ষিণ করলে। দুই হৃদয় এক হল, দুই জীবন এক হল।

সেদিন বাসরের কথা মনে পড়ে মকরন্দের। এ যেন সেই লখিন্দরের লোহার বাসর। কখন কাল নাগ এসে দেখা দেবে কে জানে। পালঙ্কে বসে আছে কন্যা—রাইকামিনী। যারা রহস্য করতে এসেছিল, সেই বাসর-জাগানীরা চলে গেছে।

তারা এখন আনাচে-কানাচে আড়ি পেতেছে, পাতন দিচ্ছে। মকরন্দ একধারে বসেছিল, সরে এল কাছে। ডাকলে, রাই!

রাইয়ের সাড়া নেই।

আবার ডাকলে, কামিনী, আমার কামিনী-কোরক!

এবারও সাড়া নেই।

আরও কাছে সরে এল মকরন্দ, হাতখানি ধরতে গেল।

বধূ সরে গেল।

মকরন্দ ভুলে গেল গুরুর বিধান, সে সবলে তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।

জয়দেবের নাগরিক কৃষ্ণ যেখানে কবি হয়ে উঠে বলছেন কথা, এ সেই কথা—একথায় খাদ নেই। এতো সরল কথা, সুন্দর কথা, সহজ কথা।

কিন্তু কন্যা আকুলি-বিকুলি করছে আলিঙ্গনে। সে মুক্তি পেতে চায়। সে বলে উঠল, না, না!

কেন?

ভুলে গেলেন? আমি যে বিষকন্যা।

বিষকন্যা নও, তুমি অমৃত পুত্রী, অমৃত কন্যা।

হাসল রাইকামিনী। ডালিমের দানার মতো দাঁত, তুষারের টুকরোর মতো দাঁত ঝক-ঝকিয়ে উঠল।

কিন্তু সে তো কালরাত্রি গেলে।

মানুষের কালরাত্রি একদিন, আর আমাদের কালরাত্রি একবৎসর। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মকরন্দ।

রাই কঙ্কণের খাঁজ খুঁটছে নিচু হয়ে, বুঝি এবার উদ্গত অশ্রু দমন করছে।

বাসরশয্যা তো এখানে গ্রহের নাগপাশে বন্দী। সে নাগপাশ আগে খুলুক, খসে পড়ুক!

ওদের শুয়ে পড়তে দেখে রহস্যের গন্ধে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল রসিকা নায়রীরা। কিন্তু দীপাধারের জ্বলন্ত প্রদীপ সে-উৎসাহ এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলে। পাত্তন-দিওনীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে গেল। ওরা শুয়ে রইল। প্রদীপ জ্বলতে লাগল। বাসরশয্যা খণ্ডিতশয্যা হল, বিরহ শেজ ভেল।

কালরাত্রি শুরু হয়ে গেল বিবাহের পরদিন থেকে নয়, বিবাহের দিন থেকেই। দীপাধারে দীপ নেবানো হল না, সলতে পুড়তে-পুড়তে একসময়ে আপনা থেকেই নিবে গেল।

কিন্তু তখন তো আর কামমোহ নিয়ে জেগে নেই দম্পতি।

বিয়ের রাত্রি থেকেই কালরাত্রি শুরু হয়ে গেল।

কাল রাত্রি, অমা রাত্রি, ঘোরা রাত্রি।

এ রাত্রির শেষ নেই, অনন্ত, অশেষ রাত্রি।

অতিচারী গ্রহ আর উপগ্রহ রাহু-কেতুর দাঁতে ফুলশেজ ছিন্নভিন্ন, চক্রবাক-চক্রবাকীর মতো ওরা বিচ্ছিন্ন। যাও আলোর ফুলকি ছিল, মুছে গেল, দ্বিরাগমনের পরেই নামল কালরাত্রির জমাট কালিঘটা।

এ-রাত্রি দিনের আলো তার কালো চুলে মুছে দিলে, দিনই এখন রাত মকরন্দের কাছে। গাঁয়ের ঘাটে বসে থাকে, নয় তো নিজের কোটরে বন্দী হয়ে রাইয়ের ধ্যান করে। জপ করে তার নাম। কাজকর্মে মন নেই, পুথি এখন শিকেয় তোলা।

মা বলেন, বা কোথা থেকে ঘুইর‍্যা আয়।

বাপ সমুখে কিছুই বলেন না, মাকে শুনিয়ে বলেন, তোমার ছেলে যে আশ-গু হবে, নবাবের ফরমান আনবে—তার কি হল?

মা চুপ করে থাকেন।

আষাঢ় এসেছে বহুদিন, কিন্তু রৌদ্রের রূপ ঘোচে নি। ফোটে নি গাছে গাছে কদম, দূর্বাদলে লাগে নি শ্যাম ছোপ। মাটি মরা; চারিদিকে বিষম খরা। দীঘির জল শুকিয়ে গেছে, খাল-বিলে শুধু কাদা আর কাদা, জল নেই। এমনি দিনে হঠাৎ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আকাশে মেঘ করে এল,

নামল ধারা। মত্ত ঐরাবত যেন এতদিন শৃঙ্খলে বন্দী হয়েছিল পিলখানায়; ছুটে এসেছে শেকল ছিঁড়ে, আর ধারাসারে ঘট উপুড় করে দিয়েছে, উজাড় করে দিয়েছে। নিজের লীলায় মেতে উঠেছে।

এতদিন পুঁথির তোয়াক্কা রাখে নি মকরন্দ, এবার শিকে থেকে লাঞ্ছিত পুঁথি পেড়ে নিয়ে মেলে বসল। আর পহেলা পুঁথিই মেঘদূত। মেঘরাজ্যের আলোড়ন মনোরাজ্যে ছায়া ফেলল। পুঁথি পড়তে পড়তে কামাতুর যক্ষের মতো উন্মাদ হয়ে উঠল মকরন্দ। পুঁথি রেখে মার কাছে গিয়ে বললে—

মা, মামার বাড়ী যাব!

কবে?

আজই—এখনি।

মকরন্দ তালপাতার ছত্রে মাথা ঢেকে উঠল গিয়ে ডিঙিতে।

বাগানের লাল গোলাপ নিতে ভুলল না। জোড়া গোলাপ নিলে। জোড়া যেন হৃৎপিণ্ড, তার ভিতরে আছে তাজা খুন। একটু টুসকি দিলেই বুঝি ঝরে পড়বে।

আপন ডাইনে চলেছে নৌকা, আর গুনগুন করে গজল গাইছে মকরন্দ।

দামু মাঝি রসিক, সেও ধরেছে বিরহের গান। কাজরী নয়, এ এক ভাটিয়ালী সুর।

গুন-গুনাগুন লাগল রে মোর অন্তরে
কাঁচা বাঁশে আগুন রে জ্বলে
সেই রকম জ্বালাইলি তুই আমারে
গুন-গুনাগুন লাগল রে মোর অন্তরে।
ছৈলা গাছে বাদুড়রে ঝোলে
সেই রকম ঝুলাইলি তুই আমারে
গুন-গুনাগুন লাগল রে মোর অন্তরে।

হঠাৎ দামু গান থামিয়ে বলে উঠল, এই যে ছোটকর্তা, দেউরগতির ঘাট।

মকরন্দ একবার তাকিয়ে দেখলে। বাঁধানো ঘাট নয়; তালের গাছ ফেলে ফেলে ধাপ তৈরি হয়েছে। আর সেই ধাপ গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সেই কদম গাছ। ঐ কদমের তলায় প্রথম দেখা। চারি চক্ষে মিলন।

লাগাও, লাগাও নৌকা। মকরন্দ চেঁচিয়ে উঠল।

পারা না গাঁথতে গাঁথতেই সে লাফিয়েও পড়ল।

আকাশ মেঘে মেঘে খিলানো। মন যেন উতলা ময়ূর। তার পেখম ধরেছে।

মকরন্দ শ্বশুর বাড়িতে এসে উঠল, আদর-অভ্যর্থনাও পেল। কিন্তু শ্বশুরের মুখ গম্ভীর, শাশুড়ীর চোখ ছলছল। জামাই এসেছে, সুখের কথা, কিন্তু কালরাত্রির অমোঘ দণ্ড উঁচিয়ে আছে। মিলনশয্যা তো রচিত হবে না, কালরাত্রির কোটরে দুই ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে দুটি মানুষ—প্রিয় আর প্রিয়তমা। তাই বিধি, তাইতো বিধান।

তাই-ই হল। বাখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাত্রির রূপ দেখতে দেখতে, কত কি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল মকরন্দ। হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙল। মনে হল, স্বপ্ন দেখছে—এক ললিত বাহু যেন বাঁধছে তাকে, সুরভিত নিঃশ্বাস যেন তার নিঃশ্বাসে মিশে গেছে। চোখ চাইতে ইচ্ছা হল না। এ যদি স্বপ্ন হয় স্বপ্নই হোক। আমাকে জাগিয়ো না এমন মধুর স্বপ্ন থেকে। জাগিয়ো না। মকরন্দ জাগল না—জাগল কি জাগর কন্যা?

সেও জাগল না। তবু দেহে জাগল কদম্বকোরক রোমকূপে-কূপে, আর দুই দেহ জেগে উঠল শারীরি চেতনায়। এ যেন পূর্ণোদয়ের পূর্ণ জাগরণ নয়, অস্পষ্ট উন্মেষ। ভোরাই হাওয়ার প্রথম রোমাঞ্চ, উষসীর প্রথম শিহরণ, প্রথম গভীর নিঃশ্বাস। শিরার নদীতে নদীতে জাগল কল্লোল রক্তের, আর তার রোল ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হাওয়া তো আর মৃদুমন্দ নয়। এখন প্রবল, আরও প্রবল—রক্তের রোল আরও গভীর। দুটি যুগ্ম ফুলে এসে আঘাত লাগল, নড়ে নড়ে উঠল, আর সেই ফুলে যেন নিজেকে আছড়ে ফেললে, আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। তাদের গ্রহণ করতে চায়, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বাঁকানো চাঁদ কোথায় যেন ছিল, নারীর দেহে তো তাকে দেখে নি পুরুষ, দেখেছেন কবি তাঁর চোখে। এক চাঁদ নয়, দুটি চাঁদ। সেই চাঁদ দুলতে লাগল আর তার পরে উপচে-পড়া মেঘে তলিয়ে গেল।

জাগল না তারা, জাগল তাদের দেহ। মিলন হল।

কালরাত্রির অমোঘ দণ্ড বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল, আকাশে দেখলেন সপ্তর্ষি,

দেখলেন কালপুরুষ। দেখলেন অরুন্ধতী আর বশিষ্ঠ তাঁরা। তাঁদের দর্শনে প্রেম পূর্ণ হল, অচল হল।

ঘুম থেকে উঠেই মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল রাই। বললে—

হায়, হায়, একি করলাম!

মকরন্দ হেসে বললে,—সপ্তপদীর বিধান আমরা মেনেছি, মানি নি গ্রহ-নক্ষত্রের অনুশাসন। আমরা তো অপরাধী নই। কালরাত্রি দূর হোক।

রাই তার মুখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বললে—আমার যে ভয় করে।

ভয় নেই গো নেই, বলে পত্নীর অধরে চুম্বন এঁকে দিলে মকরন্দ।

পরদিনই ফিরে এল মকরন্দ।

বিদায় কালে দেখা হল না রাইকামিনীর সঙ্গে। শাশুড়ী তেমনি অশ্রুসজল চোখে বিদায় দিলেন। মাথায় হাত দিয়ে শুধু বললেন, বাবা!

শ্বশুর তেমনি গম্ভীর, শুধু বললেন, কালরাত্রি শেষ হতে আর ছ মাস বাকি। তোমার পিতাঠাকুরকে সে কথা বলো।

মকরন্দ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে প্রণাম করে চলে এল। আসার সময় তাকাল এদিকে আর ওদিকে। কারো শাড়ির আঁচল দেখা গেল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

মকরন্দ বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, কিরে, আইজই ফিরলি?

ভাল লাগল না, মকরন্দ উত্তর দিলে।

মা আর কিছু বললেন না, ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। মনের দর্পণ মুখ, সেই মুখে মনের ছায়া আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলেন। হয়তো পারলেন, হয়তো পারলেন না, কিন্তু ছেলেকে আর কিছু শুধালেন না।

মকরন্দও কিছু বললে না। সে শিকে থেকে পুঁথি বার করে বসল। মন তার ভাদ্রমাসের ভরা নদী, কানায় কানায় ভরা। সেই মনকে সে আরও ভরে তুলল কাব্যরসে, আবার কাজেও মন দিলে।

কাজ এমন কিছু নয়। নিজেদের আছে তালুক। তালুক—মুলুক নয়। আর তাদের তালুকদারির সঙ্গে লখ্‌নৌ-এর রইস-তালুকদারের মিল যেমন সাগরে আর গোষ্পদে। তবু তালুক, একেবারে মানের ঠাট নয়। এই তালুক থেকেই দোল-দুর্গোৎসব হয়, বারো মাসের তেরো পূজা-পার্বণ হয়। আবার বছরের ধান ঘরে আসে, খেসারী, সরষে, মসুর ডালও আসে।

সংবৎসরের হয়ে বাকী যা থাকে, সেগুলি বিক্রি হয়, কিছু বা দান-খয়রাত করা হয়। সচ্ছল গৃহস্থ তারা। তালুক এজমালি, ভাগও বহু, কিন্তু একেবারে নিজস্ব কিছু জমি-জমা আছে, আছে খানাবাড়ীর আর কোরফা রায়ত। এতেই চলে। তবে দব্‌দবা আর নেই।

দব্‌দবা ছিল প্রপিতামহের আমলে। তিনি ছিলেন নবাব-সরকারের কারকুন। তিন পুরুষ যেতে না যেতে সেই কারকুনের লক্ষ্মীর সোনার আসন এখন টলমল, উড়-উড়ন্ত। চন্দ্রকান্তও সে সোনা না দেখে থাকুন, তার চূর্ণ স্বর্ণের আভাসটুকু দেখেছেন। তাঁরও ধু-ধু মনে পড়ে সেই ছেলেবেলার কথা। আর যখন তামাকে শানে না, ফুর্ট্‌সে মানে না, তখন সরু আর লম্বা মাটির কালো কলকেখানায় গাঁজা কুচিয়ে সেজে নিয়ে টানেন, ধু-ধু সেই কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূর্যাস্তের সেই চূর্ণ সোনার রেণু মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এক ছিলিমে তেমন নয়, দু-ছিলিমে তিনি সেদিনের শরিক হয়ে বসেন।

সেদিন তিনিও দেখেছেন। বাপ হরকান্ত ঠাকুর-দুয়ারে গৃহ-বিগ্রহ বাসুদেবের মন্দিরের সমুখে বসিয়েছেন ত্রিনাথের মেলা। হাজার এক কল্‌কে দিয়ে ভোগ হবে। লোকে লোকারণ্য। আর সেখানে শুধু কি হাজার কল্‌কের ভোগ, ফুলবাতাসা, চিনির মণ্ডার ভোগও আছে। তাই চারখানা গাঁয়ের মানুষ এসেছে, আর গাইছে—

মোর ঠাউর তেন্নাথ
যে বা করে হ্যালা
হাত-পায় চৌরঙ্গী লাগে
চক্ষে বাইরায় ঢ্যালা।

সেদিনের কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। বাপ হরকান্ত পূজা সেরে এসে ঘন আউটানো দুধ খেতেন বড় জামবাটির একবাটি। আর তিনি শুনেছেন, তাঁর সেই বৃদ্ধ-প্রপিতামহ খেতেন লচ্ছেদার রাবড়ি। সে যে কি চিজ, চন্দ্রকান্ত জানেন না। তবে আচ্ছা কিছুই হবে। গাঁজার কলকে নামিয়ে রেখে গোঁফে শুকনো ঠোঁট বুলিয়ে নেন। বুঝি লচ্ছেদার রাবড়ির স্বাদটুকু পান। আর আশা জাগে, আলেম হয়েছে ছেলে, ফারসী কেতায় দোরস্ত, আশ-ওয়েস্ স্বপ্ন তার চোখে, ছেলে লক্ষ্মীকে আবার বাঁধবে ঘরে।

রইস আদমী হবে, দশজনের একজন হবে। লক্ষ্মীকে আনার চেষ্টাও করেছিলেন। মীরবহরের মেয়ে বিয়ে করলে হত, কিন্তু ছেলে বাদ সাধলো। ছেলে হা-ঘরে কুলীনে বিয়ে করে বসল। যাক্—কালরাত্রি কাটুক, ছেলেকে মুন্সীভায়ার কাছে পাঠাতে হবে। ঠাকুর্দা এনেছিলেন নবাব ভজনা করে লক্ষ্মী, আর তাঁর ছেলে আনবে কোম্পানী বাহাদুরকে ভজে। এ তো কায়স্থ বংশের নিয়ম। তাঁরা তো জাত করণ, জাত-কলমচী। তলোয়ারবাজও তাঁরা ছিলেন, কিন্তু তলোয়ার এখন ভোঁতা মেরে গেছে। এখন কলমই তলোয়ার।

কালরাত্রি কাটুক, কলমনবীস ছেলে কোম্পানীর সরকারে গিয়ে কারকুন কি কাননগো হবে, লাখেরাজ তালুক-মুলুক করবে। আর-এক রামকান্ত হবে।

এক দুই তিন করে কালরাত্রি ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। এ যেন পুঁতির মালার পুঁতি। পুঁতি খসে খসে পড়ে, দিন যায়।

গুহদের বড় বাড়িতে সাড়া জাগল। দক্ষিণ-দুয়ারী একখানা ঘর তুলতে লেগে গেল মকরন্দ। বড় ঘরে শোবার অসুবিধে, এখানেই হবে তার শয়নমন্দির। খড়ের ছাউনী ঘর কিন্তু কি বাহার! মুলি বাঁশের বেড়ায় নানা রঙ, আবার জাফরি-কাটা জানালা। ঘরে ফুরফুর করে হাওয়া আসে। মা এসে সেই ঘরে কড়ির ঝাঁপি টাঙিয়ে দিলেন, শিকেও এখানে ওখানে দুলতে লাগল। আর দেওয়ালে এখানে ওখানে প্রকাণ্ড ঢালের মতো সরায় কালীর পট আঁকা, কোনটায় পদ্মের উপর লক্ষ্মী, কোনটায় বা মালকাছুটি মারা দুই বীরে লড়াই। এ সব গুণবাজ কুমোরদের আঁকা জিনিস, সহজে মেলে না। খুঁজে-পেতে এনেছে মকরন্দ।

কালরাত্রি এমনি করেই ঝরে ঝরে পড়ে গেল।

অন্ধ অমা শেষ, এবার পূর্ণিমার উদয়। ক্ষয়গ্রস্ত চন্দ্র তো এখন রাকাশশী। কালরাত্রিকে বিদায় দিয়ে শুভরাত্রি প্রতিষ্ঠা করতে কুলগুরু এলেন।

নিকোনো হল আঙিনা, ফুল ফুল করে লেপা-পোঁছা হল। আর সেখানে যজ্ঞের ক্ষেত্র তৈরি হল কাঠি পুঁতে পুঁতে। কলাগাছের ডোঙায় ভরে উঠল পূজার উপকরণ। যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিদেব জ্বলে উঠলেন, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের

সঙ্গে সঙ্গে হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি নিক্ষিপ্ত হল। ওঁ-হ্রীং শব্দে মঙ্গলময় বৈদিক যুগের শান্তি ফিরে এল। কালরাত্রি দূরীভূত হল।

এবার নায়রীরা আসতে লাগল দলে দলে। হাঁটা পথে আসা যায় না, নৌকায় নৌকায় এল। কেউ এল গাভা থেকে, কেউ বা বানরীপাড়া থেকে, কেউ বা সেই ওলপুর থেকে। কিন্তু শরৎসুন্দরীর দুঃখ—আসতে পারলেন না দিদি টাকি থেকে।

টাকি কি এখানে। সুগন্ধা পার হয়ে আড়িয়াল খাঁ-মধুমতী-ভৈরব উতরে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ইছামতীর পাড়ে টাকি। সেখানে পত্র যায় না, আরিন্দা পাঠাতে হয়। পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সময় নেই, তাই আপসোস।

আহা, আইতে পারলেন না দিদি!

দিদি না আসুন, নায়রীর তো হাট বসে গেছে। আবার পড়োশিনীরাও এসে দুবেলা সে-হাটে ভিড় বাড়াচ্ছেন।

এদিকে কাজেরও অন্ত নেই। ঢেঁকি ঘরে ঢেঁকিতে পড়ছে পাড, এক বছর আগেকার বিয়ের পিঁড়ি নিয়ে তাতে আবার মেরামত করতে বসেছে শিল্পকুশলা ক'জন নায়রী। হিঙ্গুল গোলা হচ্ছে, হরিতাল ঘষা হচ্ছে, আর খড়ি লেপা হচ্ছে। কনের পিঁড়িতে পদ্মের ভিতরে একখানি ঢলঢল মুখ। মেঘ বরন চুল তার, কুচ বরন তার রং, আবার নাকে আছে নোলক। বরের পিঁড়িতে নানা চিত্র, তার মধ্যে একখানা কার্তিকের মতো মুখ। সে কার্তিক দেবসেনাপতি নন, বাঙালী কার্তিক। চুলে বাবরি, গোঁফ আছে। গায়ে ফুরফুরে উড়ুনি।

পিঁড়ি-চিত্তিরের পর আঙিনা আর ঘরে চালের গোলা আর ন্যাতা নিয়ে পদ্ম আর ধানের ছড়া আঁকতে বসে গেলেন যতেক নায়রী।

পদ্ম আঁকেন, কলকা আঁকেন, ধানের ছড়া আর মোহর আঁকেন। সূক্ষ্ম কাজ।

বধূকে আনতে গিয়েছিলেন মকরন্দের মামা, মকরন্দ স্বয়ং ছিল। জোড়ে ফিরতে হয় এই রীতি।

সন্ধ্যের আগেই তাঁরা ফিরেছে।

চারিদিকে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল, শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন শোনা যেতে লাগল, আর উলুধ্বনি।

বধূ এসে দাঁড়াল উঠোনে, গাঁঠছড়া বাঁধা স্বামীর চেলির জোড়ের সঙ্গে। বধূবরন করতে এলেন নায়রী আর পড়োশিনীরা।

ওলো, জোকার দে লো! জোকার!

উলুর ধ্বনির স্রোত বয়ে গেল। তার সঙ্গে ঢাক-ঢোলের সঙ্গত।

মা শরৎসুন্দরী এসে বধূবরন করলেন প্রথম, হাতে নাড়ু দিলেন, ঘোমটা তুলে পান দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলেন। সিঁদুর পরিয়ে দিলেন সীমন্তে।

সবাই দেখল রাইকে।

স্থলকমলের মতো মুখখানি, চোখ দুটি বোজা, যেন মুদ্রিত পদ্মকোরক। সবাই মুগ্ধ, বিস্মিত।

কুলীন-ঘরে এ-রূপ তো দুর্লভ।

এ যে আগুনের খাপরা।

এক বুড়ো ঠানদি রঙ্গ করে বলে উঠলেন মকরন্দকে, চোর, কার ঘর থিকা য়্যামন রূপ চুরি কইর‍্যা আন্‌ছ?

রূপা কিন্তু আনে নাই ঠাইনদি, এক মুখফোঁড় মেয়ে বলে উঠল।

রূপা কি রে সোনা আনছে! আহা, রাইর কি রূপ!

সুন্দর চোর মুখ নিচু করে হাসল, আর সুন্দরী বিদ্যার মুখ আরও অবনমিত লজ্জায়। তার গালে রক্ত-গোলাপ ফুটে উঠল।

আবার জোকারের স্রোত বয়ে গেল।

প্রথমে বাড়ির বড়-ঘরে এসে বসল বরকনে, সেখানে সাতোইরের শীতল পাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আসর সেখানে জাঁকিয়ে উঠল। নানা স্ত্রী-আচারের ধুম পড়ে গেল।

স্ত্রী-আচার যুগে যুগের দেশের আচার, কুলের আচার। বৈদিক মন্ত্রের অনুস্বর-বিসর্গকে ঘিরে রেখেছে এরা, তার বাহার বুঝি তাতে খুলেছে।

স্ত্রী-আচার শেষ হল এক সময়ে, পড়োশিনীরা গুয়া-পান আর বাতাসা নিয়ে চলে গেলেন যে-যার গৃহে, নায়রীরা খাওয়া-দাওয়া সেরে এখানে ওখানে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন, আবার অল্পবয়সিনীরা রইলেন আড়ি পাতার লোভে জেগে।

ফুলশয্যা পাতা হয়ে ছিল দক্ষিণ-দুয়ারী সেই ঘরে। সেই ঘরে মকরন্দ পালঙ্কে রাই-এর পাশে এসে বসল।

ফুলে ফুলময় ঘর। জুঁই, বেলা, মালতি আনা হয়েছে রাশি রাশি।
আবার গোলাপও আছে। ফুলের মালাও আছে দু-ছড়া। তার মধ্যে, মরকত মণির মতো জ্বলছে তাজা রক্ত-গোলাপ। বিনি সুতোর মালায় কি করে গোলাপ গাঁথা হল, জানেন কোন নিপুণা পড়োশিনী কি নায়রী।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে মকরন্দ। কবাট বন্ধ, মুলির কেচার মধ্য দিয়ে চোখ চালিয়ে দেখা যায় না। একেবারে নিশ্ছিদ্র বুঝি বেড়া। কেউ ফিসফিসও করে না। আর রাত তো অনেক। যামঘোষ ডেকে গেছে। এখন সবাই ঘুমে।

তবু সাবধানের তো মার নেই। ফুলের স্তূপ থালায়, সেই স্তূপ থেকে এক মুঠো ফুল নিয়ে মকরন্দ ছুঁড়ে মারল সরষের তেলের প্রদীপের উপর। প্রদীপ কেঁপে কেঁপে জ্বলছিল, নীল আলোর রেখা ছড়াচ্ছিল চারিদিকে, হঠাৎ আক্রান্ত হতে সে চোখ মুদল। আলো এখন আর নেই, নিবে গেছে। এখন ফুলের গন্ধে আমন্থর রাত, নির্বাপিত তারাভরা রাত। ঘরে মৃগের রোমের মতো অন্ধকার ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, জ্যোৎস্না তার বুকে ঝালর কেটে দিয়েছে। ঝালর নয়, যেন ছক, আর সেই ছকে নেচে বেড়ায় ঘুঁটি, ঘুঁটি নয়, রূপোর সিক্কা। ঝুন, ঝুন ঝুন।

আর তো বাধা নেই।

রাই-এর গলায় একছড়া মালা তুলে নিয়ে পরিয়ে দিলে মকরন্দ।

বললে,

আমাকে পরিয়ে দাও!

রাই মালা নিয়ে পরিয়ে দিলে।

অমনি কোথা থেকে ছুটে এল মলয় পর্বতের হাওয়া। ঘরের শিকেগুলোয় দোলা দিয়ে ফুলের গন্ধ লুটে নিয়ে চলে গেল। আর বয়ে এল হাসির লহর।

মকরন্দ পালঙ্ক থেকে উঠে দরজার আগল খুলে তাকিয়ে দেখলে।

ততক্ষণে আড়ি-পাতনীরা হাওয়া।

মকরন্দ ফিরে এসে বসলে পালঙ্কে।

রাই ঘোমটা টেনে দিলে।

খানিকক্ষণ তারা চুপচাপ। কোন সাড়া শব্দটি নেই। শুধু এখন রাতের নিজস্ব শব্দ। পোকার একটানা ডাক। দু-একটা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ।

এবার হাত ধরে টানতেই রাই মকরন্দের বুকের উপর এসে পড়ল, মুখ গুঁজে রইল, তার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল মকরন্দ, হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ও-কি, রাই কাঁদছে!

পিঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে, বুকের উপরে যুগ্ম বুকে অব্যক্ত কান্নার স্পন্দন অনুভব করছে মকরন্দ।

মকরন্দ মুখখানি তুলে ধরল। সেই বিবাহের রাতে, বাসরশয্যার সজল মুখখানি। যেন জলভারে নত পদ্ম, বিশীর্ণ পদ্ম।

এ কি কাঁদছ কেন? কাল রাত্রি তো গত।—মকরন্দ বললে।

রাই কথা বলে না, আরও কাঁদে।

মকরন্দ বলে, কি হল?

বুঝি বা ঝাঁজালো তার পুরুষ কণ্ঠ!

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে রাই।

তারপর বলে, একটা কথা বলব?

একটা কেন, হাজার কথা বল, লাখো কথা বল, মকরন্দ হাসল।

রাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আমি লাজ বাসি। ডর বাসি।

ডর কেনে কন্যা, লাজ কেনে আঙা বৌ—গ্রাম্য কবির ঢঙে বললে মকরন্দ। যদি লাজই হয়, আমার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কও।

রাই একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর গলা জড়িয়ে ধরে মকরন্দের মুখখানা টেনে আনলো নিজের মুখের কাছে, কানে কানে কি যেন বললে।

কি যেন কথা—কি যেন কানাকানি—শরবনে বাতাস এসে এমনি কানাকানি তোলে, বেণুবনেও বুঝি তোলে।

মকরন্দ শুনল—শুনে কি করল?

সে চেপে ধরল রাইকে বুকে, তার বাঁধুলি ফুলের মতো ঠোঁটে চুমো খেল। শত ধারায় চুমু পড়তে লাগল। এ কি শব্দিত, স্তনিত বর্ষাধারা? হয় তো তাই—তাই।

ছাড়ুন—কেউ দেখে ফেলবে!

দেখুক না!

তবু মুখ সরিয়ে নিয়ে বললে, আমার ভয় করে।

কিসের ভয়?

মা কি বলবেন, কি বলবেন পাড়া-পড়শী?

কি আবার বলবে—বলবে তুমি—

মুখে হাত চেপে ধরল রাই।

না, না, আপনি বোঝেন না। লোকে নিন্দা করবে।

অবাক হল মকরন্দ, পত্নী যার জন্যে ক্রয় করা, সেই পরম ভাগ্য আসছে সন্তানের রূপ ধরে। গর্তের অন্ধকারে সে রূপ নিচ্ছে ধীরে ধীরে। মাতার জীবনী শক্তি নিয়ে আর এক নবজীবনের উন্মেষ হচ্ছে। এখানে তো আনন্দ—ঘন আনন্দ—নিবিড় আনন্দ—ভয় তো নেই। নিন্দা তো নেই।

রাই তবু সে আনন্দের ভাগী তো হতে পারলে না, সে বললে, আমিই দোষী। কালরাত্রের কথা আপনার মনে নাই?

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মকরন্দ, গর্জন করে উঠল, কালরাত্রি গোল্লায় যাক!

সে পত্নীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করল, অন্ধকারে যে সন্তান বাড়ছে, তাকে রূপ দিতে হবে। সে এখনো নীহারিকার মতো অস্পষ্ট— তাকে দলে দলে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই ধ্যানে মগ্ন হল মকরন্দ।

ফুলশয্যার রাত্রির বুকে কালরাত্রির ছিন্নভিন্ন ইসারা দেখা দিয়েছিল, সে তো দূরে সরে গেল।

রাতের মোহে যা অপসৃত, দিনে তাই-ই আবার দেখা দেয়। রাই আবার কুণ্ঠিত, দ্বিধাজড়িত তার চরণ। সন্তানের আগমনী গান তার রক্তে রক্তে তবু সে ভীতি-বিহ্বলা। এখনো সংকেত দেখা দেয় নি, মুখে একটু কালি পড়েছে। একটু কাজল রেখার মতো কালি চোখের নীচে দানা বেঁধেছে, তবু সে সম্বৃত করে নেয় নিজেকে ফেরতায় ফেরতায় শাড়ীতে। মুখে শিশির ঘষে। তারপর স্বামীকে প্রণাম করে সংসারের আবর্তে মিশে যায়।

রাই তো বলতে পারে না, মকরন্দেরও লজ্জা করে। অথচ বলা দরকার। নায়রীদের ভিড়ে, হৈচৈয়ের মধ্যে বলা কি যায়?

নায়রীরা একে-একে বিদায় হলেন, এবার আর বলতে হল না। মা নিজেই টের পেলেন।

বৌ খেয়েছিল ত্রিফলা, পাথরের বাটিতে ত্রিফলা নিয়ে চুমুক দিতেই ওয়াক্ উঠল।

মা একবার বধূর চোখের দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না, মুখ গম্ভীর।

নিরিবিলিতে মকরন্দকে ডেকে আনলেন, তাকে বললেন, মামার বাড়ির নাম কইয়া তুই দেউরগতি গেছিলি?

মকরন্দ শুধু মাথা নাড়লে।

কালরাত্রির ভয়ে, অভিশাপের ভয়ে পাংশুবর্ণা হলেন মা, আবার বংশধরের আগমনের আনন্দে বিহ্বলা। বধূর যত্ন-আত্তি করতে লাগলেন দ্বিগুণ করে। রাই মরমে মরে গেল। লোকনিন্দা এড়াবার জন্যে রটিয়ে দিলেন, ফল দেখেছে বৌ। পুষ্প-উৎসব হবে।

অমনি পড়োশিনীরা এসে দলে দলে হাজির। সেই সীতার বিয়ার গান শুরু হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাদা খেলা। যাকে এখানে বলে প্যাঁকপানি খেলা। সীতার রজস্বলা হবার সময় এ খেলা হয়েছিল কিনা বাল্মীকি সে কথা লেখেন নি, কিন্তু গাঁয়ের মানুষ বাল্মীকির সীতাকে তাদের সীতা করে নিয়েছে। তাই তাদের বিয়ে সীতারই বিয়ে, তাদের ঘরে প্রথম ঋতুমতী হওয়া সীতারই ঋতুমতী হওয়া। তাই কাদা খেলায়ও সীতার গান।

কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে যতেক যুবতী, আবার রসবতী বুড়ীরাও বাদ যাচ্ছে না। উঠোন কাদায় কাদা আর মুখে তাদের আদিরসের গান।

প্যাঁকে আছে রং লো সই
প্যাঁকে আছে রং,
সেই রঙে রাঙায়ে দিল আমার বসন।
রঙে রাঙায় রে,
বসন রাঙায় রে
মন রাঙায় রে।
সীতার মুখ রঙায় রে।

কাদা খেলা শেষ করে তারা চলে গেল, কিন্তু রঙ রেখে দিয়ে গেল মনে। কার মনে?

কেন—রাই-এর মনে।

তার দেহেও।

এ রং তো সৃষ্টির আদিমকালের প্রথম নারীর দেহের রং, মনেরও রং।

সাগরের বুকে চাঁদ খেলায় জোয়ার-ভাঁটা, আবার নারীর দেহেও খেলায়। নারী জানত না।

সেদিন জানল।

চন্দ্র তার কলা বিস্তার করেছে আকাশে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসেছিল নারী, হাতির হাড়ের ছুঁচ দিয়ে হয়তো বল্কলবাস সেলাই করছিল পশুর নাড়িভুড়ির সুতোয়। এমন সময় চন্দ্রের বান নেমে এল, দেহে ডাকল। ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে কোরকের মতো দেহ, খান খান হয়ে যাচ্ছে বেদনা-বিদ্যুতে, তবু জোয়ার নেমেছে রক্তে। আর সেই জোয়ারে কোরক ফুটল। জোয়ার নেমে গেল দেহ আর মন রঙিয়ে দিয়ে। প্রথম ঋতুমতী হল নারী। চাঁদ তার দেহে নিজের বানের চিত্র এঁকে রেখে গেল। নারী সেদিন ফুটল আর সেই থেকেই নারী তো ফুটছে এমনি করে। সেই বান ডাকার দিনের স্মারক এই উৎসব। যখন চাঁদের কোটাল নামে দেহে, তখন ফোটে আবার, জোয়ার চলে গেলে পলি পড়ে। কাদায়, পলিতে জন্মায় কুমার। সেই কুমার-সম্ভবের আগমন এই উৎসব, তারপরে ষোলো দিন স্থায়ী হবে এই কুসুম-ফোটার দিন। মলিনী নারী ঋতুস্নানে অমলিনী হবে। সন্তানের বীজ ধারণ করবে। নচেৎ পাপ, নচেৎ নরকবাস।

মকরন্দ নরকগামী হয় নি, হয় নি নরকগামিনী রাই, তবু মকরন্দকে এবার ঘিরে ধরল লজ্জা, ছেঁকে ধরল।

অন্দরে সে আর আসে না, বাহির বাড়িতেই বসে থাকে। কখনো বা দত্তদের চণ্ডীমণ্ডপেই দিন কাটায়, বসে-বসে দাবা খেলে, খেলা দেখে। শুধু খাওয়ার সময় ফেরে বাড়ীতে। তাও মাথা নীচু করে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে দিয়ে উঠে পড়ে।

মা বলেন, তুই ভালবাস, তাই মলান্তি মাছের অম্বল রাঁধছি আদা দিয়া—খাইলি না?

মকরন্দ মুখ নীচু করেই বলে, পেট ভরে ঢাক হয়ে গেছে।

অম্বলের খাদাটা সরিয়ে রাখে।

মা ভাবেন ছেলে বুঝি বৌয়ের জন্যে রাখলে।

হেসে বলেন, আরও আছে, তুই খা!

একটু মুখে দেয়, তারপরে ঠেলে রাখে।

মা বলেন, খাইলি না?

রেখে দাও, রাতে খাব।

উঠে পড়ে মকরন্দ।

রাতেও নাকে-মুখে ভাত গুঁজে নিজের দক্ষিণদুয়ারী ঘরে গিয়ে ঢোকে।

আর রাই? তারও লজ্জা, ঘোর লজ্জা, সাধের সময় পুষ্প উৎসব! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

তবু রাই বলে, আপনি এমন হলেন ক্যান? মা ভাবেন, আমি বুঝি আপনার কাছে খালি খাই-খাই করি, তাই খান না, সব ফেলে দেন। আমার লজ্জা করে।

লজ্জা তোমার নয়, এখন লজ্জা আমার, মকরন্দ বলে।

ক্যান?

বোঝ না, আমি দোষ করেছি। কালরাত্রি মানি নি।

সে তো আমার দোষ!

না, না, তোমার মতো যার রূপ, তার কি দোষঘাট আছে। রাঙা বৌ, তুমি মঞ্জুর করলে আমি পালাই। কয়েকদিন ঘুরে আসি।

রাই অমনি অভিমান করে। ঠোঁট দুটি ফুলে ওঠে, মনে হয় বুঝি হঠাৎ ভীমরুলে কামড়েছে। অভিমান ভাঙাতে যায় মকরন্দ। মুখে মুখ দিয়ে কোলে করতে যায়, মুখ সরিয়ে নেয় মানিনী।

আমাকে ফেলে যাবে! আমি কি করে থাকব?

আরে, তোমাকে ফেলে আমিই কি বাঁচব!

তবে যে কও?

একটু রসিকতা করলাম, রসবতী, রস বোঝ না, থুতনি ধরে নেড়ে দেয় মকরন্দ। ঠোঁটের স্ফীতি অমনি কমে যায়, সজল চোখে রোদের মতো চিকচিক করে ওঠে হাসি।

ভাব হয়ে যায় দম্পতির। বহবারম্ভ হয়েছিল, মেঘ ডেকেছিল ডম্বরু রবে কিন্তু পশলা নামল না, রোদে এসে মেঘ কাটিয়ে দিলে।

কিন্তু লজ্জা তো তবু দূর হয় না মকরন্দের। শেষে মামার বাড়ি থেকে খবর এল, দিদিমা তাকে ডেকেছেন। মকরন্দও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

লক্ষ্মণকাঠি বেশি দূরে নয়। কয়েক ক্রোশ পথ। নৌকায় যেতে এক-প্রহর দেড়-প্রহর লাগে। সেইখানেই তার মামার বাড়ি।

গ্রাম বড় নয়, ছোটই। কিন্তু পুরনো।

বাংলার শেষ সম্রাট লক্ষ্মণসেনের নামে এই গ্রামের নাম।

দূর নয়, তবু দিনক্ষণ দেখেই রওনা হতে হয়।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, সেই মুহূর্তেই রওনা হল মকরন্দ।

মা একটি দইয়ের ফোঁটা দিয়ে দিলেন কপালে।

আগের দিন রাতে রাই বলেছিল,

তুমি যেয়ো না। আমার মন কেমন করে। আমার চোখ নাচে।

মকরন্দ বলেছিল, এখন না যাই কি করে? ওসব কুসংস্কার রাই।

আর যদি দেখা না হয়!

মকরন্দ রাইয়ের মুখ চেপে ধরে বলেছিল, চুপ, ওসব অলক্ষুণে কথা ব'লো না! আমাকে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখলে তো চলবে না রাই। আমি পুরুষ, আমার লক্ষ্মীকে আমি ঘরে এনেছি, তাকে সাজাতে চাই মণি-মাণিক্যে। সে তো আমাকেই আনতে হবে। তোমার সন্তান হোক, তারপর আমি যাব কোম্পানীর শহরে, সেখান থেকে আনব ধন, তোমাকে সাজাব।

মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল রাই, মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল এক পুরুষ-সিংহকে। এ যেন আর এক মকরন্দ—এক দুঃসাহসী বীর। এ-বীরের কথা তো সে পড়েছে মঙ্গলকাব্যে। এ-বীর যায় দামলেপায়, যায় সপ্তগ্রামে, যায় দূর জাভায়, যায় সিংহলপাটনে। মকরন্দ সেই কথা-কাহিনীর বীর।

প্রাণ ভরে দেখেছিল, চোখ ভরে দেখেছিল রাই, আর গর্বে ভরে উঠেছিল তার বুক। তার স্বামী এমনি বীর!

লক্ষ্মণকাঠি চলে গিয়েছিল মকরন্দ। ফিরেও এসেছিল, রাই-এর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু তখন পাপগ্রহ তার তাণ্ডবে সব ওলট-পালট করে দিয়ে চলে গেছে, বয়ে গেছে কালবৈশাখীর ঝড়।

ঝড় তো আজ আসে নি, বহুকাল আগে যেদিন লিসবন শহরের এক বোম্বেটে আর্মাডা বেয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে কালিকট বন্দরে এসে নেমেছিল, সেদিন থেকেই ভারতের ঈশান কোণে ঝড়ের পুঞ্জ মেঘ জমে উঠেছিল। তারপর সেই যে—সেই গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের আমলে সেই মেঘ বাংলায় ভেসে এল। কিন্তু তখন মেঘ স্বরূপ প্রকাশ করে নি। সে এল নিরীহ বেশে, সদাগরের রূপ ধরে। পর্তুগিজ ফিরিঙ্গী এল সওদা করতে, সওদা বেচতে, বিকিকিনির ভিতর দিয়ে একদিন দুর্বল সুলতানদের আমলে তারাই হল দেও বা ঝড়—দেয়া। তারা বোম্বেটেগিরি শুরু করে দিলে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হল। লুঠতরাজ হল ব্যবসা। সদাগর লুঠেরা হল, হল বোম্বেটে।

সাতডিঙা সাজিয়ে চলেছেন হয় তো কোন সদাগর, অমনি পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো এসে ঘিরে ধরল ছিপে-ছিপে, তারপর লুঠতরাজ করে ডিঙা ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেল। শুধু তাই নয়, গ্রামে গ্রামেও তাদের হানা চলল পাঠান-মোগল আমল জুড়ে। তারা এল, লুঠ করল, আবার বন্দী করে নিয়ে গেল হাজার হাজার নরনারী। কাউকে তারা দাসহাটে বিক্রি করলে, আর কাউকে বা নিজেদের বহরের শৃঙ্খলিত দাস করে রাখলে; আর রমণীদের করলে ধর্ষণ, কাউকে বা ধর্ষণের পরে করলে হত্যা, কাউকে বা নিজের বাঁদী করে রাখল। বাংলা জুড়ে উঠল ক্রন্দনের রোল।

বর্গী নয়, হার্মাদ, হার্মাদ ওরা!

পল্লীবালা হার্মাদের হাতে পড়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে কেঁদে উঠল,

মনে রাখ্যো অভাগীরে
মনে রাখ্যো।
ঘাটে কলসী পড্যা রইল, কাঁকন ফেলাইয়া আইলাম।
আমারে মনে পড়লে,
ঐ কাঁকন ছুঁইযো স্বামী, ঐ কলসী ছুঁইয়ো
আমার পরান তো তাতে জুড়াবে।
আর সুন্দরী দেইখ্যা, আর এক জনারে
বিয়া করিয়ো।
আমি যে আদরের জন্য পাগল ছিলাম

তাই তারে দিয়ো।

অভাগীর কপালে তো তা নাই।

কুলবধুর সেই ব্যথাকে রূপ দিলেন পল্লীকবি।

তারা আরাকানের মগদের সঙ্গে মিশে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। লাল কোর্তা ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে দোস্তি পাতালে বহুবর্ণ পাগড়ীধারী মগদস্যুর দল। এদের অত্যাচারে বংশে বংশে ধরল ফেরঙ্গ দোষ, মগো দোষ, আবার ফেরঙ্গ রোগই কি বাদ গেল! বাংলা কলঙ্কিত হল এই দস্যুদের হাতে, রোগ-দুষ্ট হল, তারা বাংলাকে গ্রাস করলে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান কত বীর এদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, এদের ঢাকার সুবেদার হটিয়ে দিলেন, কিন্তু এরা আবার এল, ঘাঁটি গাড়ল বাংলায়। শেষে সায়েস্তা খাঁ তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তারা পালাল ধাওয়া খেয়ে, আর সে ধাউনির নাম হল মগ-ধাউনি। কিন্তু তবু কোম্পানীর আমলে এখনো তারা এসে চড়াও হয় সাগরের উপকূলের গ্রামে গ্রামে, আবার আর্মাডা ছেড়ে ছিপ নিয়ে ধেয়ে আসে একেবারে ভিতরে। এসে সব তছনছ করে দিয়ে চলে যায়।

এবারও কেউ জানত না আসবে। কিন্তু চাঁদের আলোয় কাঁকরাদারী-পঞ্চকরণের খাল বেয়ে তারা এসে হাজির হল, আর লুঠতরাজ করে নিয়ে চলেও গেল। মকরন্দ মামার বাড়ি বসে ভগ্নদূত আরিন্দার মুখে খবর পেয়েছিল। সে পাগলের মতো ছুটে এল।

নীল মেঘে কোথায় ছিল বজ্র লুকিয়ে, কেউ জানত না, সেই বজ্রপাত হয়ে গেছে। এখনো জ্বলছে গ্রাম, এখনো ক্রন্দনের রোল উঠছে।

পথে কারো দেখা মিলল না, মকরন্দ ছুটে এল। সে হাঁটা পথে নদীখাল সাঁতরে এসেছে।

বাড়ি এসে দেখলে একখানা ঘরও আর অবশিষ্ট নেই।

খুঁজতে খুঁজতে বৃদ্ধ প্রপিতামহের চিতার পঞ্চচূড়া পঞ্চরত্ন মন্দিরে দেখা মিলল। অটুট আছে চুড়া, উপরের পেতলের কলস শেষ সূর্যের পড়ন্ত আভায় সোনার মতো জ্বলছে।

সেই মন্দিরেই দেখা মিলল। চন্দ্রকান্ত আর শরৎসুন্দরী বসে আছেন। তাঁদের যেন সম্বিৎ নেই। যেন এক-চাপান পোড়ানো হয়ে গেছে, মুখে তেমনি কালি মেরে দিয়েছে।

মকরন্দ এসে ডাকলে, মা !

এক-চাপানের মড়া মা কেঁদে উঠলেন, ওরে পোড়াকপাইল্যা, কি ছ্যাখতে আইলি ! কালরাত্তির মানলি না !

মকরন্দ শুনতে চায় না, বললে, মা, সে কোথায় ?

আমার কপাল—আমার কপাল !

ডুকরে কেঁদে উঠলেন মা !

তাকে কি নিয়ে গেছে ?

না, নেয় নাই, কাল নাগে কামড়াইয়া খাইছে। বিষ ঢাল্যা দিছে।

সে কোথায় ?

পোড়াকপালী ছ্যাখ গিয়া কোথায় পইর‍্যা আছে।

মকরন্দ যাবার জন্য পা বাড়ালে।

বাধা দিলেন চন্দ্রকান্ত,

যেযো না !

সবিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে তাকালে মকরন্দ।

না, যেযো না !

কেন ?

গৃহত্যাগিনী যোশীতা পরিত্যাজ্যা, এত শাস্ত্র শিখেও তা ভুলে গেছ !

না, ভুলি নি, মকরন্দ ওষ্ঠে অধর চেপে উত্তর দিলে, কিন্তু যোশীতা তো গৃহত্যাগিনী নয়, সে গৃহ হতে লুণ্ঠিতা, লাঞ্ছিতা।

ঐ একই কথা।

আমরা তাকে রক্ষা করতে পারি নি।

কেইবা পেরেছে, তবু সে-নারী বিবর্জিতা।

আমরা অক্ষম বলেই পারি নি, তবু সে বিবর্জিতা ?

হাঁ, তাই। এই-ই শাস্ত্রের বিধান।

কিন্তু বেদ এ-বিধান দেন নি, এ বিধান লৌকিক শাস্ত্রের।

লৌকিক শাস্ত্রই আমাদের শাস্ত্র, গুরু-গম্ভীর কণ্ঠ ঝরে পড়ল।

সে-শাস্ত্র শাস্ত্রকার আর মুষ্টিমেয় ক'জন লোকের মন-রাখা কথা। তাদেরই মুখ চেয়ে তৈরি। আমি তা মানি না।

মানতে হবে। সে গন্ধরোগগ্রস্তা।

হোক রোগগ্রস্তা, সে তো তার নিজের দোষে নয়।

মকরন্দ চলে আসছিল।

ফের মকরন্দ! পিতা উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন। মকরন্দ শুনল না। সে ছুটে চলে এল সেখান থেকে।

খুঁজছে সে, সীতার খোঁজে এমনি চলেছিলেন রাম। ভাটগাছের জঙ্গল, শটিগাছের জঙ্গল আতি-পাঁতি করে খুঁজতে-খুঁজতে বিগ্রহের ভাঙা মূর্তির সামনে খুঁজে পেল।

কষ্টিপাথরের নিকষ কালো পাষাণে বাংলার শিল্পী খোদাই করেছিলেন ছেনি আর বাটালি দিয়ে বাসুদেবকে। বেদের সূর্য আর বিষ্ণুকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বেদবিরোধী ভগবান তথাগতের সঙ্গে। বনমালা আর কন্থাকে এক করে দিয়েছিলেন শিল্প-কৌশলে, পুরোহিত তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই মূর্তি ভগ্নমুণ্ড হয়ে পড়ে আছে। আর সেই মূর্তির সমুখে রক্তাক্তবসনা—

বালনখরছিন্ন পদ্মিনীর মতো ছিন্নভিন্ন, মথিতা, দলিতা, পিষ্টা রাইকামিনী।

মকরন্দ দাঁড়িয়ে রইল, যেন বজ্রাহত বনস্পতি।

বিষ্ণুর মূর্তির মুণ্ডটি দেখল। তিলফুল-জিনি নাসা এখনো দেখা যায়। এখনো পদ্মপলাশ দুটি নয়ন তেমনি তাকিয়ে আছে। শুধু সোনার চোখ দুটি নেই। এখনো তেমনি শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী হাত ক'খানি কবন্ধে দেখা যায়।

হে সুদর্শনধারী মুরারী, পারল না তোমার চক্র ঐ দস্যুদের হত্যা করতে!

তোমার গদা কেন অমোঘ দণ্ডের মতো আপতিত হল না ঐ নরাধমদের উপর।

তোমার শঙ্খ কেন নীরব রইল।

নীরব রইল কেন?

তবে কি নিজের শক্তি আমাদের উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে তুমি মহা-শক্তিমান হয়েছিলে? আমরা সেই শক্তির অবমাননা করেছি!

তবে কি আমরা পলাশীর প্রান্তরে সে-শক্তিকে বিকিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছি?

বোধহয় তাই।

হাঁ তাই। তাই অসি ছেড়ে আমরা মসীজীবী। আমরা করণ, আমরা কারকুন।

তাই তো মকরন্দ এমনি নির্জীব, তাই তো সে অস্ত্রধারী হয়েও বৈশ্য হতে চায়, খাসমুন্সী, কি খাসনবীস হতে চায়।

তুমি তো জেগে আছ ঐ অমুন্নতের মধ্যে, ঐ জেলে-কৈবর্তদের মধ্যে—তারা তো মহাশক্তিশালী। যুগে যুগে তারাই বিদেশী শত্রুকে তাড়িয়েছে বাংলা থেকে, তারাই নৌকার বেড়াজালে ঘিরে পর্যুদস্ত করেছে বাংলার শত্রুকে, বাঙালীর শত্রুকে।

মকরন্দ এবার হতভাগিনী রাইকামিনীর কাছে এল। হত্যা দিয়ে পড়ে আছে যেন রাইকামিনী। নিমিল চোখ, রক্তাপ্লুত দেহ, রক্তাপ্লুত বস্ত্র। উবু হয়ে পড়ে আছে, সমর্পণের ভঙ্গীতে—আত্মনিবেদনে। কার কাছে? ঐ ছিন্নশির দেবাদিদেব বাসুদেবের কাছে?

কাছে গিয়ে ডাকল মকরন্দ, রাই!

রাই তাকাল না। শুধু ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল।

মকরন্দ বুঝল সে জল চায়।

মকরন্দ ছুটে চলে গেল। ভস্মীভূত গৃহে একটা মাটির খোরা ছাড়া কিছু পেলে না। পুকুর থেকে তাতে করে জল নিয়ে এল। হাতের আঁজলায় করে মুখে দিলে জল। বিন্দু বিন্দু জল।

আকণ্ঠ পিপাসায় বুঝি শুষ্ক বুক, বুঝি মরুভূর পিপাসা বুকে। জল খাচ্ছে চকচক করে। এমনি জল খায় তৃষ্ণার্ত পাখী। সে একবার দেখেছিল এমনি জল খেতে। গুলতি ছুঁড়তে পারে নি। হাত আপনা থেকেই নেমে এসেছিল।

জল পান করে চোখ মেলল রাইকামিনী।

স্বামীকে দেখল, দেখে আবার চোখ বুজল। ডুকরে কেঁদে উঠল।

বললে আমাকে কালনাগে কেটেছে, তোমার ছাওয়ালরেও কেটেছে। তাকে খালে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি। তুমি আমাকে ছুয়োনা!

মকরন্দ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ছাওয়াল গেছে দুঃখ কি, আবার হবে। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ রাই। আবার সব হবে।

হবে-হবে? চোখ মেলে তাকাল রাই। রক্তিম চোখ, ঘোলাটে, তবু ভাষা প্রশ্নের উন্মুখতায় জেগে উঠল—হবে? না, না, না, হবে না! আমার তো ফেরঙ্গ দোষ, ফেরঙ্গ রোগ!

না, না, সে তো তোমার কলঙ্ক নয় রাই, আমার কলঙ্ক। আমি তো তোমাকে রক্ষা করতে পারি নি।

সে তো আমার কপাল, আমার কপাল, আমি কালনাগিনী, কাল রাত্রিতে এসে নিজের সর্বনাশ করেছি। না, না, তুমি যাও!

মকরন্দ চলে গেল না। সে রাইকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে তুলে নিলে। তারপর খালের ঘাটে গিয়ে স্নান করালো নিজ হাতে, তারপর নিজের উত্তরীয় পরিয়ে দিতে গেল।

রাইকামিনী আঁতকে উঠল, না, না!

কি হল?

আমি সধবা, ও সাদা কাপড় তো পরব না। নিজে গেছি, তাই বলে স্বামীর সর্বনাশ তো করব না।

তাহলে আমার ধুতি তুমি পর।

ও তো কালা পাড়।

তাহলে?

আমি ভিজে কাপড়েই থাকব।

ভিজে কাপড়ে আলুল চুলেই উঠে এল রাইকামিনী।

আঁচলে কি যেন গেরো দেওয়া, সেই গেরো খুলে বের করল একটা লক্ষ্মীর আসনের সিঁদুরের কৌটো। বাকুলার শিল্পীর তৈরি কৌটো, গায়ে লাল রং মাখা। সেই কৌটো খুলে বললে,

সিঁদুরের মান তো রাখতে পারলাম না। মান রাখবার জন্যে পালিয়েছিলাম, কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। আমার এক ভিক্ষা আছে।

কি, বল?

আমাকে একটু সিঁদুর পরিয়ে দেবে? তারপরে জিভ্ কেটে বললে— ছিঃ ছিঃ, আপনাকে তুমি বললাম। আমার কথা ধরবেন না। আমার মাথার ঠিক নেই।

মকরন্দ বললে, তুমিই বল, শুনতে ভাল লাগছে।

তারপর সিঁদুরের কৌটো থেকে সিঁদুর আঙুলে তুলে নিয়ে সিঁথিতে লাগিয়ে দিলে, কপালে পরিয়ে দিলে সিঁদুরের টিপ। তারপর মুখখানি চুম্বন করতে গেল মকরন্দ।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু হেসে রাই বললে, ছিঃ।

ছিঃ কেন ?

জান না আমি ফেরঙ্গ-দুষ্টা।

আবার সেই কথা! মকরন্দ তাকে জড়িয়ে ধরল।

না, না, এখন নয়। দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করি।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল রাইকামিনী।

মকরন্দ টের পেল, অশ্রু ঝরছে, উষ্ণ অশ্রু পা তার ভিজিয়ে দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, এবার উঠল রাইকামিনী। উধ্বমুখী সূর্যমুখীর মতো মকরন্দের মুখপানে তাকিয়ে বললে,

আমার কাজ শেষ, এবার কি করবে ?

কি আবার করব, এখানেই আবার ঘর বাঁধব।

হেসে উঠল মেয়ে, তুমি কি পাগল। এ বৌ নিয়ে কেউ ঘর করে ? আমার তো জাত গেছে।

আমারও জাত নেই।

বিরাট গুহের বংশধরের জাত নেই একথা কে বলবে ? তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই।

না।

তাহলে একঘরে হয়ে থাকবে ? লোকে ছিঃ ছিঃ করবে ?

মকরন্দ বললে, এখানে থাকব না। চলে যাব দূর দেশে। সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধব ?

কিন্তু ঘর বাঁধবে কাকে নিয়ে, যার ঘর নেই ?

আছে—তোমার ঘর আছে। সে-ঘর আমার বুকে।

মকরন্দ তাকে দুহাতে আবার জড়িয়ে ধরল।

দুজনেই হাত ধরাধরি করে এল ঠাকুরঘরের বারান্দায়।

দুজনেই সেখানে বসল। এইখানেই আজ আশ্রয় নেবে তারা। তারপর যখন রাত পোহাবে, পাখ-পাখালি ডাকবে, তখন তারা চলে যাবে। সঙ্গে তাদের পুঁজি কয়েক থান মোহর। সেই মোহর নিয়ে ভিন্ দেশে তারা পাড়ি দেবে, সেখানে ঘর বাঁধবে। আজ এখানেই ঘর। রাই মকরন্দের

উত্তরীয় পেতে বিছানা করে দিলে, তার গায়ের মের্জাই হল বালিশ। আর একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল রাই।

মিলন শয্যা এ নয়, কালরাত্রির জের এখনো চলছে। তাই দুই নরনারীর মধ্যে ব্যবধানের দুস্তর সাগর দুলে দুলে উঠছে। কাল প্রাতে এ-ব্যবধান হয় তো ঘুচে যাবে, সাঁকো তৈরি হবে। কিন্তু সে-সাঁকো টিকবে কিনা কে জানে! সে তো কাল, আগামী কাল—আজ কালরাত্রির বিষে ঘুমাও নীলকণ্ঠ পুরুষ—ঘুমাও বিষের নীল জ্বালায় জর্জর নারী।

তারা ঘুমাল।

কে না ঘুমায়? রোগী ঘুমায়, শোকীতাপী ঘুমায়। সবাই ঘুমায়। তারাও ঘুমাল। ঘুমের দোলনায় দুলতে লাগল।

পাখ-পাখালি ডাকতে-না-ডাকতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মকরন্দ। তাকিয়ে দেখলে, আঁচল পেতে যেখানে শুয়ে ছিল রাই, সেখানটা ফাঁকা। শুধু চাঁদের মিহি জ্যোৎস্নার মিহিন গুঁড়ো এসে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। মকরন্দ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, এদিক-ওদিক দেখলে। কি একটা শব্দ হল! ঝনাৎ করে যেন। সে তাকিয়ে দেখলে, সিঁদুর মাখা আকবরী একখান মোহর পড়ে আছে। সিঁদুরের কৌটো নেই, রাই নেই।

মকরন্দ সেই সিঁদুর মাখা মোহরখানা নিয়ে গেঁজেয় রেখে ছুটে বেরিয়ে এল।

ভোর হয় নি, তবে ভোরের পূর্বাভাস। আকাশে তারাদল বিলীয়মান। শুধু শুকতারা জ্বলছে আকাশের শিয়রে দপ্দপ করে।

মকরন্দ কি ভেবে ছুটে গেল খালের ঘাটে। ঘাটলার রানায় কেউ বসে নেই। একটা শেয়াল বসেছিল, ছুটে পালাল।

মকরন্দ ডাকলে, রাই—রাই!

চারিদিকে বুঝি প্রতিধ্বনি তুলল স্বর। পাখীর ডাকে, জোয়ারের জলের ছলছলে বুঝি সেই আহ্বান সাড়া তুলল।

পাখী কিচির-মিচির করে উঠল, রাই! রাই।

জল ছলছলিয়ে কলকলিয়ে উঠল, রাই! রাই।

বাতাস হা হা করে বয়ে গেল—রাই-রা-ই—রা—ই!

কিন্তু রাইয়ের দেখা মিলল না।

রাই হারিয়ে গেছে। রাই আর ফিরবে না।

জনারণ্যে কি কোনদিন তাকে দেখা যাবে?

না, না!

জনারণ্য থেকে এক রাই চিরদিনের মতো খসে পড়ল।

এক-রাই চলে গেল, হাজার রাই আছে, হাজার রাই আসবে—তবু সেই রাই তো আর ফিরবে না।

মকরন্দ কাঁদতে লাগল ঘাটলায় বসে।

নারীর কান্না থামে না, থামতে জানে না, কিন্তু পুরুষের কান্না তো গলা ছেড়ে কান্না নয়। সে বুক থেকে ওঠে, চোখ সজল করে দেয়, বুকের রক্ত জল হয়ে ঝরে। কিন্তু আবার শুকিয়ে যায় মুহূর্তে, বালির বুকে যেমন নিমেষে জল শুকোয়। হৃদয়ে তবু বুঝি ব্যথা থাকে, কিন্তু সে-ব্যথা গোপন করে রাখতে জানে পুরুষ। মকরন্দও ব্যথা গোপন করে রাখল। তারপর উঠে এল ঘাটলা থেকে। সে বাপ-মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করল, তারপর তরল অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপর?

সংক্ষিপ্ত সে ইতিহাস। বালাম নৌকায় এসেছে সে এখানে। এই ইমারতময় শহরের একজন হয়ে গেছে, মূল তার উপড়ে ফেলে এসেছে। এখন এখানে এই বেনিয়ার শহরে যদি তার মূল নতুন করে গজায় তো সে টিকবে। নইলে শহর তাকে দলবে, পিষবে, মাড়িয়ে যাবে। তার আগামী ইতিহাস এই সংঘাতের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস—আবার তা এই শহরেরও ইতিহাস। সেই ইতিহাসের জন্য আমরা আগ্রহে অধীর। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। শহরের শত-সহস্র ধারার সঙ্গমে সেও এক ধারায় এসেছে। আর-আর ধারায় যারা এল, তাদেরও তো পরিচয় চাই। সকলের পরিচয় দরকার নেই। কিন্তু তার কক্ষ পথে যারা ঘুরবে, যাদের সঙ্গে মুখোমুখী

হবে, ঠোকাঠুকি হবে, তাদের কথাও তো আছে। তাই আপাতত মকরন্দকে আমরা ছেড়ে দিলাম সাগর-সঙ্গমে, সে এখানে থাকুক, পাক খাক, খাবি খাক, আর ঝাঁকে মিশুক। তার পূর্বকথার তাই এখানেই ইতি। তার জীবন কাব্যের প্রথম সর্গ সমাপ্ত। কিন্তু সমাপ্ত হলেও জের তো থাকবে।

মোহানায় এসে কি মাছ ভোলে তার নালার কথা, তার নদীর কথা ?

কেউ ভোলে, কেউ ভোলে না। ভুলেও আবার ভোলে না, ভোলা যায় না।

মকরন্দের তো সেই দশাই হবে।

ভুলবে, ভুলবে, আবার ভুলবেও না।

প্রথম সর্গের স্মৃতি নিয়ে দ্বিতীয় সর্গেও সে জাবর কাটবে। আর ধরবে অতীত তাকে ঘিরে তার সোনালি মায়ায়, থাকবে তার নিজের সংস্কার, শ্রেণীর সংস্কার।

নোঙরহীন লবেজান নৌকা হয়েই সে এসেছে, এসেছে বানভাসী হয়ে, কিন্তু নোঙর সত্যিই কি ছিঁড়ে গেছে।

না—নোঙরের ছেঁড়া টুকরো এখনো আটকে আছে। শিকলি হয়ে ঝুনঝুন বাজছে।

হ্যাঁ, এখনো বাজছে।

২

লণ্ডন নয়, পারী নয়, রোমাও নয়। এই শহর, হিন্দুস্থানের বুকের শহর, বাংলার বুকের শহর।

এখানে নালা-নর্দামা চারিদিকে। মশার ঝাঁক ডিম পাড়ে, আর সন্ধ্যা হলেই সেই ডিম থেকে ফুটে বেরোয় লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে মশা। তারা এসে ছেঁকে ধরে। তবু এইখানেই এই নালা-নর্দামার ওপরে গড়ে উঠেছে কোম্পানীর শহর।

এ-শহরের গুণগান গাইবার কবিও একদিন হয়তো জুটে যাবে, তিনি হয়তো গাইবেন :—

দুপুরের এই ঠাঁই
চার্নকের এই আশ্রয়।
এখানে গজিয়ে উঠল এক নগর
যেমন করে গজিয়ে ওঠে ছত্রক,
যেমন করে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে
তার আদি জন্মস্থান থেকে,
তেমনি করেই ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল।
ভাগ্যের নির্দেশিত, ভাগ্যের গড়া,
ভাগ্যের ভিত-গাড়া এই শহর
উঠল, গজালো—
নালা-নর্দামার কাদা-জলে-গড়া
এই শহর।

কিন্তু এখন তো সে-কবির দেখা নেই, তবু এই হঠাৎ শহর, আকস্মিক শহর বাড়ছে। তার আঁকশি বাড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। আর টেনে টেনে আনছে মানুষকে।

মেরীও সেই টানে এসেছে এই শহরে। অনেকেই আসে। মেরীও এসেছে।

এ নালা-নর্দামার টান নয়, এ স্বর্ণভূমির টান, এল-দোরাদোর টান।

তবে যে সব কার্প, স্যামন আর ট্রাউট স্বর্ণভূমির টানে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে এলেও মেরী তাদের কেউ নয়।

মেরীকে যদি মাছই বলা যায় তো সে সেই পাকাল ঈলও নয়। সে নিতান্তই মিন্নো মাছ। একটু চারের খোশবায় পেলেই যারা কিলবিল করে ছুটে আসে। পাক খায়, লেজ নাচায়, তারপরে হুমড়ি খেয়ে টোপে ঠোকর দেয়। সে সেই ঝাঁকেরই মাছ।

মেরী তার পোশাকী নাম, আবার আটপৌরে নামও। সরনেম বা বংশের উপাধি হয় তো তারও একটা থাকতে পারে, কিন্তু সে তা জানে না। আর জানে না বলেই মনে হয়, কুঈন য়্যান, কি এলিজাবেথ, কি প্রথম জেমস্-এর সে কেউ নয়। এমন কি লতার লতা পাতার পাতায়ও না, যা টেনে আনতে ছিঁড়ে যায়। রাজা-রাজড়াদের জারজ পুত্রকন্যাদেরও বংশ-গৌরব তার নেই। তার রক্তে নেই সেই রাজরোগ—যাকে বলে হেমোফেলিয়া। যে-রোগ থাকলে একটু কাটলে রক্ত নালে ছোটে, থামে না। না, অমন বনেদী রক্তের কারবার করে না মেরী। নীল রক্ত নয়, তার রক্ত লালই।

সে মেরী, লণ্ডন শহরের লাখো লাখো মেরীর একজন। মেরী মাতার নামে তার নাম, আবার মেরী ম্যাগ্ডালেনের নামেও হতে পারে। মেরী মাতা তো ঈশ্বরের একজাত পুত্রের জননী, আর মেরী ম্যাগ্ডালেন তো সেই পুণ্যবতী পতিতা, যিনি আবির্ভাবের পর দেখা পেয়েছিলেন যীশুখ্রীষ্টের। তিনিও ধন্যা।

মেরী অত-শত বোঝে না, জানে না।

সে পাদরী-বাবার কাছে শুনেছে,

উৎপীড়িত যারা তারাই ধন্য, নম্র যারা, মূক যারা, তারাই ধন্য।

তাদেরই জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার খোলা।

শুধু শুনেছেই, কিন্তু চাবিকাঠির খোঁজ পায় নি।

এ যেন কথার কথা তার কাছে।

স্বর্গরাজ্যের দুয়ার যদি খোলা থাকে, তাহলে তার এত ভোগান্তি কেন?

মেরী মাতারও নিশ্চয়ই এক মা ছিলেন, তিনি তো আর ভুঁইফোঁড় নন, মাশরুম নন, তিনি তাঁকে লালন-পালনও করেছিলেন। আবার জোসেফ ছুতোরের সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন।

মেরীরও মা ছিলেন। কিন্তু এ সেই মাছের মা। সেই কার্প, স্যামন, ম্যাকারেলের মা। বিয়োন বটে, কিন্তু পালেন না। স্রোতের মুখে ডিম ছেড়ে দিয়েই খালাস। ডিম ফুটুক না ফুটুক তাতে তার কি। উম্ দেবার দায় তো নেই।

তাই ডিম ফুটল যখন, তখন মা বেপাত্তা।

মেরী ফুটল এক পাদরীর ঘরে।

রেভারেণ্ড জন স্মিথ। জবরদস্ত পাদরী। গোটা এলাকার ধর্মের চৌকিদার, খবরদার। জর্ডনের জল তাঁর সেলারে কাচের জারে জারে ভরতি, সীল করা থাকে। আর সেই জল ছিটিয়ে তিনি নবজাতকের দীক্ষা দেন। আরব-প্যালেস্টাইনের মরুভূমির ভিতর দিয়ে কোথায় এক সুতলির মতো নদী বয়ে যায, সেই নদীর জল এনে সঞ্চয় করে রেখেছেন ভাঁড়ে-ভাঁড়ে, জারে-জারে। না, এনে উপায় কি?

এই জলে যে ঈশ্বরের একজাত পুত্রকে একদা দীক্ষা দিয়েছিলেন দীক্ষাদাতা জন।

মেরীও বুঝি তাঁর কাছেই দীক্ষা পেয়েছিল, তার নামকরণ হয়েছিল। সে জানে না। মনে পড়ে না।

সে চোখ মেলেই দেখেছে, পাদরী-পরিবারের সে একজন। এককিল্লি ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁরও ঠাঁই হয়েছে।

পাদরী-মা নেই, আছেন পাদরী-বাবা। আর তিনি বাবাই বটে। শুধু 'ডোণ্ট্'—শুধু 'করো না'র কারবার বাড়িতে। এটা করো না, ওটা করো না-র হুকুম জারী।

মন্দ বলিয়ো না।

মন্দ করিয়ো না।

মন্দ ভাবিয়ো না।

এই আওতায়ই বেড়ে উঠেছিল মেরী, শুনেছিল—কুমারী মেরী আর

মেরী ম্যাগডালেনকে বাদ দিলে, সব মেরীই মন্দ—নরকের দ্বারস্বরূপ। পুরুষকে ছলনাই তাদের ব্যবসা। তারা সাপের কথায় ভোলে, শয়তানের কথায় ভোলে। তারা ঈভ্, তারা হব্বার জাত।

ইডেন উদ্যান সৃষ্টি করলেন প্রভু ঈশ্বর, আর ফলে ফুলে ভরে দিলেন। তারই মধ্যে রইল জীবনবৃক্ষ আর জ্ঞানবৃক্ষ। ঈশ্বর আদমকে এনে ছেড়ে দিলেন সেই উদ্যানে। তাঁর নিষেধের হুকুম বেজে উঠল, ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে না আদম। ঐ ফল ভক্ষণ করলে নিশ্চিত মৃত্যু।

আদম খেল না। ঈশ্বর ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তার পাঁজরার একখানা হাড় খসিয়ে তার থেকে তৈরী করলেন নারীকে। ঈভ তার নাম। আদম ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখে বললেন,

আমার অস্থির সেরা অস্থি
আমার মেদের সেরা মেদ
তাই তো তার নাম দিলাম নারী।

সেই নারী সাপের কথায় খেল ফল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল। সে হল উয়ো টু ম্যান। উয়োম্যান। পুরুষের দুঃখের ভাগী নয়, দুঃখের কারণ। আর নিজের দুঃখেরও কারণ হল বই কি। প্রভু ঈশ্বর অভিশাপ দিলেন,

আমি তোমার দুঃখ বর্ধিত করব আর তোমার গর্ভ-যন্ত্রণা।
দুঃখেই সন্তান প্রসব করবে
তোমার স্বামীর ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা হবে
সে তোমার প্রভু হবে।

এ গল্প সে ছেলেবেলা থেকেই জানে। আর যখন-তখন এই নিয়ে খোঁটাও খেয়েছে।

ঈভের জাত!
নরকের দ্বার!
মানুষের দুঃখের কারণ।

বাড়িতে সে একাই নয়, আরও ঈভের জাত আছে। আছে সিন্থিয়া, সিলভিয়া, ডরোথিয়া, কিন্তু তারা ইডেন উদ্যানের ফুল বুঝি, তাদের ওসব কথা শুনতে হয় না। মাঝে মাঝে যদিও পাদরী-বাবা হুঁশিয়ারি দেন,

সাবধান, শয়তান থেকে সাবধান!

কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

সিনথিয়া তো বলে, ওসব মিছে কথা। ফিস্‌! চুপে চুপেই বলে।

শুনতে পায় সিলভিয়া, শুনতে পায় ডরোথিয়া।

তারা বলে, চুপ চুপ!

ক্রুশের চিহ্ন আঁকে বুকে। লকেটের ক্রুশটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে। মেরীও তাই করে। দেখাদেখি করে।

বাইবেল মিছে হতে পারে না, মিছে হলে দুনিয়াই মিছে। ওকথা ভাবলেও বুক কাঁপে কিন্তু তবু মেরী ভাবে, সিনথিয়া ওকথা বলে কেন?

সিনথিয়াকে শুধায়—কেন বললে?

সিনথিয়া মুখ বেঁকিয়ে বলে, এমনিই।

তারপরে চলে যায়।

কিন্তু মনে আলপিন ফোটে, সন্দেহ জাগে, আবার পাদরী-বাবার মুখে যখন শোনে, তখন সব ভুলে যায়।

পাপ করেছে নারী, শয়তান সর্প তাকে ভুলিয়ে নিয়ে খাইয়েছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। তাই নারীর উপরে গর্ভধারণের যন্ত্রণা অভিশাপ হয়ে পতিত হল। পুরুষ আদমই কি বাদ পড়ল?

না।

জলদমন্দ্রে ধ্বনিত হল,

> ভূমি অভিশপ্ত হল তোমার পাপে।
> দুঃখেই জীবন অতিবাহিত হবে,
> কণ্টক সে প্রসব করবে।
> রুটি ভক্ষণ করবে ললাটের স্বেদ ঝরিয়ে।
> ধূলি-সম্ভব তুমি
> ধূলিতেই ফিরে যাবে, মিশে যাবে।

তাই পাপকে তার বড় ভয়। পাপ সে করবে না এই তার পণ।

পণ রেখেই চলছে, শুধু 'না' 'না', বিধি-নিষেধের বাণীই তার সম্বল। সিনথিয়া, সিলভিয়ারা কেমন স্বচ্ছন্দ, তারা গাউন পা অবধিই পরে, কিন্তু চলার সময় হাঁটু অবধি যদি উঠেই আসে কেয়ার করে না। যদি পিনদ্ধ বক্ষে দোলা লাগে, সে-দোলায় আনন্দই পায়।

কিন্তু মেরী সন্তর্পণে চলে, গাউন তার পায়ের গোড়ালি থেকে উঠে আসে না, তার বুকে দোলা লাগলেও সে-দোলা সে দেখাতে চায় না।

ওরা ঠাট্টা করে বলে, এই যে মেরী ম্যাগডালেন এলেন!

না, না, ডরোথিয়া আরও মুখফোঁড়, সে বলে, ও কুমারী মেরীর মতো—

তারপর যা বলে, সে তো বলবার নয়। পাদরী-বাবা শুনলে ডরোথিয়ার উপর কড়া হুকুম জারি করবেন, তাকে চোখের জলে ধুইয়ে ফেলতে হবে পাপ, উপবাসে বিশুদ্ধ করতে হবে মন। অনুতাপে পুড়ে পুড়ে খাঁটি হতে হবে।

মেরী পাপ আমল দেয় না।

নো ইভ্‌ল—পাপ নয়!

কিন্তু দেহের মঞ্জরি ফুটে ওঠে, কামনার ফুল অজান্তে দল মেলে।

ঐ কামনাই তো পাপ। রক্তমাংসে পাপও বুঝি ফণা তোলে।

মঞ্জরি মেলে দেয়, আঁকড়ি বাড়িয়ে দেয়। মেরী জানে না, কিন্তু টের পায়।

একটা গাছ ছিল বীজ হয়ে, সে শিরশির করে উঠল, তারপরে অঙ্কুর, তারপরে পাতা, আঁকড়ি মেলে দিলে, তারপরে ডাল-পালা।

এখন মেরী গাউন যেখানে সেখানে ছাড়ে না, ছাড়তে পারে না, নিভৃত আশ্রয় খোঁজে। আরশির সমুখে গিয়ে দাঁড়ায়।

পাপড়ি খসার মতো খসে পড়ে গাউন, নিজেকে দেখে, মুগ্ধ হয়ে যায়। যৌবন তার পিল্‌পেগাড়ি করেছে। তার জয়োদ্ধত মিনার এই স্তনাগ্রচূড়া। ওখানে কি সঞ্চিত আছে? সঞ্চিত আছে সোহাগ, বাৎসল্য, ক্ষীরধারা। সঞ্চিত আছে···

ভয়ে শিউরে ওঠে মেরী।

পাপ! সাপ!

গাছ থেকে নেমে এল সাপ।

সাপ তাকে জড়িয়ে ধরছে পাকে পাকে, তার নগ্ন বুকে মাথা রেখেছে সাপ, তার মেখলা, তার উরু তারই বন্ধনে আবদ্ধ। মেরী ছুটে যায়, তাড়াতাড়ি আর একটা গাউন গলিয়ে নেয়।

আবার আরশির সমুখে ফিরে আসে, সাপকে আর দেখা যায় না। সাপ নেই, শয়তান নেই।

প্রভু, দয়াময় প্রভু!

সারা দেহে মঞ্জরি ফোটে, মনেও ফোটে বুঝি। আর সেই মঞ্জরির মধ্যে সাপ আসে অলক্ষ্যে।

সাপ না কামনা? কামনা না সাপ?

কামনা কি মন্দ? মন্দ তো কাম।

অত জানে না মেরী—কামনাকেই কাম বলে জানে। কামই কামনা। কামনাই কাম।

তাই তাকে এড়ায়।

এড়াতে চাইলেই কি পারা যায়?

সিলভিয়া বড়, তার বর চাই।

পাদরী-বাবা আমদানি করে বসলেন বর।

পাদরী নয়, পাদরীগিরিতে শিক্ষানবীস। ডিভিনিটি বা ধর্মশাস্ত্রের ডিগ্রীধারী। নাম হেনরী।

বুড়ী ঝি ম্যাগ্‌কে দিয়ে কর্ত্রীর বদলি সাজানো চলে না, তাই, কর্ত্রী হয়ে এলেন আণ্ট লিসি। ওরফে মাসী এলিজা। মাসী লিসি—লিজাও ডাকে কেউ কেউ।

এলিজা বিয়ে-থা করেন নি, মঠবাসিনী হবার জন্য শিক্ষা নিয়েছিলেন, কনভেণ্টের বদ্ধ দেয়ালের ভিতরে মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু মঠবাসিনী হন নি। কেননা, তাঁর পিতা বাদ সাধলেন। যাহোক, তিনি কুমারীই আছেন। বৃদ্ধা কুমারী, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ওল্ড মেইড'।

সেই ওল্ড মেইড গৃহকর্ত্রীর অভিনয় করতে এলেন। আর পরোক্ষে এলেন হেনরী নামে সরল পুঁটিটিকে সিলভিয়া নামে বঁড়শিতে গেঁথে তুলতে।

এ বিষয়ে পাদরী-বাবা ভুল করেন নি। বর্ষিয়সী কুমারীরা ঘটকালি করে নিজেদের অচরিতার্থ জীবনকে চরিতার্থ করেন—একথা স্পষ্ট করে না বুঝলেও, এমনি একটা আঁচ করেছিলেন রেভারেণ্ড জন স্মিথ। তার উপরে তো আছেই সেই যুক্তি—

কে আর এসব করবে? উনি তো নেই।

আণ্ট লিসি এসেই সিনথিয়া, ডরোথিয়াকে দেখলেন। মেরীকেও আড়চোখে দেখে নিলেন।

সিনথিয়া, ডরোথিয়াও বড়, বয়েস আঠারো-উনিশ-বিশ, সিলভিয়া তো

আরও বড়—তেইশ-চব্বিশ কি পঁচিশ। হেনরীর সমান-সমানই হবে—নয় তো দু-এক বছরের বড়।

আর দেখতে সবাই নেহাতই সাধারণ—সো-সো! পাঁচ-পাঁচি।

ভারী গাউনে, বী-হাইভ খোঁপায় আরও বিশ্রী দেখায়। মুখের বুড়োটে ভাব আরও বেড়ে যায়।

সিলভিয়া কুড়ির পরের পর্যায়ের বুড়ী। আর সিনথিয়া আর ডরোথিয়া কুড়ির কোঠায় এসে ঠেকতে-না-ঠেকতেই তাই

মেরীই এদের মধ্যে মধু ষোড়শী—রূপসী ... -সুইট সিক্সটীন ... দেখতেও ভাল।

লিজা মাসী বলেন, এ যেন ফ্রেম—আঁকা ছবি ...।

সিনথিয়া তো ঘন ঘন জড়িয়ে ধরে আদর করে আর বলে,

তুই আমার ভালবাসা—আমি ... হতাম তোকে ... হতাম।

সিলভিয়া, ডরোথিয়া কিছু বলে না ... এর রূপ দেখে সবুজ হয়ে ... হিংসায়।

তাই সিলভিয়ার বর আমদানি হতেই লিজা মাসীর টনক নড়ল— সিনথিয়া আর ডরোথিয়াকে সরাতে হবে। বটেই, মেরীকেও সরাতে হবে। নইলে বাছাই করার সুবিধে পেলে ... বাছাই করবে ... তো জানা কথাই।

মেরী শোনে, পাদরী-বাবাকে ঝঙ্কার দিয়ে বলেন ... তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি-লোপ পেয়েছে ... না এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ!

আগুনের ...

হ্যাঁগো হ্যাঁ, এ তো তোমার আদুরে মেরী।

ওঃ মেরী!

আর কথা হয় না, হয় কিনা মেরী জানে না। তবে ঢালাও হুকুম জারি হয়—

রবিবারে আসবে হেনরী, আসবে বিকেলে। কেউ বাড়ি থাকতে পাবে না।

কেউ থাকেও না, সিনথিয়া না, ডরোথিয়া না, মেরীও না। আর-এক

গ্রামে যায়, আর-এক পাদরীর বাড়ি। রাত্তিরে নটায় ফেরে। তখন হেনরীর পাত্তা মেলে না, শুধু দেখা যায়, সিলভিয়া যেন সুন্দরী হয়ে উঠেছে। মুখে রং লেগেছে, চোখে লেগেছে নেশা।

সবাই তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সিলভিয়াই গল্প করতে চায়। গল্প করে হেনরীর। রূপকথার রাজপুত্রের গল্পকেও হার মানায়, হার মানায় মধ্যযুগের বীর যোদ্ধার গল্পকে।

মেরীর মনটা কেমন করে ওঠে, রক্তে দোলা লাগে। সাপটা ঘুমিয়ে ছিল কুণ্ডলী পাকিয়ে, আড়মোড়া ভাঙছে বুঝি।

হে প্রভু -

রূপকথার রাজপুত্র, মধ্যযুগের বীর যোদ্ধার সঙ্গে মেরীর দেখা হয়ে গেল।

সেদিন রবিবার। কিন্তু মেরী বেরুতে পারে নি। অকস্মাৎ ফ্লু হয়ে শয্যাগত হয়েছে। আণ্ট লিজা ভাবিত, সিলভিয়াও তাই।

মেরীকে বাগানের এক কোণে মালির যে ঘর আছে, সেখানেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। সেখানেই শুয়ে রইল।

জ্বর কমেছে, গায়ে ব্যথা। জ্বরের নেশাটুকু লেগে আছে চোখে মুখে। তাই চোখ-মুখ তার রক্ত-লিলির মতোই রক্তাভ। সে নেশার ঘোরে উঠে জাগ থেকে জল খেয়ে টলতে টলতে এল বাগানে। তারপর আর মনে নেই…

চোখ মেলতে দেখলে এক পুরুষের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে।

চমকে উঠেছিল মেরী, সাপ ভেবেছিল। উঠে বসতে গিয়ে আবার টলে পড়ে গিয়েছিল কোলে।

পুরুষটি কানে মুখ রেখে বলেছিল, ভয় কি!

মেরী একবার রক্ত চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল, তারপর চোখ বুজেছিল।

এই পুরুষই হেনরী। পাদরীগিরির শিক্ষানবীস হেনরী। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিভিনিটিশাস্ত্র-পড়া হেনরী। সিলভিয়ার রূপকথার রাজপুত্র, মধ্যযুগের নাইট হেনরী।

হেনরীকে এই তার প্রথম দর্শন

প্রথম দর্শনে প্রেম হয়েছিল কি না বোঝে নি, তবে সাপ বলে মনে হয় নি। জ্বরের নেশায় সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছিল।

হেনরীর রবিবারের পালা বদল হল। সে যখন-তখন আসে, এসে মেরীর খোঁজ করে। ডেকে জিজ্ঞেস করে না, চোখে খোঁজে।

সিলভিয়া তাস পেড়ে বসলে তাস চুরি করে ভণ্ডুল বাধায় খেলায়।

সিলভিয়াকে রাগায়।

তারপর চলে যায়।

যাবার সময় প্যান্ট্রির দরজায় উঁকি মেরে যায়।

মেরীও কাজ ফেলে যায় বাগানে। সেই হট হাউসের আড়ালে লিলি অফ্ দি ভেলি যেখানে ফোটে, যেখানে ঘন ঘাসের শয্যা বিছিয়ে থাকে, যেখানে কাউস্লিপ ফুল হাসে, সেইখানে সেই বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকে।

হেনরী এসে বলে, ইস্ মুখ যে লাল, জ্বর আছে বুঝি! দেখি, নাড়ি দেখি।

মেরী হাত বাড়িয়ে দেয়। নাড়ি টিপে ধরে হাত দিয়ে হেনরী।

কি দেখলে? শুধায় মেরী।

জ্বর—খুব জ্বর।

ফ্লু নাকি?

না, ফ্লু নয়, লভফিভার—প্রেম জ্বর। কানে কানে বলে হেনরী।

মেরী হাসে। বলে, এ জ্বর যেন না ছাড়ে।

এত কথা কোথায় পায় মেরী? কথা যেন একটার পর একটা স্রোতের মতো তোড়ে আসে, বয়ে যায়। কথা ফুরিয়ে যায় এক সময়। নায়গ্রার মতো নিঃশব্দতার নিস্রাব ঝরে পড়ে। তখন বাহু দিয়ে কাঁধ জড়িয়ে ধরে মেরী, বুকের কাছে টেনে আনে হেনরীর মাথা। বুকে চেপে ধরে। রিনঝিন করে ওঠে রক্ত।

হেনরী চলে গেলে রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাবে, এত কথা সে শিখল কোথায়? এত প্রেম সে পেল কোথায়?

অন্ধকারে ভাবনার ভ্রূণ জন্ম নেয় লাখে লাখে, বেড়ে ওঠে।

সাপ দেখতে পায় না মেরী। সাপ ইডেন উষ্ঠান থেকে কবে তার ঘরে এসেছে, তাকে নাগপাশে বেঁধেছে, টের পায় না। হিলহিলে সাপ, ঠাণ্ডা সাপ—উষ্ণ ভুজবন্ধে কি তার হদিস মেলে! আহা, বেচারী মেরী!

সাপ একদিন হঠাৎ ফণা তুলে ফোঁস করে উঠেছিল, তার রুপোলী খোলসটা ঝিকিয়ে উঠেছিল।

সেদিনও লাইলাক ঝোপের তলায় হট হাউসের সেই বেঞ্চিই সংযোগস্থল।

হেনরী বলেছিল,

মেরী, মারিয়া, ডার্লিং, তুমি তো আমার, আমার বুকের পাঁজরের হাড় দিয়ে তুমি গড়া। আমি ঘুমিয়েছিলাম, প্রভু ঈশ্বর এসে তুলে নিলেন পাঁজরের হাড়খানা, টেরও পেলাম না। আবার যে-কে সেই হয়ে গেল বুকখানা। জেগে দেখি তুমি।

আর সিলভিয়া কার পাঁজরের হাড় দিয়ে গড়া? হঠাৎ শুধিয়েছিল মেরী? সে নাগরিকা নয়, গ্রাম্য বালিকা, তবু ঈর্ষায়ই সে শুধিয়েছিল।

হেনরী উত্তর দিয়েছিল, আর যার হোক, আমার তো নয়।

মেরী বলেছিল, কিন্তু সিলভিয়া যে—

না, না, আমি তোমাকে চেয়ে নেব। তুমি আমার অস্থি, তুমি আমার মেদ—তুমি আমার।

তোমার যদি, তাহলে বাধা কি চুম্বনে, বাধা কি নিবিড় আলিঙ্গনে!

বাধা দেয় নি মেরী।

দেখেছে এ প্রিমরোজে-ভরা পথ মেরী। ভাবে নি, সেই পথের শেষে চির-বহ্নিমান নরকাগ্নির কথা।

অথচ আগুন তো সেদিন জ্বলেছিল দেহের রক্তকণায়, মগজের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, আগুন তো জ্বলেছিল।

একটা বিদেহী সাপ যেন নড়েচড়ে উঠেছিল, হিস হিস, ফোঁস ফোঁস করে উঠেছিল, পাকে পাকে বেঁধেছিল, হেনরীর দেহ যেন সেই সাপের দেহ, তার মুখ যেন সাপের মুখ হয়ে ছোবল মেরেছিল। বিদেহী সাপ, তন্মাত্র সাপ, দেহ পেয়েছিল সেদিন।

হাপসা। ভাপসা। ক্লোরোফর্মের গন্ধ, লভেনামের চড়া মাত্রা। পশী

ফুল ফুটল, ফুটল আফিম ফুল। আঁধার··· সাঁপের ছাপ—সাপের ছাপ। মৃত্যু—সুন্দর মৃত্যু।—

সাপ?

মেরী চমকে উঠেছিল সেই ক্লান্তির ক্ষণে, সে তো মুহূর্তমাত্র—তারপর সাপের বিষে ঢলে পড়েছিল।

সাপের বিষ কি লুকোনো যায়?

নীল হয়ে যায় দেহ, পুড়ে যায়।

মুখ পাণ্ডু হয়ে আসে, চোখের কোলে মেঘের মতো কালি পড়ে। মেরীর তাই পড়েছিল।

পাদরী-বাবা পুরুষ, অত বুঝতে পারেন নি। পেরেছিলেন আন্টি লিজা। একদিন জিজ্ঞেস করলেন,

কি হয়েছে রে তোর মেরিয়া?

কিছুই তো হয় নি।

হয় নি? মুখ হলদে হয়ে গেছে যে!

পাদরী-বাবা বললেন, ও কিছু নয়, ক্যালোমেল খেলেই সারবে।

ক্যালোমেল খেয়েছিল, সারে নি। বরং বেড়েছে।

আন্টি এবার স্পষ্টই ধমকে উঠেছিলেন, এ তোর বেচাল! বল্—কার সঙ্গে?

মেরী মুখ নীচু করেছিল।

যা—দূর হয়ে যা! গর্জে উঠেছিলেন আন্টি!

মেরী বাড়ি ছেড়ে যায় নি, তবে সমুখ থেকে চলে গিয়েছিল।

সকলের মুখ গম্ভীর, সিলভিয়া, সিনথিয়া আড়চোখে তাকায়। ডরোথিয়াও কাছে ঘেঁষে না।

সবার ঘুমোতে ডাক পড়েছিল পাদরী-বাবার ঘরে। আন্টি ছিলেন সেখানে। আর পাদরী-বাবা।

পাদরী-বাবা বলেছিলেন, বল, কে এই পাপের ভাগী?

আন্টি বলেছিলেন, বল্—কার সঙ্গে মুখ পুড়িয়েছিস?

উত্তর দেয়নি মেরী।

আন্টি বলেছিলেন—যেমন মা তেমনি মেয়ে।

মা?

মার নাম শুনে চমকে উঠেছিল মেরী।

পাদরী-বাবা বলেছিলেন পাদরী ঢঙে, ওকে যেতে দাও!

মেরী চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে। দরজা না পেরোতেই শুনল আন্টি বলছেন,

বলবই তো, যেমন মা, তেমনি মেয়ে। মার তো খোঁজই নেই।

মার খোঁজ না থাক, ওর বাপকে আমি চিনি লিজা—ধীরে ধীরে বলেছিলেন পাদরী-বাবা।

বাবার নাম শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মেরী, কান পেতেছিল।

বাপকে চেন?

হ্যাঁ, আমিই ওর বাপ।

তুমি?

হ্যাঁ।

তুমি?

তবু আবার বলেছিলেন...

হ্যাঁ, আমিই। আমার স্ত্রী, তোমার বোন মারা যাবার পর আমি...

তুমি! চিৎকার উচ্চগ্রামে উঠেছিল।

তারপর ঝনঝন শব্দ। বহু চীনামাটির প্লেট আর কাচের ফুলদানির চুর্ণায়িত ঝঙ্কার। মেরী ছুটে চলে এসেছিল।

সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল, তার গর্ভের আঁধারে এসেছে সন্তান, নড়ছে, বাড়ছে।

সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল তার স্তনের চুচুকে চুচুকে যেন শিহরণ জেগেছে, কোন এক উদ্বেলিত ক্ষীরধারা যেন বাৎসল্য হয়ে রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়ে মরছে। বেরুতে চায়, ফেটে, ছুটে, শতনালে, শতধারে বেরুতে চায়।

সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল, তাকে স্পর্শ দিয়ে জাগিয়েছে পুরুষ, নারী করেছে তাকে।

তাই গম্ভীরমুখ গুরুজন, আর চাপা হাসি আড়চোখের চাহনিভরা, চোখ সখীরা তাকে লজ্জা দিতে পারে নি। সে আপন মনে ভাবত তার অনাগত সন্তানের কথা।

সেই রেবেকার সন্তান, যার কথা বলেছিলেন প্রভু:—

তোমার গর্ভে আছে এক জাতি···

তার সন্তানও জাতি সৃষ্টি করবে, মহৎ হবে। তার বাপ তার মস্তক আঘ্রাণ করে বলবে,

আমার পুত্রের আঘ্রাণ
তো প্রভুর আশিসভরা প্রান্তরের গন্ধবহ।
তাই ঈশ্বর তো দিলেন তোমাকে
স্বর্গের শিশির,
দিলেন মাটির মেদস্ফীতি
শস্য আর সুরা।
হে পুত্র—সবাই তোমাকে সেবা করুক
জাতিপুঞ্জ নত করুক মাথা।
তুমি হও সবার নেতা।
···তোমাকে যে অভিশাপ দেবে
সে হোক অভিশপ্ত।
তোমাকে যে আশীর্বাদ করবে, সে
হোক আশিসপূতঃ।

বাপ এল, অনাগত সন্তানের বাপ। সে তো পুরাণকথার ইসাকের মতো নয়। কান পেতে শুনলে না গর্ভের দেয়ালে ভ্রূণায়িত সন্তানের বাণী। তার মুখ গম্ভীর।

মেরী শুধালে, কি হয়েছে তোমার?

কিছু না।

আমার বাছাকে দেখবে না?

না।

কেন?

শোন, ওসব কথা রাখ। এ সন্তান তুমি পাবে না।

পাব না?

না, একে ভ্রূণেই শেষ করে দিতে হবে।

সে যে মহাপাপ! শিউরে উঠল মেরী।

মহাপাপ হোক, কলঙ্ক তো নয়।

কলঙ্ক—কিসের কলঙ্ক? গর্জে উঠেছিল মেরী।

কুমারী-মা'র কলঙ্ক।

মেরীমাতাও তো কুমারী।

চুপ, চুপ! তুমি মেরীমাতা নও, আর হোলিগোস্ট-দিব্য আত্মা, তোমার কাছে আসেন নি। হেলিলুয়া ধ্বনি উঠবে না তোমার জন্যে। তোমাকে লোক ছি-ছি করবে!

মেরী বলতে পারে নি। কিন্তু তার মন বলতে চেয়েছিল—হেলিলুয়া—ঈশ্বর তোমারই মহিমা—এ ধ্বনি তো তারই প্রাপ্য। লোকে ছিঃ ছিঃ করুক—কলঙ্ক রটাক—সে তো ধন্য। তার নারীত্ব ধন্য।

কিন্তু গ্রামের মেয়ে ওকথা বলতে পারে নি, শহুরে মেয়ে হলেই কি পারত?

হেনরী বলেছিল, ওঁরা জানেন?

ঘাড় নেড়েছিল মেরী।

কিছু বলেছেন?

আমাকে নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নাম! কি সর্বনাশ! আঁতকে উঠেছিল ডিভিনিটির ছাত্র।

অত দুঃখেও হাসি পেয়েছিল। মেরী বলেছিল, নাম বলি নি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল পুরুষ—যাক!

তারপর একটু আদর করে হাতে হাত রেখে বলেছিল, একজন অ্যাপথেকারীর কাছ থেকে ওষুধ এনে দিই। আমার জানা আছে।

মেরী বুঝতে পারে নি, তাকিয়েছিল ফ্যালফ্যাল করে।

একটু বিতাং দিয়েই বলেছিল পাদরীপুঙ্গব এবার, কাঁটা বিঁধেছে, তাকে খসিয়ে ফেলতে হবে।

কাঁটা ?

হ্যাঁ, ঐ সন্তান।

কোথায় হেনরী, কোথায় কে! ইডেন উদ্যানের সাপটা তখন এসে দাঁড়িয়েছে, চোখ টিপে হাসছে।

সাপ! সাপ!

পাপ! পাপ!

আর্তনাদ করে পালিয়ে এসেছিল মেরী।

পাদরী-বাবার কাছে সে স্বীকার করেছিল সব কথা। তিনি তো পাদরী, আবার বাবাও। তার কাছে কনফেসন দিতে বাধা কি! স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিছু গোপন করে নি।

তিনি শুনেছিলেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে বলে উঠেছিলেন—

তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু!

পূর্ণ হয়েছিল প্রভুরই ইচ্ছা।

জ্যাকবের জন্ম হয়েছিল হাসপাতালে, ঠাঁই হয়েছিল অনাথআশ্রমে।

ইসাক আসে নি, ইসাক আঘ্রাণ করে নি তার মস্তক। আশীর্বাদ করে নি। এই জেকবদের বুঝি এমনিই হয়।

জানে না মেরী, খোঁজই রাখে না। সে এসে ছিটকে পড়েছিল লণ্ডন নগরে। সাথীও তার জুটেছিল একের পর এক। না জুটলে চলবেই বা কেন ?

কসাই, ধোবা, জাহাজের লস্কর এমনি সব বন্ধু। হরেক রকমের বন্ধু। সবাই আসে, স্ফূর্তি করে।

সাপের কথা আর মনেও পড়ে না। সেই তো এখন সাপিনী। সত্যিই তো তাই। যখন মদ খায়, চোখ যখন চকচকিয়ে ওঠে, তখন সাপের চোখ বলে ভ্রম হয়। তার কসাই প্রেমিক চমকে উঠেছিল একদিন।

এ সার্পেন্ট! বলে উঠেছিল।

তার লস্কর প্রেমিক তার কসাইয়ের থোল মাংসের মতো পুরু, লাল ঠোঁট দুখানির গুণ গাইত বটে, কিন্তু, ঠোঁটে ঠোঁট দিতে গিয়ে ভয় পেত—বলত মারি-ডিয়ারী, তোর ঠোঁট দুটো যেন সোর্ড ফিসের মতো। ওখানে চুমো খেলে আর বাঁচোয়া নেই।

সোর্ড ফিস—তীক্ষ্ণ তলোয়ার-ঠোঁট মাছ। সাগরের মাছ।

মেরী হেসে বলতো, বাঁচোয়া চাও নাকি?

লস্কর বলতো য়্যাভ্ মারিয়া! মেরীর মাইরী—কে চায়! তারপর সেই হাঙর-ধারালো ঠোঁট কামড়ে দিত।

সাপ, কামুক সাপ, সাক্ষাৎ শয়তান, কিন্তু সাপিনী তো সাপের কামনার আধার, সে তো কামনার দ্বার, নরকের দ্বার।

মেরীর তখন মন নেই বাইবেলে, তার বদলে ধরেছে বীয়ার। বীয়ারই ধ্যান জ্ঞান, জিন-বিটার্সই পরম আরাধ্য, হুইস্কীই সারাৎসার। সে আকণ্ঠ মদ খায়, পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে বলে,

ডিয়ার, দাও, আর একটু দাও, নইলে জমবে না।

ক' বোতলে তার জমে কে বলবে!

বন্ধু রোজ জোটে না, তাই দোকানে ঢুকে ছিঁচকে চুরিও করতে হয়। এটা-ওটা দেখে, এদিক-ওদিক তাকায়, হঠাৎ গাউনের ভিতরে গলিয়ে দেয়। তারপরে চলে আসে।

চোরা বাজারে সেই মাল বিক্রি হয়, যা পায় তা দিয়ে মদ গেলে। তবে হাত বড়জোর সাফ, এর জন্য ওল্ড বেইলীর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হয় নি, নিউগেটের জেলখানায় কয়েদী হতে হয় নি। কিন্তু ডর ছিল। ওর বীয়ারের মৌতাত সে-ডর ক্রমে কেড়ে নিয়েছে। বন্ধুরাও সাহস যুগিয়েছে, বলেছে—ব্রাভো! সাবাস!

নিউগেটের জেলখানার উঁচু পাঁচিলটা মেরী তবু এড়িয়েই চলত। কখনো-সখনো ভুলক্রমে গিয়ে পড়লে, সে পালিয়ে আসত। আয়ার স্ট্রীট হিলের গলি পেরিয়ে পট লেনের ভিতর দিয়ে পালাত।

সেদিন বোধ হয় সেপ্টেম্বরের শেষ দিন। ধূসর সকাল, শীতের কুয়াশার প্রথম চিহ্ন দেখা দিয়েছে। এখনো পেঁজা তুলোর মত ফগ্ জমা হতে পারে নি, শুধু আবছা বুড়ির সুতোর মতো এখানে ওখানে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর পরে অক্টোবরে পেঁজা তুলোর মতো ছড়িয়ে পড়বে ফগ্। তারপরে তো ভারী পর্দার মত ছেয়ে দেবে। বিড়াল-পায়ে পায়ে

এগিয়ে যাবে, বাড়িগুলোর শার্সি-খড়খড়ির উপর এসে নাক ঠুসে জমবে। কিন্তু আজ লণ্ডন ফগ তা নয়, আজকের ফগে তার চিহ্ন আছে মাত্র।

মেরী সেদিন বেরিয়েছিল সকালে। খোঁয়াড়ি ভাঙবার জন্যেই বেরিয়েছিল। একটা শুঁড়িখানাও খোলা পায় নি। তাই হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল, খুঁজতে খুঁজতে চলেছিল।

প্রথম ফগ গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করে না, কিন্তু তাই করল। ঠিক নিউগেটের কারাগারের উদ্ধত ফটকের সমুখে তাকে নিয়ে এল।

প্রথমে সে টের পায় নি, হঠাৎ সামনে দেখেই আঁতকে উঠল—সে ছুটে পালাতে গেল।

আর সেই সময়েই দেখা।

কার সঙ্গে?

সেই হেনরীর সঙ্গে।

পাদরীর জোব্বা-পরা হেনরী

সাপ! কিং কোবরা? না, ঈল, না ভাইপার। ভাইপারই হবে।

তার তো ভয় নেই, সে নিজেও তাই। তবু পালাতে চেয়েছিল মেরী, কিন্তু পালাতে পারে নি। পাদরী-পুঙ্গব এসে সমুখে দাঁড়াতেই হেসে বলেছিল, কি ডীয়ার, বীয়ার খাওয়াবে?

পাদরী হেসে উত্তর দিয়েছিল, আলবৎ।

নিয়ে গিয়েছিল এক কানাগলির ভেতরে শুঁড়িখানায়।

বীয়ার খেয়ে খোঁয়াড়ি ভেঙেছিল তার, তবু সহজ হতে পারে নি। সহজ হয়েছিল হেনরী নিজে। হেসে বলেছিল,

ডীয়ারী, সেই যে পালালে, কত খোঁজ করেছি আর পাই নি।

পাবে কি করে? এ শহরে হারিয়ে গেলে কি আর পাওয়া যায়? পুরোনো দিনের মেরীর অভিমান যেন কণ্ঠে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তার-পরে সে অভিমান গলে পড়ে নি কান্নায়, সে জমাট হয়ে ক্রোধে রূপ পেয়েছিল।

সে হঠাৎ গাউনটা একটু টেনে এলোমেলো চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে বলেছিল—

আসি! বাই-বাই।

উঠেও পড়েছিল। তার হাত ধরে বসিয়ে দিয়েছিল হেনরী।

বোসো। আর একটা বোতল।

না।

কেন?

উঁচুতলার মানুষের সঙ্গে নীচু তলার মানুষের কি দোস্তি সাজে? পায়রার পায়রার সঙ্গে দোস্তি, বাজের বাজের সঙ্গে।

আমি তোমারই দলে, হেসে বলেছিল হেনরী। বাজ বল বাজ, কবুতর বল কবুতর।

তুমি পাদরী।

হ্যাঁ, পাদরী, তবে জেলের পাখী, জেলবার্ড।

জেলবার্ড!

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমার চেয়ে নীচু।

সিলভিয়া?

সিলভিয়া! হোহো করে করে হেসে উঠেছিল হেনরী। সিলভিয়া কবে ভেসে গেছে। বাপ বিয়ে দিলে না, তা ভালই হল। কত সিলভিয়া জুটল।

আর উঠে আসা চলে না। বীয়ার ফরমায়েস দেওয়া হল, তারপরে এল র‍্যারাক (Arrack), আবার একবোতল সেই মহার্ঘ ম্যাডেইরাও—যার দাম দু শিলিং।

নেশা জমে উঠতে মেরীর মনে হল, পাদরী নেই, ব্যারন নেই, ভদ্দর লোক নেই। দুই জাত আছে—এক যারা জেলে যায়, আর যারা যায় না। জেলের দোরে যাদের পা তারাও একই জাত। সেও হেনরীর জাত, হেনরীও তার জাত। তাই এবার নেশায় ভিজে উঠল চোখের পাতা। কণ্ঠের অভিমানটুকু আবেগ হয়ে ঝরে পড়ল। সে হেনরীর কোলে মাথা রেখে দু বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

এমনি গলা জড়িয়ে ধরেছিল কুমারী, আনাঘ্রাতা কুমারী মেরী। আর শত আঘ্রাতা দলিতা মেরীও ধরল। সেদিন পেয়েছিল পুরুষ রতন, তার সন্তানের জনককে, আজ পেল তার সাঙাতকে। সেদিন দিতে এসেছিল, আজ দেওয়া-নেওয়া সমান ভাগ। বরং নেবে বেশী, দেবে কম। টানবে বেশী। না পারে, সমান, সমান তো থাকবেই। বলবে—উই আর কুইটস্!

ব্যাবিলনের মেয়েরা বুঝি এমনি ছিল, নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ ছিল তারা। তাদেরই একজন সে। তার চেয়ে বড় নয়। কিন্তু তাদেরও কি ছিল অনাথআশ্রমে শিশুসন্তান? তাদেরও ছিল কি বুকভরা মা?

হয়তো ছিল, ইতিবৃত্তকার তো নীরব।

দূর হোক গে! একটা কঠিন, অখ্রীষ্টানি শপথ করে বসেছিল মেরী, গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল হেনরীর···

হ্যারী, সুইট হ্যারী, আরও বীয়ার, আরও অ্যারাক, আরও ব্র্যাণ্ডি, আরও আরও ম্যাডেইরা।···

আর মনে পড়ে, গান ধরেছিল স্খলিত কণ্ঠে পাদরী হেনরী।

ও মেরী, মেইরী—মারিয়া হায়!
তার পাজামার পিনটি হারায়
য়্যাভ্ মেরী, কি হবে উপায়!
মেরী কি করবে জানে না
ও মেরী, তোর পাজামা বাগ তো মানে না।

ধরবে নাই বা কেন?

মেরী তো জানে না, যুগের এই রীতি।
যেখানে উপাসনার মন্দির গড়েন ঈশ্বর
সেইখানেই মদের ভাঁটি গড়ে শয়তান
আর দেখা যায়,
জমায়েৎ ভাঁটিতেই জাঁকালো।

একথা তো বলেন ডেনিয়েল ডিফো—এ যুগের লেখক, আর পাদরী হেনরী জানে—উপাসনা মন্দিরের দরজা খুললেই ভাঁটিখানা মেলে। জলের কলের মতো মদের নল চলে যায় বেদীর আড়াল্ দিয়ে। টিপ টিপ করে ঝরে। গোঁড়া পাদরীরা পান করে।

মেরী জানে না, হ্যারী জানে।

মেরী কিছুই জানে না।

শুধু জানে বেঙ্গালার নাম, শুধু জানে ইণ্ডিয়ার নাম

জানে সেখানে স্বর্ণরেণু বিছিয়ে থাকে ধূলায়, জানে শুধু সেই ধুলো কুড়িয়ে যারা আনে সেই নওয়াবদের কথা। তাও রূপকথায় জানা।

ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো সেডান-চেয়ার দেখে, সে পথে সরে দাঁড়ায়, শোনে ঐ হঠাৎ-নওয়াবেরা যায়। ঐটুকুই—তার বেশি নয়!

সে তো জানে না, মহাসম্মানী জন কোম্পানীর কথা।

সে তো জানে না। একদিন আগ্রায় সালাম বাজিয়ে বাণিজ্যের ফরমান পেয়েছিল কমজোরী কোম্পানী। তারাই আজ শঠতায়, প্রবঞ্চনায়, প্রতারণায় জবরদস্ত বাংলার অধীশ্বর। আর সেই বাংলা ছোট নেই—সে—

ছড়িয়ে পড়ছে। তাই গভর্নরে কুলোয় না, গভর্নর-জেনারেল চাই। নিমক মহলের রাইটার—নগণ্য কেরানী, পলাশীর লড়িয়ে সেপাই আজ সেই খেতাবের অধিকারী। আর হিন্দুস্থানের ম্যাপে খানিকটা ব্রিটিশ লালের ছোপ লেগে গেছে। বেশ খানিকটা গাঢ় ছোপ, ঘন ছোপ, পাকা ছোপ। চারিদিকে এখনো রাজা-রাজড়া আর নবাবদের পাগড়ি আর শেরপ্যাঁচের মণি-মাণিক্যের বহুবর্ণ জেল্লা দেখা যায়, কিন্তু সে জেল্লা টিকবে কিনা কে জানে!

কোম্পানী—কোম্পানী বাহাদুর কি জয়!

বিদেশী বেনিয়া প্রতিষ্ঠান আর সেই বেনিয়া প্রতিষ্ঠানের হাতে শাসনের দণ্ড, শোষণের দণ্ড, ধ্বংসের ইঞ্জিন। কাঁচা মাল লুটে নেয়, রাজ্য লুটে নেয়, ধনভাণ্ডার লুটে নেয় আর ধ্বংস করে। চরকা ধ্বংস করে, তাঁত ভাঙে, তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কাটা পড়ে। তার হাতে শুধু কি অস্ত্রই আছে, পাদরীও আছে—তারা ধর্মের নামে শোষণের যন্ত্রটাকে আরও তৈলাক্ত করে, আর সে যন্ত্র চলে দিকে দিকে। তাই পাদরীদের সেখানে মান বেশী। কিন্তু ক'জন যেতে চায়। দু-একজন যায় ধর্মের টানে, তারা ধর্ম প্রচার করে, তারা 'অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার'—স্বপ্ন দেখে, হীদেনকে ধর্ম বিলায়। আবার সেই সঙ্গে দিয়ে বসে সাদার সংস্কৃতিরই একটু ভাগ। কিন্তু তাঁদের মতো ক'জন যেতে চায়। জোর করে প্রথম দিকে পাঠানো হত নিউগেটের জেলের পাপীদের। ওরা যাক, ম্যালেরিয়া জ্বরে ধুঁকতে-ধুঁকতে মরুক! এখনো তাই। আর যায় বেলেল্লা পাদরীর দল। তারাও পাপী, কিন্তু লণ্ডনের বিশপ দেখেও দেখেন না। তিনি আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দেন। আর সৈন্যদলকে তো যেতেই হবে। তারা তো এককাঠি সরেশ। ক্লাইভ

আর ভেরেপেস্ট সৈনিকদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একটা ইনকোয়ারী কমিশন বসিয়েছিলেন। সেই কমিশন বিবরণী দিয়েছিল—ওরা পাপাসক্ত, ঘুষখোর, ব্যভিচারী, উৎপীড়নকারী, ওরা ধনের নেশায় সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছে।

পাদরীদের কথা বিবরণীতে বলে নি। কিন্তু পাদরীদের বিবরণীও মথি-লিখিত সুসমাচার নয়।

মেরী তো জানে না, এই আগাছাদের উপড়ে দিচ্ছে ইংলণ্ড, তাদের লোভ দেখাচ্ছে পূর্ব দেশের স্বর্ণরেণুর। আর তারা ছুটছে তারই লোভে। তাদের চুরি-করা হাতে সেখানে বে-আইনী লুঠ-তরাজের নখ গজাবে, তারা অশক্ত, দুর্বলের হাত থেকে কেড়ে নেবে ধন, তারা ঠকাবে, জুয়ো খেলবে, ব্যভিচারে ডুবে যাবে।

এসব মেরী জানে না। আবার এও জানে না যে, কোম্পানী বাহাদুর জাত বাঁচাবার জন্য মেয়েও রপ্তানি করছিলেন।

কোম্পানী তখনো বাহাদুর হন নি, রাজা হন নি, ব্রিটিশ লালের ছোপ লাগে নি হিন্দুস্থানের মানচিত্রে, তখন শুধু কুঠি করে ভিত গাড়ছেন। শুধু কুঠিয়াল কোম্পানী, শুধু বেনিয়া কোম্পানী তখন। এই সময়ই জাত দিয়েছিলেন জব চার্নক। না, জাত দেন নি। পুরুষ তো পরেশ, তার জাত কি যায়! তবু ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিল সাদার জাত্যাভিমান।

জব চার্নক আবার দিশি বিবির পেটের মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন বৌরিজ আর ক'জন কোম্পানীর হোমরা-চোমরা কর্মচারীর সঙ্গে।

সেদিন কথা ওঠে নি। উঠলেও কান দেবার মতো নয়।

জব চার্নকের ব্যাপারে কান দেন নি কোম্পানী, কিন্তু কদিন পরে কানে তাঁর জল গেল। ফতোয়া জারি করে দিলেন—

দেশীয় নারীর সংসর্গে যে আসিবে, তাহার পদোন্নতি বন্ধ হইবে। সে কর্মচ্যুত হইবে। কোম্পানী জানাইতেছেন যে, উহাদের জন্য ইউরোপীয় নারী সরবরাহ করা হইবে।

কিন্তু সরবরাহ কোথায়?

মেয়ে তো কাঁচা মাল নয় যে যোগাড় করে আনলেই হল।

তাই আবার ফতোয়া জারি করলেন কোম্পানী—

আমাদের সৈন্যগণ যাহাতে দেশীয় নারীদের বিবাহ করিতে চায়, তৎবিষয়ে উৎসাহ দেখাইতে হইবে। সাধারণ নারী দেশে দুর্লভ, কেহই নিজের জাহাজ-ভাড়া দিয়া এই দেশে আসিতে চায় না।

কিন্তু এতো কোম্পানী বাহাদুর হবার আগেকার কথা, রাজা হবার আগেকার কথা।

জাত বাঁচাবার কথাটা খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতে লাগল, মহামান্য বেনিয়া কোম্পানীর ভাগ্য-নিয়ন্তা মহামান্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্স বাহাদুর জানালেন—

যাহারা বিবাহিত, তাহারা স্ত্রী সমভিব্যাহারে ইণ্ডিয়ায় যাইতে পারিবে। অন্যান্য কুমারীরাও যাইবে। প্রথম যে দল যাইবে, তাহাদের কোম্পানী বৎসরকাল ভরণপোষণ করিবেন। তৎপরেও যে সকল কুমারী স্বামী জুটাইতে অসমর্থ হইবে, তাহাদের আরও বৎসরকাল ভরণপোষণ করা হইবে।

প্রথম দল সুবিধে পেলেও দ্বিতীয় দলকে তা দেওয়া হয় নি। তারা অনেক আন্দোলন করতে তাদের ছয় থেকে আট প্যাগোডা মাসে ভাতা দেবার বন্দোবস্ত হল। তাও যারা সত্যিই দুর্দশাগ্রস্ত। এক-এক প্যাগোডায় আট শিলিং, সেই আট শিলিং ভাতা বরাদ্দ হল জীয়ন্ত মালগুলির জন্য।

কিন্তু কে দেবে ভাতা?

কোর্ট অব ডিরেক্টর্স, না জন কোম্পানী?

জন কোম্পানীর কাউন্সিল জানতে চাইলেন—আমরা হুকুম পাই নাই, এমত অবস্থায় ভাতা না দেওয়ায় অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা প্রকৃতই দুর্দশাগ্রস্ত তাহাদের অনশনে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছি।··· তাহারা যে সামান্য সতীধর্মের ভাণ্ডার লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে।···আপনারা আমাদের জানাইয়াছেন যে, কতিপয় নারী জাতি, ধর্ম এবং ইংলণ্ডরাজের স্বার্থের প্রতিকূল আচরণ করিয়া কলঙ্কভাগিনী হইয়াছে, তাহাদের আপনারা এই সতর্কবাণী জ্ঞাপন করুন যে, তাহারা সংযত হইবে, প্রকৃত খ্রীষ্টান হইবে, নচেৎ তাহাদের কেবলমাত্র রুটি ও পানীয় দিয়া ইংলণ্ডগামী জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইবে।

জন কোম্পানী তখনো কোম্পানী বাহাদুর হন নি, তখনকার এই কথা।

আর এখন তো কোম্পানী রাজাবাহাদুর। এখন তো হিন্দুস্থানে যাবার জন্য কাড়াকাড়ি, মারামারি।

মেরী তবু কিচ্ছু জানে না।

এই নীচুতলায় সে-ঢেউ এসে পৌঁছয় নি। ব্যারনেরা যাচ্ছেন সস্ত্রীক-সকন্যা, মধ্যবিত্ত ঘরের কুশ্রী মেয়েদের পাঠাবার তোড়জোড় করছেন মায়েরা। তাদের পোষাকের তোরঙ্গ সাজাচ্ছেন, নতুন ফ্যাশনের হ্যাট, নতুন ফ্যাশনের গাউন তৈরি করে দিচ্ছেন। আর বুঝি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন—

হে প্রভু, একটা যেন জুটে যায়!

মেজর কি কর্নেল, নেহাত না হয় তো সাবলটার্ন।

মেয়েদের নানা উপদেশও দিচ্ছেন।

জাহাজে জ্যান্ত মাল পাঠাবার এ-তোড়জোড়ের কথা মেরী জানে না। জানলেও তার এদিকে খেয়াল নেই।

হেনরী এসে জানাল, খেয়াল করিয়ে দিলে।

যাবে?

কোথায়?

এল-দোরাদোয়—স্বর্ণভূমিতে। সোনার দেশে।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মেরী।

হেনরীর উচ্ছ্বাস তবু থামে নি, বলেছিল সুরেলা স্বরে স্তোত্রপাঠের ঢঙে—

জানো সে দেশে আছে প্যাগোডা, আছে মন্দির, আছে মিনার।

সে-দেশ কার্পেটের দেশ, শালের দেশ, পাল্‌কির দেশ।

ডিনারের দেশ, বল নাচের দেশ।

মশার দেশ।

পাংখা, পারফিউম আর হুকা-চুরুটের দেশ।

রাজা-বাদশার দেশ, হীরে-মুক্তোর দেশ।

হাতী-ঘোড়ার দেশ—পার্ল আর পিলউয়ের দেশ—

কোন দেশ বল দেখি?

ইণ্ডিয়া! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেছিল মেরী।

হ্যাঁ গো, ইণ্ডিয়া! মেরীর কোমর জড়িয়ে ধরে একবার নেচেও নিয়েছিল হেনরী।

উচ্ছ্বাস থামতে মেরী বলেছিল, তুমি যাবে?

হ্যাঁ, যাব, লুটপাট করব, রাহাজানি করব, বেগমের গলার হার ছিঁড়ে নেব, আরও কত কি করব।

বাঃ খাসা পাদরী তো তুমি!

খাসা বলে খাসা, একেবারে খাসা—! তুমিও চল মেরী!

আমি কি করতে যাব?

বর ধরতে যাবে, নবাব শিকারে যাবে। হয় কর্নেল জোটাবে, নয় জোটাবে সার্জেন্ট। আর তা যদি নিদেন না পার—কমফর্ট-গার্ল হবে—হবে সেবাদাসী। না, না, দাসী নয়, সেবাকর্ত্রী।

আহা—কি সুখের কথাই বললে! ঝংকার দিয়ে উঠেছিল মেরী।

এখানেই কি সুখে আছ? লস্করের দোস্ত, বাউণ্ডুলের সাথী। তোমার লণ্ডনও যা—ক্যালকাটাও তাই। হেসে বলেছিল হেনরী।

তা বটে! ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিল মেরী।

বরং একটা হঠাৎ-নবাব যদি পাকড়াও করতে পার, তাহলে ফিরে এসে রাণীর হালে থাকবে।

তা কি আর হবে? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল মেরী।

হবে—হবে!

কিন্তু আমার তো যাওয়া হবে না।

কেন?

সেখানে কি—?

হেনরী জেনে নিয়েছিল কথাটা, তাই বেশ খুশি-খুশি ভাবে বলেছিল, আছে বই কি—ওম্যান আছে আর ওয়াইন নেই! ওয়াইন আছে, ট্যাভার্ন আছে।

একটা ফর্দ ফস্ করে জোব্বার ঝোলা পকেট থেকে বের করেছিল হেনরী। আর পড়েও শুনিয়েছিল।

ম্যাডেইরা দু শিলং

বীয়ার এক শিলিং

র‍্যারাক চার পেন্স

শুনে চকচক করে উঠে ছিল মেরীর চোখ। বলেছিল—

আমি যাব! যাব!

যাবে ঠিক হল, কিন্তু তোড়জোড় আছে।

হুট করে যাওয়া হয় না। এ ইংলিশ চ্যানেলের ও-পারে পারীতে আনন্দ-ভ্রমণ নয়। নয় একটা টুথব্রাস নিয়ে বেরিয়ে পড়া। এ শিকড়সুদ্ধ ওপড়ানো। নোঙর তোলা।

পহেলা পথ-খরচা, রাহা-খরচা যোগাড় করতে হবে। পকেটে তো মেরীর বকেয়া সেলাই। সেখানে হেনরী একটা কড়ে আঙুল তুলেও সাহায্য করতে পারবে না। তাই সে তার আর-আর গলাগলি-হলাহলি দোস্তদের শরণাপন্ন হল। এর কাছে চেয়ে, ওর কাছে চিন্তে যোগাড় একরকম হয়ে গেল। এবার মিসেস ফের দরবারে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পেশ করলে হেনরী।

মিসেস ফে কেউকেটা নন, ইণ্ডিয়া-ফেরতা হয়েও কেউকেটা হন নি। তাঁর স্বামীটি মিঃ ফে ছিলেন এখানে ব্যারিষ্টার, কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে এখন তিনি নাম লিখিয়েছেন।

ঘষা ব্যারিষ্টার কিন্তু মেজাজে একেবারে শাহানসা-বাদশা। এর-তার সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের বরাত কাঁচিয়ে বসে আছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর বরাতটিও। যাহোক, এখন স্বামীর সঙ্গে ফারখৎ হয়ে গেছে, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় নি। স্বামীর পদবী নামের সঙ্গে টেনে নিয়ে চললেও, এখন তিনি স্বাধীন জেনানা। তিনি মেয়ে-চালানের ব্যবসা করেন না। মেয়েদের জন্যে আড়কাঠীও লাগাতে হয় না। মেয়েরা তো আজকাল সারবন্দী হয়ে বেঙ্গালায় যাবার জন্যে মুখিয়েই আছে। তাদের তিনি হন গাইড—গার্জেন। তার জন্যে কিছু দক্ষিণাও নিয়ে থাকেন। তবে তাঁর জিম্মায় নিজেকে ছেড়ে দিলে নিশ্চিন্ত। তিনি নিয়ে যাবেন, সমুদ্র-পীড়া হলে লেবুর রস খাওয়াবেন, সুখ-সুবিধেটুকু দেখবেন, আবার ইণ্ডিয়ায় নেমেই তাঁর কাজ শেষ হবে না। গিয়ে ওঠার, মাথা গোঁজার ডেরা বা ট্যাভার্ন খুঁজে দেবেন। চাই কি বরও যোগাড় করে দিতে পারবেন, নয় তো বর যতদিন না জোটে কোথাও একটা কাজ। সে ট্যাভার্নেই হোক কি হেয়ার-কাটিং সেলুনেই হোক। তিনি যেন গোটা টুরিষ্ট সার্ভিস।

লণ্ডনের কুয়াশা সারা দিনমানই থাকে, তবু তার মধ্যেই মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কাজ করে। দিবানিদ্রা এখানে ঘোর অনিয়ম। কিন্তু মিসেস ফে প্রাচ্যের মানুষ বনে গেছেন। ট্রপিকের উষ্ণতায় দিবানিদ্রাটি তাঁর সাধা। তিনি দিবানিদ্রা থেকে উঠে সবে হাবল-বাবল-এর জল পাল্‌টে এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়েছেন। আর সুখটান দিচ্ছেন। আর হয় তো ভাবছেন, ঈষ্টের কথা। হয়তো বা কলকাতার সেই মানুষটির কথা, যিনি মিঃ ফে, এডভোকেট ফে, তাঁকে পথে বসিয়ে দিয়ে যিনি সটকেছেন। এমন সময় মেরীকে সঙ্গে নিয়ে হেনরী গিয়ে হাজির হল।

দিবানিদ্রা শেষ করে দিবাস্বপ্নে ডুবে ছিলেন। সে-পালা শেষ। মেরীকে একবার দেখে নিলেন মিসেস ফে। মেরীও তাঁকে দেখলে।

মিসেস ফের মুখের রং রোদ-পোড়া, একটু বা তামাটে ছোপ লেগেছে। কাফির রং কি তাকে বলা যায়? না টফি-রং? না—কাফি রংই বলা ভাল। রংটি ভাল কিন্তু মিসেস ফের ডবল ভাঁজ পড়েছে চিবুকে। সাধারণ চেহারা কিন্তু চোখ দুটি সজাগ। সে চোখ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি কোমল হতে জানে সহানুভূতিতে।

মিসেস ফে মেরীকে দেখে নিয়েই বললেন, তোমার তো রূপ আছে, এখানে ব্রাইড্‌ গ্রুম জোটে নি?

জুটল আর কোথায়? মেরী বললে।

নাম কি?

মেরী একটু ভেবে বললে, মেরী স্মিথ।

কোথাকার?

ব্যাটার্সী।

তা আমার নিয়ম তো জানো—

মেরী মাথা নাড়ল।

এবার মামুলি প্রশ্নের কেঠো আমেজ দূর হল, মিসেস ফে বেশ সহজ হয়ে উঠলেন। বললেন,

তোমার যা চেহারা, ভয় নেই, জাহাজেই হয়ত কোন রাইটারের নেক-নজরে পড়ে যাবে। চাই কি একটা ছোকরা-মেজরও জুটতে পারে। আর চাঁদপাল ঘাটে নামতে-না-নামতে ফোর্টের ছোকরারা তো তোমায় লুফে

নেবে। দেখবে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। সেই যে এক কবি ছড়া কেটেছে—পড় নি ?

যাও গো যেখানে
ছুঁড়ীরা যায়
ক্যালকাটা বন্দরে ধায়।
ছুঁড়ীর বাজার, সেথা ছুঁড়ীর বাজার
তুমি যদি যাও তো
মোর মুখ ব্যাজার !

মেরী চুপ করে রইল।

আবার গার্জেনি ঢঙ স্বরে এনে বললেন মিসেস ফে, মাই গার্ল, আমার কথা শুনতে হবে। যাকে-তাকে মন দেওয়া চলবে না। হেনরীর দিকে একবার তাকালেন, তোমার এই স্থাপেরনটির কথা শুনলে চলবে না।

হেনরী হেসে বললে, আমি ওর মুরুব্বী নই, ও আমার কাজিন—তুতো বোন।

মিসেস ফে হেসে বললেন, কাজিনের বয়-ফ্রেণ্ড হতে দোষ কি! যাক গে—এখন কাজের কথায় এস! কাম টু বিজনেস। ইণ্ডিয়ার জাহাজ ইণ্ডিয়াম্যান ভ্যালেণ্টাইন রওনা হচ্ছে আসছে সপ্তাহে।

এত তাড়াতাড়ি ? মেরী যেন চমকে উঠল।

কেন ? বাধাটা কিসের ? আবার কবে জাহাজ ছাড়বে কে জানে! মাই গার্ল—এনি অব—

নো, নো! না, না—মেরী বললে। দেশ ছাড়ব কিনা—তাই।

ওঃ হ্যাঙ্‌ দোজ নোষ্টালগিয়া! ওসব দেশের জন্য মন কেমন করা রেখে দাও! যখন নবাব-গিন্নী হয়ে বসবে, তখন ল্যাণ্ডোতে চড়বে, দশটা খানসামা-খিদমৎগার পায়ে পায়ে সেলাম বাজাবে, দেশকেই বেমালুম ভুলে যাবে।

মেরী লজ্জিত, তবু বললে শুনেছি পথের কষ্ট ঢের।

হোয়াট ? কি বললে, ঢের ! না, না, এতো হার্থরাগ ট্রীপ্‌। যেন বাড়ির কার্পেটের উপর বসে আছ—পথ—পথ বলে মনেই হবে না। হ্যাঁ, সে আমরা যখন যাই, তখন হয়েছিল বটে। হরিবল ! তখন ইংলণ্ডে ফ্রান্সে লড়াই।

ঘোড়ার গাড়িতে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেলাম। সস্তা সরাইখানায় রাত কাটাতে হয়েছে, তারপরে আল্পস পর্বত পেরিয়ে লেগহর্নে গিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজে উঠলাম। সেখান থেকে সুয়েজ, কায়রো পার হয়ে লোহিত সাগর বেয়ে মোকায় এসে পৌঁছলাম। মোকা জান তো? যেখানকার মোকা কাফি। সেখান থেকে আবার জাহাজে পাড়ি। জাহাজে সে কি কাণ্ড! খাবার ফুরিয়ে আসছে। আমরা গোটা কয়েক মেয়ে জাহাজে, মাংস তখন দূরের কথা, এক টুকরো হাড়ের জন্য ডগ্‌ফাইট করছি। প্রথমে-প্রথমে লজ্জা করত, টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে নিতে সংকোচ ছিল কিন্তু তারপরে তো কুত্তার লড়াই চলল, একেবারে বর্বর—স্যাভেজ তখন আমরা।

আবার কালিকটে নেমেই কি রেহাই আছে। মাইশোর-ইউ নো? জান? পুওর গার্ল, হাউ ইউ আর টু নো? কি করে জানবে? সেখানকার চিফ হায়দার আলী। সেই হায়দার আলীর লোকেরা এসে গ্রেফতার করলে। ফিফটিন উইকস্‌! পনেরোটি হপ্তা তাদের জেলখানায়! না, না, নাজেহাল কিছু করে নি, শুধু গারদে পুরে রেখেছিল। কালারা এমনি ভাল। মিঃ ফে-তো বদমেজাজী মানুষ। শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ বড রগচটা। ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস ফে।

একটু থেমে আবার বললেন, যাহোক, শেষে ছাড়া পাওয়া গেল। ক্যালকাটায় এসে পৌঁছলাম এক বছর আঠারো দিনে। থিঙ্ক অফ্‌ ইট —ভাব একবার! টুয়েলভ্‌ মন্থস্‌ য়্যাণ্ড এইটিন ডেস! মোস্ট ট্রাইয়িং য়্যাণ্ড ডিফিকাল্ট জার্নি। একেবারে হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে দিলে।

মেরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, মেরী একটু বা ভীত। তাই হেসে বললেন, নো, নো ফীয়ার! ভয় নেই! এখন তো সুখের জার্নি, যেন হনিমুনে চলেছ। আর একটু কষ্ট না করলে কি কেউ এল-দোরাদোতে পৌঁছতে পারে!

পাকাপাকি কথা দিয়ে বিদায় নিলে মেরী। ভালেণ্টাইনেই সে রওনা হবে স্বর্ণভূমি ইণ্ডিয়ার উদ্দেশ্যে। যেখানে সোনার তালের জন্য মাটি খুঁড়তে যায় স্বর্ণ-খননকারিণীর দল—গোল্ড ডিগার্সরা। তারা য়্যাপ্রন ভরে সোনা আনে, হঠাৎ নবাবের নবাবেস বা নবাবিনী হয়। সেও তাই হবে।

যাকিছু ছিল সে বেচে দিলে, যা বেচা যায় না, তা বিলিয়ে দিলে। কিনলে

বণ্ড স্ট্রীট থেকে নতুন ফ্যাশনের গাউন আর রেশমের ঝুলমি লাগানো কানা-চওড়া টুপি। সে তৈরী হল।

তার জেকবের কথা তার মনে পড়ল বই কি!

অরফানেজের উঁচু দেয়াল-ঘেরা বাড়িটার চারিদিকে একবার ঘুরে এল। ছেলেমেয়েদের কলকাকলি শুনল, কিন্তু গিয়ে খবর নিতে সাহস হল না। লোহার বড় গেটটার ফাঁক দিয়ে দেখলে, বাগানে একদল দামাল ছেলেমেয়ে খেলা করছে।

সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে, কোনটি তার কে বলে দেবে?

নামগোত্রহীন সন্তান, কে তাকে চিনিয়ে দেবে?

সে ফিরে এল। এসে দেখলে ঘরে অপেক্ষা করছে হ্যারী।

কোথায় গিছলে মারিয়া?

মেরী চুপ করে রইল।

তার থম্‌থমে মুখ আর ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে হেনরী ঝোলা পকেট থেকে বের করলে বোতল, বললে, দেখ কি চিজ এনেছি। শ্যামব্রোসিয়া—স্বর্গের অমৃত।

মাইরী সাঙাৎ, এ যে ক্লারেট? চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে উঠল মেরীর।

না, না, ক্লারেট নয়, ইণ্ডিয়ার লাল সরাব—এই তো ইণ্ডিয়ায় ওর নাম।

লাল সরাব দেখে মেরীর নোলায় সরছে জল, সে বললে—দাও, দাও!

হেনরী বাধা দিলে—দাঁড়াও! কিন্তু ওতো পানসে, বাবু-ভায়ার নেশা, নবাবেসের নেশা—ওর সঙ্গে ম্যাডেইরা মিশিয়ে পাঞ্চ করে নিচ্ছি, দেখবে কেমন জমবে।

নেশা জমল। লাল সরাব আর ম্যাডেইরার মদির নেশায় মদির হয়ে উঠল মেরী। আর সেই নেশার ঝোঁকেই হেনরীর গলা জড়িয়ে ধরে বললে—

আমার জেকবকে একবার এনে দাও, এনে দাও—তার মাথা আঘ্রাণ করে তাকে আদর কর! কর—কর!

স্খলিত জড়িত স্বর, হেনরী আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, করব—করব!

মেরীর মাথা ঢলে পড়ল তার কাঁধে। শুধু বিড়বিড় করে বললে,

জেকব—জেকব!

হেনরী পুরুষ—অবৈধ সঙ্গমের সন্তানের কথা তার মনে নেই। তাই ভাবলে, এ মাতালের প্রলাপ। রেভিংস।

ভ্যালেণ্টাইন ভাসবে পোর্টস্‌মাউথ বন্দর থেকে। দিনটায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে বসল।

লণ্ডনের ফগের মতোই লণ্ডনের বৃষ্টি। ঝরতে শুরু করলে আর শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই।

তবু মেরী তৈরী হয়ে নিলে। একেবারে ঘর ছাড়বার জন্য তৈরী। না, ঘরই তার নেই, দুদিনের ডেরা। তবু মায়া হয়। বন্ধকি গাউনটা ছাড়িয়ে এনেছে দোকান থেকে, মেরুন রঙের গাউন। বহুদিন দোকানেই পড়েছিল, ভাঁজে ভাঁজে মথ্‌বলের গন্ধ উঠছে। সেইটাই পরে নিলে মেরী। এইটেই তার একমাত্র পোশাকী জিনিস, এক ভদ্দরলোক প্রেমিকের দান। বার বার মদের খরচা, রুটির খরচা যোগাতে বাঁধা দেয়, আবার হাতে টাকা হলেই ছাড়িয়ে আনে। দোকানীও এটা চিনে ফেলেছে। দশ শিলিং-এর টিকিট অমনি গেঁথে দেয়। একটু বা মুচকি হাসে। আবার ছাড়িয়ে নেবার সময় তেমনি মুচকি হেসে টিকিটখানা খুলে নেয়। কখনো পয়সা কমায় না। মেরী সেই গাউনটা পরে পারা-ওঠা আরশিতে মুখ দেখে নিলে। একটু রুজও সঞ্চিত আছে। আপদ্ধর্মের জন্য। সবসময়ে সে মাখে না, বিশেষ কারণে সেই কৌটোটা বের করে। সেই রুজ মেখে নিলে মুখে, গালে। চামড়ায় লাল আভার জেল্লা দিচ্ছে, বাহার খুলেছে। খোঁপা আর বাঁধলে না মেরী, কুঈন য়্যান্ বেণী ঝুলিয়ে নিলে। কুমারী-কুমারী ভাব মুখে। আরশিতে নিজেকে দেখে ভালই লাগল। কিন্তু সাথীর দেখা নেই।

প্রতীক্ষায় বিকেল হয়ে এল। বেশ দেরি করেই এল হেনরী। মুখে মদের গন্ধ। কাঁধে পৌটলা-পুঁটলি। এসেই বললে, রেডি মেরী?

রেডি!

তাহলে চল!

পথের মোড়ে ওরা একটা ক্যাবে চেপে বসল, পোর্টস্‌মাউথে পৌঁছতে বেশ দেরিই হয়ে গেল।

ভ্যালেণ্টাইন এখনো বন্দরে, গ্যাঙ্ওয়ে এখনো তুলে নেওয়া হয় নি। শুধু জলের ভিতর থেকে ভারী ভারী দাঁতালো নোঙরগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। এখুনি পাল খাটিয়ে দেওয়া হবে। জাহাজ ভাসবে সাগর জলে।

হ্যাকনি ক্যাব এসে পৌঁছতেই ওরা নেমে পড়ল।

মিসেস ফের সঙ্গে গ্যাঙ্ওয়ের মুখেই দেখা। ঘোর সবুজ রঙের গাউন পরেছেন, মাথায় কানা-চওড়া বিরাট টুপি। তিনি বললেন—

এত দেরি হল! জায়গা পাবে কিনা কে জানে। হঠাৎ একটা গোটা রেজিমেণ্ট যাবে বলে হুকুম এসেছে। ওদিকে কিছু মিস্টার আর মিসেসরাও আছেন। স্টেট ক্যাবিন ভরতি, রাউণ্ডহাউস ভরতি, এখন তো ডেকে মারামারি।

ওদের নিয়ে গ্যাঙ্ওয়ের ফালি তক্তা বেয়ে উঠলেন এসে জাহাজে। এবার মিসেস ফের রাজত্ব। তিনি এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন, একে কি বলছেন, ওকে হাতজোড় করে অনুনয় করছেন। হেনরী মিসেস ফের হেফাজতে মেরীকে ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

মিসেস ফে এসে বললেন, ক্যাপ্টেন বলছেন, এত মেয়ে যাবে না। এটা এখন আর যাত্রী জাহাজ নয়। ক্যালকাটায় চলেছে বিশ নম্বর রেজিমেণ্ট, এ জাহাজ এখন তাদের, যাত্রীদের নেমে যেতে বলছেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স নাকি সেই হুকুমনামা দিয়ে পাঠিয়েছেন। রাইটার আর তাদের স্ত্রীরা যাবে, যাবেন হোমরা-চোমরা মেজর আর কর্নেলের স্ত্রীরা ; শুধু আমাদের বেলায়ই যত আঁটোসাঁটো ব্যাপার। কিন্তু আই য়্যাম এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক! অতো সহজে ভেঙে পড়ছিনে। দেখি—কি করতে পারি।

মিসেস ফে আবার অন্তর্ধান হলেন।

ক্যাপ্টেন নাছোড়বান্দা রেজিমেণ্টের মিলিটারি কর্তাটিও তাই। শেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে ঠিক হল, অবিবাহিতা যেসব মেয়ে বরের খোঁজে ইণ্ডিয়ায় যেতে চায়, তাদের নাম নিয়ে লটারী খেলা হবে। ত্রিশটির মধ্যে যে দশটির নাম উঠবে, তারাই যাবে।

জাহাজে উত্তেজনার সঞ্চার হল। জুয়ার নেশার ঘোর লেগেছে সকলের মুখে চোখে। দর উঠছে মেয়েদের, ভাল ওয়েলার ঘোড়ার মতো। উঠছে, নামছে। রেড লিলি জিতবে, না হার্মিয়া জিতবে—না হেলেনা?

হেনরীও এই জুয়ায় আছে। সেও জুয়াড়ি, রেসের রেসুড়ে। সে এসে মেরীর কানে কানে বললে—

তোমার নাম ওরা রেড লিলি রেখেছে। তোমার দশের দর। জেতা চাই!

মেরীও হার-জিতের এই উত্তেজনায় মশগুল, সে বললে, রেড লিলির জকি কে?

হেনরী একটু হকচকিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ হেসে বললে—

আমি।

না, তুমি নও—মুখ বাঁকালে মেরী। তুমি আনাড়ী জকি, চাট্ ঝাড়লেই পালাবে। এই বলে মেরী তাকে পা দিয়ে একটা ঠেলা দিলে।

অসতর্ক হেনরী হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডেকের উপর। হাসির হুল্লোড় উঠল। গায়ের ধুলো ঝেড়ে মুখ নীচু করে পালিয়ে গেল হেনরী।

লটারি খেলা শুরু হয়ে গেল। ঘোড়ার রেসকেও হার মানায়।

ত্রিশটি মেয়ের নাম নিয়ে লেখা হল টুকরো টুকরো কাগজে, সেই কাগজ পাকিয়ে তাল করা হল। তারপর মিশিয়ে দেওয়া হল। এই মেশাবার ভারটি পড়ল মিসেস ফের উপর। তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হল, তিনি কাগজের গুলিগুলোকে মিশিয়ে মিশিয়ে দিলেন, তারপর তাঁর চোখ খুলে দেওয়া হল। এবার স্টেট ক্যাবিন থেকে এলেন রেজিমেণ্টের মেজরের পত্নী। তিনি গাউন লুটিয়ে এসে দাঁড়ালেন। যেন মহিমময়ী রাণী এলিজাবেথ। এসে গুলিগুলোর ভিতর থেকে একটি তুলে নিলেন। মিসেস ফের হাতে তুলে দিলেন। মিসেস ফে পড়লেন—

এলিস!

আর অমনি শোরগোল পড়ে গেল। যারা জিতেছে, তাদের কি উল্লাস! মেয়েটিও নিঃশ্বাস ছাড়লে। তাহলে ইণ্ডিয়ায় সে যেতে পারবে। সে বর জোটাতে পারবে। সে তো লাকি—ভাগ্যবতী মেয়ে।

তারপরে জেনি এল, মিলি এল, সুসান এল, লিনা এল, মড এল, কিন্তু দশটি নামের মধ্যে মেরীর নাম শোনা গেল না। মেরী—রেড লিলি ফুটে উঠল না। মেরীর হার, রেড লিলির হার হল।

মেরীর উত্তেজনা কমে এল, এতক্ষণ স্ফূর্তি খেলার নেশায় পেয়ে বসেছিল,

কিন্তু আর তো নেই। এবার হতাশা। তবু পোড়-খাওয়া মেয়ে সে, ভেঙে পড়ল না।

হেনরী কাছে এসে দাঁত বের করে বললে, ফাই-ফাই—দুয়ো-দুয়ো! দশের দরের ঘোড়া কুপোকাৎ।

মেরী হেসে বললে, কিন্তু কুপোকাৎ হয়েও চাট্ ঝাড়তে জানে—এবার যদি চাট ঝাড়ে তো সাত সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। চলে যাও!

হেনরী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল, মেরী যেন উদ্যত ফণা কুঈন কোবরা।

সে মানে মানে সরে পড়ল।

মেরী পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নামার জন্যে তৈরী হচ্ছে, এমন সময়ে মিসেস ফে মেজর-গৃহিণীর সঙ্গে এসে দেখা দিলেন।

মেরীকে দেখে বললেন, কোথায় চলেছ?

ডাঙায়।

তোমাকে যেতে হবে না, মেজর-গৃহিণী বললেন।

কেন? অবাক চোখে তাকাল মেরী।

তোমার যাবার মঞ্জুরি মিলেছে, ইউ উইল বি মাই মেইড—মাই—

মিসেস ফে শেষ করলেন কথাটা—তুমি হবে নামে ওঁর সার্ভেণ্ট—দাসী—রাজি তো?

মেরী মাথা নেড়ে সায় দিলে।

দীর্ঘ যাত্রা শুরু হল। প্রতিকূল বাতাস গ্রেভস্যাণ্ডে জাহাজকে আটক রাখল কয়েকদিন। তারপর ডাউনে এসে আবার বন্দী হল।

মেরী দেখলে ডোভারের খড়ির পাহাড় আর গাছপালাহীন প্রান্তর। সে তো জানে না, এই প্রান্তরকে অমর করে রেখেছেন তাঁর দেশের কবি সেক্সপীয়র। তাঁর বিষণ্ণ মনের প্রতীক রাজা লীয়ার এখানে ঘুরে বেড়াতেন রাজ্যহারা হয়ে।

চ্যানেল পেরিয়ে জাহাজ চলল তারপর। এবার অনুকূল হাওয়া এসে পালে লেগেছে, ফুলে-কেঁপে উঠছে পাল। আর গাংচিলের মতো ছুটে চলেছে জাহাজ।

ইণ্ডিয়াম্যান ভ্যালেণ্টাইন ভারতের পথে প্রথম বন্দর ম্যাডেইরাতে এসে নোঙর করল। আফ্রিকার দ্বীপ। পর্তুগিজ এলাকা। আঙুর বাগিচায় ঘেরা দ্বীপ, থোলো থোলো আঙুর ধরে আছে পথের ধারে। এখানকার আঙুর চোলাই হয়ে তৈরি হয় ম্যাডেইরা। আর সেই মদ চালান যায়। দেখতে—দেখতে সেই ম্যাডেইরার পিপেয় ভরতি হয়ে গেল জাহাজের খোল। এই ম্যাডেইরা ইণ্ডিয়ায় যাবে, উত্তমাশা অন্তরীপ পেরুবে, তারপর ইণ্ডিয়া হয়ে আবার চালান যাবে ইংলণ্ডে। সেখানে বোতলে-বোতলে ভরতি হয়ে, লাল সীলমোহর এঁটে বিক্রি হবে। আর সেই ম্যাডেইরা পান করবে মানুষ। মেরীও তো পান করেছিল।

মেরী চোখ ভরে দেখতে-দেখতে চলল, যত দেখে, তত তার রক্তে রিনঝিন করে ওঠে নেশা। একটা অজ্ঞাত জগৎ যেন খুলে খুলে যাচ্ছে, জাদু গালচের মতো। যত খুলছে তত তার বিস্ময়। আবার সে বিস্ময়ে অনুপান যোগান মিসেস ফে। কি না তাঁর চেনা! কত না তাঁর দেখা-শোনা!

জুলুদেশের উপকূল বয়ে এক রাতে চলছিল জাহাজ। তারাভরা ছিল আকাশ। ডিনারের পরে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন মেজর-গৃহিণী। কুরুশ কাঁটায় একজোড়া মোজা বুনছিল সে, আর মিসেস ফে কালো মরক্কো চামড়া-বাঁধানো বাইবেলখানা খুলে বসেছিলেন।

হঠাৎ বই বন্ধ করে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন বুকে।

নড়ে-চড়ে বসলেন মেজরিনী। হেসে বললেন—

কি হল মিসেস ফে?

তিনি জানেন এইবার মিসেস ফে-কে একটু নাড়া দিলেই গল্প ঝরে পড়বে। আর পড়লও তাই।

মিসেস ফে বললেন, জানেন, এই জুলুদেশেই আমাকে হয় তো থেকে যেতে হত। আজ হয়তো এখানে এই ডেকে আমাকে দেখতে পেতেন না।

মেজর-গৃহিণী ডেক চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিলেন, নড়ে-চড়ে উঠে বসলেন।

তাই নাকি! য়্যানাদার স্টোরী! আর একটা গল্প বুঝি!

হ্যাঁ, গম্ভীর স্বরে জানালেন মিসেস ফে, তবে কক্ য়্যাণ্ড বুল নয়, আষাঢ়ে নয়।

নো, নো, মেজর-গৃহিণী বললেন, আমি তা মনে করে বলি নি। আপনি বলুন!

মেরীও বোনা থেকে মুখ তুলে তাকাল।

জাহাজ ভেসে চলছে জুলুল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে। ম্যাকারেল মাছের গায়ের সাদা দাগের মতো টুকরো-টুকরো মেঘ ভাসছে আকাশে। ম্যাকারেল আকাশ। তার ভিতর দিয়ে তারার ফুলকি দেখা যায়, সে ফুলকির ছায়া পড়ে জলে। দুলে দুলে ওঠে ঢেউয়ে, ভেসে-ভেসে যায়। এমন রাত তো গল্প শোনারই রাত। আঁতোয়া গাঁলদের কথা জানে না মেরী, জানে না আরব্য উপন্যাসের ধারা তিনি বইয়ে দিয়েছেন ফ্রান্সে, সিন্ধবাদ নাবিক এসে ফরাসী গোরিও, পীয়ের আর ভিক্তরদের মন জুড়ে বসেছে, বেদোরারা এসে আসন নিয়েছে মারি, মীরাদের মনে। সে জানে না, কিন্তু সে জানে আজ রাত গল্পের—আর সে গল্প হবে, দূর রাজ্যের, দূর সাগরের দেশের গহন বনের গল্প। সেও তাই উন্মুখ।

মিসেস ফে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে এক সময়ে বলতে শুরু করলেন—

সে সতেরো শো একাশি সালের কথা। মিঃ ফে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি একেবারে পেনীলেস। কপর্দকহীন। সেই সময়ে গ্রভনর জাহাজ ছাড়ছিল ক্যালকাটা থেকে। অনেক সোনা আর হীরে তখন তার খোলে মজুদ হয়েছে। অনেক গোল্ড য়্যাণ্ড ডায়মণ্ড। অনেক সম্পত্তি! একটা গোটা কিং সলোমনের মাইন যেন জাহাজ। আবার ন্যাবব আর ন্যাববেসরাও আছেন। সেই জাহাজেই আমি ফিরে যাব লণ্ডনে এমনি কথা। কিন্তু কি কারণে টাকা যোগাড় হল না বলে যাওয়া হল না। জাহাজ চলে গেল। মাস তিনেক পরে খবর এল।

ভীষণ খবর। রেক অফ গ্রভনর! গ্রভনর ডুবি হয়েছে ন্যাটালের উপকূলে, জুলুল্যাণ্ডে। কেউ বেঁচে নেই!

ক্রুশ আঁকলাম বুকে। থ্যাঙ্ক গড! যাই নি—রক্ষে!

যাহোক, খবরটা দুদিনেই পুরোনো হয়ে গেল। কিন্তু আমার কাছে বাসি

হল না। আমার এক ফ্রেণ্ড ছিলেন জাহাজে, তাঁর জন্যে দুঃখ হল। এ ফ্রেণ্ড ইন ডীড। কেজো বন্ধু। নাম সোফিয়া। মনটা খারাপ হয়ে রইল। নিজের দুঃখে আবার সবই ভুলে গেলাম। আই ফরগট য়্যাণ্ড ফরগট। চার বছর পরে হঠাৎ একদিন লণ্ডনে শোনা গেল, ন্যাটালের উপকূলে জাহাজ ডুবি হলেও কয়েকজন রক্ষে পেয়েছে। তাদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হল। পার্লামেণ্ট পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল। যদি ক'জন বেঁচেই থাকে, তাদের কি দশা! জুলুরা তো ক্যানিবৃল—নরখাদক!

যদি মেয়েরা বেঁচে থাকে তাদের কি দশা!

দুর্ভাবনায় ইংলণ্ড অস্থির। অমনি রিলিফ পার্টি সাজতে লাগল। শেষে একখানা জাহাজ ন্যাটালের উপকূলে সেই জাহাজ ডুবির দ্বীপে এসে নোঙর করলে। সে পার্টিতে আমি ছিলাম না—কোনো মেয়েই ছিল না।

একটু থামলেন মিসেস ফে। তারপরে আবার শুরু করলেন,

দুমাস বাদে ফিরে এল রিলিফ পার্টি। সঙ্গে কেউ নেই। যারা ক'জন গিয়েছিল, তারাই শুধু ফিরেছে। নো ম্যান, নো উওম্যান।

কি ব্যাপার?

গ্রভনর ডুবিতে কয়েকজন মেয়েই শুধু বেঁচেছিল। তারা জুলু আদমিদের ঔরৎ বনে গেছে। দে আর লিভিং য়্যাজ মেন য়্যাণ্ড ওয়াইভস্। তাদের বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে। হাউ হরিবৃল! দে বিকেম হীদেন ওয়াইভস, দে বিগট হীদেন চিলড্রেন। ওরা হীদেনদের স্ত্রী হয়েছে, হীদেন সন্তানের জননী হয়েছে! থ্যাঙ্ক গড! আমি বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!

তারাও তো বেঁচে গেছে, ফস্ করে মেরীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তারা বেঁচেছে! তারা তো নরকাগ্নিতে পুড়ছে। আহা পুওর সোফিয়া! বেচারী!

বেচারী কেন? তিনি কি বিবাহিত ছিলেন?

নো—নো—য়্যান ওল্ড মেইড।

তাহলে তো ভালই আছেন, বিবাহ করে সুখে আছেন।

তুমি একে বিবাহ বল মেরী? মিসেস ফে অবাক।

হ্যাঁ, বলি, যেখানে মনের মিল সেইখানেই বিবাহ। তা পাদরী থাকুন আর নাই থাকুন!

তুমি হীদেনদের মতো কথা বলছ—প্যাগানদের মতো কথা বলছ!

সত্যি কথাই বলছি।

তাহলে তুমিও ইণ্ডিয়ায় গিয়ে নেটিভের সঙ্গে ঘর করবে, দো-আঁশলা বাচ্চার জন্ম দেবে।

দেব—যদি আমার ভাগ্যে থাকে দেব!

কি বললে! মেজর-গৃহিণীও নড়ে-চড়ে বসলেন। চোখ দুটি তাঁর অগ্নিগর্ভ।

মেরী একটু হেসে বললে, মিসেস ফের বরাতের চেয়ে কি সেটা ভাল হবে না। মিঃ ফে কি একটা নেটিভের চেয়ে সরেশ!

এই বলে সে বোনার সরঞ্জাম নিয়ে উঠে চলে গেল।

ম্যাডেইরা ছাড়িয়ে সেণ্ট হেলেনায় এসে থামল জাহাজ। কালো পাথরের পাহাড়। ঢেউ এসে কালো পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে। কিন্তু জল কি স্বচ্ছ! মেরী দেখতে-দেখতে চলল। উত্তমাশা অন্তরীপে ঝড় উঠল না। শান্ত অন্তরীপ ঘুরে জাহাজ চলল। সমুদ্রের দেবতা নেপচুন প্রসন্ন রইলেন। মেরীর জাহাজ অনকূল বাতাসে পাল ফুলিয়ে চলল।

ইন্দ্রজালের দেশ ইণ্ডিয়া। কোথাও সে দেখলে জাহাজের দু'পাশে পড়ছে বৃষ্টি, অথচ ডেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে না। কখনো বা মেঘ করে এল, ঝড় বইল, আবার পরমুহূর্তে শান্ত সমুদ্র, নিথর জল, চাদরের মতো বিছানো জল।

করমণ্ডলের উপকূলে এসে ভিড়ল জাহাজ। এই ইণ্ডিয়া। সারি সারি নৌকা, তক্তা ফুটো করে গাছের লতা দিয়ে বাঁধা, সেই নৌকা চালায় কালা আদমিরা। ক্যানো নয়, ঢাও নয়, র‍্যাফ্‌ট নয়—ঐ নৌকা। সেই নৌকায় নির্ভয়ে পাড়ি দেয়। কখনো বা নৌকা ডুবেও যায়। মেরীর খুব ইচ্ছে হল, ঐ নৌকায় চড়ে, কিন্তু অভিভাবিকা আছেন মিসেস ফে। তাই সে চড়লে না। হয়তো চড়ত, কিন্তু যখন শুনল, ঐ নৌকা একজন ইউরোপীয় যাত্রী নিয়ে ডুবলে, মাঝিরা সমুদ্রের হাত থেকে বাঁচলেও গভর্নরের জল্লাদের হাত থেকে তাদের রক্ষে নেই তখন আর চড়বার সাধ

রইল না। সে সেই প্রথম জানল, এখানে কালা আদমির জীবনের দাম একটা মাইটও নয়, এক কানাকড়িও নয়।

মেজর-গৃহিণী আর মিসেস ফের জন্য গভর্নরের বোট এল, তাঁরা চলে গেলেন। মেরীকে ফেলেই চলে গেলেন। মেরী হীদেন হতে চায়, তাই তাঁদের অস্পৃশ্য। অছুৎ। মেরী একাই কাটিযে দিলে ডেকে। লস্কররাও নেই। তারা মাদ্রাস শহরে নেমে পড়েছে। ট্যাভার্নে তারা এখন হই-হল্লা করছে।

মাদ্রাজ থেকে আবার জাহাজ ছাড়ল। কদিন পরে সাগরদ্বীপে এল জাহাজ। এইখানেই গঙ্গার মোহানা। মেরী জানে না, এখানে আছে হিন্দুর তীর্থ। প্রতি বছর সাগর-সঙ্গমে স্নান করতে আসে পুণ্যলোভীর দল। সে শুনল, মিসেস ফে আর মেজর-গৃহিণী বলাবলি করছেন,

এখানে আছে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। আছে এলিগেটর।

হিন্দুস্থানে সোনা কুড়োতে এসে হিন্দুর তীর্থের কথা জানতে তাদের বয়ে গেছে। তাই জানে না, জানলে বলতেন—কুসংস্কার—হিন্দুর বর্বরতা!

এইখানেই পাইলট বোট এসে হাজির হল। এখানকার জোয়ার ভাঁটার মর্জি কেউ জানে না। পাকা লস্করও এখানে নাজেহাল হয়। তাই পাইলট বোট এসে পথ দেখিয়ে নির্বিঘ্নে নিয়ে যায় বন্দরে। নইলে জাহাজ হয় তো ভেসে যাবে বিপথে। হয়তো বানচাল হবে।

পাইলট বোট নিযে চলল জাহাজ, সাগর পেরিয়ে কুল্পীতে এসে হাজির হল। তারপরে খেজিরী। এখান থেকে বজরায় যাওয়া যায় ক্যালকাটায়। সারি সারি বজরা এসে ভিড়ল। কেউ বা নেমে গেল, কেউ বা রইল।

মিসেস ফে বললেন, এখান থেকে বজরায় ওরা ক্যালকাটা যাবে! কেউ বা আজ থাকবে কাজিরির ট্যাভার্নে। কাল যাবে।

মেজর-গৃহিণী নামতে চাইলেন, কিন্তু মেজর অনিচ্ছুক। তাই আর নামা হল না।

খেজিরী থেকে জাহাজ এসে ভিড়ল চাঁদপাল ঘাটে।

কবেকার চাঁদপাল মুদীর দোকান ছিল এখানে, তারই নামে ঘাট। ফোর্ট থেকে লাল কোর্তা গায়ে গোরারা এসে হাজির। তারা এসেছে মেয়ে দেখতে। কাতারে কাতারে গ্যাঙ্‌ওয়ের সামনে জটলা পাকাচ্ছে।

মেরী মিসেস ফের সঙ্গেই নেমে এল। তাঁকে টাকা দিয়েছে, তিনি তো তার গাইড হতে বাধ্য।

মেরী আর দলে-দলে মেয়েকে নামতে দেখে এদিক-ওদিক থেকে শিসের ধুম পড়ে গেল। সিটির ধুম! কেউ বা চোখ টিপলে। মিসেস ফে ভ্রুক্ষেপও করলেন না, মেরীকে নিয়ে গট্‌গট্ করে নেমে এলেন।

তাকে কশিটোলার একটু দূরে একটা আস্তাবলের পাশে এক সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে তুললেন মিসেস ফে।

মেরীর সঙ্গে মিসেস ফের এইখানেই সম্পর্ক শেষ। সম্পর্কের জের টেনে সে চলতে পারে, তাঁকে মুরব্বী পাকড়াতে পারে। কিন্তু সে তা চায় না। তাই মিসেস ফে-কে বিদায় দিলে। তিনিও অমন মেয়ের মুখ দেখতে নারাজ। তাঁর সম্পর্কও শেষ হল। মেরী সম্পর্কে তিনি ধোওয়া-পাখলা হলেন।

আর হেনরী?

হেনরীর সঙ্গে জাহাজের ডেকে দেখা হয়েছে বহুবার। হেনরী ভাব করতে এসেছে। একদিন সমুদ্র পীড়ায় হঠাৎ সে কাতর হয়ে পড়ে। সেদিন জিন আর বিটার্স গেলাসে নিয়ে ছুটে এসেছিল হেনরী। কিন্তু মেরী খায় নি। শুধু বলেছিল, না, না, তুমি যাও! তোমার সঙ্গে আমার শোধ-বোধ। উই আর কুইটস্! যাও!

হেনরীর সঙ্গে তারপরেও তার জাহাজে দেখা হয়েছে, কথা হয় নি। খিজিরীতে সে যখন নেমে যায়, এক পলক দেখেছিল। এখন সে একা। বিদেশ বিভুঁয়ে তাকে এখানে পথ করে নিতে হবে। সে একা। হয় সে হবে নবাবেস-নবাবিনী, নয় তো সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে হোটেলের খিদমত্‌গারি করে তাকে খেতে হবে। কি হবে, সে জানে না। ভাবে না। পাশার দান পড়েছে, এখন যা হয় হোক! রুবিকান পার হয়ে এসেছিলেন সীজার, সে-ইতিহাস পড়ে নি কিন্তু রুবিকান সেও পার হয়েছে। এখন এস্পার-ওস্পার যাই-ই হোক —সে ভাবে না।

ইণ্ডিয়া তাকে ঘিরে ধরেছে, তার স্বপ্নে এখন ইণ্ডিয়া, তার দিবাস্বপ্নে এখন ইণ্ডিয়া, তার জাগরণে এখন ইণ্ডিয়া। কশিটোলার এই গলি, এই ভ্যাট্‌ভেটে ড্রেনের আর ঘোড়ার নাদে বদবু-ভরা গলি, এই ইণ্ডিয়া, এই

তার ক্যালকাটা। এই তার এল-দোরাদো, তার স্বর্ণভূমি। এইখান থেকেই তার যাত্রা শুরু হবে। হয় জিতবে, নয় তো হারবে।

মেরী শক্ত করে হাত মুঠো করে বলে—আই উইল উইন! আমি জিতবো। জিততে না পারি—জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বো। ঘায়েল হব না।

দেখি—মেরী কি হয় তোমার—দেখি!

কি দেখতে পাব মেরী কে জানে!

ঐ কশিটোলার সরাইখানা কি তোমাকে ধরে রাখতে পারবে?

মনে তো হয় না।

ওখান থেকে শুরু হবে তোমার যাত্রা।

হয়তো গিয়ে পড়বে কশিটোলা থেকে লালবাজারে।

হয়তো তোমার জন্যে পাগল হয়ে উঠবেন কোন বুড়ো জেনারেল, তাঁর পার্চমেণ্টের মতো চামড়ার আড়ালে তোমাকে দেখে ছলাৎ ছলাৎ করে উঠবে রক্ত। যদি তাঁর বৌ হ্যাম্পশায়ার কি হলবোর্ণে থাকে তো হাত বাড়িয়ে দিয়ে চাইবেন সান্ত্বনা, ছিটেফোঁটা ভালবাসা।

হয়তো লাল আর সাদা উর্দি-মোড়া কোন এনসাইনও জুটতে পারেন। তিনি জেনারেল না হোন, জেনারেলের সহকারী তো বটেন। তিনি হয়তো ফস্ করে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাণিগ্রহণের কথাই বলবেন।

দেখো মেরী, অমনি হাত ধরে বোসো না, হাতে হাত দিয়ো না। কি জানি, কি হবে। ওরা মিলিটারী—ওদের কথায় বিশ্বাস কি!

হয়তো হঠাৎ-নবাব এক রাইটারও জুটে যেতে পারে। নবাবিনী হবার তোমার যদি ইচ্ছে থাকে, তাহলে ঝুলে পড়তে পার!

নয়তো চেখে-চেখে দেখতে পার, এ-ট্যাভার্ন থেকে সে-ট্যাভার্নে যেতে পার। রূপের প্রশংসা শুনে রুজমাখা গালে আর-এক পোঁচ লজ্জার লাল ছোপ লাগিয়ে অভিনয় করতেও পার। যখন পোল্‌কা কি ফকস্ট্রট নাচবে, বুকে মুখ রেখে পুরুষের সঙ্গে জুটি বাঁধবে, তখন যদি কানে কানে কেউ 'এঞ্জেল' বলে ডাকে, পাখা দিয়ে লীলাভরে একটু মৃদু আঘাত করতেও পার।

সবই পার তুমি মেরী—এই এল-দোরাদোর যত পথ সবই তোমার জন্যে খোলা।

না, না, তুমি যে বয়স্কা কুমারী—সব পথ কি আর খোলা আছে ?

আছে।—এখনো তোমার যৌবন আছে। পাকা আপেলের মতো পূর্ণ যৌবন।

কিন্তু ট্রপিককে সাবধান—এই শহরকে সাবধান!

লণ্ডন শহর তোমাকে রেখেছিল তার তুষার-শীতলতায় মুড়ে, তাই তুমি বুড়ী হও নি, কিন্তু এখানে মানুষ বুড়ো হয় অকালে। তুমিও হবে। য়্যালকোহল এখনো তোমাকে মেদভারে ভারাক্রান্ত করতে পারে নি, কিন্তু এই শহর তা করবে।

তার আগে তোমার ভাগ্য খুঁজে নাও মেরী।

কশিটোলা থেকে তোমার পদযাত্রা শুরু হোক!

মেরী—মেরী, এই পদযাত্রায় কি কোন নেটিভ, কোন জেণ্টুর সঙ্গে তোমার দেখা হবে ?

হয়তো হতে পারে।

সেদিন তোমার পথে হয়তো এসে পড়বে এক মকরন্দ। হয়তো 'জেণ্টু' বলে দেখেও দেখবে না। ক্রুহাম, ব্যারুসে চড়ে চলে যাবে।

ক্রুহাম—ব্যারুস না জুটুক, পথে যেতে যেতে দেখা হলে 'নেটিভ' বলে মুখ ফিরিয়ে নিতেও পার।

তবু তো এই শহরের আগত পদাতিকদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তুমি তো তাদেরই একজন। তাদেরই শ্রেণী—সব হারিয়ে শ্রেণীহীন শ্রেণী। তাই কি ? না-শ্রেণী আছে, শ্রেণীর শিকড়টুকু আছে। তোমারও আছে মেরী। তুমি জান না।

দেখা হবে কশিটোলার পথে, বাগবাজারের ঘাটে, বড় বাজারে ; নয় তো জানবাজারে।

তারাও পদাতিক—তুমিও পদাতিক।

বেঙ্গালার সোনার রেণুর মায়ায় তুমি এসেছ, তারাও তাই এসেছে।

দেখি মেরী—কি হয় ?

পহেলা এসেছে মকরন্দ, তারপর এলে তুমি ?

দেখি—তোমাদের কি হয় ?

এই শহর, জব চার্নকের এই শহর।

সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে মাত্র তেরো শো টাকায় কেনা এই শহর।

তাই কি?

না, বাদশাজাদা ফর্রুকশায়ারকে নজরানা দিতে হয়েছিল ষোলো হাজার তঙ্কা—সে কথা কেউ বলে না।

বলে না, আর্মানী সরহন্দ সাহেবের মেহনতির কথা। এই স্থবে বাঙ্গালার আমিরবাদ পরগণার মৌজা কিনতে কি খাটতে হয়েছিল তাঁকে! দালালি সরহন্দ পেয়েছিলেন কি না কে জানে! ইতিহাস তো বলে না।

ইতিহাস কি সব কথা বলে?

হয়তো পেয়েছিলেন। নয়তো স্থতা আর স্থটির ব্যবসা ফলাও করে করবার অলিখিত চুক্তি হয়েছিল চার্নক সাহেবের সঙ্গে।

সেই শহর, ১৬৯০ সালের শহর।

আজ সে শহর বাড়ছে, তার মানচিত্র লহমায় লহমায় বদলাচ্ছে। ছিল বাগবাজারের ঘাট থেকে নিমতলা অবধি স্থতানুটী, নিমতলা থেকে চাঁদপাল ঘাট বরাবর কলিকাতা, আবার সেখান থেকে আদিগঙ্গা অবধি গোবিন্দপুর। এখন বাড়ছে তো বাড়ছেই বিন্দু ছিল শহর, এখন তো সিন্ধু। তখন নাম ছিল না, এখন নাম হয়েছে। নামডাক হয়েছে।

এই শহর দেখে এখন কে বলবে—

ছিল এ একদা বাঘের বাসা।
বাঘের মতন মানুষ যাহারা—
তাহাদেরই ছিল যাওয়া ও আসা।

এখন তো— কালা পল্টন গোরা কোম্পানী
আজিকে উহারে করিল রাণী।

আর— রচি দিল গায়ে
বাঘডোরা আঁকা আঙিয়াখানি।

এই শহরে এসেছে লাডলী। কেউ ডাকে লাডলী, কেউ বা লার্লী। কেউ বা লাল, লালমোহন।

না, না, লাডলী পাঞ্জাবী উমিচাঁদের জাতি নয়, সে শেঠ নয়। হীবের ফুল কানে পরে না, মোকাম মুখসুদাবাদে গদি খুলে বসেন নি তার পূর্বপুরুষ : সুন্দরবনের কাঠ নিয়ে ব্যবসা করেও দৌলতখানা বানান নি। বিহারের সোরা নিয়ে যে ব্যবসার ভানুমতীর খেল চলে তাও তাঁরা জানতেন না। তবে সোরা যে বারুদে লাগে—তা হয়তো শুনে ছিলেন। আর নবাব সিরাজ যে বিদেশী কোম্পানীকে এক রত্তি তা রপ্তানী করতে দেবেন না বলে হুকুম জারি করেছিলেন—সেকথাও। কিন্তু আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখেন নি।

তবে ?

নাম তার লাডলী শুধু নয়, লাডলীমোহন। সেই যে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁরই শতনামের এক নাম তার। ননীচোরার মতোই কোমল তার চেহারা। নবমেঘ-শ্যামল তাঁর গায়ের রং। বাঁশী বাজাতে সে জানুক আর না জানুক, গোপিনীদের বুঝি মন মজাতে জানে। তাঁর রূপ দেখে পুরুষেরই মন টলে, রমণী তো ছার! তাছাড়া সে কবি। সংস্কৃত আর ফারসীতে পত্ত লিখতে পারে। বাংলায় পয়ার মেলাতে পারে না, হরফ ফাঁদতে পারে না এমন নয়। ছন্দে হাত পাকা, আবার অলঙ্কারশাস্ত্রও বেমালুম হজম। এক কথায় সবকিছুতেই তার দখল অসামান্য। সে রোজনামচা রাখে। তার রোজনামচা পডলেই তা বোঝা যায়।

লাডলী রোজনামচা লিখছিল।

সবে সে এসেছে এখানে। নতুন খাতা তৈরি করেছে, নতুন সিয়াই পেতেছে মাটির দোয়াতে। খাগের কলম চোখা করে কাটা আছে। সঙ্গের থলেয় করে নিয়ে এসেছে। প্রথমেই সে কলম ধরল। মুঠ-কলম নয়, আলগোছে ধরেছে কলম, যেন তুলি ধরেছে শিল্পী। মুক্তোর মতো হরফ ঝরে পড়বে এবার। হরফ তো নয়, ছবি—তস্‌বীর।

শুরুতেই সে ফাঁদলে তার কুলদেবীর নাম—

শ্রীশ্রীকাত্যায়নী পদভরসা,

তারপর কলম নিয়ে ভাবতে বসল।

তুলোটের সাদা কাগজ পড়ে আছে, সিয়াইভরা দোয়াত অনাদৃত, কলমের স্পর্শ পাচ্ছে না। হঠাৎ কি ভেবে একখোঁট কালি তুলে নিলে।

তারপর লিখলে…শক…হিজিরী…

তারপরে আবার ভাবনা।

থলের ভিতর থেকে পুরোনো খাতাটা বের করলে। দুদিকে কাঠের পাটা দেওয়া পুথির মতো খাতা। কাগজ ভ্রমর দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে মুগার সুতোয় গাঁথা। লাডলী খুলে বসল খাতা। পাতার পর পাতা কালির সাজে সেজে উঠেছে। বাংলা লিপি, কোথাও বা দু-একটি দেবনাগরী আখর কোথাও বা পোকার শুঁড়ের মতো সূক্ষ্ম ফারসীলিপির আঁচড়।

উলটে যেতে লাগল পাতা, জীবনের দিনগুলি আছে এই রোজনামচার পাতায়। তার ফারসী শিক্ষার গুরু মুখসুদাবাদের ফতেউল্লা বলেছিলেন,

লাল, রোজনামচা রেখো। রোজনামচা তো জীবনের বুস্তানের ফুল আর কাঁটা দুই-ই। ফুল দেখে মন তর্ হবে, কাঁটা দেখে হুঁশিয়ার হবে। ফুলের খোশবু মন ভরে দেবে, কাঁটা বিঁধবে। এই তো জীবন।

লাডলীর কথাটা মনে ধরেছিল। সে তখনি তুলোট কাগজ এনে মুগার মাজা সুতো দিয়ে গেঁথে নিয়েছিল কেতাব। সেই কেতাব ভরে ভরে উঠেছে। কিন্তু কেতাব ফুরোয় নি। 'তামাম শোধ' এখনো লিখতে পারে নি। এক কেতাব আর-এক কেতাবে জীবনধারাকে বয়ে নিয়ে গেছে। কোথাও চড়া পড়ে নি, কোথাও থামে নি। মথুরাপুর, শিয়াখালা থেকে মুখসুদাবাদ : আবার মুখসুদাবাদ, শিয়াখালা আর মথুরাপুর আবর্তে ঘুরে ফিরে এসেছে। একই খাতে ঘুরেছে, কিন্তু এরই মধ্যে বৈচিত্র্য আসে নি এমন নয়। এক একটা দিন এসেছে—আঙুরিনার মাদকতা নিয়ে, আসবের নেশায় মাতাল করে দিয়েছে, কখনো বা কুন্দ ফুটেছে, কখনো বা হাসনুহানা। কখনো বা গুল। কিন্তু গুলে কাঁটাও ছিল, ফোঁড় খেয়ে রক্তাক্তও হয়েছে! দিনগুলির পুঁতির মালায় সে রক্তের ছোপ আছে।

পাতা ওলটাতে-ওলটাতে নজরে পড়ে গেল ক'টা কথা। একটা বয়েত। খানিকটা তার নীচে লেখা।

মানন্দ তু আদমি দর আকাক্
মুসকিন নবুদ—পরী নদিদম্।

সাদির বয়েত। সাদি প্রিয়ার রূপে পাগল। তাই বলেছিলেন,

তোমার সমান মানবী তো সম্ভব নয়
পরীরূপে এলে প্রিয়া, পরাভূত
হও প্রিয়া। থাকো—থাকো।

তস্থৌ প্রিয়া, তস্থৌ প্রিয়া!

এক লহমার জন্য দেখেছিলাম তাকে। তাঞ্জামের পর্দা উড়ে গিয়েছিল হাওয়ায়, মনে হয়েছিল এই আমার মানসী। আমার হুরী।

আগর মাহ্ জুয়ী, হমা রুয়ে উস্‌ত্।
ওগর মুশ্‌ক্ বুয়ী, হমা বুয়ে উস্‌ত্

যদি ইন্দু চাও তো দেখ,
প্রিযার চন্দ্রানন দেখ!
সুগন্ধ মৃগনাভি তার বদনে

কে সে?
রুদাবা!

রুদাবা নয়, তহ্‌মিনাও নয়। সে কোন হুরী?

নাম জানত না লাডলী। শুধু পথে দেখেছিল। বুবখার নেতের জালের আড়ালে ছিল না চোখ দুটি। বুরখা খুলে, পর্দা ফাঁক করে রূপসী দেখছিল পথের শোভা। হঠাৎ চারিচোখে মিলন হয়েছিল। কালিন্দীর কূল নয়, কদম্বতরু নেই, তবু দিঠিতে দিঠিতে হয়েছিল মিলন। বেহারারা দাঁড়ায় নি। তাঞ্জাম নিয়ে চলে গিয়েছিল। পর্দাও পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পর্দার আড়ালের দুটি চোখ তো মর্মতলে বিঁধে গিয়েছিল। বিঁধে রয়েছিল। সে চোখ তো সেদিন থেকে নীতল আকাশের নীলসায়রে তারা হয়ে ফুটে উঠল, আর্দ্রা, মৃগশিরায় ফুটে রইল, রয়ে গেল মেঘল আকাশের কজ্জল রেখায়। সুর্মাপরা দুই চোখের মায়া সে ভুলতে পারে নি।

কতদিন তারই খোঁজে পথে পথে ঘুরেছে, দেখা পায় নি। দিবাস্বপ্নে গড়েছে সে মূর্তি। গুল আন্দাম। সমস্ত দেহ গোলাপের মতো। গোলাপের মতো তার কোমল দেহ, তেমনি সুরভি-মদির, আবার তেমনি বুঝি

রক্তিমবর্ণ। গোলাপ, গোলাপ—গোলাপ ফুটেছে দেহে। গোলাপ তার গাল দুখানি, গোলাপ তার অধর। গোলাপে গোলাপে ছয়লাপ। ক'দিন সেই নাম-না-জানা হঠাৎ-দেখা সুন্দরীই হল তার ধ্যানজ্ঞান। দিবাস্বপ্নে সে দেহ ধরে আসে। বলে,

তুমি কি ঘুমুলে ?

কবি লাডলী বলে, ঘুমুতে কি তুমি দাও। তুমি যে আমার চোখের তারায় বসে আছ, নিদ্ কেড়ে নিয়েছ ; হায়, নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।

হাসে গুলবদনী, লাখো লাখো গোলাপ ফোটে।

তারপরে এসে সে পাশে বসে। রুদাবা নয়, তহ্মিনা নয়, বেদৌরা নয়, এ যেন উমা—উমা! কার উমা ? কালিদাসের উমা।

তার কচি পল্লবের মতো তাম্রাঙ্গুলি রাখল তার হাতে, রোমোদ্গম হল উভয়ের. স্বিন্নাঙ্গুলি দুই হাত। স্বেদজলে ভরে গেল।

কিন্তু চুম্বনের ক্ষণে হঠাৎ বাস্তব এসে দেখা দিল, কোথায় পালাল উমা, কোথায় পালাল রুদাবা। শুধু লাডলী দেখলে তাম্বুলরসচর্চিত বৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে উপাধানে। আর কেউ কোথাও নেই। শূন্য মন্দির, মাহ বসন্ত।

লাডলী পাতা উল্টাতে লাগল রোজনামচার। সেই বুরখাপরা প্রিয়া আর নেই। গুল আন্দাম হঠাৎ ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গেছে রঙমহলের কোন তিমির আঁধারে। হয়তো নবাব-অন্তঃপুরের সরদাবার বিজন কোণে এখন তার ঠাঁই। সেখানে যায় খোজারা, পুরুষ তো যেতে পারে না ; পুরুষ মাছি-মশাও না। থাক সে সেখানে, লাডলী তার কথা ভাববে না। দেওয়ানার মতো ঘুরবে না ইতি উতি। তাই তাকে বিদায় দিলে। ছায়া কতদিন থাকে ? কতদিন থাকতে চায় ? আবার খাতার নয়া পাতা। নয়া হুরী। তবে দিবাস্বপ্নে নয় বাস্তবে—পলকের দেখা নয়—তাকে কাছে বসিয়ে দেখতে চায়। তাই সে বাস্তবে মানসী খুঁজতে বেরিয়েছে। শরৎকালে রাজাদের বিজয়া অভিযানের মতো। মুর্শিদাবাদের তয়ফাউলীদের মুজরোর আসরে ধরনা দিচ্ছে, হুজরো পেতে চাইছে। হুজরোর নায়কও হচ্ছে। পেলা আর পানপাত্তিতে তার মুদ্রাধার শূন্য, সে ফতুর।

এসব দিনের শুধু নাম আছে খাগের কলমে কালো সিয়াইয়ে লেখা।

ফিরোজাকে ভাল লাগল।

রুমাবাঈ জবরদস্ত।

মুন্নির গজল দিল্ তর্ করে দেয়।

যমুনাকে আমি ভালবেসেছি।

হাজার আকব্বরী মোহর দিয়ে ওকে পেতে হবে।

তার পরে শুধু যম্নার নাম। যম্না, যমুনা। আমার গঙ্গা—যমুনা!

লাডলীমোহন অবগাহন করছেন যমুনায়, তারই স্বাক্ষর।

আবার, উস্তাদের কথাও আছে।

উস্তাদ বলেন,

লাল—একি হল? একি করছ? এতো মহব্বত নয়, এযে দেহপাত।

উস্তাদের বেনামদার খরিতা পেয়ে বাপ প্যারীমোহন ছুটে এলেন না মুর্শিদাবাদে। নায়েব পাঠিয়ে ছেলেকে মথুরাপুরের চৌহদ্দীতে এনে বন্দী করলেন। যেদিন চলে যায়, সেদিনের কথাও আছে রোজনামচায়।

হোলির দিন। আবীরের স্তূপ জমে উঠেছে মেজেয়। আর গেরোবাজ, লোটন, লক্কা কবুতরগুলোর পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। তারা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে স্তূপে। মিঠে বোল তুলছে। আবীর ছিটছে, উড়ছে পায়ে-পায়ে, ডানার ঝাপটায়। আতরের খোশাবায়ে মিশে সে-আবীর গন্ধ-মদির। সেই আবীর ছড়িয়ে পড়ছে লাডলীর ফিনফিনে ধুতি আর মের্জাইয়ে, ছড়িয়ে পড়ছে জরিপাড় উড়্নিতে, যুমনাবাঈয়ের অ-নাভী কাঁচলে, সারঙ্গীর মেহেদীমাখা দাড়িতে। কলিদার পাঞ্জাবীতে। সবই আজ লালে লাল, অন্য রং নেই, বিলাস নেই, আজ শুধু লালের বিলাস, লাল বিলাস।

পানপাত্তির থালাখানা লাল, রুপোর আতরপাশ লাল, রুপোলী তবক-মোড়া পানের দোনা লাল, শুধু তাতে ঝিলিক মারছে রুপোর লবঙ্গ।

সবই লাল। চোখে-মুখে রক্তিমতা। আসবের নেশায় লাল আঁখি। সারঙ্গী লাল, লাডলী লাল, আর লালে লাল যুমনাবাঈ। তারও বসন লাল, ভূষণ লাল, তাম্বুল-লাল তার ঠোঁট, আর সেই তাম্বুলের রসে লাল তার কণ্ঠনালি—রস বয়ে যায়, আর তা ফুটে বেরোয় বাইরে। আঁখি লাল মদিরায়। নয়নাবান মেরে সে ধরলে রঙের গান। হোরির গান।

কেন রং দিলি ঢং করে। কেন ভিজে কাপড় রঙিয়ে দিলি পিচকিরি মেরে। এ সেই রঙের গান, ঢঙের গান,—সবই লাল, সবই ছন্দময়।

এমন সময় ছন্দ-পতন ঘটল। বাসা থেকে চাকর এসে জানাল, মথুরাপুর থেকে প্যারীমোহন পত্র দিয়েছেন মাতাঠাকুরাণী মরণাপন্না।

লাডলী বিদায় নিলে। বিদায় কি চট করে নেওয়া যায়! যমুনা শুকনো চোখে আতর দিয়ে অঝোরে কাঁদলে। গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলে। তারপরে অনেক বুঝিয়ে, তার হাত ধরে, তার হাতে মোহরের থলিটা গুঁজে দিয়ে শান্ত করে ছিল লাডলী। শান্ত তবু হতে চায় নি যমুনা। আরও গলা ছেড়ে উদারা-মুদারা-তারায় তুলেছিল কান্না। তারপর লাডলী চলে যেতে সারঙ্গীর গলা জড়িয়ে ধরে মদের নেশায় বিহ্বল হয়ে হেসে উঠেছিল—বলেছিল, লাল মুর্দা গয়া, বাঙ্গালী মুর্দা গয়া!—এখন তুই জিয়াগঞ্জের শেঠিয়া ফতেচাঁদকে নিয়ে আয়! ফুর্তি জমুক! হো-হো দোললীলা—হো-হো হোরি খেলা!

লাডলী জানে না, সে কবি, তাই যমুনার প্রেম, মুখসুদাবাদের মায়া কাটাতে গিয়ে লিখেছিল রোজনামচায়—

বিদায় মুখসুদাবাদ! বিদায় হীরাঝিল, মোতিঝিল। বিদায় দিল কী পিয়ারী যমুনা—বিদায়! আর কি আসব না, আর কি দেখব না তোমাকে, যার—

হিলালে কে রব্ আসমান যায়ে উস্‌ত্

তরাশিদ্‌হ্ নাথন পায়ে উস্‌ত্

চাঁদের ঠাঁই তো আকাশে

তবে পদনখে তার চাঁদ

কেন আজ প্রকাশিত?

তারপরে আছে এক বাঙালী কবির কয়েক ছত্র

কে বলে, শারদ শশী সে মুখের তুলা।

পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

লাডলী জানে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা কবি ভারতচন্দ্রের এই ক'টি ছত্র।

ভারতচন্দ্র নাগরিক কবি, দরবারী কবি—দরবারী মানুষের মনের কথা জানেন। তারা সূক্ষ্ম কারুকাজ করে কথায়, কিন্তু মন থাকে অনাহত, রস নিঙড়ে দেয় না। অমন কবি, অমন দরবারী মানুষ সে নয়। কিন্তু তবু

যমুনাকে ভুলে ছিল। মুখসুদাবাদী জল-হাওয়া যাবে কোথায়? দুদিন যেতে না যেতেই আবার নতুন আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

ফিরে আসতেই মা হরিমোহিনী যত্নআত্তিতে ভরে দিয়ে ছিলেন। হরিদ্রাবাটা দিয়ে প্রত্যহ স্নান, মাথায় ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রদানে দেহ আর মনের গ্লানি দূর হয়ে গিয়েছিল।

পিতাঠাকুর প্যারীমোহন কবিরাজ দিয়ে চিকিৎসা করাবার কথা ভাবলেন। গুলঞ্চাদি পাচনের ব্যবস্থা হলেই এ-রোগ সারবে, এ তাঁর জানা। নিজের যৌবনে মোকাম মুখসুদাবাদে তিনি কস্মিনকালে যান নি, জিয়াগঞ্জে তাঁকে কসবীর খোঁজ করতে হয় নি। তবু যৌবনের এ-রোগ, পুরুষের এ-রোগ তাঁর জানা। এ পুরুষালি রোগ কার না হয়েছে? এমন কি ভোলা মহেশ্বরই কি বাদ গেছেন! কোচানীদের পাড়ায় গিয়ে কি হয়েছিল সেও সকলের জানা। তাই ও-রোগ নিয়ে মাথা ঘামান না। একবার রাসের মেলায় ছই-ছাপ্পর-ঘেরা দুদিনের ডেরায় স্ফূর্তি করতে গিয়ে তিনিও বাধিয়ে এসেছিলেন। তাঁর উপরেও সেবার শিবের দয়া হয়েছিল, তখন কবরেজের ঐ ব্যবস্থায় উপকার পেয়েছিলেন। ছেলের জন্যেও ঐ ব্যবস্থা তাঁর মোনাসিব, কিন্তু ছেলের গম্ভীর মুখ দেখে আর সাহস পেলেন না। ডেরাটেনের ঘোসজা রামশঙ্কর তাঁর বড় শ্যালক, দুঁদেল পাকাপোক্ত মানুষ, না জানেন হেন জিনিস নেই। না ঘুরেছেন হেন জায়গা নেই, এমন কি সেই পদ্মাপাড় ঢাকায়ও গেছেন। ওলন্দাজ, আর্মানী, দিনেমার, আংরেজ সকলের হাল-হদ্দ জানেন। একেবারে সবলোট লোক। বাহাদুরও বলা যায়, যদিও নবাব-সরকার থেকে সে খেতাব মেলে নি, সেরপেঁচও জোটে নি। তাহলেও মান্যগণ্য মানুষ। তাঁকেই ধরলেন—

ছেলেকে তো নিয়ে এলাম, কেমন মনা-কাটা হয়ে আছে, দেখতো কি ব্যারাম-স্যারাম?

রামশঙ্কর বললেন, ও কিছু নয়। আশনাই করেছে বাঈজীদের সঙ্গে, জোর করে নিয়ে এলে—মন তো খারাপ হবেই, ব্যামো হলে পারা উঠত না।

তাহলে উপায়? ফরসিতে টান দিয়ে শুধালেন প্যারীমোহন।

উপায় একটা হবেই।

তা ভাই তুমি এখন একটা হিল্লে লাগিয়ে দাও!

রামশঙ্কর কথা খরচ করেন কম, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, তা দেব'খন, কিন্তুক ছেলের মন জানতে হবে নি।

তা জান, যা হয় কর!

রামশঙ্কর বুদ্ধিমান, সাত ঘাটের পানি এক ঘাটে করেন, তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। ইয়ার-বকসীরা কিছু বলতে পারলে না। লাডলী মুখফোঁড় নয়, মুখচোর। দিদিকে ধরলেন, তাঁর কাছেও হদিস মিলল না। শেষে চৌর্যবৃত্তি ধরলেন। একদিন ভাগ্‌নের দপ্তর ঘাঁটতে গিয়ে রোজনামচার খাতাখানা আবিষ্কার করলেন আর সেই খাতাখানা উলটে-পালটে দেখেও নিলেন।

লেখাপড়ায় তিনি ব-কলম নন, কিন্তু ফারসী বয়েত কখনো শেখেন নি। খত-খতিয়ান, দলিল-দস্তাবেজ লেখা, কার্যঞ্চাগে, অস্য পুত্র, তস্য মাতা-এসবে বেশ দোরস্ত। কাটনিকে কত দাদনি দিতে হবে, কত মুফতে হবে, সব জানেন —নিমক মাপে কত কমানো যাবে তাও হিজলীতে নোকৃরি করে শিখেছেন। কিন্তু একি সব লেখা! তবে আর কিছু না বুঝুন, এটা বুঝলেন, মোকাম কাশীমবাজারের কোন ছুটী যুমনাবাঈ বাবাজীর মাথাটি খেয়েছেন। শুধু তাই নয়, আবার তহ্‌মিনা আর রুদাবা নামে দুটি যবনীও আছে। মনে মনে ভাগনেবাবাজীর এলেম দেখে অবাক হলেন। এযে উড়নতুবড়ী! বাবা, একটা নয়, তিন-তিনটে খানকীর মোহড়া নেওয়া! তার উপরে শুধু ফুর্তিই করে না, আবার সেই যে পুব বাংলার কথায় বলে, কবির চাটাম—সেই চাটামেও আছে। ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা লিখেছে—তাদের রূপ নিয়ে। তা হবে না কেন, বাপ কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া তো! প্যারীমোহন গাঁয়ে বসেই কি কম করেছেন। গায়ে পারা তুলে ছেড়েছিলেন—এখনো কি কম। বড় ভগ্নীপতিকে তো এসব কথা বলা যায় না, একটু ধোপদোরস্ত করে বলতে হয়। তাই বললেন,

ছেলের বিয়ে দাও! ছেলে বিগড়েছে।

প্যারীমোহন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

রামশঙ্কর জানালেন সব কথা।

তারপর ঘটক ডাকা, কোষ্ঠী বিচার, পাত্রীর গুণপনার রূপগুণের ব্যাখ্যান, পর্যায় বিচার চলতে লাগল। পাওনা-দেওনার কথাও উঠল। শেষে সেই

দক্ষিণ বাদার বনবিবির মুলুক জয়নগরের মিত্রদের ঘরেই সম্বন্ধ পাকাপাকি হল। পাল্‌টি ঘর, বাপ জমিদার আবার বেনিয়ান। কোষ্ঠীতেও মিল, পর্যায়েও অমিল নয়। ছেলে উনিশ আর মেয়ে একুশ। বরের নাতনীর সমান পর্যায়ে কনে। ওতে বাধা নেই। দাদু-নাতনীতে রঙ্গরস চলে, আর নাতনী-সমান মেয়েকে বিয়ে করা চলবে না কেন? এবিষয়ে কুলবিচারীরা ফতোয়া দিয়ে দিয়েছেন।

বিয়ের উলু উলু। গালে হাত দিয়ে মুখে পান আর দোক্তা ঠুসে এক গলা ঘোমটা দিয়ে গান শুরু করে দিলেন মেয়েরা। সেই রামের বিয়ের গান।

রাম ছাড়া গীত নেই। সেই রাম আর সীতার মিলন। সেই সাকেত অঙ্গনাদের আনন্দের কলকাকলি, মিলনক্ষণের সেই পুলক। সে পুলক তো বিবাহের আগেই নয়, জল সইতে গিয়েও সেই গান। বিবাহের পরে প্রথম ঋতুমতী হলে ফুলচৌকেও সেই গান। রাম আর সীতা, সীতা আর রাম। সীতারাম।

চারিদিকে হুলাহুলি, কলরোল, তার মধ্যে লাডলীমোহনের রোজনামচার পাতাও সাদা রইল না। সে তখন গড়ছে তিলে তিলে তার তিলোত্তমা। যমুনাবাঈ-এর টিকলো নাক, অজানা মুঘল কন্যার সুর্মা আঁকা চোখ, মুন্নাবাঈয়ের নিবিড় নিতম্ব, মীনাবাঈয়ের কদলী সমান উরু মিলিয়ে গড়ছে তার গোরোচনা গৌরী কিশোরী। এখনো স্তনন্মা হয় নি, এখনো চোখের কোলে পড়ে নি কাজলের আভার মতো স্নায়ুর স্বাক্ষর। তাকে সম্বোধন করেই তার কবিতা, তার ভাবোচ্ছ্বাস।

বিয়ে করতে চলল লাডলীমোহন। মথুরাপুর থেকে জয়নগর। এক-টিল পথ নয়। ডাক দিলে শোনা যায় না। বজরা, স্লুপ, পিনিস সাজিয়ে চলল। সঙ্গে বরকর্তা মাতুল, পুরোহিত, সামাজিকজন, আত্মীয়-স্বজন। নাপিত আর চাকরান জমি-ভোগী গোলামের দল। আর আছে বন্ধুবান্ধব। সঙ্গে তানপুরা, বাঁয়া তবলা, খোল আর গেলাবমোড়া সেতার।

কানা নদীর বাঁক ঘুরে শিবাক্ষেত্র শিয়াখালা, সেখানে উত্তরবাহিনী দেবীর পূজা দেওয়া হল ষোড়শোপচারে। দেবী নৃমুণ্ডমালিনী, দ্বিভুজা, বিচিত্র রক্তবর্ণা। কুলদেবী নন, কিন্তু বীজ পুরুষ নরেন্দ্র খাঁ ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত। সেই ভক্তির জের টেনে চলেছে বংশ। শুভকর্মে দেবীর পূজা দিতেই হয়।

শিয়াখালা পেরিয়ে সরস্বতীর সোঁতা ধরে ভাগিরথী-গঙ্গায় এসে পড়ল বহর। তারপরে কালীর থান কালীঘাট বাঁয়ে রেখে, ঘুরে ঘুরে বাঁকের পর বাঁক ছাড়িয়ে পাল তুলে চলল। পথে পড়ল মাইনগর—বসুবংশের আদি বাসস্থান। পালে হাওয়া লাগছে, তরতর করে ভেসে চলেছে, রায় মঙ্গলের ঘনশ্যামের সেই পথ, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের সেই পথ।

সাধুঘাটা পাছে করি, সুখপুর কাছে তরি
চাপাইল বারুইপুরে আমি।

তারপরে বনবিবির থান দক্ষিণ বারাসত—তারপরেই জয়নগর।

বিবাহ হয়ে গেল। বরণডালায় সাজানো সরা চিত্রবিচিত্র, সরা-ঢাকা মুচির প্রদীপ মঙ্গল আলোর রোশনাই নিয়ে ঝলসে উঠল, বেশ্যার দুয়ারের মাটি এনে সাজানো হল, মোনাফল মুনিফলের সঙ্গে মিলল। জলপাত্রে এই মিলন না হলেই মাটি। এ বুঝি সে-ই আসল মিলনের প্রতীক, স্ত্রী-আচারে সে মিলন আজও জীয়ন্ত। এমনি করেই শুভদৃষ্টির লগ্ন এসে হাজির হল। লাডলীর শিবের মতো ত্রিনেত্র নেই, দুটি তার চোখ। সেই দুটি চোখ মেলেই সে দেখলে। কাপড়ের আচ্ছাদনী ঘেরাটোপ হয়ে দুজনকে আবৃত করে দিলে। দেয়ালগিরির আলো ঢাকা পড়ল। এখন দুজোড়া চোখ শুধু দেখবে পরস্পরকে—আর মঙ্গল আলো ঝলসে উঠবে দুচোখে। সে মঙ্গল শাশ্বত, অব্যয়, অক্ষয়।

কনে মুখ নীচু করে আছে। কিন্তু একি!

রোজনামচার সেই পাতাটা ওলটালে লাডলী।

একি হেরিনু। এযে গোরোচনা গোরা নয়, লক্ষ্মী শ্যামা নয়, এ যে কালো মেঘ। না, তাই বা বলি কেন, এযে খস্‌খসে কালো মেয়ে। রূপের বালাই নেই। হায় বৃন্দাবা!

কিন্তু এতো বধূ, পরকীয়া নয়, স্বকীয়া, একে নিয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হয়। একে বিবি বা বাঈ বানানো চলে না। আবার নাগরিক মন বলে উঠল—সংসারটা চেখে দেখা যাক, তারপরে সংসারের বাইরে তো আছেই অবিদ্যার দল। স্বকীয়ার ধ্যান চলুক এখন, আবার সে স্বকীয়া যখন অনাঘ্রাতা কিশোরী। মন মাতাল হয়ে উঠল। আবার কাঁটা খচ্‌খচ করে বিঁধল।

এ যে গুল আন্দাম নয়, গুলাব গাণ্ডেরীও নয়, আবার কালো জামও নয়। এযে কালো কিষ্কিন্ধ্যে। হা হতোস্মি!

শুধু কালোই নয়, যেমন কালো, তেমনি মোটা, তেমনি বেঁটে। যেন গুড়ের নাগরী। যেন চালের মটকী। যেন ঢাকাই জালা।

লাডলী মোহনের অপরূপ রূপের কাছে বধূ বড়ই বেমানান, বেঢপ। ওকথা এতক্ষণ মিলন উৎসবের আঙিনায় চোখে পড়ে নি; অসঙ্গতি ধরা পড়ে নি। এবার পড়ল। দুধে-আলতা পাথরে গিয়ে যখন বিয়ের পরে বর কনে দাঁড়াল, তখন সকলের নজরে পড়ল।

মেয়েরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বললে, এযে দাঁড়কাকের মুখে আঁব লো।

পড়োশিনীরা মন্তব্য করলেন—আহা, পয়মন্তী মেয়ে গো, অনেক শিব পুজো করেছিল, তাই এমন বর পেলে।

আহা, অক্তের মতন নাল দুখানি ঠোঁট আর গাল, যেন অক্ত ফেটে পড়চেক গো!

বাসরেও সেই এক কথা। বাসর-জাগনীরাও বলে ঐ কথা, বলে রসিকা নায়রীরা। আবার পাড়ার ঠানদিরা। ঐ এক কথা। তবু বাসরের মোহ লাডলীকে পেয়ে বসেছিল। বেনের পুঁটলীর মতো শাড়িতে গয়নায় মুড়ে এক কোণে পড়েছিল থাকমণি। সে নিজের বলিষ্ঠ হরতেল বর্ণ বাহু দুখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল আলিঙ্গনে—কিন্তু হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। কবি মনে আঘাত বেজেছিল। মন ভারী, তুলোট কাগজের সাদা পাতা তাই সাদাই রয়ে গেছে। শুধু লেখা আছে বিবাহ বাসর। আর কিছু নেই। শুধু কিছু কাটাকুটি। হরফ ঝরতে চায় নি, তাই স্রোতের মুখেই কাটাকুটির চড়া।

সুন্দর আর কুশ্রীতে মিলন হল। ঘোষজা বিবাহান্তে বর আর বধূকে নিয়ে ফিরে এলেন। নৌকা বজরা আর সুলুপে ভরতি হয়ে এল দানসামগ্রী। রুপোর একপ্রস্থ তৈজসপত্র দিয়েছেন মিত্র মহাশয়। মায় থেলো হুঁকোটিও পর্যন্ত রুপো-বাঁধানো, এছাড়া মেঘডম্বুর, বালুচর জামদানি কোন্ শাড়িই বা বাদ গেছে! আছে বারাণসীর বেনারসী, আছে সাঁচ্চা জরির কড়িয়াল। মেয়ের কালো গা মুড়ে দিয়েছেন চিকে চন্দ্রহারে, কেয়ূরে-কঙ্কণে, রুশমে,

তাগায়-বাজুবন্ধে শতনরী হারে, আবার ভূমিদানও করেছেন। সামাজিক বিদায়, প্রণামীও দিয়েছেন ঘটা করে। গরদ, মলমল, শান্তিপুরী, ফরাসডাঙা ধনেখালি-বহরমপুর-মালদার তসর-মটকা—কি নেই!

থাকমণিকে বিবাহ বাসরে শুভ্র শেজের উপর এক ধ্যাবড়া সিয়াই বলে মনে হয়েছিল, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল লাডলীমোহন। ফুলশয্যার দিন ভাল করে দেখলে। রোজনামচার পাতায় সেদিনটি গাঁথা আছে।

আমার ফুলশয্যা—ফুল শেজ পাতা, ফুলে ফুলময়। কিন্তু ফুলশয্যার যিনি অধিশ্বরী, তিনি কোথায়? এক গলা কালির বোতল নিয়ে আমাকে ফুলশয্যার রাত কাটাতে হবে। রক্তাম্বর পরে এ কে বসে আছে—ডাকিনী যোগিনী! এ তো তাই হলেই ভাল ছিল। কিন্তু অলঙ্কারে যে একে আরও কুশ্রী দেখাচ্ছে। হায়, নারীর রূপ তো নেই অলঙ্কারে, লাবণ্য তো নেই কনক বেশরে, নেই কনক-কাটা কড়িতে—নেই বাউলী আর পাশুলিতে। রূপ থাকলে সে-রূপ বাড়াতে পারে। সে রূপের অনুপান—রূপটান। কিন্তু সেই অনুপানই কুৎসিতার পক্ষে বিষবড়ি হয়ে ওঠে। হায় নারী! তবু কি ছিল রাতে কে জানে, কাছে গিয়ে বসলাম।

মুখ ফিরিয়ে নিলে থাকমণি।

বললাম, প্রিয়ে মানময়ী…হাত ধরলাম।

ও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিতে গেল, পারলে না।

ঘোমটা খসে পড়ল, আর কালো রূপ বিকশিত হল।

ঝংকার দিয়ে উঠল থাকমণি, লজ্জা করে না। আমাকে কি নুটীর পারা পেয়েছ! আমি নুটী নই, মুখসুদাবাদ যাও।

হেসে বললেম, নুটী কোন ছার—তুমি স্বর্গের বিদ্যাধরী।

আহা, কিযে কথার ছিরি, আমি বিদ্যেধরী হলেম কেন গো? বিদ্যেধরী আছেন মোকাম মুখসুদাবাদে। সেখানে যাও!

তা যাব, কিন্তু তোমাকে তো ছাড়ব না।

সেই প্রথম সম্ভাষণ। ভীমরুলের হুলের টের পেয়েছিল মিত্র-দুহিতার কথায়। তবু তাকে নিয়েই যমুনাবাঈ-এর প্রেমিক, কবি লাডলীমোহন জীবন শুরু করতে চেয়েছিল। ভার্যা—ভার্যাই। রূপ আছে নটীর ঘরে, সেখানে রূপ মেলে, বংশধর মেলে না। মিললেও কুলের প্রদীপ হয়ে সে আসে না।

ফল-শোভন উৎসবের পরে ঋতুমতী কন্যার সঙ্গে প্রথম সঙ্গমের দিনটিও তার খাতায় পাতায় জীবন্ত হয়ে আছে।

উৎসব হয়ে গেছে, কাদা খেলার কাদা শুকিয়ে গেছে উঠোনে। তিন দিন গত। চাঁদ যে রক্তের জোয়ার এনেছিল নারীর দেহে, সে জোয়ার এখন শান্ত। নারীর সর্বাঙ্গে রূপ দিয়ে, লাবণ্য দিয়ে, কামনা দিয়ে সে অন্তর্হিত। এখন শরীরের সে গ্লানি মুছে গেছে, এখন পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সে বিদ্যুৎময়ী। ঐ বিদ্যুৎময়ীকে স্পর্শ করতে হবে পুরুষকে, তার বুকে কুমার-সম্ভবের যে কামনা আছে তাকে রূপ দিতে হবে। কিন্তু স্পর্শ করলেই তো হল না, তারও আছে আচার, ভবদেব ভট্টের অনুশাসন। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সবাই একদা মেনে চলতেন এ-অনুশাসন। কিন্তু আজকাল এ অনুশাসন থেকে ভ্রষ্ট করছে কলি। তবু এ বংশ সামবেদী এই রীতি মেনে চলেন, আবার সেই রীতি নিয়ে গড়া ভবদেব ভট্টের অনুশাসনও অগ্রাহ্য করেন নি। তাই তৈরি হল লাডলীমোহন।

প্রজাপতিদেব ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে চরু নিবেদন করা হল, হল ঘৃতাহুতি প্রদান। চতুর্দশী অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথি নয়, রবিবার বা সংক্রান্তিও পড়ে নি। জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, উত্তরষাঢ়া নক্ষত্রও নেই; আছে মৃগশিরা, শুভযোগ উপস্থিত। এই শুভযোগে লাডলীমোহন স্ত্রীতে উপগত হবে। আর্যঋষিরা স্ত্রী ও পুরুষকে এই শুভযোগে মিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে গেছেন। সন্তানের ক্ষেত্র স্ত্রী, পুরুষ বীজ। স্ত্রী ভাব্য বংশ, পুরুষ ভাবক বংশ। স্ত্রী জাতি অনুকূল তড়িৎ আর পুরুষ তড়িৎশক্তির আধার।

সায়ং সন্ধ্যা অতীত হল। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পবিত্র বেশ পরলে লাডলীমোহন, চন্দনে চর্চিত তার ললাট, সূর্যার্ঘ প্রদান করে সে প্রস্তুত হল। তারপর উত্তরীয়ে ছিটিয়ে নিলে অগুরু নির্যাস। এবার সে চলল শয়নমন্দিরে। আজ আর অন্দর মহলে যেতে লজ্জা নেই। কেউ বাঁকা চোখে তাকায় না। কেউ ফিসফিসও করে না। আজ দুয়ার খোলা।

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে। শোবার ঘর ধুপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে ম-ম করছে। ফুলও আছে, সুগন্ধি ফুলের মালা পাত্রে রয়েছে, শয্যায় ফুল নেই। এতদিন ফুলশর মদন অধীশ্বর ছিল শয্যার,

কিন্তু আজ কামনা থাকলেও কাম নেই। তাই ফুলশেজ পাতা হয় নি। চিত্র-বিচিত্র শীতলপাটি পাতা রয়েছে, তার উপরে সারি দেওয়া সাটিনের বালিশের স্তূপ—শিয়রের বালিশ, পাশ-বালিশ, কান-বালিশ—সব আছে।

লাডলী ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলে দরজায়। তারপর এদিক-ওদিক তাকালে। রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। তারই আলোয় দেখা যায়—মুর্শিদাবাদী দুধ-গরদের শাড়ির স্তূপ বসে আছে। মুহূর্তে কামনা যেন উবে গেল। কোথায় তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা নারী, আর কোথায় এই কুশ্রী মিত্রদুহিতা। এরই উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করে বলতে হবে—

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু তষ্টারূপানি পিংশতু
আসিঞ্চতু প্রজাপতি ধাতা গর্ভং দধাতু তে।

বলতে হবে—হে প্রজাপতি-লোকপালক-লোকস্রষ্টা—দাও, গর্ভ দাও!

শাস্ত্রকারের এই বিধি, পদ্ধতিকার ভবদেব ভট্টের এই বিধান।

তাই করলে লাডলী। কিন্তু পুতুলনাচের পুত্‌লার মতো এগিয়ে গেল, পাত্রে জীইয়ে রাখা মালা নিয়ে পরিয়ে দিল থাকমণির গলায়, চন্দনের টিপ দিয়ে দিলে ললাটে, নিজেও মালা পরলে। তারপর তার হাত ধরে পালঙ্কে নিয়ে গেল। পালঙ্কে শুইয়ে দিলে লাডলী। হয়তো একটু জোরই করেছিল, ব্যথাও লেগেছিল থাকমণির। হয়তো কুদর্শনা-নারীকে সন্তানের ক্ষেত্র হিসাবে কল্পনা করতে গিয়ে ঘৃণা হয়েছিল।

আঃ মর! বুড়ো মিন্সে, শোয়াতে জানে না! ঝংকার দিয়ে উঠল থাকমণি।

কঙ্কণ ঝংকার নয়, সেতারের বোল নয়, কাঁসার পাত্রের খ্যান-খেনে আওয়াজ। একটু বা চমকে উঠেছিল লাডলী, ব্যথিত হয়েছিল তার কবি মন। কিন্তু তবুও চলে যায় নি আগল খুলে। পালায় নি। রমণীর স্পর্শে একটু বা কামনাও জেগেছিল। সেও পাশে শয়ন করেছিল। তারপর মিহি মলমলের পুঁটলিতে বাঁধা অশ্বগন্ধার চূর্ণ মন্ত্র পড়ে নাকে ধরেছিল।

অশ্বগন্ধার চূর্ণে কি মাদকতা আছে? আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সে জানে না। কিন্তু বোধহয় আছে।

থাকমণির ঘোমটা খসে পড়েছিল। কাঁচুলির ফাঁস আলগা হয়ে গিয়েছিল। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল। চোখ তার বোজা। কেমন

যেন ভাল লেগেছিল তাকে দেখে। শুভদৃষ্টির সময় ভাল লাগে নি, প্রত্যহের দেখা-শুনোয় ভাল লাগে নি, সেদিন লাগল। রক্তে টুংটাং করে করে বাজছে কামনার টংকার। ষোড়শীকন্যা প্রতীক্ষায় আছে। তার শিথিল কাঁচল, শিথিল নীবি, এবার টেনে নিলেই হয় বুকে। কিন্তু এখনো আদিরসের আবাহন হয় নি। উপস্থ ইন্দ্রিয়ে চলল মর্ষণ, আদিরস শিরা থেকে শিরায় বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। আর মুখে প্রজাপতি আবাহনের মন্ত্র। শিরা থেকে শিরায় সঞ্চারিত আদিরস, ব্রহ্মতালুতে গিয়ে উঠল।

এবার পুরুষ ও প্রকৃতি প্রস্তুত।

গর্ভংদেহি সিনীবালি, গর্ভং দেহি সরস্বতী।
গর্ভস্তে অশ্বিনৌ দেবা বাধতাং পুষ্করস্রজা॥

গর্ভ দাও, দাও বীজ, দাও সন্তান। দাও, দাও!

দেবী, বীজকলা-পালয়িত্রী লক্ষ্মী! গর্ভের আঁধারে বীজ বহন করুক প্রকৃতি, অংকুরে উদ্‌গত হোক, ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক! গর্ভ দাও!

লাডলী যেন মন্দিরে প্রবেশের পথে। কামমোহ এখন সংযত, সীমিত, আবেগ আছে দেহের ধমনীতে। কিন্তু সে-আবেগ ভ্রষ্ট করে না, ইতস্তত করে না। সে এখন যোগীর আবেগ, তপস্বীর আবেগ। সে কল্পনা করছে এক বিরাট পদ্ম। সে পদ্মের মুখ থেকে শ্রবিত হচ্ছে মধু। আর সেই মধু পানে এসেছে ভৃঙ্গ। ভৃঙ্গ দলে দলে বসছে, মৃণালের মেলায় তার আসন। গর্ভকেশরে সে রেখে যাচ্ছে তার বীজ। বীজবতী হবে পদ্ম, গর্ভাশয়ে তার সেই বীজ জন্ম দেবে।

লাডলী ক্লান্ত, স্বেদজলে স্নাত। আর নারীও তাই। শিথিল বেশবাসে, আলুল কেশে পড়ে আছে। চোখ বোজা। আউলা।

লাডলী একবার তাকিয়ে দেখলে। বুঝি শিউরেই উঠল। এতক্ষণ প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন ছিল, এতক্ষণ বাস্তব কাছে ঘেঁষতে পায় নি। এবার বাস্তব এসে হাজির। ঐ কালির বোতল তার সহধর্মিণী, তার সন্তানের জননী! উঠে সে নিঃশব্দে শ্বেতপাথরের বাটি থেকে চরু খেলে, কর্পূর জল খেলে! অবশিষ্ট চরু রেখে দিলে। তারপরে একটা পাশ বালিশ টেনে নিয়ে পিছন ফিরে শুতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেল স্বর।

হাড় হাভাতে, একাই বুঝি গাণ্ডেপিণ্ডে গিললে! আমার জন্যে নেই!

লাডলী অবাক হল, কোন কথা বললে না।

থাকমণি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল; শিথিল, চুলগুলো এলানো। উঠে নেমে পড়ল পালঙ্ক থেকে। তারপর চরুর বাটিটা তুলে নিয়ে আবার গর্জন,

ক্ষুদ্দ র রাক্ষস, সবটা চেটেপুটে খেয়েছে!

বাকি যেটুকু ছিল, সেটুকু খেয়ে, ঢকঢক করে এক খোরা জল খেয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ল।

লাডলী সবই দেখলে, তার কবিচিত্তে ব্যথা লাগল।

এই কি তার গৃহিণী, সচিব, সখী!—একে নিয়েই কি তাকে ঘর করতে হবে।

তবু ঘর করতেই চাইল লাডলী।।

কালো রূপেই তখন মন মজেছে।

লাডলী তারই ধ্যানে মগ্ন।

তন্বী নয় থাকমণি, তবু লাডলী মনকে বোঝায়, তন্বী তো তস্বীরের জীব, বাস্তবে কি সে ভাল? সে তো ভুজবন্ধের নিবিড়তায় তেমন করে কামমোহ আসতে পারে না। ক্ষীণমধ্যা নারী কি ভাল? তার কটিতট বেষ্টন করে তো স্ফীত কটিতটের আনন্দ মেলে না। নিবিড়নিতম্বা নিশ্চয়ই ভাল, কদলী-সমান উরু নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু সে নাগরিক, রমণী সে দেখেছে বহু। সুন্দরী শয্যাসঙ্গিনী রূপে অযোগ্যা—নাগর-শাস্ত্রের এ বিধি তার জানা। তাই লাডলীমোহন মনকে বার বার বোঝালে। কালো-পাথরবাটির মতো ছালমেটে কালো—সে কুচ-কালো করে তুলতে চাইল মনে, দন্তিলাকে সে সুচারুদশনা করে নিলে। থাকমণিই তখন তার যুমনিবাঁঈ, তার সেই এক লহমার দেখা নারী। তার কাংস্যকণ্ঠই বীণাবিনিন্দিত স্বর লহরী হয়ে দাঁড়াল। লাডলী রোজনামচার পাতায় লিখলে—

রূপ কি নারীর দেহে, না পুরুষের মনে? মনের রং চুবিয়ে, নিজের ইচ্ছার তুলি দিয়ে এঁকে নাও রূপ, তবে তো তুমি কবি লাডলী। তবে তো তুমি সাকীকে খুঁজে পাবে। ওমর পেয়েছিলেন, সাদি পেয়েছিলেন, হাফিজ পেয়েছিলেন, তুমিও পাবে। ওমর তো তাই কিশোরকে কিশোরী—সাকী করেছিলেন—তুমিও পারবে।

পেল লাডলী। পারল লাডলী

দিন কাটে তার রূপের নেশার ঘোরে। কেতাব পড়ে-পড়ে বুদ্ধি শানিয়ে রাখে। রূপের অনুপান যোগাড় করে। রাত হলে অন্দরমহলে এসে নিজের মহলে খিল এঁটে দিয়ে মনের মতো করে পেতে চায় জয়নগরের মেয়েকে। জয়নগরের মোয়ার মতো তারিয়ে তারিয়ে পেতে চায়।

জয়নগরের মেয়ের ক-অক্ষর গোমাংস, কিন্তু নাগরালিটুকু সে জানে। বাপের আংরেজের সঙ্গে খুব মিতালি। বেনিয়ান গায়ে এঁটে বেনিয়ানগিরি করেন। দুর্গাচরণ মিত্তির হতে পারেন নি, মোকাম বাগবাজারে দৌলত-খানা বানাতে পারেন নি, কিন্তু কামাখ্যা মিত্তিরও কিছু কম্‌জোরী লোক নন। কলকেতায় হামেসাই আসেন, ছোটেন কাশীমবাজার, ছোটেন ইংরেজবাজার মালদয়, আবার ঢাকায়ও যান। গোমস্তা আছে, খাজাঞ্চী আছে, ব্যবসা বেশ সরগরম। তাঁর সোহাগী মেয়ে নাগরালি শিখবে বই কি!

লাডলী যখন রাতে তার কাছে আসে, থাকমণি কোনদিন বা পরে মেঘডম্বুর জামদানি। কোনদিন বা শবনম মলমলে দেহ মুড়ে বসে থাকে। খোঁপায় গুঁজে দেয় ফুল, চোখে আঁকে কাজল। আবার সরবাটার প্রলেপ আর লেবুর রস মেখে মেখে মুখখানাকে মসৃণ করে তোলে। আংরেজ বিবিরা কলকেতায় বুকে মুখে লাল রং মাখে, সে রঙেরও বড় তার সাধ। ভাইকে দিয়ে সে রঙ এনে মাখে। কালো চামড়ায় লাল রং বেগ্‌নী আভা ফোটায়।

লাডলী রহস্য করে বলে, কি গো, আজকে যে বেগনী আলো ছড়াচ্ছ? জয়নগরী বেগুন বুঝি এমনি?

থাকমণি চুপ করে থাকে।

লাডলী থামে না, কাছে এসে কোমর জড়িয়ে ধরে বলে, এমনি বুঝি মাজা মোটা, এমনি বুঝি বেঁটেখাটো বেগুন। কালোর মধ্যে এমনি বুঝি লাল ঝিলিক দেয়!

এবার রহস্যের হুলটুকু টের পায় থাকমণি, সে অমনি কাঁসরের রোল তোলে। বলে,

বেশ তো আমি জয়নগরী বেগুন, যাচ্ছেতাই। বেঁটে মোটা কালো, হদো-কুচ্ছিৎ—তাতে কার কি!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে বসে থাকমণি।

লাডলীর ভালই লাগে। আরও ক্ষেপাতে চায়। বলে, আমি তো জানতাম, তুমি আমার কালিন্দী, কালোর ঢল নেমেছে। কালোয় কালো, নীলের জেল্লা দিচ্ছে তার মাঝে। নীলকান্তমণি হয়ে আছ। তা মুক্তকেশী বেগুন হতে সাধ গেল কেন গা?

সাধ গেছে তো গেছে, কার কি!

তোমার ভেয়ের তো আর গায়ে লাগে না, আংরেজের বিবির রং এনে দিলেন! আর বোন অমনি বুকে মুখে সে রং মেখে বেগ্‌নে বিবি সাজলেন, দখণে বেগুন হলেন—এদিকে আমার কালিন্দীতে যে চড়া পড়ল, তাতে আমার তো অনেক বয়ে গেল।

কি বয়ে গেল?

কি বয়ে গেল শুনবে? হাত ধরে থাকমণিকে টেনে কাছে নিয়ে এল লাডলী, কোলে শুইয়ে ঠোঁট দুটি ধরে আদর করে বললে, শুনবে? আমার কালো রূপ যে মাটি হয়ে গেল—আমি তো বিবির শ্বেতি রং চাইনে, লাল রং চাইনে, আমার কালো রূপই ভাল। আমার নীলকান্তমণিই ভাল।

সত্যি? থাকমণি আবেশ-মদির চোখে চোখ চেয়ে বলে।

সত্যি না তো কি মিছে! আমি নিজামত আদালতে নালিশ করব তোমার ভেয়ের নামে। শালার নামে। আমার ধন ফুসলে নিতে চায় কেন?

ও মা! ও কি কথা গো!

চুমু খেয়ে বলেছিল লাডলী, চায়ই তো—ভাই-ভাতারী করে রাখতে চায় তোমাকে। ঘরের মেয়ে পরকে দিতে চায় না!

ওমা—কি ঘেন্না! শিউরে উঠেছিল থাকমণি। কাঁসরের আওয়াজ খাদে নেমে এসে কোমল হয়ে উঠেছিল, এবার আবার সপ্তমে চড়ল। লাডলী বললে, ঘেন্নারই তো কথা গো মণি। তুমি তো ভাই-ভাতারীই, নইলে আমার হলে আংরেজের বিবি হতে চাইতে না, আমার কালমণি হতে।

ফোঁস করে উঠতে চেয়েছিল থাকমণি, কিন্তু নাগরিকতা তাকেও পেয়ে বসেছে। সে বাহু দুখানি দিয়ে শুধু গলা জড়িয়ে ধরেছিল লাডলীর, কথা বলে নি। লাডলী রেড়ির তেলের আলোয় দেখেছিল কঙ্কণ-জড়ানো

মুখানি সুঁদুরীর চেলাকাঠের মতো মোটাসোটা বাহু, দেখেছিল তার খসখসে কালিমা, দেখে শিউরে উঠেছিল। তারপরে তয়ফাউলী যমুনার কথা ভেবেছিল। আর এক নিমেষে বদলে গিয়েছিল থাকমণির ঐ বাহু, সেখানে কমল-কোমল, কঙ্কণ-জড়ানো শুভ্র বাহুলতা এসে জুড়ে বসেছিল। নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল লাডলী। অধর সুধা সে পান করতে চায়। কিন্তু অধরের কাছে অধর নেমে আসতেই আবার ঘিনঘিন করে উঠেছিল মন। তেলাকুচার লালিমা নেই, যাকে বলেন কবিরা বিম্ব-বিমোহন—এযে মাংসল কামুক ঠোঁট, লাল জেল্লা ছাড়ে না, পাঁটার কলিজার মতো মেটে চমক জাগায়। আবার নাম-না-জানা হুরী এসে জাদুই কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল, তাই অধরে অধর নেমে আসতে বাধা পায় নি। পরিপূর্ণ চুম্বনে নিজেকে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল লাডলী, তৃপ্ত হয়েও ছিল! রূপ তো কবির মনে, শিল্পীর মনে। জরিন কলম তার, সেই কলমে যা আঁকি-বুকি দেবে, টান-টোন দেবে—তাই-ই তো সত্য। বাকি সব ঝুটা হ্যায়।

সব ঝুট হ্যায়!

লাডলীর রোজনামচার পাতা সিযাইয়ের হরফে এমনি সব মন্তব্যে ভরে উঠেছিল।—

সাথীরা বলে—লাডলী, তোর হল কি? আমাদের যে চোখে পড়ে না। মাগু নিয়ে এমনি মেগ্‌গো হয়ে গেলি!

লাডলী হেসে উত্তর দেয়—মাগু নিয়ে তোরাই বা কি কম করিস!

আহা, আমাদের মাগ তো পোড়া কাঠ! আছেই বা কি, সব তো শেষ—

পোড়াকাঠে প্রাণ-প্রতিষ্ঠে করতে জানা চাই, লাডলী জবাব দেয়। তাহলে নীরস তরু, শুষ্ক তরুও জলজল করে উঠবে। সেই যে কালিদাসের কথা—নীরস তরুবর পুরত ভাতি—ঠিক তেমনি।

ওরা বলে—আমরা তো তোর মতো কবিয়াল নই যে, মিছে বলে মনকে বোঝাব। আচ্ছা, কতদিন থাকে এ পীরিত দেখি!

লাডলী হেসে নাগরালি করে বলেছিল, যতদিন থাকে, ততদিনই লাভ।

তারপরে কি হবে?

রূপের ভোমরা হয়ে রূপ খুঁজবো আবার।

বাঃ জীতা রহ সাঙাৎ, এই তো কথার মতো কথা! বাতের মত বাত!

এদিকে মা খুশী, বাপ খুশী। ঘর নিয়েছে ছেলে। লাহরী সর্বনাশী হরীর সুর্মার মায়া কেটে গেছে, এখন সংসারী বনেছে। মা রূপটান মাখান বৌকে; চুলে ভৃঙ্গরাজ আর গন্ধতেল মাখান, গাও ঘষে দেন ধুঁধুলের খোসা দিয়ে, মুখে মাখান নিজের হাতে হলুদতেল, সিঁথের সিন্দুর পরিয়ে দেন রুপোয় বাঁধানো সজারুর কাঁটা দিয়ে, কাঁচপোকার টিপও পরিয়ে দেন। তারপরে শান্তিপুরী পাছাদার ডুরিয়া। আবার পশ্চিমা খাটো কাঁচুলিও বাদ যায় না। এ যেন লাস বেশ। এই লাস বেশের কথা আছে প্রাচীন কবির কাব্যে। স্বামী-সন্দর্শনের জন্য এমনি করে পটের বিবি সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু তবু ঝিরা, পড়োশিনীরা মুচকি হাসে। ঝিরা পুকুরঘাটে বাসন মাজতে-মাজতে বলাবলি করে।

কি বলে?

এ যেন কুচকুচে কালা দাঁড়কাকের মুখে টুকটুকে আঁব গো!

কুচকুচে দাঁড়কাকটি কে লা?

টুকটুকে আঁবটি কে লা?

বলে দিতে হয় না, সবাই জানে। সবাই হাসে। ছলছল, কলকল করে ওঠে হাসিতে। পরিহাসে।

থাকমণির কানেও কথাটা যায়। মনে ঝংকার ওঠে, পায়ের আঙুলের ডগার চুটকি বেসুরো বোল বোলে, দুমদাম করে কুনকে হাতীর মতো ছুটে গিয়ে গোসা ঘরে খিল লাগায়। পাশ বালিশ আঁকড়ে, শিয়র বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। আর বলে,

ওলো শতেক খোয়াড়ী, চোকখাগীরা, তোদের কি! তোদের কি!

খায় না, দায় না, গোসা ভাঙতে শাশুড়ী আসেন না, আসেন ও-পাড়ার রাঙা ঠানদি। গোসা ভাঙে না।

রাত হলে যখন লাডলী আসে, তখন গোসা ভাঙে।

বলে, তোমাকে যদি প্যাঁটরায় পুরে রাখতে পারতেম গো! সিন্দুকে যদি ছোরানকাঠি দিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারতাম গো!

লাডলী হেসে শুধায়, কেন?

ওরা চোখ দেয়, ওদের পরান খাঁক হয়ে যায়! আমি নাকি দাঁড়কাক, আর তুমি টুকটুকে পাকা আঁব!

বলুক গে। আমি তো জানি—তুমি কি! তুমি আমার—

থাক গো, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। আমি জানি—জানি। মুখ ফিরিয়ে নেয়।

গোসা ভাঙাতে জানে লাডলী। সে কবি, মান-ভঞ্জনের সব কিছু তার জানা।

গোসা ভাঙে, মানিনীর ধূমাবতী রূপ মুছে যায়, আবার রসবতী হয়ে ওঠে। কে বলবে তখন—এ সেই কালির বোতল, ঝোলা গুড়েরব নাগরী, সুন্দরীকাঠের গুঁড়ি থাকমণি। লাডলী তাকে নিজের মনের রূপে সাজায়। এ রূপ তারই দান, প্রেমিকের দান—স্বামীর সোহাগের যৌতুক।

এই রূপ থেকেই শোণিত উত্তাল হয়ে ওঠে, শোণিতে শোণিত মেশে, কালল আনে, কল্লোল ধ্বনি জাগায়, ফেটে পড়ে বুদবুদ, আর সেই বুদবুদ ঘন হয়ে ওঠে, তারপরে সম্ভব আসে। স্বামী জন্ম নেয়, নিতে থাকে।

একথা জানেন জীবতত্ত্বের রহস্যবিদ্ বিজ্ঞানীরা। জানেন সুশ্রুত, জানেন মাধবকর। জানেন, বলেন, গর্ভের আঁধারে যে রহস্য, তাকে শ্লোকে শ্লোকে বেঁধে দেন। নরনারীর সম্ভবের রহস্য এমনি করেই ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু যে নারী নিজের বুকে রহস্য উৎপাদন করে, সে তো জানে না। সূর্যের রশ্মি এসে পড়ে, শোণিত মেলে শোণিতে, বুঝি দুটি ধারার মিলন হয়; নয় তো অরণি কাঠে কাঠে ঘর্ষণ হয় আগুন জ্বলে ওঠে, আসে অগ্নিতেজা কুমার, অগ্নিময়ী কুমারী। স্ফটিকের উপর সূর্যরশ্মি যেমন করে গমন করে, তেমনি করে সন্তান গর্ভের অন্ধকারে প্রবেশ করে। নারী একথা জানে না, সে পুলকে গ্রহণ করে; রহস্যের পুলকটুকু অনুভব করে। আর পুরুষ? সেও পুলকে অভিভূত হয়ে যায়। জানেন জ্ঞানী পুরুষ শুশ্রুত, জানেন জ্ঞানী মাধবকর। তাঁরা বিধান দেন, আর সে বিধান অনুসারে প্রাচীনারা গর্ভের শিশুর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলেন।

গর্ভব্যাকরণ জানে না থাকমণি, জানে না লাডলী, কিন্তু একজন রহস্য-পুলকে অধীর, আর-একজন বংশধরের আশায় উদ্‌গ্রীব। আর অধীর মা আর বাবা।

থাকমণি স্বপ্নে দিন কাটায়, শ্বশুর-শাশুড়ী দিন গনেন, দিন গনেন জয়নগরে বেনিয়ান আর তাঁর স্ত্রী। লাডলীও স্বপ্ন দেখে। অবসাদগ্রস্তা স্ত্রীকে কোলে

নিয়ে আদর করে, স্তনদ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণ মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। দক্ষিণ উরু কদলীর মতো সুপুষ্ট, তারই উপর হাত রাখে।

কি হবে বল তো? শুধায় লাডলী।

ব্রীড়াভরে বুকে মুখ লুকিয়ে বলে থাকমণি, আমি কি জানি।

আমি জানি।

কি করে জানলে?

স্তনের বোঁটা কালো হয়ে গেছে, ডান উরু মর্তমান কলার মতো, মুখখানি পদ্মের মতো! আচ্ছা, তুমি কি স্বপ্ন দেখ বল তো?

থাকমণি বলে—জান, সেদিন স্বপন দেখনু—বসে আছি, অমনি কোলে এসে টুপ করে কি পড়ল। ওমা—হাতে নিয়ে দেখি—এযে টুকটুকে লাল আঁব।

তাই নাকি! স্ত্রীকে সোহাগে জড়িয়ে ধরে লাডলী—তাহলে ছেলেই হবে।

ছেলে!—মেয়ে নয় তো!

না, না, ছেলে!

হঠাৎ উঁহু, উঁহু করে ওঠে থাকমণি।

লাগল নাকি!

নাগো না, পায়ের আঙুল সিটিয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিতে গেল লাডলী।

নাগো, পায়ে হাত দিতে দেব না!

লাডলী কি শোনে, পায়ের সিটোনো আঙুল টেনে-টুনে দিলে। রক্ত চলাচল হতে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে থাকমণি। ভ্রূণ বাড়ছে গর্ভের অন্ধকারে, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত থেকে অঙ্কুর উদ্গত, হস্তপদ, মস্তক, লোম সব পেয়েছে—এবার নাভি। গর্ভের দেয়ালে আছাড় খাচ্ছে, নড়ে নড়ে উঠছে। মহাসমারোহে মাসের পর মাস চলছে সাধ-ভক্ষণ। একদিন পিত্রালয়ে যাবার ডাক এল।

কন্যার প্রথম সন্তান বাপের বাড়িতেই জন্মায়, এই রীতি। এই কুলের আচার।

এর কারণ ভবদেব ভট্ট বলেন নি, শুধু বিধিই দিয়েছেন।

এ বুঝি স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে, সন্তানের দিকে চেয়ে অনুশাসন। পূর্ণগর্ভার

সঙ্গে সহবাস বিধেয় নয়, কিন্তু কামুক পুরুষ কি শুনবে? রমণী যখন ঋতুমতী হয়ে চণ্ডালিনী, ব্রহ্মঘাতিনী ও রজকীর মতো অপবিত্রা হয়ে ওঠে, তখনো পুরুষ কামমোহিত হয়ে অনাচার করে, বেদবিধি লঙ্ঘন করে। তাই বুঝি এই বিধান।

লাডলীকেও বিদায় দিতে হল থাকমণিকে।

থাকমণিও যেতে চায়, চায় না। বলে,

আর যদি না আসি। আপনি আবার বিয়ে করবেন।

ছিঃ ওকথা কয় না!

কি জানি কি হয়!

কি আবার হবে, সোনার চাঁদ ছেলে কোলে করে ফিরবে।

থাকমণি আর কিছু বলে না, লাডলীর গলা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথাটি টেনে আনে। নারীর পুত্র কামনা স্বামীর মাথা চেপে ধরে মেটায়।

শাশুড়ী যাবার সময় বলেন, সাবধানে থাকবে বউ। উবু হয়ে শোবে না, ইতি-উতি ছুটবে না। কিস্সা শুনবে না, রামায়ণ-মহাভারত শুনবে। গরম দুধ খাবে না, খাবে ওল, খাবে পরমান্ন। আর কি বলব, বেয়ান-ঠাকরুণ, সাত ছেলে, পাঁচ মেয়ের মা, তিনি তো সবই জানেন।

থাকমণি চলে গেল পানসীতে চড়ে, সঙ্গে গোমস্তা আর দুজন পাইক। আবার সন্তান হলে আসবে সন্তান কোলে করে। সে অনেক দিন—অনেক দেরি।

লাডলী মনমরা হয়ে ঘরে বসে রইল ক'দিন। থাকমণির জন্যে মন কেমন করল। সাধ হল, জয়নগরে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু জয়নগর দিল্লী না হলেও দূর অস্ত্। দিল্লী তবু যাওয়া চলে, কিন্তু জয়নগর তো নয়। যায় যদি তো ছিঃ ছিঃ উঠবে, কেলেঙ্কারির ধুম পড়বে। তাই জয়নগর থাক, সে কাব্য নিয়ে বসল। রোজনামচার পাতা উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময়।

শুধু থাকমণির কথা। থাক বেখাপ্পা নাম, বকুলাবলিকা, রত্নাবলী, মালবিকা নয়, তাই তার নাম রাখলে মণি। মণিমালিকা! মণিমালিকে বলে ডাকা যায়। আবার বলা যায় নীলকান্তমণি; আবার পিয়ারী মুনি, মুনিয়া, মুন্নি বলতেও বাধে না। সেই নীলকান্তমণির ধ্যানে সে মগ্ন হল।

...র ধ্যান কি অটুট থাকে? কোন্ যুগেই বা ছিল?

তাই দুদিন পরে ধ্যান ভেঙে গেল। গুহা থেকে বেরিয়ে এল লাডলী।

ইয়ার-বকসীরা বললে, কি গো, হঠাৎ যে ঈদের চান্দের উদয় হল?

বউ নেই, কি করবে?

বউ থেকেই বা কি করত, ও বৌ তো এখন অচল।

দুই বৌ, তিন বৌ—অনেকেরই। তাদের একজন বললে,

তা বাওয়া! আর-একটা বে-থা কর না! ওটা তো অচল, আর-একটা জুটিয়ে নাও!

না রে, প্যারীখুড়ো সেদিকে কড়া মানুষ, অমনি ত্যাজ্য পুত্র করবেন।

কেন—কুলীনের পুত কি একেশ্বর হয়ে থাকবে নাকি?

বাবা আমরা ওতে নেই। একশো বিয়ে করলেও একশো একটায় মন পড়ে থাকে—কুলীন ব্রাহ্মণ এক চট্ট মন্তব্য করলে।

আমরাই কি আছি নাকি—আমরাও বেগম বাড়াতে পারলেই খুশী; আমরাও হরেক কিসিমের আউরতে রঙমহাল বাড়াতে পারলে ছাড়ি না। এক দস্তজা বললে।

তা প্যারীখুড়োর কিন্তুক এ ভারি দোষ!

দোষঘাট কার, তা নিয়ে ভাবতে বসে কি হবে—এস ফুর্তি করি!

আর একজন বলে উঠল, মাইফেল চালাও!

লাডলী তাতেই রাজী।

একদিন গেল চড়িভাতি করতে। পুরন্দর খাঁর গড় ভেঙে গেছে। জাঙ্গাল ভেঙে গেছে, পুরন্দরগড় এখন পাট্টা-পরচার শুধু নিশানা। সেখানে এখন মানুষ থাকে না, থাকে বাঘ, থাকে সাপ।

পানসী ভাসিয়ে গিয়েছিল, হাঁড়িকুড়ি, ছিল সঙ্গে, ছিল নফর। মাইফেলের মালও ছিল মজুদ। ছিল না শুধু জ্যান্ত মাল। সেটাও যোগাড় হতে পারত। কিন্তু লাডলীই বাধা দিয়েছিল। সবাই ঠাট্টা করতে কসুর করে নি, বলেছিল—পুরুষ সতী! পঞ্চাশবার মাছভাত খেয়ে বেড়াল বসেছেন বোষ্টম হয়ে! কিন্তু তবু লাডলীর গোঁ-ই থেকেছিল।

কানা নদীতে নৌকা রেখে সবাই পাড়ে উঠেছিল। গোপীনাথ বসুর কীর্তি পুরন্দরগড়। স্বাধীন আদিবাসী রাজাকে দমন করে গড় বসিয়েছিলেন

সুলতানের প্রিয়পাত্র। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজ বসিয়ে ছিলেন, বিধান দিয়েছিলেন। আজ সে গড় ইটের স্তূপ, পোড়া মাটির স্তূপ—মাটির ঢিবি। কোথাও কোথাও চলছে চাষবাস, কোথাও বা হাড়ি-ডোমদের পাড়া। সেখানে বড় বড় বটগাছের তলায় ধর্মরাজের থান, সিঁদুর-মাখা পাথর পড়ে আছে। কুঁকড়োর মাথা আর ধড় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কোথাও বা হাঁড়িয়ার শূন্য পাত্র আর কলস পড়ে আছে। আর এখানে-ওখানে চাল ছড়ানো। ধর্মরাজের পূজার এই বিধি, তাঁর মূর্তি নেই, তিনি 'নাহিক আচার রূপগুণ আর, কে জানে তাঁহার মায়া!'

দেখতে-দেখতে তারা চলল। লাডলী মুখসুদাবাদে, কাশীমবাজারে মানুষ। এসব দেখে নি, কানেই শুনেছে। রূপরাম, খনরামের পাঁচালীর পুথি পড়েছে, কিন্তু এসব জানে না। সে দেখতে-দেখতে এল।

সাঙাৎরা বললে, কি দেখব, ওকি নোতুন জিনিস! ওসব তো দেখেছি। দেখে দেখে চোখও পচে গেছে। তবে হাড়ির ছুঁড়ীগুলো ভাল। যখন ধর্মঠাকুরের পুজো হয়, ওরা হাঁড়িয়া পচাই খেয়ে যখন বেসামাল হয়ে নাচে, তখন জব্বর লাগে! আহা, যেন সাক্ষাৎ রক্ষেকালী!

আবার কেউ বা প্রতিবাদ করলে, না, না, সবাই কালী হবে কেন? কারো বা হরতেল গোলা রং, কেউ বা যেন আগুনের ফুল্কি।

তা অমন একটা পেলে মাইফেল জমত! বাগান হত বটে!

কে যাবে বাবা জোটাতে! যবনীকে আগলায় মামদোভূত, আর ওদের আগলায় ধর্মরাজের চেলা-চামুণ্ডা। এখনি সব তেড়ে আসবে।

কাজ কি ভাই ও-সবে? লাডলী বললে।

গড়ের একটা ভাঙা বাড়ির শেয়াকুল কাঁটা আর বন-বাদাড় কেটে সেখানে চড়িভাতির আসর বসিয়ে দিলে। নিরামিষ আসর বলে আর খুঁতখুঁতানি রইল না।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরছিল পানসীতে ওঠার পর-পরেই। এবার চেপে এল, হাওয়া দিল জোরে। আর সে-হাওয়া আর বৃষ্টি থামলে না। তারই মধ্যে ইট পেতে উনুন তৈরি হল, চাপানো হল খিচুড়ী মাটির হাঁড়িতে, তপসে আর ইলিশ ভাজা হল, আবার পচাইয়ের ভাঁড় খোলা হল। জমে উঠল মেয়েমানুষহীন নিরামিষ মাইফেল।

খাওয়া-দাওয়া সারতে একটু বা দেরিই হয়েছিল। আকাশের দিকে কেউ চেয়েও দেখে নি, দেখার অবস্থাও ছিল না। তাই বঙ্গোপসাগর থেকে ঘূর্ণিহাওয়া যখন ছুটে এল, কাকের ডিম ভেঙে যেমন কালচে কুসুম ছড়িয়ে পড়ে, আকাশে তেমনি গড়িয়ে পড়ল ঘন মেঘ; তখন সবাই টের পেলে।

ভরপেট্টাই নেশা, রঙীনতম হয়ে উঠেছে। তাই ঝড় বৃষ্টি, ঘূর্ণি হাওয়ার নাচন-কোদন মাথায় নিয়েই তারা বেরিয়ে পড়ল।

আঁধারের ঝুরি তখন নেমেছে দিকে দিকে, তারই মাঝে দিশাহারা হয়ে নেশার ঘোরে ছুটে চলল লাডলীরা।

তার পরে কিস্সায় যেমন হয়, যেমন হয় রূপকথায়। যূথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে মন্ত্রীপুত্র কোটালের পুত্র, যূথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে রাজপুত্র। তেমনি পড়ল লাডলী। একা-একা জলঝড় মাথায় করে আঁধারে ছুটল। নেশা তখন ছুটে গেছে। ধারা জলে কি আসবের নেশাই থাকে—তা এতো পচাই। তারপরে সেই ধর্মরাজের থান এসে পড়ল। বিদ্যুৎ ঝিলিকে দেখলে সিন্দুরমাখা পাথর। এই সেই দেবাদিদেব নিরঞ্জন। লাডলী সেইখানেই, সেই অশথ তলায় বসে পড়ল। মলমলের উড়ুনি ভিজে ন্যাতা, পিন্ধনের ধুতিও তাই।

সে গাছের তলায় বসে নিঙড়ে-নিঙড়ে নিলে কাপড়, উড়ুনি, উড়ুনি দিয়ে মাথার জল, গায়ের জল মুছলে। তার ভাল লাগছে, ঝড়ের রূপ দেখে মন যেন উতলা ময়ূর। এ যেন এক মহাঝড়, অভিসারক্ষণের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে, হাতছানি দিচ্ছে। এ ঝড়ে জাহাজ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। নিয়েও ছিল। গঙ্গা থেকে উড়িয়ে এনে ফেলেছিল বহু-বহু দূরে এই মণ্ডলঘাট পরগণায়। মার কাছে শুনেছে সে গল্প। ঠিক তেমনি ঝড়, তেমনি ঘূর্ণিহাওয়া। কিন্তু মনেও যে ঘূর্ণি হাওয়ার উতরোল, কলরোল। জয়নগরে নিয়ে যায় কি সে হাওয়া? হাওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কি যেতে পারে জিয়াগঞ্জে সেই কসবীর ঘরে! পারে না। কবিমন বলে, পারে। বাস্তব বলে, পারে না, পারি না আমি। লাডলী পারে না। বৃষ্টি, তবু বৃষ্টির নেশা তাকে নামাল পথে। অশথের আশ্রয় ছেড়ে সে ছুটে চলল। অভিসারক্ষণ উপস্থিত, চাই নায়িকা, চাই নারী—যদি চণ্ডালিনীও হয় আপত্তি কি!

চণ্ডালিনী তো প্রশস্ত, ভৈরবীচক্রে তাকে চাই, চাই তপসিদ্ধিতে। চাই

উত্তরসাধিকা রূপে। সেই যে কুলপালক বল্লাল, তিনিও তো তাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই যে—

একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যাজিয়া বিপিন রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক প্রাতঃকালে ডোমকন্যা আসি॥
অতি শুভ্র দধি বাঁশের ঝাঁপিতে লইলা।
করিয়া পরম যত্ন রাজভোগ দিলা॥
তাহাকে দেখিল রাজা অতি রূপবতী।
পদ্মিনী লক্ষণ রাজা দেখিলা যুবতী॥

রাজা পদ্মিনীকে পেয়েছিল, সে না হয় হস্তিনীই পাবে। ছুটে চলল লাডলী।

আশ্চর্য মিল কিস্‌সার! হাড়ির বাড়িতে কিস্‌সার চেয়েও আজব মেয়ের দেখা পেল। পদ্মিনী লক্ষণ আছে, নামও পদী। পদ্মাই বটে, তবে কৃষ্ণ পদ্ম। না কৃষ্ণ নয়, বুঝি ঘন নীল, তাই আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণ দেখায়।

বল্লালের পদ্মিনী হাড়ির মেয়ে ছিল না, ছিল বল্লভ বেনের মেয়ে। আর এ-মেয়ে হাড়ি কিনা সে সন্দেহও জেগেছিল মনে। হয়তো কোন রাজকন্যা শাপভ্রষ্টা হয়ে এসেছে। প্রথম দর্শনেই লাডলীর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হয়েছিল, থামতে চায় নি স্পন্দন। দক্ষিণ চোখের পল্লবে স্ফূরণ দেখা দিয়েছিল। লাডলী নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল।

চাঁড়ালনী আর তার মেয়েও তাকিয়েছিল অবাক হয়ে। তল্‌তা বাঁশের চটি চেঁছে দিচ্ছিল মেয়ে দা দিয়ে দিয়ে, আর মা তাই সিঁদুরে রঙে রাঙিয়ে নিচ্ছিল। ভদ্দরলোক জল ঝড়ে দাওয়ায় এসে উঠল, কাজ ভণ্ডুল হয়ে গেল।

ওমা, এযে ভিজা কাগের পারা গো!

কোথায় বা বসতে দেয়, কিসে বা বসতে দেয়!

নোতুন চ্যাটাই আন লো, মেয়েকে বলেছিল চাঁড়ালনী। তারপরে লাডলীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কুথে এলে আজ্ঞা ?

আজ্ঞা নই, নগণ্যি মনুষ্য, হেসে বলেছিল লাডলী, জলঝড়ে ঠাঁই নিতে এলাম।

তা বেশ, হেসে বলেছিল চাঁড়ালনী। দুটি চোখ মিটিমিটি পিদিমের আলোয় চকচক করে উঠেছিল, বেশ, তা বেশ !

নক্সা-আঁকা চাঁটাই নিযে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মেয়ে। এতক্ষণ লাডলী ভাল করে দেখে নি এবার দেখল। কালো নয়। পিদিমের আলোয় কি থাকে নীল গুঁড়ো ? না, নীল পরাগ ছড়ায় ঐ প্রদীপ ? আলোর পরাগ মেখে ঘন নীল হয়ে উঠেছিল মেয়ে। লজ্জা করে নি, আড় বাঁশীর কোমল-গান্ধারে বলেছিল—

বসবে নি !

লাডলী বসেছিল চাটাইয়ের আসনে।

তার পরেই চমকে উঠেছিল মেয়ে, ওমা-অক্ত গো, অক্ত ! তাজা কুঁকড়ো কাটা, পাঁ্যাঠা-কাটা অক্ত !

লাডলীর চমকে উঠেছিল। তাকিয়ে দেখেছিল। সত্যিই পায়ে রক্ত। পায়ের গোড়ালিতে রক্ত।

চাডালনী অমনি ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ফেলেছিল নিজের কাপড়, তারপরে দুদিকে আঁটো করে বেঁধে দিয়েছিল তাগা। মেয়েকে বলেছিল, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস লা—যা বিষ-পাথর লিয়ে আয় !

ঘরের ভিতর থেকে বিষ-পাথর এনেছিল মেয়ে, তারপরে বিষ-পাথর কাটা জায়গায় লাগিয়ে ছিল আর মন্তর পড়েছিল চাঁড়ালনী—

হর গোরী মহাদেব শেষ।
পায়ে পুঁছি লাঞি বিষ ॥
তিন চাপড় মার ॥
শঙ্কর বেটা কাঞী
থুত্তুড়িতে বিষ লাঞী ॥

বিষ-পাথরে বিষ উঠল না। চাঁড়ালনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। বলে উঠল--

বিষ লাই, বিষ লাই।

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়ে—ওমা মোঁদের আজাকে ঢোঁড়ায় কেমড়েছে গো!

চাঁড়ালনীও হেসে উঠেছিল, কুঞ্চিত রেখাময় মুখ আরও রেখল হয়ে উঠেছিল।

তারপরে খাবার পালা।

চাঁড়ালনী বলেছিল, কি বা খেতে দিই আজা নোককে!

কিছু দরকার নেই, পেট ভরতি।

লাডলী হেসে উত্তর দিয়েছিল।

তবু মুড়ি ছিল ঘরে, ছিল চাঁপা কলা, তাই দিয়েছিল।

লাডলী ছোঁয় নি।

জাত যাবেক লেই, খেয়ে ফেল আজা! চাঁড়ালনী উলকি পরা হাত নেড়ে বলেছিল।

জাতের ভয় করিনে! জাতের তোয়াক্কা রাখি নে! লাডলী মৃদু হেসে বলেছিল।

লাডলীর রোজনামচার পাতায় লেখা আছে সে-রাতের কথা।

সিরাজের গুল খুঁজতে গিয়েছিলেম, পেলাম না। কিন্তু আপসোস তো নেই। পেয়েছি নীল পদ্ম। না, না, নীল পদ্ম বুঝি নয়, এ তো অপরাজিতা। নীল পাপড়ি থাকে বোজা, তারপরে মেলে দেয়। সেই অপরাজিতাকে দেখলাম, বজ্র হাঁকল আকাশে, বিদ্যুৎ চমকে উঠল, মনে হল এ আমার সর্বনাশ। এ আমার বেহেস্ত, এ আমার দোজখ। এখন কি করি!

সবাই যা করে তাই করলে লাডলী।

গোপনে সালুতি ভাসিয়ে আসা-যাওয়া শুরু হল। ভাঙা গড়ে চলল প্রেম। অপরাজিতা নাম রেখেছে লাডলী। কথা বেশি বলে না, হাসে, ভাব-মদির চোখে তাকায়। চোখের ভাষায় উত্তর পায়। তাকে জড়িয়ে ধরে সাকীর স্বপ্ন দেখে। রুদাবা কি তহ্‌মিনার স্বপ্ন দেখে। বলে, তুই আমার পদ্ম, তুই আমার অপরাজিতা। চাঁড়ালের মেয়ে হাসে আর হাসে। বলে, তুই আমাকে বশ করেছিস। অমনি চাঁড়ালের মেয়ে ফুঁ দেয় মুখে চোখে, মন্তর পড়ে, বলে, ভিলিক ভেল ভেলোটি ভেলামুখা।

লাগ ভেলকি চতুর্মুখী।
লাগবি তো ছাড়বনি, ছাড়বিনে, তো পাসববনি
লাগ-লাগ-লাগ ভেলকি লাগ।

লাডলী হেসে বলে, তুই আমাকে তুক করেছিস।

ষাট-ষাট। তুক কেনে করবে, হামি পিরিত করেছি।

পিরিতই তো তুক্ রে, আসল তুক।

অপরাজিতা হাসে, গড়িয়ে পড়ে গায়ে।

মা দেখে খুশী হয়, জামাই লোক ভাল। রূপার পৈছে দিয়েছে। আমির লোক! আবার হাড়িয়া চাইলেই খাওয়ায়, আর দুঃখ কি!

কিন্তু টিকবে কি এ-পিরীতি?

না টেকে দুঃখু কি, এক যাবে, আর এক আসবে।

চাঁড়ালনী কি ভয় পায়?

তবে জামাইটা ভাল। যেমন রোপ, তেমনি রীতি। ভাল, ভাল, ভাল।

তাই বশীকরণের কথা ভাবে না, দইপড়া, জলপড়ার কথা ভাবে না। মা ভাবে না, মেয়েও ভাবে না। মেয়ে তো বশীকরণ করেছে তার রূপে, তার চোখের দিঠিতে!

প্রেমে বাধা আছে, কণ্টক সেখানে পদে-পদে। তাই বাধা পড়ল। জয়নগরের মেয়ে সন্তান কোলে করে গণেশ-জননী হয়ে ফিরলেন। পুত্র-সন্তানই হয়েছে। লাডলীর চোখ পেয়েছে তো, মায়ের সারা অঙ্গের খুঁত পেয়েছে। মা একটু বিষণ্ণ হলেন, তবু বংশের পিদিম, শিবরাত্তিরের সলতেকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ঘরে তুললেন। বংশরক্ষা হল, তার চেয়েও বড় কথা, জমিজমা রক্ষে হল।

বাপ প্যারীমোহন নতুন গুরু পেয়েছেন। কুলগুরু নন, ক্ষীরগ্রামের সর্বসিদ্ধ তান্ত্রিক। এ সেই ক্ষীরগ্রাম, যেখানে পদে পদে আছে পঞ্চমুণ্ডী আসন—যে ক্ষীরগ্রাম সিদ্ধপীঠ, যে ক্ষীরগ্রাম গুপ্ত বারাণসী। সেই তান্ত্রিকের স্থান ক্ষীরগ্রাম, গুরু সেখানকারই অধিবাসী। পীত্বা, পীত্বা, পুনঃপিত্বা—এই তাঁর

খুঁয়ো। সেই গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন প্যারীমোহন। তিনি রক্তবর্ণ চেলী পরে রক্তজবা শিখায় বেঁধে তন্ত্রাচারে মগ্ন। ঢাক-ঢোলের শব্দ শুনে তাঁর মুহূর্তের জন্ত চেতনা হল। তিনি দূর বাগানবাড়ি থেকে পালকি করে ছুটে এলেন। পালকি থেকে নেমে খড়ম পায়ে খট্‌খট্ করতে-করতে এসে হাজির হলেন, আকব্বরী মোহর দিয়ে নবজাতকের মুখ দেখলেন। বংশ রক্ষা হল, মোকাম মুখসুদাবাদে কানুনগোগিরি করে যে পুঁজি করেছেন বাপ-পিতামহ, তার উপরে ভাগ্‌নে-বাঁদর এসে গদিয়ান হয়ে বসতে আর পারবে না, এই তাঁর পরম স্বস্তি। তিনি মুখ দেখে ফিরে গেলেন, গিয়ে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যানে আবার মগ্ন হলেন।

লাডলীর ঔরসজাত নবকুমার, সুতরাং তার তো আনন্দ হবেই। সেও কোলে তুলে নিলে, জাতকর্ম করলে। কাঁসার পাত্রে মধু ও ঘৃত মিশিয়ে 'ঐঁ' বীজমন্ত্র একশো বার জপ করে আঙুলে করে পান করালে। পুত্রের জন্যই পুত্রবতীকে বুঝি ভাল লাগল। থাকমণির কালো রূপের ঢলে ডুবুডুবু হল লাডলী। আর থাকমণি এখন গরবিনী, আবার একপোয়াতী রসবতীও। সে লাডলীর জন্যে দীনের মতো প্রতীক্ষা করে না, হ্যাংলামি তার নেই। উপেক্ষাও সে করতে জানে। আবার রসিকাও হয়ে ওঠে।

তাই আর সালতি ভাসিয়ে পুরন্দরগড়ে লাডলীর যাওয়া হয় না, অপরাজিতার নীল রং বুঝি মুছে গেছে। এখন কালো, শুধু কালো।

অপরাজিতা কি করে? সে তো লিপি লিখতে জানে না, পদ্মপাতায় যে বিরহজ্বালা শীতল হয়, তাও জানে না। আবার কেতাব খুলে বসেও মনে শান্তি পাবার তার উপায় নেই। কি করে নীল অপরাজিতা—কি করে? ডালা-চালুনি বোনে, বেতের ফাঁস আঁটতে গিয়ে বুঝি গলায় ফাঁস দিতে চায়, আবার ধর্মরাজের পায়ে বুঝি মাথা খোঁড়ে? বলে—ঠাকুর ও শুন্যি ঠাকুর লিয়ে আয়—তাকে লিয়ে আয়! কি করে অপরাজিতা?

কি করে লাডলী?

সত্যিই কি নীল রঙ মুছে গেছে? না, অপরাজিতার নীল রং এত তাড়াতাড়ি মোছে না। এত তাড়াতাড়ি নীল পদ্মের নীলাভ বিভা মিলিয়ে যায় না। তাই মনে পড়ে। ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক।

সেদিন গড়ে বেড়াচ্ছিল তারা। নীল অপরাজিতার তোড়া বেঁধে নিয়ে

এসেছিল লাডলী। সেই ফুল পড়ে গিয়েছিল কানা নদীর জলে। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুঁজেছিল, পায় নি। লাডলীকে চাঁড়ালের মেয়ে হেসে বলেছিল—কি হবে আজা তোকে আমি গড় থেকে ফুল আন্যে দেব। লাডলী ফিরে এসেছিল ভারী মনে। তারপরে তার যাওয়া হয় নি।

লাডলীর মনে পড়ে, যাওয়া হয় না। থাকমণি, নবজাত পুত্র, জমিদারি নিয়েই সে ব্যস্ত। মথুরাপুরের সবকিছুই তাকে দেখতে হয়। প্যারীমোহন তন্ত্রে ডুবুডুবু, সব কাজ ভেসে গেছে। তন্ত্রই সার, পরাশক্তিই এখন তাঁর ধ্যান। দূর বাগানবাড়িতে বসে ধর্মকর্ম করেন। মরাহাজা তালুক-মুলুক, আবার তন্ত্রের ধারা দিয়ে তাকে উর্বরা করে তুলতে চান। আবার হয়তো অভিচার বামাচারেও তাঁর সখ।

এরই মধ্যে লাডলীকে বিষয়কর্মে আবার যেতে হল বর্ধমানের রাজদরবারে। তমসুখ আর দলিলের চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল মন। ভার নামিয়ে ফিরল। মনে পরম আনন্দ।

সেদিন নব অঞ্জনের মত মেঘ করে এসেছিল আকাশে। নীলকান্তমণির বিচ্ছুরিত আলোর মতো বিদ্যুতের জিহ্বা ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছিল। লাডলীর সেদিন মনে পড়ল নীল অপরাজিতার কথা। রোজই মনে পড়ত, আজ আরও বেশি করে পড়ল। এরই মধ্যে অপরাজিতার মার কাছে সে খবর পাঠাতে পারে নি। লোকলজ্জা, জানাজানি হবে এই ভয়ে। সে নিজে আজ কাছারিবাড়ির খেরো-বাঁধানো খাতার স্তূপ ঠেলে সরিয়ে রাখলে, থাকমণির ছোরানির গোছার আহ্বান উপেক্ষা করলে, নব জাতকের কলহাস্যও তাকে টেনে আনতে পারলে না অন্দরে। অন্দরে না গিয়ে সে বাইরে ছুটল। ঘর নয় আজ, আজ বাহির। গিয়ে সালতিতে উঠে পড়ল।

কানা নদী আজ স্ফীত, দামোদর থেকেই বয়ে এসেছে সে-জলধারা, আর দামোদর তা পেয়েছে সাগর থেকে।

সাল্‌তি ভেসে ভেসে চলল; দুলে-দুলে উঠল ঢেউয়ে; আকাশে মেঘ সাজল। সেদিকে চোখ নেই তার, সে তখন নীল অপরাজিতার ধ্যানে মগ্ন। তারই নাম জপ করছে।

জপ করতে-করতেই পাড়ে উঠল, আর সেই নামই তাকে পিচ্ছিল পথ

বেয়ে টেনে নিয়ে গেল সেই চাঁড়ালপাড়ায়, চাঁড়ালনীর বাড়িতে। বাড়ি তো নয়, একচালা ঘর। চালা উড়ে গেছে, এখানে-ওখানে পড়ে আছে ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি। পাড়ার একটেরে বাড়ি। কাউকে পেলে না যে, জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করতে সাহসও হল না। সে ফিরে এল। ধর্মরাজের থান সেই অশথতলায় খানিকক্ষণ দাঁড়ালে। পাথরখানা তেমনি সিঁদুরলেপা পড়ে আছে, তেমনি মাটির ঢিবি দিয়ে এক কচ্ছপ তৈরি করে রেখেছে। ধর্ম নিরঞ্জন, ধর্ম শূন্যরূপ-আবার তিনিই কূর্ম। ধর্মরাজ তার ঠাকুর নয়, ডোম-মহত্তরের ঠাকুর, তবু লাডলী অপরাজিতার দর্শন কামনায় তাঁর কাছে মানত করলে। একশো আটটা কুমড়ো দিয়ে পুজো দেবে, শুয়োর বলি দেবে, দুধ দিয়ে নাইয়ে দেবে ধর্মরাজের পাথর। শুধু ঠাকুর—

নীল ফুল, নীল ফুল—নীল ফুল দাও।
মোর অপরাজিতা তুমি আমায় ফিরে দাও!

ধর্মঠাকুর প্রার্থনা শুনলেন কিনা, কে জানে।

লাডলী ফিরে এল ঘরে। আবার সেই খেরো-বাঁধানো খাতা, দলিল দস্তাবেজ, আমলা-গোমস্তা নিয়ে ব্যস্ততা। এক পোয়াতীর প্রেম, নবকুমারের প্রতি বাৎসল্য। হঠাৎ এরই মধ্যে উড়ো খবর নিয়ে এল এক পাইক। কালু তার নাম। জাতে ডোম। তাকে চর লাগিয়েছিল লাডলী। সে খবর দিলে, মথুরাপুরের কাছে সাত নং লাটে কর্তাদের যে বাগানবাড়ি আছে, সেখানে দেখা গেছে পদীর মাকে। সে দেখে নি, দেখেছে তার শ্বশুরার পো।

লাডলী তাকে বকশিশ দিয়ে বিদায় দিয়েছিল। সে অন্দরে এসে বাপ প্যারীমোহনের খোঁজ করেছিল।

তিনি নেই। কিছুদিন থেকেই তিনি বাড়ি থাকেন না রাতে। বাগান-বাড়িতে কাটান। এখন সাতের মৌজার রথতলার বাগানবাড়িতে আছেন। সঙ্গে আছেন ক্ষীরগ্রামের সেই গুরু।

হাতের কাছে পাঁজিখানা ছিল। এ পাঁজি তুলোট কাগজে তৈরি করেছেন বালীর গ্রহাচার্যগণ। সেই পাঁজি সে দেখলে। আজ শনিবার, অমাবস্যা। অমনি মনে সন্দেহ জাগল। কেন সাতের মৌজায় গেছেন প্যারীমোহন? কেন গেছে নীল অপরাজিতার মা? দুয়ে দুয়ে ঠিক দিয়ে চার করে নিলে

মন। তাহলে নীল অপরাজিতাও আছে সেখানে। ধক্ করে উঠল বুকখানা। তাই কি···তাই কি?

আজ হয়তো বসবে বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনার চক্র, আর সেই চক্রে আহুতি পড়বে তার নীল অপরাজিতা। অপরাজিতার কথা মনে পড়তেই চমকে উঠল লাডলী।

তন্ত্রের কিছুই সে জানে না। কিন্তু বহু আদি যুগে থেকেই রাঢ়দেশ তন্ত্রমন্ত্রের দেশ। আদিবাসী জাতি হাড়ী, ডোম, বাগদী-কেওরা-কেয়ট এ মন্ত্রের সিদ্ধাই। শূন্যদেবতা ধর্মরাজ এসে তাদের সঙ্গে মিশেছে। শিব ছিলেন, কালী ছিলেন, তারপরে বুদ্ধ কূর্ম-অবতার ধর্মরাজরূপে এসে মিলেছেন তাঁদের সঙ্গে। বৌদ্ধযুগের অবনতি তাঁকে তন্ত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সে তন্ত্র জানে না, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য তাকে শিখিয়েছে কতগুলি শব্দ; কতগুলি মুদ্রা—কুলকুণ্ডলিনীর চক্র, ভৈরবীচক্র এমনি কতগুলি নাম। আর নবব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারে সে মানুষ বলেই শক্তির উপাসক হয়েও এর প্রতি তাঁর একটা অপরিসীম ঘৃণাই দেখা গেছে। প্যারীমোহন যেদিন গুরু জোটালেন, সেদিনও ঘৃণাই দেখা দিয়েছিল। মার মনে দেখা দিয়েছিল ভয়। মা লাডলীকে ডেকে বলেছিলেন,

লার্লী, বাবা, এবার বংশ নিব্বংশ হবেক। তোর বাপ তন্তর-মন্তর করছে! কোথা কোন চুক্ হবে, আর আমার বংশ যাবে!

লাডলী বলেছিল, মা, তুমি বারণ কর।

বারণ শুনবে নাকি! আমার ভয় করে।

সত্যিই ভয় করে। সিন্দূরের ফোঁটা কপালে। বাবরীতে টকটকে রক্তজবা, পরনে পট্টবস্ত্র, চোখদুটো ঘোর রক্তবর্ণ—এমন রূপকে ভয় কে না করে!

ভয় কি মা! লাডলী বলেছিল, কলিযুগে বেদবিধি চলে না, বেদের এখন আর দখল নেই, তাই তন্ত্র এসেছে।

মা বলেছিলেন, বলিস নি! ডেরাটোনের মেয়ে আমি, তন্ত্র জানিনে! আমার গোষ্ঠীতে অমন চার-চারটে তান্ত্রিক ছিলেন। একজন তো শবাসন করতে গিয়ে এমন থাবড়া খেলেন যে আর উঠতে হল না। রক্তবমি করে মারা গেলেন। আর উনি তো শুদ্ধপুরুষ নন। জীবনে বহু অনাচার করেছেন, এখন বীরাচারী হবেন? এ তো অতো সোজা নয়।

লাডলী কিছু বলতে পারে নি। কিন্তু বাপ প্যারীমোহনকে বাধা দেওয়াও হয় নি। কি করে বাধা দেবে? পিতা শক্তির জন্য, ঐশ্বর্যের জন্য সাধনা করছেন, পরম মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করছেন—তাঁকে কে বাধা দেবে? বাধা দিলেই কি তিনি শুনবেন?

কিন্তু আজ তো বাধা দিতেই হবে। অপরাজিতা ছিল গুল্মে, উন্মেষ হয়েছে সবে তার। আপন ভারে সে অবনমিত, সে মেলে দিয়েছে তার জন্ম দ্বার, রক্তকরবী তাকে আমন্ত্রণ করছে। সেই আমন্ত্রণে বাধা দিতে হবে। বাধা দিতেই হবে এই বামাচারী অভিচারী উপাসনায়। একদিন বল্লাল বীরভাবে পূজা করেছিলেন, উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—

সেবন্তে করিবৈরিনং কিমারিভি ভীর্তি ভবেৎ সেবিন।

তোমার যে সেবক—তার কি ভয় বৈরীর!

বৈরীর ভয় করে নি সেদিন বাঙালী, মগধ জয় করেছে, বারাণসীপট্টে উড়িয়েছে তার বিজয়কেতন। দেবীর চেলা আগা ডোম, বাগা ডোম সেজেছে, ঘোড়ায় সেজেছে ডোম সৈন্য। ঢালী সেজেছে হাজারে হাজারে। কলিঙ্গের বিজয়ী শিলালেখ উৎকীর্ণ করেছে তারাই, আবার কলিঙ্গ-অঙ্গনাদের সঙ্গে রাজার নর্মলীলার কথাও বলেছে। সেদিন গত। তন্ত্র এখন বীরাচার নয়, দিব্যভাব তাতে নেই, এখন সে বামাচার। লতাসাধনাই এখন তার বড় কথা। তাই তার মন্ত্রের এখন বিকৃত অর্থ। পরাশক্তিকে মা বলে, জায়া বলে আরাধনা করা হয় না, তাকে নর্মসহচরী বলেই সম্ভোগ করা হয়। অপরাজিতা তো সেই মহাসম্ভোগেরই অর্ঘ্য হবে।

চাবির গোছার ঝংকার উঠল, নবকুমারের কলহাস্য শোনা গেল, কিন্তু সে শুনল না।

সে বেরিয়ে এল। সঙ্গে তার কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু আছে মোহর আর সিক্কা ভরা থলি। আর নকসীদার রেশমী রুমালে বাঁধা রোজনামচায় ক'খানি পুথি, আর তীক্ষ্ণধার একখানা ভোজালী। এরা তার সঙ্গের সঙ্গী, অঙ্গের সঙ্গী।

লাডলী ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। তার ঘোড়া হরিহরছত্রের মেলায় কেনা। সাধ করে নাম রেখেছে ঝুলঝুল। ধুলো উড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে চলল ঝুলঝুল।
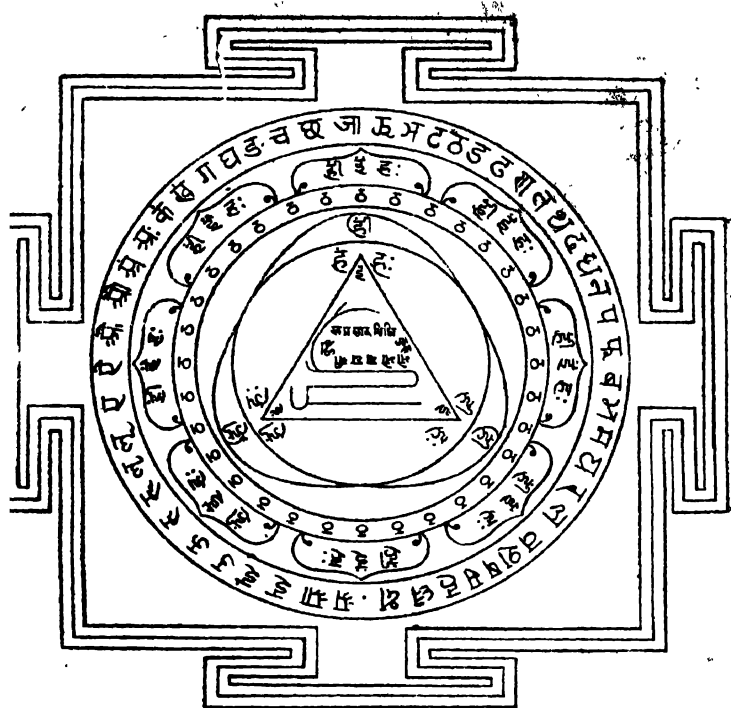
অমাবস্যা লেগেছে, অমাবস্যার ঘোরা রাত্রি সমাগত। প্যারীমোহন পট্টবস্ত্র পরে বসে আছেন, ললাটে সিন্দুর রেখা। সম্মুখে মণ্ডলাকার চক্র। চারিপাশে তামার টাটে টাটে পূজার উপাচার, লিঙ্গপুষ্প করবী, যোনিপুষ্প অপরাজিতার সমারোহ। পাত্রে দুগ্ধ, চিনি ও মধু। ঐ দুগ্ধ চিনি মধুই বিচিত্রবসনা, বরাভয়া আনন্দভৈরবী ও শ্বেতবর্ণ দিব্যবসন বিভূষিত আনন্দ ভৈরবের সামরস্যে সুরায় পরিণত। সেই সুরা মন্ত্রে শোধিত। সম্মুখে বসে আছেন আচার্য, চক্রেশ্বর গুরু, আর-আর চক্রবীরগণ। তাঁরাও পট্টবস্ত্র পরিহিত। তাঁদেরও মস্তকে কেশভার। শিখায় রক্তজবা। গুরু বললেন—

বৎস, ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্বতন্ত্রেষু গোপিতম। এই চক্র সারাৎসারং, পরাৎপরং। এই চক্রে সাধনা করতে হলে চাই পরাশক্তি। বৈদিক বিবাহের স্বশক্তি হলে চলবে না। এই পরাশক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে জাগ্রত কর, ইড়া আর সুষুম্নাকে জাগ্রত কর, পান কর কারণ।

কারণবারি নরকপাল থেকে ঢেলে দিলেন চক্রেশ্বর, পানপাত্র এগিয়ে দিলেন। হস্তের মুদ্রা সহকারে পান করলেন প্যারীমোহন, তারপর আর-আর বীরগণের পান আরম্ভ হল। চক্রের বাহিরে বার বার হস্ত প্রক্ষালন করে পানপাত্র চুমুকে চুমুকে নিঃশেষিত হল। পট্টবস্ত্রের লাল কারণের লালে মিশে চোখে ছায়া ফেলেছে—তাই মদির নেত্র—করঞ্জাক্ষ বীরগণ।

এবার চক্রেশ্বর আজ্ঞা দিলেন, কন্যাকে আনয়ন করহ!

মদালসলোচনা কন্যাকে চক্রে নিয়ে আসা হল। সঙ্গে কন্যার মাতা। পট্টবস্ত্রধারিণী কন্যা, গলায় নীল অপরাজিতার মালা। সে সুরায় মাতাল। চক্রেশ্বর প্রথম যৌবনা রজস্বলা নারীর কুসুমলিপ্ত রক্তচন্দনের ফোঁটা তার ললাটে পরিয়ে দিলেন। কন্যার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। অধরে তার স্ফুরিত হাসি, লোচন নিমিলিত।

সে প্রবেশ করতেই বীরসাধকগণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

চক্রেশ্বর শুধালেন—বীর, তুমি কোন্ বিবাহ করবে? দ্বিবিধ এ শৈব বিবাহ। এক জীবনাবধি—দ্বিতীয় চক্রনিবৃত্তি অবধি। কোন বিবাহ তোমার অভিপ্রায়? শক্তি, তুমিও বল—কোন বিবাহ তোমার মনঃপূত?

প্যারীমোহন কন্যার দিকে তাকালেন। উদ্ভিন্ন যৌবনা চণ্ডালিনী, নীলকান্তমণির মতোই রূপসী। এ কন্যা দেবভোগ্যা, এ কন্যা পেলে চক্রাধিপতি ভৈরবেরও মন টলে, মানুষ তো কোন ছার! চক্রে বসে সুরা আর কামনায় তিনি মাতাল হয়ে উঠলেন—স্খলিতস্বরে বললেন—

জীবনাবধি।

জীবনাবধি হলে তোমার উত্তরাধিকারীকে এই শক্তির-গর্ভজাত সন্তানকে পালন করতে হবে। গুরুর গম্ভীর স্বর ঝরে পড়ল।

তার ব্যবস্থা আমি করব। প্যারীমোহন জড়িত স্বরে উত্তর দিলেন।

এবার চক্রেশ্বর কন্যাকে শুধালেন—শক্তি, তোমার কি অভিপ্রায় বল?

শক্তি তো অশক্তা, মাতোয়ালী বেহোঁশ। তার অধর নড়ে উঠল।

গুরু আবার শুধালেন—কি তোমার অভিপ্রায়?

প্যারীমোহন বলে উঠলেন, শক্তি সম্মত। আমি সব ব্যবস্থা করব।

বেবস্থা তো করবে, হামার বেবস্থা কি হবে গো? নাখেরাজ জমি দেবে না? নেশার ঘোরে বলে উঠল চণ্ডালিনী। ক'খান মোহর দিবি বল্ না! জামাই অমন গজরাজ, দেবে নি!

চক্রেশ্বর গুরু ধমক দিলেন, এটাকে কে নিয়ে এল! ওকে দূর করে দাও!

ইস্—মোর মেয়ার বিয়া হবেক, মোকে তুরা দূর করে দিবি! এর চেয়ে যে মোর সেই জামাই ভ্যালো ছেল গো!

সেই জামাই? একজন বীর শুধালে!

হাঁগো-লটরপটর হয়েছেলো গো। পিরিত হয়েছেল!

কন্যা তাহলে অন্যপূর্বা! চিৎকার করে উঠলেন চক্রেশ্বর-গুরু।

হোক অন্যপূর্বা—এ-কন্যা দেব-ভোগ্যা—আমরা তো বীর—আমরা তো দেবতা--এ আমাদেরই ভোগ্যা। সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠলেন।

ভোগ্যা! তোদের ভোগ্যা!—গর্জন করে উঠলেন চক্রেশ্বর। সাবধান, সাবধান! কলুষিত হবে চক্র, তোরা নির্বংশ হবি!

নির্বংশ হই হব! সমস্বরে বেজে উঠল স্খলিত জড়িত স্বর। বীরাচারী বীরগণ ব্যভিচারী হয়ে উঠলেন। তাঁরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর চক্র ভেঙে, টাটের পুষ্প, পূজা উপকরণ ছড়িয়ে পড়ল। আনন্দ ভৈরবী ও আনন্দ ভৈরব অন্তর্হিত, কামমোহিত বীরগণ কামাচারী হয়ে উঠলেন। 'মনসাও কাম-চিন্তা করো না'—যে বিধান দিয়ে ছিলেন শিব, সেই বিধান তখন অবহেলিত। তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই নারীর উপর। অপরাজিতা ধর্ষিতা হল, তার মাও বাদ গেল না। তাঁরা দুই নারীকে ধর্ষণ করলেন, মর্ষণ করলেন, তারপর নরখাদকের মতো, হিংস্র পশুর মতো যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললেন, কেউ ধরলেন পা, কেউ বাহু—কেউ স্তন—নিজেদের লালসায় তাদের আহুতি দিলেন। বামাচারী বীরগণ তাদের নিয়ে যে আচার করলেন তা পশ্বাচারের চরম। চক্রেশ্বর-গুরু বাধা দিতে গিয়ে হত হলেন খড়্গের আঘাতে। গুরুর ছিন্ন মুণ্ড গড়িয়ে পড়ল তামার টাটের উপরে।

দুলদুল যখন লাডলীকে সোয়ারী নিয়ে পৌঁছল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

চক্রের আশে-পাশে পড়ে আছে মাতালের দল। চক্রেশ্বর-গুরু হত, নীলপিণ্ড খড়্গ পড়ে আছে রক্তস্নাত হয়ে। লাডলীর কোন দিকে খেয়াল ছিল না। সে খুঁজতে লাগল; খুঁজেও পেল। অপরাজিতা এককোণে পড়েছিল, তার কাছে গিয়ে নাকে হাত দিয়ে দেখলে লাডলী। প্রাণ নেই। রক্তাক্ত বসনভূষণ বহু কামলোভীর কামনার স্বাক্ষর বহন করছে। আর সেই স্বাক্ষরিত দেহে নেমে এসেছে মৃত্যু। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ, চোখ ঠেলে

বেরুচ্ছে। কি কুৎসিত মৃত্যু! লাডলী আর তাকালে না। সে ছুটে চলে যাচ্ছিল। তার নাগরার শুঁড় হঠাৎ আটকে গেল সে চমকে উঠল। এক মাতাল মদের ঘোরে জড়িয়ে ধরেছে তার পা লাডলী লাথি মারলে মাতালের মুখে। মাতাল চিত হয়ে পড়ল।

মুখ দেখে শিউরে উঠল লাডলী।

এ যে প্যারীমোহন—তার পিতা!

রক্তবর্ণ নিমিল চোখ, কি যেন অস্ফুট স্বরে বললেন। সে শুনতে পেলে না। সে আর তাকালে না, টলতে-টলতে বেরিয়ে এল।

তারপর আবার দুলদুলের পিঠে চড়ে বসল।

দুলদুল কোথায় যাবে?

ঘাড় বাঁকিয়ে দুলদুল চলেছে, বালাম নড়ে-নড়ে উঠছে।

মথুরাপুরীর পথে নয়, যেখানে থাকমণি আছে, সন্তান আছে সেখানে নয়। কেন নয়?

একবার অতৃপ্ত নয়নে লাডলী তাকাল সেদিকে। তার থাকমণি আছে, নবজাতক আছে। তাদের নিয়েই কি সে এই ব্যভিচারী পুরী ছাড়বে? সঙ্গে নেবে লক্ষ্মীর কুনকের ক'টা ধান, এক থান মোহর। দূর দেশে আবার নরেন্দ্র খাঁর বংশের লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করবে, বংশ প্রতিষ্ঠা করবে। সে ছুটে যেতে চাইল, ঘোড়ার মুখ ফেরাতে গেল। কিন্তু দুলদুল ঘাড় বাঁকিয়ে রইল। এ বুঝি মনের নির্দেশ, বিধাতার নির্দেশ। মনই তো বিধাতা, মন বলে উঠল—থাকগে! যেতে চাইলে থাকমণি অনর্থ বাধাবে। তাকে আঁকড়ে ধরবে। আর ঐ পাপাচারী পিতার সঙ্গে তাকে থাকতে হবে, ঐ নীল অপরাজিতার ধর্ষণকারীর সঙ্গে বসবাস করতে হবে! না, মথুরা পুরেতে নয়। যাবে অন্য পথে—যে পথের শেষে আছে নয়া জীবন। নয়া পত্তন। নয়া জমানা। সেই পথে লাডলীকে নিয়ে ছুটল দুলদুল।

এ-লাডলী দায়ভাগ আইনের শাসন মানে না, কুলজীর কুলপ্রদীপ হয়ে কুল আঁকড়ে থাকতে চায় না, এ লাডলী হতে চায় নয়া জমানার নয়া মানুষ।

দুলদুল তাকে কি সেখানে নিয়ে যেতে পারবে—পারবে কি নবজীবনের তীরে পৌঁছে দিতে?

নয়া জীবনের তীরে সে এসেছে, কিন্তু ফুলফুল তো নেই। ক্লান্ত ফুলফুল লুটিয়ে পড়ে আছে পথে।

লাডলী রোজনামচার পাতায় লিখল—

ফুলফুল ফিরিঙ্গীর কলকেতায় নিয়ে এসেছে। এখানে মথুরাপুরের লাডলীমোহন বসু কেউ নয়, এক রাহা, এক মুসাফির। এই মুসাফির কি নয়া জমানায় রোশনাই দেখতে পাবে? কিন্তু ভরসা কি? ফুলফুলকে পথে হারিয়েছি। রাঢ়ের শুকনো ধুলো ওড়াতে-ওড়াতে সে আসছিল, ধুলোয় তার কবর হয়েছে। ফুলফুল, তুই তো নয়া জমানার রোশনাই দেখতে পেলিনে। পাবে কি তোর মনিব?

হয়তো পাবে, হয়তো পাবে না লাডলী।

এখন তো সে এখানে এসেছে, মুসাফির হয়ে এসেছে। থিতু হয়ে বসুক, তবে তো দিন আসবে, নয়া শহরে তার মসনদ তৈরি হবে। তার স্বার্থ তো তাকে দৌড় করাবে মসনদের লোভে, তারপর কি হয় দেখা যাবে। তার আগে তো সেও পদাতিক, সেও রাহী, মকরন্দের মত রাহী, মেরীর মতো রাহী। রাহী, মুসাফির, পদাতিক, পথিক।

এক, দুই ছিল, ছিল মকরন্দ আর মেরী—এবার তিনেকে তিন হল, লাডলী এসে মিলল।

৪

শহর যখন বাজার তো বসবেই।

একটা-আধটা নয়, বাজারের পর বাজার। বাজারের ভিড।

ইংরেজ মেয়ে সোফিয়া গোল্ডবোর্ন বাজার বলতে পারেন না, তাই বলেন—বেইসার। আবার হরেক রকমের বাজারের নামও আওড়ান।

বলেন—বড়া বেইসার। সেখানে বিকিকিনি হয় ফল আর মেঠাই। মচ্চি বেইসার, সেখানে মছলির সওদা, ডিউভওয়ালার বেইসার, সেখানে গয়লাদের ভিড, শুয়োরওয়ালার বেইসার, সেখানে শুয়োরের ব্যাপারীরা শুয়োর গোনে আর শুয়োর বেচে। আবার আছে ইউরোপ শপ্, দোকান—সেও এক-একটা বেইসার। কালাদের বাজারে সোফিয়ার মতো আংরেজ মেয়ে যায় না, তাই বলে—বড় বাজার মেঠাইমণ্ডার বাজার, ফল-ফুলারির বাজার।

বেইসার বা বাজারেই উঠেছে হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী, আর সেটা চীনা বাজার।

কশিটোলায় ঢুকে মেরিডিথ সাহেবের আস্তাবল পার হয়ে আরও এগিয়ে যেতে হয়, ঢুকতে হয় আরও ভিতরে। তারপরে এক সময়ে গিয়ে হাজির হতে হয় সরু গলিপথে। এই চীনা বাজার।

এও কালার বাজার। তবে তারা কালা পশ্চিমা নয়, মাড়োয়ারী নয়, পাঞ্জাবী নয়—কালা বাঙ্গালী।

এ বাজারের কথা সোফিয়া বলেছেন। সোফিয়া কার কাছ থেকে শুনেছেন, এখানে চিনি বিক্রি হয়। তাই চিনি বাজার এর নাম।

না, তা নয়, চীনামাটির জিনিস বিক্রি হয় বলেই বোধহয় তার এই নাম। শুধু তাই নয়, এখানে ঘর-গৃহস্থালির টুকিটাকি সব জিনিসই পাওয়া যায়। ঘিঞ্জি পাড়া, দুধারে ঘিঞ্জি দোকানের সার। আর তাতে হাতা-বেড়ী

থেকে সবকিছু মেলে, দশকর্মের জিনিস মেলে। আর এই বাজারের উত্তর দিকের লেজুড় থেকেই গুড় বাজারের শুরু।

সোফিয়া জানেন না; চোখে দেখেন নি। হয়তো বা ক্রহামে যেতে-যেতে এক ঝলক দেখেছেন, এক পলক দেখেছেন, হয়তো কালাকাঁদের স্তূপ দেখে মেঠাই বাজার ভেবেছেন, আর হিন্দুস্থানের, তুর্কস্থানের মেঠাই কিনেও এনেছেন। কাবুলের নারঙ্গী কিনেছেন, আখরোট, খোবানি কিনেছেন; ভেবেছেন এ ফলের বাজার। কিন্তু এ-বাজার ঘুরে দেখেন নি।

কি না পাওয়া যায় এ-বাজারে? সোফিয়ার এই বেইসারে?

কি না মেলে?

কথায় বলে, বাঘের দুধ, সাপের পানি—তাও বুঝি মেলে।

বাজারের জুলি পথে যদি ঘুরতে পার, পাবে মণিকারের হীরে-জহরতের দোকান। সেখানে গোলকুণ্ডা আর বুন্দেলখণ্ডের মণি-মাণিক্য মিলবে, আবার শাল-দোশালার দোকানে মিলবে কাশ্মীরী শাল, জামিয়ার, শালের রুমাল। বিলেতি কাপড়, মুর্শিদাবাদী আর বারাণসী রেশমী কাপড়, ঢাকাই মসলিন, ছিট—সবই পাওয়া যাবে। কাপুড়ে পট্টি ছাড়িয়ে নয়ানজুলির মতো পথে ঘুরতে-ঘুরতে যদি করোমণ্ডলের মুক্তো চোখে পড়ে, অবাক হয়ো না। আবার পারস্যের মহার্ঘ কিংখাব যদি ঝলসে দেয় চোখ, তাতেও হকচকিয়ে যেয়ো না। এ এক আজব বাজার, বড়া বাজার। এমন বাজার হারুন-অল-রসিদের তাইগ্রীসের পাড়ের শহর বোগদাদেই কি আছে? আছে কি লন্ডন শহরে? নেই বলেই তো মনে হয়। সোফিয়া এদিকে আসেন নি তাই দেখেন নি। হয়তো সরু গলিতে ক্রহাম আর এগোতে চায় নি। তাই এমন তাজ্জব কথা বলেছেন।

সোফিয়ার একশো বছর পরে কোলস্‌ওয়াদি গ্র্যাণ্ট দেখেছিলেন। তিনি পুরুষ, ঘুরে ফিরে নাকে রুমাল চেপে চক্কোর দিয়েছিলেন। মেওয়া আর মেঠাই, মসলা আর ধূপধুনা কিছুই তাঁর চোখ এড়াতে পারে নি। কিন্তু সোফিয়া শুধু মেওয়া আর মেঠাই ছাড়া কিছুই দেখেন নি।

হরানন্দ তো আর সোফিয়ার মতো ফেরঙ্গ বিবি নয়। সে চীনা বাজারের এক দোকানের পেছনের এক চিলতে কোঠায় মাচাঙ-এ শোয় বটে, কিন্তু ঘুরে দেখার চোখ তার আছে। সে ঘুরতে-ঘুরতে এসেছে এখানে,

দেখতে-দেখতে এসেছে। এসে উঠেছে এই মুদির ডেরায়। চাঁদ মুদীর মতো নামী নয়, নিতান্তই এক নগণ্য মুদী। তবে এ এক আজব শহর। আজ মুদী, কাল শেঠ; আজ ফকির, কাল উজীর। আজ ভিখারী, কাল রাজা।

নওয়াবের মরজিতে ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ মিলত। এখন আর-এক নওয়াব এসেছেন আংরেজ কোম্পানী-বাহাদুর, নবাব-নাজিম শ্রীল শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর। হাতে শির নেন। আবার শিরপেঁচ দেন, খেলাৎ দেন। পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি, সেও এখন জমিদারীর মালিক। কান্ত মুদীরা সাহেবদের কুঁচো চিংড়ির ছালন আর পানিভাতের নাস্তা করিয়েও তালুক-মুলুক করে ফেলে।

অথচ এই তো সেদিনের কথা—নাটোর ছিল জমজমাট! রাণী ভবানীর রাজ্যে কি সুখেই ছিল মানুষ! তারাঠাকুরঝিকে নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছিল সরফরাজ খাঁর আমলে। তখন সে জন্মায় নি। কিন্তু আলীবর্দীর আমল দেখেছে, সিরাজের আমল দেখেছে। আর পলাশীতে আংরেজের কার-সাজিটাও সে জানে। তখন সে পড়ে পাঠশালায়।

পাঠশালায় পড়ায় গুরুমশাই, মক্তবে পড়ায় মৌলিবী, এদিকে কামান গর্জে গর্জে ওঠে পলাশীর আমবাগানে। ইংরেজ বেনিয়ার সঙ্গে ষড় করে এদেশী বেনিয়া আর নিমক হারামেরা তামাম মুলুকটা তুলে দিলে তাদের হাতে। সেদিন দেশের মানুষ চোখের জল ফেলে নি। গুরুমশাই বেত মারছিলেন, মৌলভী কোরা লাগাচ্ছিলেন। সর্দার পোড়োরা গরহাজির পড়ুয়া হরানন্দকে চ্যাং-দোলা করে বিষকাঁটালি বন থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল ছড়া কাটতে-কাটতে—

রামতুলসী রামতুলসী
রামতুলসীর পাতা
গুরুমোশায় কইয়া দেছেন
কান মলিবার কথা।

বেদম মার খেয়েছিল হরানন্দ।

ওদিকে পসলা পসলা নেমেছিল বৃষ্টি। কামানের বারুদ ভিজে গিয়েছিল আমবাগানে, ভিজে ভিজে ঢোল হয়ে উঠেছিল সব। কত খেলাৎ দিয়েছেন, কত একলাই শাল, কত জামিয়ার ইনাম দিয়েছেন দাদুসাহেব আলিবর্দী, আর

তার একখানা দিয়ে বারুদে চাপা দেবার কথা কারো মনে হল না। মনে হলেও কেউ তা করলে না। ভিজে ভিজে গেল বারুদ। আর সেই সুযোগে আংরেজ ক্লাইভ, তুনে কামাল কর্ দিয়া। হো-হো—কামাল কর্ দিয়া!

পলাশীর আমবাগানের শিয়রে সেদিন মেঘ করেছিল, বাদল ঝরেছিল।

আর বহুদূরে বাহারবন্দ পরগণায় আমরুল পরগণারও মেঘ করে এসেছিল, কিন্তু হরানন্দরা তাকিয়ে দেখে নি।

এ যে বাংলা মার কান্না, বাঙালীর কান্না—বুঝতে পারে নি।

মার খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল পাততাড়ি বগলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বেরিয়েছিল। বিকেল হতে ফিরেছিল হরানন্দ।

তেমনি চণ্ডীমণ্ডপে কচেবারোর দান পড়ছিল পাশায়, তেমনি শামুক-ভরতি নস্যের ডিবে ঘুরছিল কর্তাদের হাতে হাতে, তেমনি হুঁকোয় বামুন আর কায়েতরা নল পালটে-পালটে ভুড়ুক ভুড়ুক টানছিল।

অথচ বিকেল তখন এলিয়ে পড়েছে। সহস্রকিরণ দিনমণি তখন অস্তাচলে। বাংলায় তথা ভারতে বিষাদরজনী নেমে এসেছে।

হরানন্দ জানতেও পারে নি, কর্তারাও জানতে পারেন নি, জানতে চান নি। জানতে চাইলেও কি পারতেন?

মুতাক্ষরীন তো অনেক পরে লেখা।

মুতাক্ষরীন পড়ে জানে নি হরানন্দ। জেনেছিল অনেক পরে, যখন টোলে মুগ্ধবোধ ছাড়িয়ে ভট্টী পড়তে শুরু করেছে। একদিন এক ভিখারী গুপীযন্ত্র বাজিয়ে গাইছিল গান, সেই গান শুনলে।

কেন যেন ভাল লাগল। টুংটাং বাজে গুপীযন্ত্র, বুকে অব্যক্ত ব্যথার টংকার দেয়, ঝংকার ওঠে। সে ভিখারীকে পাঁচটা কড়ি বকশিশ দিয়ে গানটা লিখে নিলে,

কি হোলোরে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।

কি হল রে জান,
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
নবাব কাঁদে, সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,
কলকেতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হল রে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান।
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটি,
চাঁদোয়া টাঙায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হল রে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান।

শিখে নিলে, নিজে সুরটাও রপ্ত করে নিলে। তারপর গাইতে-গাইতে ঘরে এল। গায়, গায়, গাইতে-গাইতে যেখানে আসে—'কি হলরে জান' —আপনা থেকে গলায় ঘনিয়ে আসে ব্যথা, গলা বুজে আসে।

কেন আসে?

হরানন্দ পলাশীর নাম শুনেছে।

কোম্পানীর নামও তার জানা।

নবাব নামটাও চেনা।

কিন্তু নবাবের প্রাণ গেলে তাদের কি? তাদের কেউ তো নয় নবাব।

নবাব, তোমার সঙ্গে তো মেলে না আমাদের।

তুমি তো থাক দৌলতখানায়, হাজার দুয়ারীতে হাজার পিদিম জ্বলে। মোতিঝিল, হীরাঝিলে বসে তোমার বিলাস বাসর। তুমি খাও মোগলাই খানা, তাঞ্জামে চড়, হাতীর হাওদায় দুলতে-দুলতে যাও। আর তোমার নগদা সিপাই এসে আমাদের ধরে-বেঁধে নিয়ে যায়, আমাদের রাজাকে বৈকুণ্ঠবাস-নরকবাস করায়। আবার তোমার খাজনা দিতে আমাদের রাজা আমাদের শুষে নেয়, চুষে নেয়। তবু নবাব তুমি আমাদের। তবু কাঁদে তোমার জন্যে পল্লীবাংলার কবি, কাঁদে বাঙালী মোহনলালের বেটী।

কেন?

হরানন্দ কি এসব বোঝে, এসব জানে? এসব প্রশ্ন কি তার মনে উদয় হয়?

না।

সে গল্পের গন্ধ পায়, পরণকথার গন্ধ পায়, এক কিস্‌সার খোশবায়ে তার দিল ভুর্‌ভুর করে ওঠে। শুনতেই হবে।

পরণকথার রাজা, কিস্‌সার শাহানশা-বাদশা আছেন বকসী-দাছ্। হরানন্দের গানের গলা ভাল, তিনি তাকে বিষ্ণুপুরী ঠাটে গান শেখান, ঠুংরী শেখান, মালসী শেখান। দাছ্কে গান গেয়ে শোনাতে হয়। আর দাছ্ শোনান কিস্‌সা। সেতারে গেলাপ এঁটে দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখেন, বক্কুজবার মতো চোখছুটো আরও ঢুলু ঢুলু, তারপরে শুরু করে দেন।

যেদিন বকসী-দাছ্র বাগানে নষ্টচন্দ্রে শসা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল হরানন্দ, সেইদিনই প্রথম পরিচয়।

ঘুরঘুট্টি রাত। সঙ্গীও ছিল জনকয়েক। লাহেড়ীদের বাগান, ঘোষদের খিড়কির মাচা সেরে, ওরা বকসী-বাড়িতে হানা দিয়েছিল। এ সত্যিই বাগানবাড়ি! এখানে আম, জাম, কুল তো আছেই, আবার নারঙ্গীও মেলে। পান-কর্পূরের মিষ্টিপাতাও ছিঁড়ে আনা যায়। দালচিনি গাছের ছাল ছাড়িয়েও খাওয়া যায়। আবার তুঁতফল তো খাসা।

কিন্তু টু শব্দটি করলে চলবে না। ওরা টু শব্দটি করে নি, পা-টিপে টিপেই গিয়েছিল, আর কোঁচড় ভরে শসা, আরও কত কি ফলও নিয়েছিল। ফলের ফলার হবে। এমন সময় হরানন্দ কিসে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। সঙ্গীরা ছুড়দাড় ছুটে পালাল। পাটকাঠীর মশাল জ্বালিয়ে টাঙ্গি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বকসী-দাছ্। সেই পহেলা নজর। প্রথম পরিচয়।

ঘরে এনে আগেই বললেন, ওরে গেঁড়া, লাগে নি তো র্যা?

উঁহু।

উঁহু! লাগলেই তো আচ্ছা হত, আক্কেল হোত। ধর্ম্ম ছাখতাম। তোর নাম কি রে?

হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী। উত্তর দিয়েছিল হরানন্দ।

বাবাঃ, এক রত্তি পোলার দেড়গজি নাম। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচ।

গঙ্গাগ্রামী নামডা কোথায় পেলি ?

নিরুত্তর হরানন্দ।

বকসী-দাদু হেসে বললেন,

হুঁ—বাপ-দাদার নাম জান না টেমগোপালের লাতি !

সেই থেকেই তার নাম টেমগোপালের লাতি।

বকসী-দাদুই বলেছেন,

তোরা আবার বামুন কিসের ? একে তো কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে, তার পাপ। তার উপরে তোরা আবার পৈতে ফেলে দিয়ে নেড়া হয়েছিলি। আমরাই তো বৈদিক বামুন, তোদের বাঁচালাম। ফিরে-ফিরতি পৈতে দিলাম। তোদের তো তখনি জাতপাত হয়েছে। আবার জাতপাত করলে তুর্ক আর মুগলে। জানিস সে-সব ? এই তো তুই, তোর রক্তে মেলেচ্ছ দোষ আছে। তোর চোখ অমন কেনে রে ? ও-তো তুর্ক চোখ। তোর রংডা অমন লালচে-লাহান হল কোথা থেকে ? বামুনের রং তো সবরীকলার খোসার মতো। ছাখ তো আমাদের !

এই বলে নিজের দিকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সত্যই সবরীকলার খোসার মতো গায়ের রং ! একটু বা তামাটে মেরে গেছে মুখের রং, কিন্তু গায়ের রং দিব্য গৌর।

তিনি বলেছেন, তুর্কর তোদের ঘরের উপরে চিরকালের তাগ। একটা-কিয়ার ভাদুড়ির পোলা তো তুর্ক হইয়াই গেল। তোদের ঘরের পোলা মেয়্যা পেলে লুফে নিত ওরা। তাইতো তোদের অমন তুর্কী চেহারা। কারো আছে ধোঁদা দোষ।

হরানন্দ জানে না, উন্মুখ হয়ে শোনে।

বকসী-দাদু বলতে থাকেন, ধোঁদা খালে জল আনতে গেলেন বড় কুলীনের দুই মেয়্যা, আর অমনি হাসাই নামে থানাদার তাঁদের সঙ্গে জলকেলী করলে। কেউ বা আবার জুনিখানের বেটা-বিটি বিয়োলেন। শৌরী গাঙ্গুলীর জরুকে হাওয়াবেগ নিয়ে গেল। লাল খাঁ, মগা খাঁ কে না তোদের সুন্দরী কন্যা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ! সব ঘরে যবনদোষ, কুলীন সমাজ যায়-যায়। এমন সময় দেবীবর ঘটক দেখা দিলেন বিক্রমপুরে।

তিনি দেখলেন, জাত তো যায়। পণ্ডিত, বুঝদার, বুদ্ধিধর লোক,

তিনি মেল বেঁধে দিলেন। যবনঘাতিরা গৃহলক্ষ্মী হল, কসবী হল না, ছুটী হল না।

হরানন্দ বলে, কিন্তু লোকে যে দেবীবরকে যা-তা বলে।

বলে তারা মানুষ নয় বলে। দেহে আঘাত করেছে বলে, মনটা কি পচে গেল! দেবীবর সেইটে বুঝেছিলেন, আর বুঝেই এই ব্যবস্থা দেন। উঁচা মন আর কার হবে র‍্যা! এমন মেয়্যার জন্তে দরদ আর কে দেখাবে র‍্যা? দরাজ-দিল মানুষ ছিলেন তিনি। দেবতা আমরা চোখে দেখি নি, তিনিই দেবতা ছিলেন। নইলে কি আর তোদের কুলের কেচ্ছা গাইতে গিয়ে ও-কথা বলতে পারত কুলজীতে।

কাশীসুত হরিহর ফুলিয়ার মুখটী।
ভাল বিভা হৈল তোমার জুনিখানের বেটী॥

নে রে বেটা, এবার ভাল করে এক ছিলিম সাজ তো!

কুলের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল হরানন্দ।

বকসী-দাদু অনেক জানেন, শুধু পরণকথা নয়, কুলের কুলজী, আবার ফারসী, আরবীও জানেন। মুতাক্ষরিন-এর নাম করেন, গোলাম হোসেন না কার নাম করেন, আবার সংস্কৃতেও হুনর। ভট্টির শ্লোক বুঝতে না পারলে বকসী-দাদুর কাছেই সে ছুটে আসে।

আজও হরানন্দ তাঁর কাছেই ছুটে গেল।

দাদু চুপ করে বসেছিলেন, সামনে একটা কাজ-করা চীনামাটির সোরাই। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু।

ওকে দেখেই বলে উঠলেন, কি রে, হাওয়াবেগের বেটা, কি খবর?

নিত্য নতুন নামে ডাকেন দাদু, কোনদিন বলেন টেমগোপালের নাতি, কোনদিন হাওয়াবেগের বেটা, কোনদিন আবার কাশ্যপ গোত্তর, কোনদিন বা বলেন, বাঙাল, পুঁটিমাছের কাঙাল। হরেকরকম নাম, কৃষ্ণের শতনামকেও হার মানায়। কুলজী তুলে গালও দেন। বলেন বারিন্দীদের কুলের পটী তো এমনি। এ দোষ ও দোষ। একে আস্তাড়িলেন, ওকে আস্তাড়িলেন—তার মানে খুঁত ধরে পাঁটা আছড়ালেন। তো বেঁটাদের কথাই আলাদা, দোষে দোষে তোরা শতছিদ্দির কলস। এই আবদুল রহমান দোষ ধরা পড়িল, ঐ উমানন্দী দোষে আস্তাড়িল, আবার ভট্টাঘাত দোষ নিষ্কৃতি করিল ভোজন দিয়া।

হরানন্দ হেসে বললে, আজ হাওয়াবেগের বেটা, মোহনলালের বেটীর গান শিখে এসেছে দাদু।

এই বলেই সে গাইলে মেঠো সুরে।

স্তব্ধ হয়ে শুনলেন বকসী-দাদু। ঢুলুঢুলু ভাব কেটে গেল। চোখ জলে ভরে গেল। গান শেষ হতে বললেন—

মেরী জান, এ গান কোথায় পেলি?

পেলাম ভিখারীর ঠেঁয়ে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারি নি। নবাব তো বুঝলাম, পলাশীও বুঝলাম, কিন্তু মোহনলালের বেটী কাঁদে কেনে?

বকসী-দাদু চুপ করে রইলেন, সোরাইটার সরু গলাটা চেপে ধরে তুলে নিলেন, তারপরে গল-গল করে ঢেলে দিলেন গলায়। শূন্য সোরাইটা ঠিক করে নামিয়ে রেখে নড়ে-চড়ে বসলেন।

এবার ঝোলা থেকে বেরুবে গল্প। অধীর হরানন্দ।

বকসী-দাদু কিন্তু গল্প শুরু করলেন না, বললেন না, এবার তাহলে শোন্। চুপ করে বসেই রইলেন।

দাদু, বললেন না তো? মোহনলালের বেটী কাঁদে কেনে!

কেনে কান্দে? কেনে কান্দে? তুই তো কাঁদিস নি, মুই তো কাঁদি নি, তবে মোহনলালের বেটী কান্দলে কেনে? আর মোহনলালের বেটীর সনে ঐ যে হাড়ী, ঐ যে ডোম, ঐ যে পলা, ঐ যে পোদ—ওরাই বা আজ গান বেন্ধে কানছে কেনে। জব্বর সওয়াল করেছিস জুনিখানের বেটা—এর জওয়াব তো দিতেই হবে।

এমন জবান শোনে নি কখনো হরানন্দ, বকসী-দাদু এমন হেঁয়ালিতে কথা কন নি কখনো। হরানন্দ চুপ, বিলকুল চুপ!

হ্যাঁ, ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন বকসী-দাদু, জওয়াব দিতে হবে। ঐ মোহনলালের বেটী নবাবকে মহব্বৎ করত তাই কেন্দেছে; আর নবাব তাদের দিল কে প্যারে ছিলেন বলেই কেন্দে কেন্দে এই জানের চাপান বেন্ধেছে ঐ পলা, ঐ ডোম, ঐ হাড়ীর দল।

বকসী-দাদুর কথায় শুধু ফারসী খোঁচ, উত্তেজিত হলে সে খোঁচ বেড়ে যায়। তিনি আবার বললেন, ওদের পেয়ারের নবাব বলেই বেন্ধেছে এ-গান। ‘জান কি হল’ বলে কেন্দে দরিয়া ভাসাচ্ছে।

হরানন্দের পলাশীর কথা আবছা মনে আছে। সে বললে—

ধু-ধু মনে পড়ে। সেদিন খুব বাদলা হয়েছিল—না দাছ?

না, খুব বাদলা নয়, মেঘ করেছিল, দু-এক পসলা ঝরতাছিল। কিন্তু তাতেই কাল কল্লে। দাবা-বড়ে টেপা নয়, পিল দিয়েই মাৎ। শাবাশ চালবাজ সাহেব—শাবাশ! শাবাশ সবৎজঙ্গ!

সবৎজঙ্গ কে দাছ?

সে কি র‍্যা! সবৎজঙ্গের নাম শুনিস নি! সেই যে পলাশীর লড়াই-জেতা লড়্কে সাহের। নবাব-আলীব-ইল মমালিক সবৎজঙ্গ বাহাদুর।

হরানন্দ অবাক হয়ে বলেছিল—

দাছ আপনি এতও জানেন।

জানি কি আর সাধে র‍্যা! আমি কি যে-লোক, ক্রোক-সাজোয়ালের আমলা। বৈদিক বামুন, বেদ পড়ি নি, টোলে যাই নি, বাড়ি থেকে পাল্যে গেলাম ছেলেবেলায়। নবাবের ক্রোক-সাজোয়াল রঞ্জিত রায়। আরবী-ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দিতে বোল বোলে যেন খই ফোটে। তাঁর ওখানেই ঠাঁই পেলাম। মুরশুদকুলীখাঁর আমল থেকেই তাঁর ঐ নোকরি। পাইক নিয়ে পরগণায়-পরগণায় ঘোরেন, জমিদারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। জমিদার তো তটস্থ। এই রে, এবার বৈকুণ্ঠ চালান দেবে! কিন্তু রায়-মশায় পারতপক্ষে তা করতেন না। তাঁর ছিল দয়ার শরীল, রং-তামাসায় ছিলেন তেমনি উস্তাদ। আবার জমিদারদের যার যেমন রীত আর চরিত তাই নিয়ে ছড়া বাঁধতেন। ঐ যে তাড়াশ, ওখানে তখন হরদেব রায় জমিদার। লোকটা হাড়-কেপ্পন। তাকে নিয়ে ছড়া বাঁধলেন—

> হর দেওকো দেঁখেছে তাড়ওয়াশকো গাঁওমে।
> তহলা কাটে সেনকা নামমে॥
> ভুলা ভাটকা আখের যায়।
> আগলা বাড়ী…ছে বাৎলায়।
> আখের জো ধরনা দে।
> কহে থোড়া চাউল লে॥
> শোন্ রঞ্জিৎ কী বাৎ।
> এস্কো কৌন কহে কায়েৎ কী জাত॥

সেই রঞ্জিত রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি, এ মুলুক কি দেখা আমার বাকি আছে র‍্যা! হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম হরা?

ঐ যে পলাশীর সাহেবের কথা! সবৎজঙ্গের কথা। দাদু, আপনি কি দেখেছিলেন সে-লড়াই?

চুপ, চুপ, ও-নাম মুখেও আনিস নি জুনিখানের বেটা! সে-লড়াই দেখলেও যে এখন পাপ! অমনি হাতে হাতকড়ি পড়বে, পায়ে পড়বে বেড়ী। টানতে-টানতে নিয়া যাবে রঙ্গপুরের বাড়ি!

দেখেছিলেন কি না বলুন! হরানন্দ অধীর হয়ে উঠেছিল কৌতূহলে।

এক ছিলিম ভাল করে সাজ, তারপরে ও-কথা হবে।

হরানন্দ সেজে দিয়েছিল তামাক, ফু দিয়ে-দিয়ে গনগনে করে দিয়েছিল আগুন। কষে টেনেছিলেন বকসী-দাদু। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। শুধু গোল্লা গোল্লা ধোঁয়া উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঘরে। আর মগজে বুঝি পাক খাচ্ছিল। মগজের নাটাই থেকে স্মৃতির মাঞ্জা-দেওয়া সুতো খুলে গিয়েছিল, কোথাও বা জট-পাকিয়ে গিয়েছিল, ছেঁড়বার উপক্রম হয়েছিল—সেই সুতোগুলো বুঝি গুটিয়ে আনছেন। গুটিয়ে গুটিয়ে আনছেন···

তারপরে গলা খেঁকারি দিয়ে সাফ করে শুরু করেছিলেন বকসী-দাদু।

মেঘলা আকাশ। আমবাগে তারই ছায়া। আটশো গজ দীর্ঘ আমবাগ, প্রস্থে তিনশো গজ। সেখানে পড়েছে দুই দলের তাঁবু। কামানে বারুদ ঠাসা হল, গর্জন শুরু হল। তীরন্দাজ ছুঁড়লে তীর, বর্শা শনশন করে ছুটল, বোমা দুমদাম ফাটতে লাগল। সকালের যেটুকু আলো মেঘলা আকাশ থেকে ঝরে পড়েছিল, সেটুকুও কামানের ধোঁয়ায় বুজিয়ে দিলে। সবৎজঙ্গ টিকতে পারলেন না, পিছু হটে আমবাগের আড়ালে আশ্রয় নিলেন। মীরমদন লড়ছেন, লড়ছেন মোহনলাল। একটা গোলা আমগাছের ঘন আড়াল-আবডাল থেকে এসে পড়ল মীরমদনের উপর। মীরমদন আহত, মুমূর্ষু। তাঁকে নবাবের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। মীরমদন শুধু বললেন, নবাব সাহেব, মেহেরবান, খোদাবন্দ্, আপনার দুশমন আপনার নিজের আদমী, আমার জান দিয়েও আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না।

মীরমদনের ফুসফুস থেকে ভুস করে বেরিয়ে গেল হাওয়াই জান। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, মিশে গেল। মোহনলাল্ তবু তখনো লড়াই দিচ্ছেন।

তোপ দাগছে গোলন্দাজ, বারুদ ঠুসছে খোলে, পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে চকমকির আগুন, আর দাগছে। আমবাগের ডালপালা ভেঙে পড়ছে ঝুপঝাপ, গাছ ভাঙছে মড়মড়িয়ে, চেপে পড়ছে আংরেজ লোকের উপর। ওদিকে সেপাইরা তেলিঙ্গা আর হার্মাদদের উপর চালাচ্ছে তীর, মারছে বর্শা, ছুঁড়ছে বন্দুকের গুলী। সে এক তুলকালাম কাণ্ড! এরই মধ্যে নিমকহারাম মীরজাফর হুকুম দিলে—পেছু হঠো, লড়াই বন্ধ কর!

সে তো কবুতর, বাজের সঙ্গে জুটি বাঁধতে গেছিলো। তোবা! তোবা! সে দিলে সিপাহ-সলার হিসেবে হুকুম।

মোহনলাল নিমক হালাল, গর্জে উঠল—কভী নেহী! এই কি তোমার লড়াই বন্ধের সময়? আমি তো এ-হুকুম তামিল করব না! আমরা পিছু হঠবো, আর আংরেজ লোক আমাদের পাছু থেকে চোরা-গোপ্তা মারবে। না, না, দাগ তোপ, ছোঁড় বন্দুক, তলোয়ার দোলাও! সবৎজঙ্গকো মার ডালো, আংরেজ লোগকো মার ডালো!

সিপাহীদল থেমে পড়েছিল, আবার ছুটে চলল। তোপ দাগা হল, তীর ছুটল বাঁশের ধনুক থেকে, বর্শা ঝকমকিয়ে উঠল। কিন্তু বার বার আসে হুকুম। মীরজাফরালির তখন ধুকধুকানি—যদি মোহনলাল জেতে আর সিরাজ নওয়াব থাকে তাহলে তো জান খতম। তাই হুকুমের পর হুকুম চালালে। শেষে বীর মোহনলাল, লালা কায়েথ মোহনলাল, বাঘের বাচ্চা মোহনলাল তলোয়ার ফেলে দিলে। ফেলে দিয়ে চলে এল।

গোলাম হোসেন তো সবজান্তা, সে বলে গ্রিফতার হল মোহনলাল। ওতো ঝুটা কথা! মোহনলালকে গ্রিফতার করবে কে?

মোহনলাল ফিরছিল, এমন সময় মীরজাফরের এক গোলাম পাছু থেকে গুলী ছুঁড়লে। পলাশীর ময়দানে লুটিয়ে পড়ল বাংলার জঙ্গী, বাংলার শের মোহনলাল।

শেষ করলেন বকস-দাদ্বুদী। তারপর একটু থেমে থেমে বললেন, আমরা যারা খেয়েছি, পরেছি, নবাবের খেলাৎ-সেরপেঁচ পেয়েছি, জায়গীর, লাখেরাজ পেয়ছি, তারা সেদিন কান্দি নি। কেন্দেছিল, ডোম, হাড়ী, কেন্দেছিল, নীচা নগরের মুছলমান। তারা পলাশীর নামে কসম খেয়ে বলেছিল, এ খুনের বদলা আমরা নেব, এ কর্জ আমরা খুন দিয়ে তামাম শোধ দেব!

মোহনলালের বেটী কে ? কি ছিল নবাবের ? হরানন্দ শুধালে।

নবাবের জান ছিল, কলিজার খুন ছিল, দিলের পিয়ারা ছিল, তাই লোকে বলে। গোলাম হোসেন পুঁথি লিখলে, সেও তো বলে তাই। আমি তা জানিনে। আমি জানি, মোহনলালের বেটী ছিল বাঙালী আম্মা। ছিল বাঙালী জরু—বাঙালী বহিন—বাঙালী সিরাজের জন্য সে কেন্দে ছিল। সে-ই বাঙালী আম্মা সিরাজের সাথে সাথে ছিল, তাঁদেরই একজন এখনো সিরাজের কবরে পিদিম জ্বালায়। সে জায়রা হতে পারে, কিন্তু সে তো বাঙালী আম্মা, বাঙালী জরু।

ধান-দুর্বো হাতে নিয়ে বসে যেন শুনছিল হরানন্দ, কথকঠাকুর বকসী-দাদু। কথা শেষ হবার পরও কেউ ওঠার নাম করে নি। আমরুল পরগণার এই নগণ্য গ্রামে এই খড়ের ঘরের এক কোণে মুলিবাঁশের বেড়া আর গজারি কাঠের দরজা দিয়ে বুঝি ঢুকে পড়েছিল এক টুকরো মেঘ। আমবাগের সেই মেঘই বুঝি। বারো বছরের ব্যবধান মানে নি। ঢুকে ভিজিয়ে দিয়েছিল ওদের চোখ। আবার আগুনের ফণা তুলেছিল ছেই ভিজে চোখের মণিকোঠায়।

শুধু কি ঐ এক টুকরো মেঘ ?

মেঘে মেঘে তখন বুঝি ছেয়ে গেছে সুবে বাঙ্গালার আকাশ। আর ঝরছে বৃষ্টি।

জাফরাগঞ্জের নিমকহারাম মীরজাফরের প্রাসাদের নিমকহারাম দেউড়ীতে, যেখানে সুবে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ নবাব হত হলেন, সেখানেও বুঝি ঝরছে। বুঝি ঝরছে মুখসুদাবাদের গঙ্গার ধারে খুশবাগে। সেখানে তো আছে নবাবের কবর। বুঝি সুন্দরী জায়রা বিবি লুৎফন্নেসা আজ চেরাগ জ্বালতে এসে, জ্বালাতে পারে নি চেরাগ। বার বার জ্বালতে গিয়ে নিবে গেছে। সুর্মাহীন চোখের নিবিড় কালো মণি বেয়ে বুঝি ঝরেছে জল, আর সে-জল বুঝি বর্ষাধারায় মিশে গেছে। বুঝি পানের রসে আজ আর টুকটুকে নয় বেগমের লাল অধর, বুঝি গলায় যেখান দিয়ে পানের রস যায় সেখানটা রাঙিয়েও ওঠে নি রক্তরাগে। সেখানটা নীলকণ্ঠের বিষে নীল হয়ে আছে। তাই বুঝি সরকারী মাসহারা তিনশো পাঁচ তঙ্কার মান রাখতে পারেন নি, পারেন নি আংরেজের চেরাগ জ্বালিয়ে স্বামীকে অপমান করতে।

কেঁদেছেন জায়রা বেগম, আঝোরে কেঁদেছেন, আবার বিষের জ্বালায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছে আগুনের ফুলকি। বেগম ফিরে গেছেন।

সেদিন হরানন্দও ভিজতে-ভিজতে ফিরে গিয়েছিল বাড়ি। বৃষ্টির কথা মনে পড়ে নি, তালপাতার জোমড়াটা মাথায় ধরে নি। কাকের মতো ভিজেছিল, কিন্তু সারা গায়ে তখন গনগনে আগুনের আঁচ জ্বলছে, আর তাতে পুড়ে যাচ্ছে; খাক হয়ে যাচ্ছে বুক। মনে পড়ছে কসমের কথা। বদলা নিতে হবে। শ বছর পুরতে দেব না, শ বছরেই জাহান্নমে ঠেলে দিতে হবে কোম্পানী সরকারকে। আবার সরকার বসাতে হবে সুবে বাঙ্গালার মানুষের, হিন্দুস্থানের মানুষের। লন্দন তক্ চলেগী হিন্দুস্তানকী তলোয়ার!

ঘরে এসে খিল এঁটে দিয়েছিল হরানন্দ।

বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ে হয় নি তার। গাঞি দেখে, মেল দেখে বাঁধার চেষ্টা চলছে। গোত্র, প্রবর নিয়ে চলছে বিচার। গ্রহ-নক্ষত্র তো আছেই। এখনো যোগাযোগ হয় নি, তাই গাঁঠছড়া বাঁধা হয় নি, সাতপাকের চক্কোর পড়ে নি। তবু তার ঘর আছে। সে-ঘরে সে একা। সেই একা ঘরেই সে খিল এঁটে দিয়েছিল।

'ফিষ্টঅঙ্গিনী' এসে দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে গিয়েছিল, সে সাড়া দেয় নি। আসলে কৃষ্ণ রঙ্গিনী তার মেজ-বৌঠাকরুণের নাম। কিন্তু কৃষ্ণরাম তার জেঠামশাই। মা নাম ধরে ডাকতে পারেন না, তাই নামটা অমন বিকৃত করে ডাকেন।

এই তো রীতি।

রাম কারো বড় ভাশুর, হরি মেজ ভাশুর, গঙ্গা, গোপীনাথ—এমন সব স্বামী-শ্বশুর-ভাশুর যে-কুলবধূর অদৃষ্ট, তিনি কি দিনান্তেও একবার রাম, হরি কি গোপীনাথের নাম নিতে পারবেন না? আবার মা-গঙ্গা বলতেও তো তাঁর বাধা। তাহলে দিনের এই পাপক্ষয় কি করে হবে?

অদৃষ্ট এমন করেছে, তাই বলে তিনি কি চুপ করে থাকবেন?

কুলবধূ একটা উপায় ঠাওরালেন, রাম হলেন ফাম, গঙ্গা ফঙ্গা। গোপীনাথ ফুপিনাথ, হরি হলেন ফরি। এক ফ দিয়েই কার্যসিদ্ধি। বধূ ছড়া বাঁধলেন—

ফাম ফঙ্গা ফুপীনাথ, ফঙ্গা জলে ফরি
পাপীরে তরাও হে ফরি, ফরি, ফরি!

একসঙ্গে নামও জপা হল, আবার সোয়ামী-শ্বশুরকুলের মানও বাঁচল।

মা কৃষ্ণরঙ্গিনীর নামটা বিকৃত করে ডেকে কুলের মান বাঁচাচ্ছেন, কুলবধূর মান বাঁচাচ্ছেন। আর মুখে মুখে এই বিকৃত নামটা চালু হয়ে গেছে। এখন সবাই ডাকে ফিষ্টঅঙ্গিনী।

কৃষ্ণরঙ্গিনী কিন্তু ছাড়ে নি, আবার কাজ ফেলে এসে ডেকেছিল, বার বার ডেকেছিল।

ও-ঠাকুরপুত, ও-ছোট্‌ঠাকুরপুত! ফিসফিস করে ডেকেছিল কৃষ্ণ-রঙ্গিনী। বৌমানুষ, হাঁক পেড়ে তো ডাকতে পারে না।

খোলেন না কপাট! খোলেন না! দেখেন, চন্দ্রপুলী আনছি!

হরানন্দ চন্দ্রপুলীর লোভে খুলেছিল দরজা।

কৃষ্ণরঙ্গিনী বলেছিল, গোসা কার উপর করলেন? গোসা করার মানুষ তো আসে নাই।

গোসা করেছি কে বলে? হরানন্দ বলেছিল।

তবে কেনে কপাট বন্ধ করলেন?

দেহ ভাল না।

দেখি, কপালে হাত দিয়ে দেখেছিল কৃষ্ণরঙ্গিনী। তারপরে হি-হি করে হাসি। হাসি আর থামে না, মুখে কাপড় গুঁজে দেয়, তবু উছলে পড়ে হাসি। কাপড়ের পুঁটলির ভেতর থেকে কল-কল করে উছলে পড়ে। চোখে মুখে উথলে ওঠে।

হরানন্দের সত্যিই রাগ হয়। সে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

ওমা! মুখ ঘুর‍্যা রইলেন কেনে? কি হল? কালা মুখ দেখতে চান না নাকি? তা গোরা মুখ দেখার তোড়জোড় তো হতিছে।

কে তোমার গোরা মুখ দেখতে চায়—আমি ভাবছি অন্য কথা। শুনবে? তাহলে কপাট বন্ধ করে দাও!

কপাট বন্ধ করে দিয়েছিল কৃষ্ণরঙ্গিনী। হরানন্দ বলেছিল।

আবার আমবাগ। আবার মেঘল দিন। তোপের গর্জন। মীরমদনের পতন, মোহনলালের আততায়ীর হাতে হত্যা। 'কি হলরে জান'—সেই চাপান গান। সেই বিয়োগান্ত যবনিকা। সেই নবাবের খুনের বদলা।

হরানন্দের স্বর বলতে-বলতে বার বার কেঁপে উঠেছিল আবেগে।

কৃষ্ণরঙ্গিনী বোঝে নি, কিছুই বোঝে নি। তবু এইটুকু বুঝেছিল, তার ছোট ঠাকুরপুত আজ নতুন কথা কইছে। সে তো এ সংসারে বহুদিন। গৌরী-দান করেছিলেন মা-বাপ। তাকে পাটে ঘোরায় নি, মস্ত বড় রুপোর থালায় করেঘোরানো হয়েছিল। ছোট ঠাকুরপুত প্রায় তার সমবয়েসী। সে হয়েছিল তার খেলার সাথী। ফুট-ফরমায়েস তাকে দিয়ে সে খাটায়, সাধে-ভজে, আবার পাকঘর থেকে ভাল-মন্দ আঁচল চাপা দিয়ে এনে খাওয়ায়। এই ছোট্ ঠাকুরপুত তার বন্ধু, বন্ধুর চেয়েও বেশি—তার ভাই, তার মন্ত্রী। যত মন্ত্রণা তার সঙ্গে। তার সবকথাই সে জানে। আবার ভট্টি যখন আওড়ায়, মুগ্ধবোধ যখন পড়ে, সে তন্ময় হয়ে শোনে। বুঝুক না বুঝুক, ঝংকার এসে কানে ঠেকে, ভাল লাগে। কুমুদের রেণুতে হলদে হয়ে অন্য ফুলে বসতে গিয়ে ভ্রমর যখন মানিনী ফুলের কাছ থেকে বাধা পায়, মানিনী ফুল অভিমান করে, তখন তার ভিতরের মানিনীও ফোঁস করে ওঠে। তার তাডাশের নায়েব-স্বামীর কাছে বাজুবন্ধের আবদার জানাতে গিয়ে সেও একদিন মানিনী ফুলের মতো ফোঁস করে উঠেছিল। সব বোঝে, বয়সের ধর্ম তাকে বোঝায়। কিন্তু আজ একি কথা ছোট্ ঠাকুরপুতের মুখে! একি কথা? তার ভয় করে। বুকটা টিপটিপ করে, ঢেঁকির পাড় পড়ে বুকে। বলে,—

আপনে ও-কথা কইয়েন না, আমি শুইনতে চাই না।

হরানন্দ বলে, শুনতে যে হবে। এ আমার ব্রত।

অমন বরতের কথা তো জন্মে শুনি নাই।

না শুনেছ, তাই বলে কি শুনতে নেই।

ঐ পর্যন্তই।

জীবনধারা বয়ে চলে। শ্বশুরঠাকুর পুজা-আর্চা নিয়ে থাকেন, ভাশুর ঠাকুর দেখেন জোত-জমি। আর স্বামীঠাকুর করেন নায়েবাতি। আর ছোট ঠাকুরপুত পড়েন টোলে। শাশুড়ী ঠাকরুণ মালা জপতে জপতে তরকারি বানানো দেখেন, হেঁশেলের তদারকি করেন, আবার দিদিশাশুড়ীর হবিষ্যি-ঘরে রান্না চাপান। ছেলেমেয়েরা করে কলরল। জীবনধারা বয়ে যায়।

কৃষ্ণরঙ্গিনী ভুলে যায়। অতো বড় কথা, ভারী কথা, তার মনে থাকবার কথা নয়।

হরানন্দও বুঝি ভুলে যায়।

বকসী-দাদুও আর এ নিয়ে উচ্চ-বাচ্য করেন না

শ্রীল শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুর কায়েম হয়ে বসেছেন, একেবারে গদিয়ান। মীরজাফরের তোলাভর আফিমের মৌতাতে বাংলা ঘুমে ঢলে পড়েছিল। তবু এই মৌতাতের মধ্যেও ইংরেজের মালিকানা তাঁর ভাল লাগে নি। তাই মনিব বদলাতে চেয়েছিলেন মীরজাফর, আংরেজ মনিবের বদলে ওলন্দাজ মনিব। কিন্তু সবৎজঙ্গ সব বানচাল করে দিলেন। মৌতাত তোলাভর পোয়াভর হল। মীরকাশেম এসে সেই মৌতাত টুটাতে চেয়েছিলেন, হেঁচকা টানও মেরেছিলেন। উধুয়ানালা আর বক্সারে জীয়নকাঠী পায়ে, মরণকাঠী শিয়রে উঠে এল। আর সেই সুযোগে ইংরেজ নিলে দেওয়ানি, মসনদে কায়েম হয়ে বসল। বিশ্বাসঘাতকতায় আর দ্বৈত কূটনীতিতে তার মসনদের ভিত্ গড়ে উঠল, বাঙালী শোষণে তার মিনার আকাশ ছুঁয়ে গেল। কালা বেনিয়া জগৎ শেঠেরা ভেবেছিল, ধলা বেনিয়া তাদের জাত—হোক না তারা কালাপানি পাড়ের গাঞি। কিন্তু ধলার আদিকথা জানত না বলে, তাদের হিকমত জানত না বলে কালা-ধলা সমান হতে পারলে না। কালা বেনিয়া বেনিয়ান আর মুচ্ছুদ্দি হয়ে, মাল যোগান দিয়ে তব্ দিলে সাদা মনিবের পুজা করতে লাগল। কোথায় গেল তার সেই চান্দ বেনে, কোথায় সেই শ্রীমন্ত বেনে! সিংহল পাটনে যাওয়া বল্লালের আমলে বন্ধ করে দিয়েছিল ব্রাহ্মণেরা কারসাজি করে। সপ্তডিঙা মধুকর পড়ে ছিল ডাঙায়, গাবকালি না খেয়ে ঘুণে ধরে ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল। বল্লাল জাতপাত করে দিয়েছিলেন বেনিয়াদের। আবার যখন ফাটকের আগল খুলল, যখন আটক রইল না, সপ্তগ্রাম জাঁকিয়ে উঠল। শুধু জাত বেনে নয়, নয়া বেনেও দেখা দিলে কুলীন কুল থেকে। সে বেনে দুর্গাচরণ মিত্তির, সে বেনে গোকুল ঘোষাল, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। কিন্তু বেনে বুঝি তারা নয়, তাই তারা ধলা বেনিয়াদের শোষণের হাতিয়ার হল। তার যোগালে টাকা, তারা খরিদ করলে মাল, হিসেব রাখলে খাতায়। জাহাজ থেকে নামলে বেনিয়া কোম্পানীর কেরানী, বেনিয়ার পয়দা। আর সেই বেনিয়ার পয়দাকে

রাতারাতি বেনিয়ার বাদশা করে দিলে। নিজেরা বেনিয়ান গায়ে চাপিয়ে হল তাদের বেনিয়ান, টাকার যোগানদার, খাজাঞ্চী, হিসেবনবীস, বাজার সরকার। তাতেই তারা খুশী। কালাপানি না পেরিয়ে ঘরে বসে এই নয়া কিসিমের বেনিয়াগিরি শুরু হল। এতেই তারা খুশী, এতেই তারা তর্‌দিল। এই তো তক্‌দির, এই তো নিয়তি। দুর্গাচরণ বোঝেন নি, গঙ্গাগোবিন্দ বোঝেন নি, গোকুল ঘোষাল বোঝেন নি, জয়রাম ঠাকুরও বোঝেন নি। তবুও কেউ-কেউ যে না সমঝেছেন, এমন তো নয়।

বকসী-দাদু, নেহাতই জরীপের আমিন, কানুনগোও নন ; চেন টানতেন, তদারকির ছড়ি ঘোরাতেন না। কাঠা-কালি, বিঘাকালিটা তাঁর পাঠশালে রপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ক্রোক-সাজোয়ালের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতেন, জমির মাপ নিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে তাই চলে আসছিল—সফররাজ হয়ে আলীবর্দী-সিরাজ পর্যন্ত সে-কাম বহাল ছিল। তারপরে রেজা খাঁর তল্‌পিদারী আর করেন নি। তিনি তো আদার ব্যাপারী। দু'চার পয়সার আদা এক হাটে গস্ত করেন তো ফডেমি করে সেই হাটেই তা বেচে দেন। তাঁর তো আদার জাহাজের খবর রাখার কথা নয়। কিন্তু তিনি রেখেছেন, বুঝেছেন, আবার বোঝাচ্ছেনও। অথচ যাঁরা আদার জাহাজের কারবারী, তাঁরা সমঝান নি। এই তো নিয়তি। এই তো তক্‌দির। এই তো ভাগ্য!

অথচ জীবনধারা বয়ে চলে, তাল কাটে না। মক্তবে পড়ান মৌলভী, টোলে পণ্ডিত, পাঠশালে গুরুমশায়।

জাল বোনে মাকড়সার মতো ধলা বেনে, জাল বোনে আর জাল বোনে।

কোন জাতের মাকড়সা?

সেই যে—সেই যে—মধ্য এশিয়ার তৃণভূমিতে দেখা যায়, এরা যেন সেই কারাকুর্ত। খিরগীজ আর তাতাররা এদের যমের মতো ডরায়। এরা দেখতে ছোট, নিরীহ, কিন্তু যখন হুল ফোটায়, যখন চুষতে যায়—তখন তো মরণ-কামড় দেয়। এরা সেই কারাকুর্ত!

বকসী-দাদু জানেন না কারাকুর্তের নাম। কিন্তু তবু তাঁর মনে এদের সম্পর্কে এই ধারণা।

হ্যাঁ, এরা কারাকুর্ত—এরা সাক্ষাৎ শমন। এসব জেনেই বকসী-দাদু বলেন, বোঝান। হরানন্দ বোঝে, কৃষ্ণরঙ্গিনীকে বোঝাতে যায়। কিন্তু

দশ হাত কাপড়ে মেয়েমানুষ ন্যাংটো। কি বোঝাবে তাকে। তবু বুঝিয়ে দিতে গিয়ে ভাল লাগে। কৃষ্ণরঙ্গিনী বুঝুক না বুঝুক, গম্ভীর হয়ে শোনে, সহিষ্ণু হয়ে শোনে। বক্তার কাছে সেইটেই বড় কথা।

কৃষ্ণরঙ্গিনী নবাবের ভাগ্যে চোখের জল ফেলে, বলে—আহা!

হরানন্দ বলে, শুধু চোখের জল ফেলবে! বকসী-দাদু বলেন, ওরে চোখ থেকে তোরা আগুন ঝরা, জল ফেলে কি হবে?

ওমা—চোখে আবার আগুন আছে নাকি গো?

নেই—সেই যে শিবের ঝরেছিল।

ওমা—তেনারা তো দেবতা! তাই বলে মোদের ঝরবে!

ঝরবে, বৌঠাকরুণ ঝরবে।

হরানন্দের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণরঙ্গিনী, চোখে আগুন দেখে নি, কিন্তু মনে হয়েছিল, কালো মণিদুটো জলজল করছে, ঠিক বাঘের চোখের মতো। তার বাপের বাড়ির গাঁযে একবার নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে এমনটি দেখেছিল। কৃষ্ণরঙ্গিনী তাকিয়ে ছিল।

হরানন্দও তাকিয়ে দেখছিল তার চোখের দিকে। অবাক চোখ, কালো চোখ, কাজলের রেখা টানা চোখ! এ চোখ কি শুধু নরম দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতে জানে। শুধু কি বর্ষার আকাশের মতো মেদুর হয়ে উঠতেই জানে। পারে না কি সেই মেদুরতার ভিতরে হঠাৎ নীলাভ কটাক্ষে ত্রিলোচনের বহ্নি আনতে? শুধু কি পারে প্রসন্নদৃষ্টি মেলে বর আর অভয় দিতে, পারে না কি করবালের তেজ নিয়ে ঝলসে উঠতে? পারে—পারে। হরানন্দ নারীকে চেনে না, বাঙালী মেয়েকে চেনে না। তার চোখের আগুন সে দেখে নি। দেখেছিল, একদিন দেখেছিল। দেখার সুযোগ হয়েছিল।

ধীরানন্দ মেজো ভাই, তাড়াশের নায়েব। তিনি মস্ত কোশায় চড়ে মাঝে মাঝে আসেন। সঙ্গে থাকে পাগড়ীধারী বরকন্দাজ, তাদের কোমরের খাপে ঝোলে তলোয়ার, চামড়ার বন্ধনীতে ঝোলে গাদা বন্দুক। জমিদারীর খাজনা আদায় করবার ফাঁকে একবার বাড়ি ঘুরে যান। তখন শোরগোল পড়ে যায় বাড়িতে। সারা গ্রাম ভেঙে পড়ে। আরজির পর আরজি, আবেদনের পর আবেদন। তাড়াশের এলাকা এটা নয়, এটা খোদ রাণী

ভবানীর এলাকা। কিন্তু তাড়াশের নায়েবটি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ। তাই সলা-পরামর্শ করতে আসে মানুষ। এই বংশ এজন্য বিখ্যাত। নইলে এদেশের মানুষই নয় তাঁরা। কুলজী কি বলে, ঘেঁটে দেখে লাভ কি! ওতে সত্যি কথার সঙ্গে মিথ্যে রং মিশলেও মিশতে পারে। গাঁয়ে এখনো ছড়া মুখে মুখে আওড়ায় লোকে—

কোথা হতে এল বামুন পাকুড়তলা বাড়ী,
কেহ বলে কামরূপী, কেহ বলে রাঢ়ী।

সেই বামুনকে কেউ চেনে না, জানে না। তাকে কন্যা দান করে বসলেন এক ব্রাহ্মণ। এক নতুন পটীর সৃষ্টি হল।

রাজশাহীর তখন নামও হয় নি। রাজা মানসিংহের রাজাশাহী তখন বসে নি। কিন্তু পটী গড়া হয়ে ছিল ভালই। আর সে-পটীতে যদি বা যবনঘাতী দোষ পড়ে থাকে, তবু তার নামডাক কিছু কমে নি। এই বংশেরই সন্তান তারা। যজন-যাজন কেউ কেউ করেছেন কেউ করেছেন শক্তির উপাসনা, সাধু হয়েছেন; আবার ক' পুরুষ ওসব ছেড়ে-ছুড়ে খাগের কলম কানে গুঁজে করণ হয়েছেন। বংশের সেই ধারা ধীরারন্দ গঙ্গাগ্রামী বজায় রেখেছেন। তাই তিনি আসেন জাঁকজমকে, করতোয়া বেয়ে তাঁর কোশা এসে ঘাটে ভিড়লে গাঁয়ে ধুম পড়ে যায়।

আজও পড়েছে। এবার যেন ধুম বেশি। এ কোশাও ঢের বড়, পাইক বরকন্দাজেরও ঘটা খুব।

কি ব্যাপার?

মনিব বদল করেছেন ধীরানন্দ গঙ্গাগ্রামী। তিনি বাড়িতে বাপ-মাকে, গুরুজনদের প্রণাম করে সে-খবর জানালেন।

নন্দলাল রায় ইজারাদার হয়েছেন আনরূল পরগণার। কোম্পানী বাহাদুরকে অনেক নজরানা দিয়ে এ-পরগণা নিয়েছেন। অনেক সিক্কা আমলা-ফয়লার উদরে গেছে। এখন ধীরানন্দ তাড়াশ ছেড়ে নন্দলালের কাজে বহাল হয়েছেন। এইমাত্র নাটোর থেকে আসছেন।

বৃদ্ধ বাপ শুধালেন, রাণী ভবানীর কি হল র‍্যা? তিনি আছেন তো?

আছেন বই কি!

বৃদ্ধ আর কথা বললেন না, ধীরানন্দও ঘরে ঢুকলেন।

হরানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল।

বকসী-দাদুর কাছে সে দুপুরে গিয়ে হাজির হল।

কিরে—কি খপর?

দাদা এসেছেন।

কোথা থেকে রে? তাড়াশ থেকে?

না নাটোর থেকে?

কাঁচা গোল্লা এনেছে বুঝি রে?

তা জানিনে, তবে খবর নিয়ে এসেছেন।

কি খবর? বকসী-দাদু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আমরুল পরগণা—নন্দলাল রায় বলে কে একজন কোম্পানী বাহাদুরের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে। দাদা এখন তার দেওয়ান।

তারপর? চকচকিয়ে উঠল বকসী-দাদুর চোখ।

তারপর পিতাঠাকুর জিগুল্যান—কিরে, রাণী ভবানীর কি খবর?

দাদা বলেন, তিনি আছেন নাটোরে।

আর কিছু বলে নি?

না।

তা আমার কাছে ছুটে এলি কেন র‍্যা হাওয়াইবেগের ব্যাটা?

শুধাতে এলাম—একি ব্যাপার!

ব্যাপার গুরুতর! বকসী-দাদুর মুখ গম্ভীর। তালপাতার একখানা পুথি পড়ছিলেন, পাটা বুজিয়ে রেখে বললেন, বোস্ বোস্।

হরানন্দ বসল মাদুরের একধারে।

বকসী-দাদু বললেন—

জমিদারী বানের জল, বন্যের জল। এই একজনের থাকে তো আবার জল চলে যায়, আর একজনের ঘরে গিয়ে সেঁধোয়। জমিদারীর লক্ষ্মী অলক্ষ্মী। তাঁর খুব দবদবা। গেরস্ত ঘরের লক্ষ্মীর মতো দুখানা বাতাসা আর একটু গুড়ে তুষ্ট নন। তাঁর চাই পোড়া মাছে, পোড়া মাংসে আমানা ভুজ্জি। পুণ্যির হাওয়া লাগলে অমনি পালাই পালাই করে। রাণী ভবানীর পুণ্যির হাওয়া সইবে কেনে? সাঁতোলের রাণী শর্বাণী দান-ধ্যান করলেন, আর দুদিন যেতে না যেতেই লক্ষ্মী তাঁদের বংশ ছেড়ে নাটোর বংশের রঘুনন্দনের কাছে

চলে গেলেন। আবার ভবানী-মা অলক্ষ্মীকে চটিয়েছেন। নবাবের নিমক-হারামের দলে ভেড়েন নি, নিজে দান-ধ্যান করছেন আর অমনি অলক্ষ্মী পালাই-পালাই ডাক ছেড়ে চললেন।

কথায় বলে—

কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, রাণী ভবানীর বৃত্তি।
দিনাজপুরের নগদ দান, বর্ধমানের কীর্তি ॥

তা যার যত কীর্তিই থাক, রাণী ভবানীর মতো কে এমন টোল বসিয়েছে দেশে, সরস্বতীর থান বসিয়েছে! তাই ঐ অলক্ষ্মীর রাগ।

বকসী-দাদু একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, রাগ না হলে এক মাত্র কন্যা, তাঁর বিভা দিলেন অমন গজরাজ জামাই রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে, আর সে কিনা অকালে মরল! আর ভবানী মাকে পুষ্যি নিতে হল! তাঁকেও তো মানুষ করেছেন কিন্তু সবৎজঙ্গ যে ভেলকি দেখিয়ে তখত কেড়ে নিলে, সেই ভেলকিতেই কোম্পানী এখন গদীয়ান। সবৎজঙ্গ জেবে অনেক টাকা পুরেছিলেন, নয়া সবৎজঙ্গ হেষ্টিংস তার উপরেও এক কাটি সরেশ। ও যদি বাজ হয় তো, এ বাজগীল—বাজকে গেলে। কোম্পানীর ফুৎবামোদের ভরাতে হবে, কোম্পানীর খোদ কর্তা জাঁদরেলের পেট টৈ-টুম্বুর করে তুলতে হবে, আমলা-ফয়লারা খুদে নবাব হবে—এই তো চাই। তাই জমিদারদের হাত থেকে জমিদারী কেড়ে নিয়ে নয়া নয়া ইজারাদার বসাচ্ছে। লাভের লালচে সে-বেটারাও ছুটে আসছে, কিন্তু এর ফল কি ভাল হবে র‍্যা!

হরানন্দ কথা বলে নি। চুপ করে ছিল।

না, হবে নি, মাথা নেড়ে বলেছিলেন বকসী-দাদু। ভাল হবে নি। ওরা অলক্ষ্মী ঢোকাল ঘরে—ভালাই হবে নি, ওরা মরবে. প্রজা মরবে, মুলুক ছারেখারে যাবে।

তাহলে উপায়?

উপায়?—তাই তো! বকসী-দাদুর বলিরেখা-পড়া ললাট আরও কুঞ্চিত হল। তারপরে তামাকের নেশায় ডুবে গেলেন। আর কথা হল না। একসময়ে হরানন্দ চলে এল।

কৃষ্ণরঙ্গিনীই তাকে খবরটা দিলে।

যেমন এসেছিলেন কোথায়, একদিন একরাত্রি বাস করে চলেও গেছেন ধীরানন্দ। গ্রামের জীবনযাত্রা হাউড়িয়ে দিয়েছিলেন, আবার স্থির হয়ে গেছে। কৃষ্ণরঙ্গিনীও একরাত্রির স্বামী সোহাগে সোহাগিনী। ননদিনী যাঁরা আছেন, সেই ঠাকুরকন্যার দল এখন স্বামীর ঘরে। তাই স্বামী সোহাগের চিহ্ন ধারণ করে লজ্জায় কালো গাল বেগনী হয়ে উঠল না। মন খলবল, উতাল। আবার যেন কি ভেবে অস্থির, আশঙ্কায় অধীর।

দেওরকে এসে বললে সে কথা—ও ছোট ঠাকুরপুত, সর্বনাশ হয়্যা গেল!

কি আবার হল?

ইজারদার রাজ্যি নিচ্ছে। তেনি তো তার দেওয়ান। বলল্যান, এবার সোনায় তোর গা মুড়ে দেব।

বললাম, সোনাডা আসবে কোথিকে?

বললেন, ভাবনা কি র‍্যা, এবার পোয়া বারো! ইজারদারের হুকুম, খাজনা চাই। যেন তেন প্রেকারে খাজনা চাই, নইলে ইজারা থাকবে নি, অগ্গেয়ে কোম্পানী না কি হুকুম দেছে। তাই বুললেন, ঝাড়েমূলে এবার খাব, ইজারদারের প্যাট ভরাব, কোম্পানীর প্যাট ভরাব আর নিজের প্যাট কি খালি থাকবে? দেখিস—অঙ্গিনী, এবার চৈতের কোণায় বর্ষালেই হালিয়া মাগীর কানে সোনা উঠবে, রূপার পৈছা উঠবে হাতে, আর সেগুলি কেড়ে এনে তোর সাতনরী হার গড়িয়ে দেব, তোর কানের ঢেঁড়ি-ঝুমকো গড়িয়ে দেব।

জিগুলাম, ওমা-হালিয়া মাগীর কানে সোনা হবে না কি গো—সত্যি?

তেনি বলল্যান, আরে দূর সোনা হবে কোথিকা? ছেয়াত্তরের আকালে গাঁকে গাঁ উজাড় হয়ে গেছে। তবে সেবারে খুব আদায়-উশুল হয়েছিল। বলল্যাম, ওমা-আদায়-উশুল হবে কি গো? সব যে মর্যা ছারেখারে গেল! তেনি বলল্যান—সে তুই কি বুঝবি রে অঙ্গিনী, তুই কি বুঝবি! তোর সেবার গলায় সাতনরী দুলয়্যা দিছি। পায়ে মল আর পাশুলি দিছি, কোমরে দিছি গোট।

কৃষ্ণরঙ্গিনী বলেছিল, হাচাই কথা কিন্তু ঠাকুরপুত!

হাচাই কথা, সাচ্চা কথা। হরানন্দ অবাক হল। তার মনে আছে আকালের কথা। তাঁদের গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল মড়কে। হাড়ী, বাগদী, পোদ—ওরা তো ভিটেবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে ছিল, তদ্দরলোকেরাও

পালিয়েছিল। তারা পালায় নি। মাটি কামড়ে পড়েছিল। তার দাদা হীরানন্দই তখন তাদের বাঁচিয়ে ছিল সেই অজন্মা আকালে। যারা গেল, তারা অনেকেই ফিরে আসে নি। ভবানী-মা মানুষের জন্য অনেক করেছিলেন, কিন্তু বাঁচাতে পারেন নি। তখন গাঁ শুধু ছাড়া ভিটে, শুধু শ্মশান-মশান। সেই মশানে আবার মানুষ এসে বসেছে।

হরানন্দ শুধু এইটুকু জানে, আর কিছু জানে না। কৃষ্ণরঙ্গিণীও তেমন-কিছু জানে না। শুনেছে আর চোখে দেখেছে—শুধু সেইটুকু। আর সেবার গা-ভরতি গয়না পেয়েছিল তাও তার মনে আছে। থাকবে না কেন? গয়না আছে আমকাঠের সিন্দুকে—যখন-তখন পরতে দেন না শাশুড়ী-ঠাকরুণ। আটপৌরে আছে নোয়া, আছে মোটা শাঁখা; শাঁখার আংটি। আর ঐ জিনিসগুলো পোশাকী। যখন-তখন বেরোয় না। বেরোয় নায়রী যেতে। বাপের বাড়ি যেতে। তখন আমরুলি পাতা দিয়ে মাজা হয়—চীনাপাত সোনা ঝকমকিয়ে ওঠে। কিন্তু গয়নার খাঁজে-খাঁজে যে আছে কত চাষীর রক্ত—তা কি করে জানবে?

কি করে জানবে যে, চাষীর রক্ত তার স্বামী ছিনে-জোঁক হয়ে শুষেছে জমিদারের জন্যে, জমিদারের কাছ থেকে তা বড় জোঁক হয়ে শুষেছে রেজা খাঁ-সীতাবরায় কোম্পানী। নিজেদেব ভোগে লাগিয়েছে, আবার কোম্পানীর নাদা পেটও ভরিয়েছে। আর কোম্পানী-বাহাদুরের কাউন্সেল রিপোর্ট পেশ করেছে সাত সাগরের পারের মালিকদের কাছে—

…মন্বন্তরে মানুষ ধ্বংসের খতিয়ানও তাই প্রচণ্ড। কিন্তু খাজনা আদায় হয়েছে বেশ।

ডিরেক্টর বোর্ডে সে রিপোর্ট পড়ে জন-কোম্পানীর মালিকেরা খুশী হয়েছিলেন। ভেরী গুড! এই তো চাই। ক্লাইভের জন্য হয়তো কারো কারো মনও কেঁদে উঠেছিল।

ক্লাইভ—সবৎজঙ্গ!

ম্যাডেইরা আর লাল সরাব আর হুইস্কী মিশিয়ে যদি মৌতাত বেশ জমাট হয়, যদি মীরশামে ভাল তামাক ঠেসে নিয়ে ধরানো যায়, যদি মোনাসিব-মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে—তখন সবৎজঙ্গের কথা মনে না পড়ে পারে না।

সবৎজঙ্গ—বেনিয়া স্বার্থের তাঁবেদার, নিমকহালাল; নিজের স্বার্থেরও কম ওস্তাদ নয়। সেই সবৎজঙ্গ হাউস অফ্ কমন্স-এ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন।

কোন খ্রীষ্টাব্দ সেটা?

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

বলেছিলেন—

কোম্পানী পেয়েছেন শাহানশাহী, বাদশাহী। পেয়েছেন এম্পায়ার। ফ্রান্স আর রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপের যে কোন দেশের চেয়ে বড় এই রাজ্য। খাজনা আদায় হয়েছে লাখে লাখে টাকা। ফোর মিলিয়ান ষ্টার্লিং। আর সেই অনুপাতে করেছেন বাণিজ্য। এতে শাসক-কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু তাঁরা কি তা দিয়েছেন? না। কর্তৃপক্ষ এই কোম্পানীকে সেই সাউথ সী কোম্পানীর মতো বুদ্‌বুদ্‌ই মনে করেছেন। তাঁরা তাই বর্তমানটাই দেখছেন, ভবিষ্যৎটা দেখছেন না।

ভাবছেন, আজ যা পাই, নিয়ে নিই, কালকের কথা কে ভাবে! এখন রুটি আর মাছের ভাগটাই ভাবনা।

তা রুটি-মাছের ভাগ জুটেছে বেশ, কিন্তু ইণ্ডিয়ার কথা কে ভাবে!

সিক্কা চাই, সোনা চাই, আর কি চাই!

আর কিচ্ছু না, কুচ নেহী, নাথিং মোর।

ছিয়াত্তরের আকালে ভাবে নি, এখনো ভাবে না, পরেও ভাববে না।

বিলেতের শাসনকর্তা আর কোম্পানীর লুঠেরা ডিরেক্টর-বাহাদুরদের একথা জানে না কৃষ্ণরঙ্গিনী, জানে না হরানন্দ। জানে না ধীরানন্দ। সে তো শোষণের যন্ত্রের একটা ওয়াশার। তার ভাববার এক্তিয়ার কি?

আমিরচাঁদ, হুজুরীমল, বুলাকিপ্রসাদ আর ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, বোষ্টম চরণ শেঠেরাই কি জানেন?

জানেন না।

সবৎজঙ্গ-ক্লাইভ জানতেন, জানেন হেষ্টিংস—আর জানেন কোম্পানীর ডিরেক্টর-পুঙ্গবেরা। তাই হেষ্টিংসের ইশ্‌তেহার বেরুল, চাই, আরও খাজনা চাই। পুরোনো জমিদারেরা ম্যাথট আদায় করেছেন, বাজে জমা নিয়েছেন, কিন্তু তেমন করে শোষণ করে নি। বরং দান-ধ্যান করেছেন, বৃত্তি দিয়েছেন, নিজের গোলা খুলে দিয়ে আকালে বাঁচিয়েছেন। সামন্তেরা বেনিয়া হতে

পারে না প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু এবার ইজারাদারের পালা, তারা তো শুনবে না।

উপায় ?

উপায় মা-ভবানী। আর রাণী ভবানী।

উপায় পুঁটিয়া, উপায় নাটোর।

প্রজারা মুখ চেয়ে রইল।

প্রজা সন্তান, তাদের মুখ চেয়ে রাণী ভবানী অভয় দিয়েছিলেন, কোম্পানী-কে বলেছিলেন, দেব, তুমি যা চাও, তাই দেব—তোমার পেট ভরাব।

কিন্তু পেট ভরাতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। অথচ প্রজা-পীড়নে সে-কোষ ভরাতেও পারেন না, শেষে রাজকোষ শূন্য হতে হাল ছেড়ে দিলেন।

কোম্পানী-বাহাদুর এবার কালা বেনিয়াদের মুখের দিকে চাইলেন, ইজারা-দারদের উপরে ভরসা করলেন। তারা বললে, কুচ পরোয়া নেই, আমরা দেব।

তারা দিতে লাগল। কোম্পানীর তহবিল ভরে উঠল। তাদের নগদীরা, পাইকরা ছুটল, তাদের নায়েব আর দেওয়ানেরা প্রজার কাস্তে-কুড়ুল ক্রোক করলে, প্রজা বৌয়ের রুপোর নথ ছিঁড়ে নিলে, পৈছে-হাঁসুলি কেড়ে নিলে।

দীরানন্দ গঙ্গাগ্রামীও তাদের দলে। হালিয়া মাগীর কানের সোনা তো বটেই, কানের লতিও জখম হয়ে গেল। সেখানে রক্তের ফোঁটা জমে উঠে শুকিয়ে রইল। সেই রক্তই হল সোহাগের সোনা, ঢেঁড়ি।

প্রজারা কি করল ?

নগদীর বেত খেল, নায়েবের জুতি খেল। ঘটিবাটি ক্রোক-সাজোয়াল এসে কেড়ে নিয়ে গেল। ঠুনকো ঘটিবাটির সঙ্গে তাদের মেয়েদের সতীধর্ম গেল। সেও বুঝি তেমনি ঠুনকো।

এ-খবরে বামুনদের কি, তাদের ব্রহ্মোত্তর আছে, বৃত্তি আছে। এ-খবরে কায়েতের কি —তাদের তো আছে নোকরি। তালুকদারের কি, তার তো পোয়া বারো। বাকি খাজনার জন্যে যাচ্ছেতাই করা চলবে। তহসিলদার-গোমস্তা-নায়েব-দেওয়ানের কি ? তাদের তো লুটের মহোৎসব লেগে গেল। সত্যিই তাদের কি ? বকসী-দাদুরই বা কি ?

তাঁর তো আমিনগিরির পয়সা আছে, জোত-জমি আছে, আর আছে খেলো হুঁকো আর সেই নক্সীদার চীনামাটির সোরাই।

হরানন্দরই বা কি? সে তো টোলের ছাত্র। হয় যজন-যাজন নেবে—নয় তো ফারসী শিখে কারকুন হবে।

তবু হরানন্দ বকসী-দাদুর কাছেই ছুটে গেল।

বকসী-দাদু বাড়ি নেই। তাঁর চাকরই খবর দিলে।

সেই যাকে বলে পুবে শুধু ঝুগ্‌ঝুগে দিয়েছে ভোর, তখন বেরিয়েছেন। আর সারা দিনমান দেখা নেই। সূর্য তো এখন ডুবু-ডুবু।

দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে দিলে চাকর, বসল হরানন্দ।

রাত বাড়ছে, দাদুর দেখা নেই।

বসেই রইল হরানন্দ, যখন উঠতে যাবে, তখন দাদু এলেন।

এসে তাকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে শুধালেন, কিরে কাশ্যপ গোত্তর, কি সংবাদ?

আপনার সংবাদ জানতে এলাম। উত্তর দিলে হরানন্দ।

আছে রে, জোর খবর আছে, বোস তুই, আমি আসছি!

এই বলে ভিতরে চলে গেলেন।

হরানন্দ বসে বসে মশার কামড় খেতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে ফিরলেন বকসী-দাদু। স্নান সেরে এসেছেন, কাঠের কাঁকই দিয়ে চুল আর দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে এসে হাজির হলেন। বললেন—

ওরে হাওয়াবেগের বেটা, আগুন জ্বলেছে, একে হাওয়া দিতে হবে। তবেই পলাশীর কর্জ শোধ হবে।

হরানন্দ কথা বলে নি, তন্ময় হয়ে শুনেছিল।

দিকে দিকে ইজারাদারের বিরুদ্ধে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। সে আগুনে এখন ইন্ধন যোগাতে হবে। সে ইন্ধন যোগাবে কে? যারা জমিদার তারা নয়, যারা তহসিলদার তারা নয়, যারা যজন-যাজন করে তারা নয়, কিন্তু তাদেরই জাত থেকে জাতিচ্যুত মানুষ চাই। যারা এদের সঙ্গে মিশতে পারবে, এদের ব্যথাকে নিজের ব্যথা করে নেবে। শোষণের চাকাটাকে যারা তৈলসিক্ত করে চালাতে কাঁধ দেবে না। তারা সে চাকা রুদ্ধ করার হুমকি দেবে। তারা কারা?

বকসী-দাদু কথা শেষ করে বললেন, তোর জাত আছে নাকি রে?

বাঃ, জাত নেই আমার।

না সে জাত নয়, এই জাত রে কুলিখানের বেটা! এই যে যারা শুষে নেয়, চুষে নেয়—তাদের জাতের সঙ্গে তোর মেল বেঁধেছিস নাকি? তাদের জাতের তাঁবেদারি করিস নাকি?

আমি করি না, আমার দাদা তো করে। হরানন্দ উত্তর দিলে।

বকসী-দাদু বললেন—দাদা করে তো করুক। কিন্তুক তুই তো কাশ্যপ গোত্তর হতে পারিস। সব হারিয়ে ওদের সঙ্গে মিশতে পারিস!

দাদু, আমি পারি?

তোর চোখ বলছে পারিস, মুখ বলছে পারিস।

হরানন্দ বকসী-দাদুর দিকে চেয়ে বললে, পারব দাদু, আমি পারব।

তারপর আর দ্বিধা থাকে নি, সন্দেহ থাকে নি।

তারপর স্বপ্নের মতো দিনগুলি।

ঝড়ের গতিতে এগিয়ে-চলা দিনগুলি।

বিদ্রোহের অগ্নিঝরা দিনগুলি।

গ্রামে গ্রামে ঘুরছিল তারা। পরগণার পর পরগণায় তখন আগুন দাউদাউ জ্বলছে। আর সেই আগুনে হাওয়া দিয়ে বেড়াল তারা।

মানুষকে ইজারাদারদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। গ্রামরক্ষীবাহিনী তৈরী হল এক নিমেষে, আর সেই বাহিনী ইজারাদারদের পাইক আর নগদা ফৌজ, নায়েব আর তহসিলদারদের তাড়িয়ে দিতে লাগল। কোথাও বা তাড়িয়ে দিলে, কোথাও বা পারলে না। তবু আগুন তো নিবল না, জ্বলতে লাগল—আর বকসী-দাদু আর সে ঘুরতে লাগল। লাট্টুর মতো বনবন করে ঘোরা।

এরই মধ্যে একদিনের কথা মনে পড়ে হরানন্দের

সেদিন তারা ঘুরতে-ঘুরতে এসে হাজির ভবানীপুরে। করতোয়া, আত্রেয়ী আর যমুনার তিনটি ধারা এসে মিশেছে—এখানেই ভবানীদেবীর আদ্যাপীঠ। দেবীকে স্কন্ধে নিয়ে যখন শিব ঘুরছিলেন সারা জম্বুদ্বীপময়, তখন বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হয়ে এখানে পড়েছিল সতীর তল্প বা বাম কর্ণ। তার থেকেই দেবী ভবানীর উৎপত্তি। জাগ্রত ভবানীদেবী, যাঁর নামে এই গ্রাম। এ গ্রাম ছিল না, দেবীর মন্দির ছিল না, শুধু ছিলেন দেবী। তাও তুর্ক

ঘোড়সওয়ারের পায়ের খুরে বাংলা যখন টাল-মাটাল—এ তীর্থ লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এ-তীর্থের উদ্ধার হয় সেই গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন শাহের সময়ে। সেই থেকে হিন্দুরা দলে দলে আসে পূজো দিতে, মুসলমানেরাও আসে। সান্তোলের রাণী শর্বাণী দেবী মন্দির গড়ে দেন। সে-মন্দির জরাজীর্ণ হয়ে আসে কালের প্রবাহে। আবার সে-মন্দিরের সংস্কার করেছেন রাণী ভবানী। জাগ্রত মা-ভবানী। যে যা বর চায়, পায়। বরাভয়া। সে কোন্ যুগের কথা। এক তুর্ক সেনাপতি না কি দুরারোগ্য রোগ থেকে আরামের আশায় হিন্দুর এই দেবীর কাছে মানত করেছিলেন। আর সেরেও গিছলেন। তিনি এখানে এক জোড়া-বাঙলা তৈরি করে দেন। সেই থেকে মুসলমানেরাও আসে, মন্দিরের চৌহদ্দীর বাইরে থেকে পাকা ভোগ দিয়ে যায়।

মা ভবানী আছেন, শিব আছেন বামন-ভৈরব। তারা মা-ভবানী আর বামন-ভৈরবের পূজা দিতে আসে নি। তারা যাবে ভিনগাঁয়ে। মন্দির পথে পড়ে। বকসী-দাদু বললে—

চল—মার পায়ে দুটো জবা ফেলে যাই। ভারী জাগন্ত দেবতা!

ঘাটে নৌকা বাঁধা হল, দুজন স্নান করে মন্দিরে এলেন।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে পালকি থেমে আছে। ময়ূরপঙ্খী পালকি। আর কাহারেরা জটলা করছে।

ওদিকে ভিখারীর ভিড়। কড়ি আর চাল বিলানো হচ্ছে ধামা ধামা।

হরানন্দ শুধালে, এ কার পালকি?

বকসী-দাদু বললেন, ঠাহর করতে পারছি নে বাবা! পুঁটিয়া, না, দীঘাপাতিয়া! দাঁড়া বাবা, জিজ্ঞেস করি।

কাহারদের কাছে গিয়ে শুধালেন, এ কার পালকি গো কত্তা?

আমার পালকি!

বকসী-দাদু চমকে ফিরে তাকালেন। হরানন্দও তাই।

হরানন্দ দেখলে, সমুখে তসরের থান পরনে এক মহীয়সী নারীমূর্তি! দুর্গা প্রতিমার রং মুখে, বালেন্দু আভা ঠিকরে পড়ছে। চোখদুটি দেখেই মনে হয়—প্রপন্নার্তিহরা দেবী। চাঁদির তারের মতো কেশগুচ্ছ ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়—বৃদ্ধা কিন্তু অপূর্ব তাঁর রূপ।

বকসী-দাদু এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বললেন, মা আপনি! মা-ভবানী!

হরানন্দ ছুটে গিয়ে প্রণাম করলে। এ রাজ্যে মাকে না চিনলেও সবাই জানে।

আশীর্বাদ করলেন রাণী ভবানী—বাবা, সুখে থাক! দীর্ঘজীবী হও।

বকসী-দাদু বললেন, মায়ের ও আশীর্বাদ তো ফলবে না। বলুন মা, দুঃখে থাক, ক্ষীণজীবী হও।

রাণী-মার আয়ত চোখদুটি সজল হয়ে এল, মুখের বলিরেখায়-রেখায় শোকের কুঞ্চন যেন আরও গভীর। শুধু মৃদুস্বরে বললেন, ছিঃ বাবা! ও আশীর্বাদ কি মা করতে পারেন?

বকসী-দাদু বললেন, পারেন না! তা তো জানি। কিন্তু পরগণার পর পরগণায় তো দেখে এলাম ঐ আশীর্বাদই ফলছে। ভাবলাম, মা কি বিরূপ হয়েছেন! তাই কি আশীর্বাদ না করে অভিশাপ দিলেন!

রাণী ভবানী মুখ নীচু করে বললেন, লজ্জা দিয়ো না বাবা! কিন্তু আমি কি করব? আমি নিরুপায়।

আমরা সব জানি না, বকসী-দাদু বললেন। কিন্তুক আমরাও যে নিরুপায়। তাই সব হারিয়ে-টারিয়ে মার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকি। তাঁকেই আমরা ভরসা বলে জানি। আর কাকে ভরসা করব বল মা!

সূর্য মেঘে ঢেকে যেতে দেখেছে হরানন্দ, আনেখল সঞ্চরমান ঘন মেঘের কথা জানে, কিন্তু সে শুধু অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব—আজ সে দেখলে, রাণীমার বালেন্দু আভাময় মুখে মেঘের ছায়া, কালো ছায়া, দুঃখের ছায়া। চোখ সজল।

সে-মূর্তি বড় সুন্দর। বিজয়া দশমীর বিসর্জনের বরণ করতে এসে পুর-নারীরা যে-মূর্তি দেখেছেন দশভুজার—এই সেই মূর্তি।

হরানন্দ চোখ ভরে দেখলে, প্রাণভরে দেখলে।

ভবানী-মা শুধু বললেন, তোমরা কে বাবা, জানি না। জানি—তোমরা আমার ছেলে। আমার ছেলেদের বলো—মার হাত-পা বেন্ধে দিয়েছে কোম্পানী—কিন্তু মন বাঁধতে পারে নি। সেই মন আছে তোমাদের সঙ্গে। বলো—ভবানী আছেন তাদের সঙ্গে। আর বলো—ভবানী চান না রাজ্য, রাজদণ্ড ধরতে চান না—তিনি চান মহাভারতের সেই রাজ্য যেখানে—

ন তত্র রাজাসীৎ ন দণ্ডো, ন চ দণ্ডিক।
স্বধর্মেণ ধর্মজ্ঞা তে রক্ষন্তি চ পরস্পরম॥

সেখানে রাজা নেই, দণ্ড নেই, দণ্ডিক নেই। সেখানে ধার্মিক মানুষ পরস্পরকে রক্ষা করেন। কিন্তু ভবানী তো তা পারলেন না। বলো —তারা যদি তা হাসিল করতে পারে, ভবানী আছেন তাদের সঙ্গে।

এই বলে পালকির দিকে এগিয়ে গেলেন। কবাট ফাঁক করাই ছিল, উঠে বসলেন। কবাট বন্ধ হল।

বকসী-দাদু আর হরানন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন।

হরানন্দের মনে পড়ল—মোহনলালের বেটী কেন কেঁদেছিল, সেকথার মানে সেদিন কিছুটা বুঝেছিল, আজ আরও ভাল করে বুঝল। মোহনলালের বেটী যার জন্যে কেঁদেছিল, ঠিক তারই জন্য কাঁদলেন রাণী-মা ভবানী। কবাটের আড়ালে বসে এখনো কাঁদছেন তিনি। ঐ যে কাহাররা চলেছে পালকি নিয়ে হৈ-হৈ করে, সেই রুদ্ধদ্বার পালকিতে তিনি মকমলের আসনে গড়িয়ে পড়ে কাঁদছেন। আঠারো ক্রোশ দূরে নাটোরে গিয়ে যখন পৌঁছবেন, তখনো কাঁদবেন। কান্না থামবে না। উথলে উথলে উঠবে। উছলে উছলে উঠবে।

মোহনলালের বেটী কান্দে কেনে?

রাণী ভবানী কান্দেন কেনে?

আজ হরানন্দ বুঝল।

পরগণায় পরগণায় যে-আগুন ছিল স্ফুলিঙ্গমাত্র, সে-আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। নিরন্ন প্রজার দল সংঘবদ্ধ হল। রাণী ভবানী তাদের সঙ্গে আছেন, আর কি চাই! তিনি তোপখানা থেকে ঢাল-তলোয়ার, সড়কি, বন্দুক পাঠান নি—পাঠিয়েছেন নিজেকে। তাই বাঁশের তেলকুচকুচে লাঠি তাঁরই আশীর্বাদে বন্দুক-সড়কি ঠেকাতে এগিয়ে এল। ইজারাদারের লোকেরা ভয়ে পেছু হটল। এবার ইজারাদারেরা শরণ নিলে কোম্পানীর বীরবাহুর। বৃটেনের দুঁধে লেফটেনাণ্টরা কলকাতার নয়াকেল্লা ফোর্ট উইলিয়ামে কর্ণাট আর মহীশূর লড়াইয়ের জন্য একেবারে তৈরী হয়ে আছে। তাদেরই কয়েকজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল রাজশাহীতে। তারা এসে মিশল ইজারাদারের ফৌজের সঙ্গে। এবার মিলিত হানা শুরু হল। কিন্তু রায়তরা

পিছু হটল না। তারা মারল, মরল, রাণী-মার জয় জয়কার দিলে। রায়তের মা-বৌ-বেটীরা জোকার দিলে লড়াই শেষে যখন সবাই ফিরে এল।

নাটোরের রাজবাড়িতে সব শোনেন রাণী ভবানী। কোম্পানীর অত্যাচারে কাঁদেন, আবার প্রজার বিজয়ে হাসেন। নিজেকে তিনি শামিল করে দিয়েছেন তাদের সঙ্গে। তাঁর স্বপ্ন সেই মহাভারতের রাজ্য—রাজার নয়, মানুষের রাজ্য।

হরানন্দের চেয়ে সেকথা আর ভাল করে কে জানে! তার কানে বাজে সেই মধুর গম্ভীর স্বর।

সেদিন এক গাঁয়ে গেছে তারা।

রাত হয়েছে। চারিদিকে বসেছে পাহারা। এমন সময় খবর নিয়ে এল চর। ইজারাদারের দল আসছে, সঙ্গে কোম্পানীর ফৌজ।

অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মেয়েরা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে চলে গেল আমবাগানে, জামবাগানে। জোয়ানেরা রইল পথের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে। ঢিল পাটকেল ছুঁড়বে, তীর ছুঁড়বে—তারপর বেগতিক দেখলে পালাবে।

গাঁয়ের ধর্মগোলার রক্ষক ছিল হরানন্দ। যদি ফৌজকে না হঠানো যায়, তারা ধর্মগোলায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে।

ডিম ডিম তালে বাজছে দূরে বাজনা, একটা মহাবন্যার স্রোত আসছে ধেয়ে, তারই উচ্চণ্ড কলরোল। ফৌজ আসছে, শাঁখ বেজে উঠল। সবাই তৈয়ার।

হরানন্দ জানত এ অসম যুদ্ধ—তবু সে বাঁশের লাঠি আর পাকাটির আঁটি নিয়ে বসেছিল, সঙ্গে ছিল চকমকি পাথর। ভয়ে দুরুদুরু করছিল তার বুক।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, ভয় কি?

নারীকণ্ঠ, মধুর বরাভয় কণ্ঠ।

চমকে তাকিয়েছিল হরানন্দ।

কেউ নেই। শুধু অন্ধকার।

আবার সেই স্বর—ভয় নেই!

হরানন্দ চমকে উঠেছিল। মনে পড়েছিল—এ সেই ভবানী মন্দিরে শোনা স্বর। রাণী মা-ভবানীর স্বর।

তিনি সঙ্গে আছেন—মা ভৈঃ হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী!

ফৌজ এসেছিল পঙ্গপালের মতো, রাত্রির আকাশ কলরোলে বিদীর্ণ করে দিয়ে। তারা পারে নি, তবু ঝোপঝাড় থেকে তীর ছুঁড়েছিল। মুখোমুখি লড়াইয়ে বাঁশের লাঠি তলোয়ারকে হার মানিয়েছিল। কিন্তু বন্দুকের কাছে হারতে হয়েছিল, তোপের পলতের আগুনে পুড়ে ছারখার হতে হয়েছিল। তবু হরানন্দ ভয় পায় নি। ধর্মগোলায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে সে চলে এসেছিল।

রাণী ভবানী-মা ছিলেন তার সঙ্গে। শুধু তার সঙ্গে নয়, যারা পালাল তাদের সঙ্গে, যারা পালাতে পারল না তাদের সঙ্গে।

মাথায় ভবানীপুরের জাগ্রতা দেবী মা-ভবানীর আশীর্বাদ রইল, রাণী ভবানী-মা রইলেন সঙ্গে, তাঁর দিব্যদেহ রইল, আর ভয় কি! ভয় পেল না মানুষ, মরতে মারতে আর ভয় পেল না। কিন্তু তাঁর এই অনুপ্রেরণার খবর কি করে পেয়ে গেলেন নাটোরের রেসিডেণ্ট সায়েব? বেনিয়া কোম্পানী ধূর্তই ছিল, সাম্রাজ্যবাদে নখ গজাতে আরও ধূর্ত হয়ে উঠেছে। একদিকে মানবতাবাদের জয়ধ্বজা তুলে ধরছে, আর একদিকে শোষণের চাকাটিও অবাধে ছুটিয়ে চলেছে। ধূর্ত বেনিয়া এখন ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদী, আর সেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক রেসিডেণ্ট সাহেব রাণী-মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এখনো এত্তেলা দিতে সাহস নেই, কিন্তু এত্তেলা পেতে এসে শাসাতে শিখেছেন।

রাজবাড়ির খাস কামরায় চিকন বাঁশের চিক খাটানো হল। রাণীমা রইলেন তারই অন্তরালে, সাহেব তারই সামনে।

সেদিন আর নেই। রাজ্য করতে এসে বাংলা শিখতে হয়েছে। ইংরিজী খোঁচ দিয়েই ভাঙা বাংলায় বললেন—

ইউর এক্সেলেন্সী—হামি শুনিয়াছে, রায়টরা রিভোল্ট করিটেছে। আপনি কি শুনিয়াছেন?

হ্যাঁ, মৃদুস্বরে উত্তর ভেসে এল।

ইহা ঠামাইবার উপায় কি?

উপায় যাঁর রাজ্য তিনি ভাববেন!

বাট্—এ তো আপনারও কিংডম! আপনারই রাজ্য!

রাণী ভবানী উত্তর দিলেন, আমার রাজ্য নেই, এখন তো কোম্পানীর রাজ্য। আমার রাজ্য হলে আমি তাদের থামতে বলতাম, এমন অত্যাচার হতে দিতাম না।

সাহেব পায়ের বুটের একটু শব্দ তুললেন মেজেয়। গালচে-মোড়া মেজেয় বেজে উঠল শব্দ। মৃদু শব্দ, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের জোরটুকু আছে। দ্যাটস্ ইট! হামি ঠিকই শুনিয়াছে। হামি শুনিয়াছে, আপনি রায়টদের সাঠে আছেন।

রাণী ভবানী বুঝতে পারলেন। বুকে জ্বালা তবু শান্ত স্বরে উত্তরে দিলেন, আছি বই কি, ওরা যে আমার ছেলেমেয়ে—মা কি ওদের সঙ্গে ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে।

টাহা হামি জানে না, টবে কলিকাটায় এই রিপোর্ট হামাকে পাঠাইটে হইবে—ইওর এক্সেলেন্সী এ রেবেল লীডার। সাহেব চড়া গলায় জানালেন।

তা পাঠাবেন, রাণীমার দৃঢ় কণ্ঠের স্বর ঝরে পড়ল।

বাট—টাহার ফল ভাল হইবে না। কোম্পানী রাজশাহী খাস করিয়া লইটে চাহিবেন। টখন কি হইবে?

চিকের আড়ালে স্তব্ধ হয়ে রইলেন ভবানী।

রেসিডেন্ট সাহেব নিঃশব্দে বাউ করে চলে গেলেন।

হরানন্দ একথা শুনেছিল বকসী-দাদুর মুখে। রাণীমা হয়তো দেওয়ানকে বলেছিলেন একথা। হয়তো নাটোরের দেওয়ান একথা বলেন নি। হয়তো বা বলেও ছিলেন খাস-মুন্সীকে। হয়তো ঢালি আর পাইকের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করেছিলেন। হয়তো শুনেছিল তাদের কাছ থেকে সেরেস্তারা আমলারা। কানাঘুষো উঠেছিল। কানাঘুষোয় ছড়িয়ে পড়েছিল খবর। আরও জোট বেঁধেছিল রায়তেরা। কোম্পানীর বীরবাহুর রথের চাকা দলিত-মথিত করে চলেছিল তাদের। চাকার দাগ বুকে নিয়ে তারা জানের লড়াই, মানের লড়াই চালিয়েছিল।

হরানন্দদের বুকের উপর দিয়ে চলেছিল চাকা। আর সেই চাকাকে প্রতিরোধ করবার আপ্রাণ চেষ্টায় তারা বালির বাঁধ দিয়েছিল।

হরানন্দের ফুরসত নেই। আজ এ-গাঁয়ে, কাল সে-গাঁয়ে ঘোরে। আবার একবার করে নিজের গাঁও ঘুরে যায়।

কৃষ্ণরঙ্গিনী বলে, কি হল আপনের ঠাকুরপুত! চোখে কালি, মুখে কালি—অমন সোনার তনু, কালি মাড়্যা দেছে। দু-দিন থাকেন, জিবাম. খানদান!

থাকে হরানন্দ, যত্ন-আত্তি উপভোগ করে।

বলে, তোমার সাতনরী গড়ানো হল মেজ বৌঠাকরুণ?

সাতনরী গড়াতে দিতে চান, নিই নাই। ঠাকুরপুত, আমার ভয় করে। কি হবে?

কি হবে কে জানে! হরানন্দের বুক ঠেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ে।

আর শাপান্ত করে কৃষ্ণরঙ্গিনী, ইজারদার মরুক, মরুক!

হরানন্দ বলতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে ইজারাদারের নায়েবকেও ও অভিশাপ দিতে হয়। কিন্তু ধক্ করে উঠেছিল বুকখানা, বলতে পারে নি ভাবতেও সে পারে না। কৃষ্ণরঙ্গিনী তার কাছে সব কথা শুনে কেঁদেছিল আবার বলেছিল,

মরুক, মরুক, ওরা ঝাড়ে-মূলে মরুক!

স্বামী ধীরানন্দের অমঙ্গল কামনা কি সেদিন করেছিল কৃষ্ণরঙ্গিনী!

আবার পথ, আবার মৃত্যুবিষে নীলে নীল পরগণা। মৃত্যুর ধুকধুকানি, গোঙানি, তারই মধ্যে নবীন প্রাণের উদ্দীপনা।

ইজারাদারের সঙ্গে শেষ মোকাবিলার প্রস্তুতি। হয় জান দেবে, নয়তো ইমান রাখবে।

আমরুল পরগণা বহ্নিমান। জিলা-নাটোর বহ্নিমান—বহ্নিমান সারা রাজশাহী—অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে তার। আর সেই অগ্নিশুদ্ধ মানুষের সঙ্গে শুরু হল কোম্পানী-ইজারাদারের ফৌজের মুখোমুখি মোকাবিলা।

হরানন্দ ঘুরছে তো ঘুরছেই। আজ এখানে, কাল সেখানে। মা-ভবানী

ঘুরছেন তার সঙ্গে। ঘুরছেন রাণীমা ভবানী—মর্ত্যের ভবানী-মা ঘুরছেন জঙ্গী প্রজাদের সঙ্গে। মা ভৈঃ—বাণী উঠছে।

মরলেও ভয় নেই, যেটুকু লহু পড়ল বৃথা তো যাবে না। দুশমনের ঝাড় মেরেই তো মরবে তারা। আর সেই রক্তে দুশমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীছন থাকবে।

দুশমন কোম্পানী, দুশমন ইজারাদার নন্দলাল রায়, দুশমন ধীরানন্দ গঙ্গাগ্রামী তার নায়েব। দুশমনের ঝাড় মুর্দাবাদ!

সে তখন যমুনার ধারে এক গাঁয়ে। বকসী-দাদু হঠাৎ সেই গাঁয়ে এসে হাজির।

দাদু এসেই বললেন, তোর খোঁজে আলাম।

আমার খোঁজে? হরানন্দ অবাক।

হাঁ রে, আমাদের পালা শেষ হল, রাণী-মা নিজেই ইজারদার হলেন।

তাহলে লড়াই শেষ হল?

কোথায় শেষ রে! একটু ক্ষ্যামা পড়ল, আবার শুরু হবে। এর কি শেষ আছে রে! কোম্পানী যতদিন থাকবে, ততদিন লড়াই। বাংলাকে ভাতে মেরেছে এ তারই লড়াই, বাংলার চরকা আর মাকু ভাঙছে—এ তারই লড়াই। তুই বাড়ি যা!

কেন?

যা—সেখানে কাজ পড়ে আছে।

পায়ে হেঁটে, আর নৌকায় পাড়ি দিয়ে হরানন্দ বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল সেদিন রাতেই। বাড়িতে কান্নাকাটির রোল।

দোর্দণ্ড প্রতাপ নায়েব, বুদ্ধিমান ধীরানন্দ গঙ্গাগ্রামী আর নেই। আমরুল পরগণার এক গ্রামে পাইক-নগদী নিয়ে অত্যাচার করতে গিয়ে মারা গেছেন। চার ফালি করে ফেলে রেখেছিল তাঁর লাশ। কোম্পানীর ফৌজ এসে তার শোধ তুলেছে, কিন্তু গঙ্গাগ্রামীর চার ফালি লাশ আর জোড়া লাগে নি। মা কাঁদছেন, বৃদ্ধ বাবা উপানন্দ কাঁদছেন। হরানন্দকে দেখে আরও কাঁদলেন, জোরে কাঁদলেন।

হরানন্দ বাড়ির ভিতরে চলে এল।

কৃষ্ণরঙ্গিনীর ঘরে তাকে পাওয়া গেল।

কৃষ্ণরঙ্গিনী ঝামা দিয়ে পা ঘষেছে, নখ ফেটেছে, নাপতিনী এসে চওড়া টানে আলতা পরিয়ে দিয়ে গেছে। চেলি পরেছে, সিঁথায় পরেছে সিন্দুর।

হরানন্দ তাকিয়ে দেখলে, কিছু বললে না।

কৃষ্ণরঙ্গিনী হেসে বললে, কি দেখছেন ?

এমন সাজগোজ কেন ?

কেনে ? জানেন না ?

সে তো দুশমন।

দুশমন আপনের, আমার সোয়ামি।

তোমার দুশমন নয় ?

ছিলেন—যখন ঠেঙাড়ে ছিলেন, এখন তো···

কিন্তু তাই বলে—?

বাঃ রে, সোয়ামি নষ্ট-দুষ্ট যাই-ই হোক, সোয়ামি তো—তেনার সাথে যাব না ?

না,যাওয়া তোমার হবে না বৌ-ঠাকরুণ।

আপনে বুললেই হল বুঝি ? ভাবছেন বুঝি—ভয় করবে ? না গো, না, ডর নাই। মাষের ডাল তাতা খোলায় ভাজতে ভাজতে হাত দিয়ে দেখেছি, সয়ে যায়। হুরুম ভাজতে গিয়ে হাত দিয়ে দেখেছি। মালসায় গনগনে তুষের আঁচে আঙুল দিয়ে দেখেছি ?

বেশ করেছ, কিন্তু আর বেশি দূর এগুনো চলবে না।

কেনে চলবে নি ?

চলবে না—ওগুলো মিছে বলে।

কৃষ্ণরঙ্গিনী অবাক হয়ে বললে, মিছে—সোয়ামির সাথে যাওযা মিছে ! শাস্তর যাঁরা লিখেছে, তারা ভুল করেছে ?

ভুল করে নি বোঠান, ধাপ্পা দিয়েছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণরঙ্গিনী।

হ্যাঁ, ধাপ্পা দিয়েছেন তোমাদের ঐ স্মার্ত রঘুনন্দন। সন্তান না থাকলেও বিধবা জমিজমার ভাগ পাবে, এটা তো জমির মালিকদের সইল না।

পুরানো শাস্ত্রকার জীমূতবাহন ঐ বিধানই দিয়েছিলেন। সেই জীমূতবাহনকে তাঁরা বাতিল করতে চাইলেন। তাই স্মার্ত রঘুনন্দনের শরণ নিলেন। ঘুষও দিলেন বুঝি। ঘুষ মানে জমিজমা, ব্রহ্মোত্তর আর সমাজের উপর কর্তালি। আর রঘুনন্দন ঘুষ পেয়ে, ঘুষ খেয়ে দিলেন ঐ বিধান। জমিজমার মালিকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন।

তবে যে শুনেছি বেদে আছে? কৃষ্ণরঙ্গিনী বললে।

বেদ! হরানন্দের গম্ভীর স্বর ঝরে পড়ল—বেদে আছে, সবই বেদে আছে—শুধু বেদের দোহাই! বাঙালীর ঐ বেদের উপর না-পড়ে শ্রদ্ধার কথা ধূর্ত রঘুনন্দন জানতেন। তাই ঋকবেদে যেখানে ছিল—পত্নীরা সুসজ্জিতা হয়ে সম্মুখের প্রকোষ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হবে, সেখানে তিনি সেই সম্মুখ-ভাগের প্রকোষ্ঠকে মুছে ফেলে লিখে দিলেন—অগ্নিপ্রকোষ্ঠে আরোহণ করবে। ব্যস্—আর কি চাই! রঘুনন্দনের চালে আর জালিয়াতিতে জমির মালিকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তুমিও এই ধাপ্পায় ভুলবে?

ধাপ্পা কিনা আপনে জানেন। আমি জানি, ভাতারের সঙ্গে ভাতের সুখ গেল, সাধ-আহ্লাদ গেল। আর তো কিছুই রইল না।

সবই কি যাবে?

যাবে বই কি, নইলে কি মন্দোদরী হয়ে আপনের ঘর করব?

রহস্য করেছিল কৃষ্ণরঙ্গিনী।

হরানন্দ মুগ্ধ হয়েছিল সেদিন তার লাস্যময়ী রূপ দেখে। হয়তো মনে মনে মন্দোদরী-তারার কামনাও যে না করেছিল এমন নয়। আবার তার সংস্কার তাকে বাধা দিয়েছিল, বলেছিল ধিক অনড্বান, ধিক! শুধু মুখে বলেছিল—ছিঃ বৌঠাকরুণ—ছিঃ!

অত ছিয়া-ছিয়া কেনে ঠাকুরপুত? আমি কি আর হাচা কইছি—একটু রঙ্গ বোঝেন না!

না, আমি বুঝি না—তোমাকে আমি মরতে দেব না!

একি মরণ নাকি—এতো সহগমন। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল কৃষ্ণরঙ্গিনী। আপনে না বুললে কি হবে, আমি তো যাব। আমি কার জন্যে খালি হাতে বস্তা থাকব, কার জন্যে হবিষ্যির আতপ চাউল খাব? তার চেইয়া স্বগগে যাই, নরকে যাই, সোয়ামির সাথে থাকব। আমারে আপনেরা

মাছভাত দেবেন, সাধ-আহ্লাদ করতি দেবেন? আমি রাড়ি হয়ে থাকব না। কার মুখ চেইয়া থাকব? আমার একটাও তো ফল নাই। না—ঠাকুরপুত —ওকথা কইবেন না! শেষে আপনেরই কলঙ্ক হবে।

হরানন্দ আর কিছু বলে নি।

সত্যই তো, কৃষ্ণরঙ্গিনীর ভবিষ্যৎ কি?

পরাশর সে পড়ে নি—তাই সমাধান খুঁজে পায় নি।

আর সমাধান খুঁজে পেলেই বা কি? কৃষ্ণরঙ্গিনী কি সম্মত হত? সেও কি পারত বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করতে?

রক্ত পট্টাম্বরে সুসজ্জিতা, অলঙ্কারে পুষ্পমাল্যে সুশোভিতা সতী, স্বামীর চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করে আরোহণ করেছিল অগ্নিপ্রকোষ্ঠে। থানাদার এসেছিল, দু-একজন বারণও করেছিল। কৃষ্ণরঙ্গিনী শোনে নি। বলেছিল, আমি স্বামীর সাথে স্বর্গ ভোগ করব। সতী না হলে কি করে তা হবে? সেই দৃঢ় মূর্তি দেখে কেউ আর কিছু বলে নি। উলু দিয়েছিল সধবা নারীরা। ঢাক ঢোল বেজে উঠেছিল। তার পরে তো দেব বৈশ্বানর জ্বলে উঠেছিল, ঘৃতমাখা মৃত দেহ আহুতি পড়েছিল, আহুতি পড়েছিল জীবিতার দেহ। জ্বলে উঠেছিল অগ্নি আর স্বাহার সম্মেলনে। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা:

ভয় পায় নি কৃষ্ণরঙ্গিনী। কষ্ট হলেও দেহের জ্বালা চেপে রেখেছিল, চতুর্দশ ইন্দ্রকাল-যাবৎ পতিলোকে বাস করবার স্বপ্নে তখন সে বিভোর। তাই এক চাপানের পরও শোনা যাচ্ছিল তার রাম নাম।

রাম রাম রাম
হরি হরি হরি।

সবাই শুনেছিল, হরানন্দও শুনেছিল।

তারপরে আর শোনা যায় নি।

একটা আর্তধ্বনিও ওঠে নি। যখন চোখ গলে গলে যাচ্ছিল, তখনো কি কৃষ্ণরঙ্গিনী আর্তনাদ করে ওঠে নি?

হয়তো—হ্যাঁ, হয়তো না।

শুনতে পায় নি হরানন্দ।

চারিদিকের প্রচণ্ড কলরবে, বাদ্যধ্বনিতে, খোল-করতালের শব্দে শুনতে পায় নি।

ধীরানন্দ মরল, কৃষ্ণরঙ্গিনী সতী হল। সেই সতীদাহ করে হরানন্দ আর ফিরল না। করতোয়ার ঘাট থেকে স্নান করে সে আপন মনে চলতে লাগল।

কোথায় যাবে?

কোম্পানীর শহরে যাবে! কোম্পানীকে জানবে, দুশমনকে জানবে, বুঝবে, দুশমন তাড়াবার মুলুক-সন্ধান পাবে—এই তার পণ।

তাই সে এসেছে এই শহরে, এই বাজারে এসে উঠেছে।

ঘুরে ঘুরে দেখছে সে আজব শহর, কোম্পানীর আজব শহর।

হরানন্দ, তোমার পূর্বপুরুষ তো দেখে নি এমন শহর। তুমিও দেখ নি। তুমি শহরের নাম বলতে শুনেছ—অতীতের বানগড, পৌণ্ড্রবর্ধনের নাম। শুনেছ সেদিনের গ্রাম-নগর সান্তোলের নাম। দেখেছ পুটিয়া, দেখেছ নাটোর। কিন্তু এ শহর তো চোখে দেখ নি হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী। তোমার গঙ্গাগ্রামের বীজপুরুষের দলও চোখে দেখেন নি। এ-শহর নবাবী শহর মুখসুদাবাদ নয়, বাদশাজাদার নামে নাম শহর জাহাঙ্গীরনগর নয়, নয় বাদশাহী দেহলী দিল্লী। এ শহর গড়েছে কোম্পানী। আর এই কোম্পানীই এখন দেশের রাজা, সুবে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার রাজা। তারা শোষণের ইঞ্জিন চালাচ্ছে, ধ্বংসের রোলার চালাচ্ছে। আর সেই ধ্বংসের রোলারের চাপে তুমি এসেছ এখানে। এসে এই শহরে, এই বাজারে স্থান পেয়েছ।

হরানন্দ, এই ডেরা থেকেই কি তোমার যাত্রা শুরু হবে? বড বাজারের গলি গিয়ে মিশবে কশিটোলায়, মিলবে গিয়ে জানবাজারে, সেখান থেকে যাবে শহরের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে যেখানে নতুন সায়েব-সুবোর থান গড়ে উঠছে, আলীনগরের নামটা নামের অবশেষটুকু ধরে আছে—সেই আলীপুরে। যাবে খিদিরপুরে, যাবে মেটিয়াবুরুজে, আবার মোড় ঘুরে ঘুরতে-ঘুরতে আসবে ফিরে শহরে—মোকাম এই খাস কলকাতায়, তারপরে সুতোর মতো, লাটাইয়ের সুতোর মতো ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে।

রাহী তুমি, পদাতিক তুমি, এই পথে চলতে-চলতে দেখবে, বুঝবে, জানবে। তুমি আংরেজের দাপটে নিজের মুলুক ছেড়ে এসেছ এই আজব

শহরে। এসেছ আংরেজকে বুঝতে, জানতে, আংরেজকে জেনে শুনে বুঝে তার সঙ্গে লড়াইয়ের তোড়জোড় করতে।

কিন্তু তার আগে তো তোমার জানা চাই।

জানা চাই—যারা ছিল জুলিয়াস সীজারের কালে অসভ্য বৃটন, কি করে তারা ক্ষুদ্র দ্বীপে রোমান সভ্যতার পিলসুজ থেকে ধার করলে তেল, ধার করলে আলো। কি করে এলার রাজ্যে বয়ে নিয়ে এল একঈশ্বরের নাম—হেলিলুয়ার গান।

জানা চাই—কি করে তারা নানা জাতির সংমিশ্রণে এক জাতি গড়ল।

জানা চাই—কি করে তারা নবযুগ আনলে, কি করে জাহাজ ভাসিয়ে চলল বণিক হয়ে সওদা করতে—কি করে বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করলে।

জানা চাই—কি করে তারা সাগরের অধিশ্বর হল, কি করে তারা জাতীয় সঙ্গীতে গেয়ে উঠল—

> ব্রিটেন, শাসন কর,
> শাসন কর ঢেউকে
> শাসন কর।
> ব্রিটেন তো দাস হবে না।

আরও জানা চাই—

আরও জানা চাই।

কি জানা চাই?

জানা চাই—কি করে ইংলণ্ডের বণিকের মূলধনের যুগ পার হয়ে গেছে।

জানা চাই—হিন্দুস্থানের স্বর্ণভূমির সঙ্গে তুলনা করা যায় ইতালীকে, ইউরোপখণ্ডের ইতালীকে। আমাদের হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় তার পর্বত আল্পসকে, আর এই সুবে বাঙ্গালার সঙ্গে তুলনা করা যায় লোম্বার্ডির শস্যশ্যামলা উর্বরা প্রান্তরকে।

কিন্তু একথাও জানা চাই—হিন্দুস্থান ইতালী নয়, প্রাচ্যের আয়ার্ল্যাণ্ড; আর আংরেজ জানে, তার ঐতিহ্য গৌরবময় আবার বিষাদময়।

জানা চাই—এরই উপর দিয়ে বয়ে গেছে অভিযানের প্লাবন, বয়ে গেছে বিপ্লবের ঝড, বিজয়ের জগদ্দল রথ, কিন্তু সে-ধ্বংস ছিল তার

উপরিতলের—তার অন্তরতল সে স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু পারল আংরেজ। সে সাম্রাজ্যবাদের কেতন উড়িয়ে তার সমাজের প্রাকারই ধসিয়ে দিলে। তার পুরোনো পৃথিবী রইল না, আবার নতুন পৃথিবীর শরিকও সে হতে পারল না। আর তাতেই তার এই বিষণ্ণতা।

এ বিষণ্ণতায় তো ছেয়ে গেছে বাঙ্গালার মন, বাঙ্গালার যিনি প্রতীক, সেই রাণী-মা ভবানীর মন, ছেয়ে গেছে বকসী-দাদুর মন, ছেয়ে গেছে হরানন্দের নিজের মন। তাঁরা বুঝেছেন তাঁরা সব হারিয়েছেন। হিন্দুস্থানের ঐতিহ্য গেছে, সব গেছে আর সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁদের দূত, তাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে হরানন্দ। সে জানতে চায় আংরেজের ঐতিহ্য, চিনতে চায়, আংরেজকে সে বুঝতে চায়।—তারা ছিল আংরেজের চেয়ে সব বিষয়ে সেরা, তবে কেন হারলে? কেন পরাজয় মেনে নিলে। পলাশীর আতসবাজীর ফুলঝুরিতে এমন সর্বনাশ কি করে হল, কি করে এমন সর্বনাশ হল? সে জানবে বলেই এসেছে, ঘুরছে।

ঘুরতে ঘুরতে সে চিনবে, জানবে। আর সেই পদযাত্রায় তার সঙ্গে মকরন্দের হয়তো দেখা হবে, দেখা হবে লাডলীর সঙ্গে; হয় তো বিদেশী মেয়ে মেরীর সঙ্গেও মোলাকাত হবে। লাডলী, মকরন্দ অচেনা হলেও স্বদেশী।—তাদের সে চেনে, বিদেশিনী মেরীকে চিনতে চাইবে। কিন্তু মেরীকে চিনে তো ইংরেজ কোম্পানী, সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীকে চেনা যাবে না। চেনা যাবে না নয়া নবাব বাহাদুরকে, তাঁর আমীর-ওমরাহদের। তবু তাঁদেরও সে চিনতে চাইবে।

কিন্তু চেনা তো একদিনে শেষ হবে না। হরানন্দের জীবন যাবে। হয় তো অনেক হরানন্দেরই জীবন যাবে, অনেক বাঙালীর, অনেক হিন্দুস্থানের মানুষের জীবন যাবে। তবে হয়তো চেনা যাবে।

এখন ঘোরো তুমি হরানন্দ, ঘোরো! পথে পথে রাহী হয়ে ঘোরো—শহরকে দেখ, চেন, জানো। দুশমনকে চেন, জানো। সে-দুশমন আংরেজ, সে-দুশমন সাম্রাজ্যবাদ। তার ঔপনিবেশিক নখ গজিয়ে উঠেছে, সেই খরধার নখ ছেঁটে ফেললে হবে না, কেটে ফেললে হবে না—আবার গজাবে। তার ঐ নখ সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। সেই তোমার ব্রত, বাঙালীর ব্রত, ভারতীয়ের ব্রত। ঘোরো হরানন্দ, সে-ব্রত উদ্‌যাপন কর।

৫

কোথায় শ্রীপাট খড়দহ—আর কোথায় চিত্রপুর !

কত যোজন পথ—কত ক্রোশ ?

মাঝখানে কি আছে সাগর ?

সাগর না থাক, মা-গঙ্গা তো আছেন।

হাঁটা পথে যদি তুমি পাড়ি দিতে চাও—তাও পার। তাহলে ক্রোশ ছয় দূর হবে।

ভোর না হতেই রওনা হলে, সূর্য মাথার উপরে ওঠার আগেই এসে পৌঁছুতে পারবে। পথে যদি পাইক পাড়ায় গঙ্গাগোবিন্দ সিং-এর জলসত্রে জল আর বাতাসা খাবার সাধ না যায় তো ঠিক-সময়ে পৌঁছে যাবে। ছায়া তখন বেঁটে হয়ে যাবে না, দুপুরের রোদে মাথার চাঁদি ফাটবে না। মুখে-কপালে তেমন ঘামও ঝরবে না। সোজা এসে হাজির হবে চিত্রপুরের ঘাটে—সেখান থেকে চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরে যেতে পার, নয় তো যেতে পার আর কোথাও। নয় তো সোনাগাছির জমিদার বাড়ির অতিথশালায় গিয়ে উঠতে পার। সেখানে এখন আর খেরো-বাঁধানো খাতায় হিসেব লিখতে গিয়ে মালসি গান লেখেন না ভক্তকবি রামপ্রসাদ। তবিলদারি পান নি বলে নালিশ করেন না মার কাছে।

হাঁটা পথেও আসতে পার, আবার খড়দহের গঙ্গায় আছে পানসী, বজরা, হাফ-বজরা, সালতি—তারই একখানা কেরায়া করেও নিতে পার। যেমন তোমার গেঁজের জোর, তেমনি নৌকা। তারপর যদি জোয়ার এসে দেখা দেয় সাগরে, যদি স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার হয়, সে জোয়ার তো ছুটে ছুটে আসবে সাগর থেকে গঙ্গায়—আর খড়দহের গঙ্গার ধারায় এসে মিলবে। তখন সেই জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ো তোমার ডিঙি—চিত্রপুরের ঘাটে আসতে কতটুকু সময় বা লাগবে। শুধু বৈঠে ধরে থাকলেই হল।

তরতর চলবে তরীর শির, ছলছল করে ভাঙবে ঢেউ, কাটবে জল। আর চিত্রপুর এসে পৌঁছবে পেছনে ফেলে রেখে গ্রামের পর গ্রাম। তারপরে তুমি সেখান থেকে যেতে পার চাঁদপাল মুদির ঘাটে—যেখানে নতুন শহর, নতুন কেল্লা, আজব নগর। সেখান থেকে যেতে পার কালীর থান কালী-ঘাটে। আবার ও-পথে না গিয়ে চলে যাও অন্য পথে।

এ-পথে পড়বে কত গ্রাম, তারপরে সেই মজা-হাজা সপ্তগ্রাম—সেই সাতগাঁও। গঙ্গার এ ধারা তো পুরোনো, এ খাত তো পুরোনো। এই পথে বুঝি সগরবংশ উদ্ধারের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলেন। শঙ্খ বাজাতে বাজাতে এসেছিলেন ভগীরথ আগে আগে—আর গঙ্গা পিছনে পিছনে। তাই তাঁর নাম ভাগীরথী। এ পথের বর্ণনা বাল্মীকি দেন নি, দিয়েছেন ফুলিয়ার বাঙালী-বাল্মীকি কৃত্তিবাস। বলেছেন—

আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
খড়দহ পাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥

কিন্তু কোথায় আকনা, কোথায় মাহেশ—আর কোথায় খড়দহ! কত গ্রাম তো তার মাঝখানে। তাদের নামও করেন নি মহাকবি। হয়তো মহাকবি কৃত্তিবাসের সময় এত গ্রামই ছিল না, হয়তো বা ভারাক্রান্ত করতে চান নি মহাকবি তাঁর মহাকাব্য। কিন্তু তাঁর ঢের পরে বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর মনসা-মঙ্গলে তা করেছেন। করতেও পেরেছেন। মনসা-মঙ্গল তো সপ্তকাণ্ড নয়, এক কাণ্ডেই সমাপ্ত। মহাকাব্যও নয়, মঙ্গলকাব্য। আর তাতে রামচন্দ্রকে বাঙালী করে তুলতে হয় না। বাঙালী চাঁদ সদাগর, সায় সদাগরের সংসারের পরিচয় দিতে হয়। তাই কথায় কথায় বাঙালী-রান্নার ফিরিস্তি দিতে হয়, 'আর তথি দিবে খণ্ড' বলে শেষ করতে হয়। আবার পথের হদিসও দিতে হয়। সে-পথ চাঁদ বেনের সপ্তডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্যে যাবার পথ। বাঙাল বিজয় গুপ্ত হুসেন সাহের আমলে একরকম দিয়েছিলেন, নিজের জানা পথের কথাই বলেছিলেন। আবার বাঙাল নারায়ণ দেবও তার বাইরে যান নি। বিপ্রদাস পিপলাইও তাই দিয়েছিলেন। আর দিতে গিয়ে এই গঙ্গার পারের গ্রামগুলিকে বাদ দেন নি। গঙ্গার পারে যেন বিন্দু তারা। সিন্ধু বয়ে যায়, তার পারে টলমল করে বিন্দু, বিন্দুর মতো গ্রাম। সিন্ধুতে বিন্দু নয়, সিন্ধুর তীরে বিন্দু।

বিপ্রদাসের চাঁদ বেনে মধুকর সাজিয়ে চলেছেন।

ঘুরে ঘুরে এসেছেন শ্রীধাম খড়দহে। সেখান থেকে ডিঙা চলেছে।

বাঁয়ে খড়দহ, ডানে রিষিড়া, আবার চলতেই বাঁয়ে সুকচর পড়ে তো পশ্চিমে কোন্নগরের বিন্দুটি দেখা যায়; কোতরং আপন ডাইনে থাকে তো আপন বামে থাকে কামারহাটি—পুবে দেখা যায় আড়িয়াদহ। পশ্চিমে ঘুষড়ি থাকে তো পূর্বকূলে চিত্রপুর। চিত্রেশ্বরী দেবীর নামে যার নাম। মুখে মুখে কি আর অত শুদ্ধ করে বলা যায়—চিত্রপুর! তাই মানুষ বলে চিৎপুর।

এই চিত্রপুরই বুঝি কোম্পানীর শহর। নয় তো শহরের আশেপাশের অঞ্চল। শহর নয় তো উপশহর, শহরতলি। বিপ্রদাস এ শহর দেখতে পান নি, তিনি শহরের আগেকার মানুষ, তাঁর চাঁদ বেনেও সেকেলে, তাই চিত্রপুর বলেই খালাস। কিন্তু যাঁরা তাঁর পুথি নকল করেছেন যুগে যুগে, তাঁরা তার মধ্যে যেমন নিজেদের কবিত্ব ফলিয়েছেন, তেমনি তাঁদের কালের জায়গার নামও জুড়ে দিয়েছেন।

বিপ্রদাস দেখেন নি শহর, তাঁর চাঁদ বেনেও দেখেন নি। তাঁর আমলে এখানে শহরের নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু বিপ্রদাসের যদি পুরাণের সেই মার্কণ্ডেয়র পরমায়ু হত, যদি দেড়শো বছর পরে আসতেন তাঁর চাঁদ বেনে এ পথে—তিনি দেখতে পেতেন কলকেট বা কলকেত্তা—যা দেখেছিলেন এক ওলন্দাজ ফ্যানডেনব্রেক—যার নকসা এঁকেছিলেন নিজের খাতায়। হয়তো রাজনীতিক উদ্দেশ্যেই এঁকেছিলেন—এলদোরাদোর নদীর ধারাটাকে চিনিয়ে দিতে চাইছিলেন সুদূর হল্যাণ্ডের তাঁর ভাই-বেরাদরদের—যাতে করে লুঠতরাজের সুযোগ হয় তাই বুঝি ছিল তাঁর মতলব। যাক সেকথা—বিপ্রদাসের চাঁদ বেনে দেখতে পেলেন না। যদি দেখতে পেতেন চিত্রপুরের ঘাটে বসে এই শহরকে—কি দেখতেন?

তাই তো—কি দেখতেন?

দেখতেন, কত রকমের নৌকা ভেসে চলেছে। দেখতেন, কত রকমের মানুষ স্নান করছে।

বিপ্রদাসের আমলেও ভেসে যেত নৌকা, স্নান করত মানুষ।

নতুন কি দেখতেন?

দেখতেন বই কি!

পালকি কাঁধে হুম্‌হাম্ করে বেয়ারা যায়

তার সমুখে আসাসোঁটা ঘাড়ে কারপরদাজ ধায়!

সেও তো সেই সাবেক চাল—নতুন কি?

নয়া শহরের এও পুরোনো ধারা।

পুরোনো ধারাই বয়ে যায়। এখনো নতুন পুরোনোকে বাতিল করে নি, করতে পারে নি। এখনো সাবেকি তাঞ্জামেই চড়ে। কিন্তু সে-তাঞ্জাম সোনাগাছির বাবুদের বাড়ি যায় না, তাঁদের দেউড়ি এখন ভাঙা, তাঁদের নহবৎখানায় এখন বট-অশথ গজায়।

ষোলো কাহারের পালকি তাহলে কোথায় যায়?

লক্ষ্মী চঞ্চলা, এখন জমিদারির গদাই-লস্করি পাট ছেড়ে বণিকের পাটে পা দিয়েছেন। বণিকের ঘরে, বেনিয়ানের ঘরের ঝাঁপিতে গিয়ে অধিষ্ঠান হয়েছেন। জমিদারের সোনায় মোড়া বেতের কুনকের ধান আর আকব্বরী আসরফির উপর তাঁর টান নেই। তিনি এখন বণিকের লক্ষ্মী, বেনিয়ানের লক্ষ্মী।

চাঁদ সদাগর দেখতে পান নি, দেখলে আহ্লাদে আটখানা হতেন।

আহা—বেচারা চাঁদ বেনে!

পালকি ধায়,

পালকি যায়।

হুমহাম শব্দ হয়

কার বাড়ি যায়?

যায় পোস্তার নকু ধরের বাড়ি, যার অঢেল কড়ি।

যায় গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ি, যিনি বড়লাটের ফরসা হাতের কালো নড়ি। সাধুর ভরসা শ্রীহরি, আর সকলের ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।

যায় পিরেলি ঠাকুরদের বাড়ি, সেই যে যাঁদের—

পদ্মের মৃণালে কাঁটা।
ঠাকুরে পিরেলি খোঁটা।

যায় সেই আমিরচাঁদ—ওরফে উমিচাঁদের বাড়ি, যাঁর আছে জাদুই দাড়ি। সেই দাড়ি নাড়েন আর জাদু করেন।

যায় সেই নকু ধরের মুহুরী রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি, যেখানে তিনি সভা বাজার মিলিয়ে বসেছেন, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহ বাঁধা রেখেছিলেন।

যায় দুর্গাচরণ মিত্তির, গোকুল ঘোষালের বাড়ি। যাঁরা কোম্পানীর সাহেব ধরে পহেলা বেনিয়ান, যাঁরা ছর-বেছড় ইংরেজীতে কথা কন। গ্যাড-ম্যাড-ল্যাড যাঁদের কথার খোঁচ। সাহেবকে পয়সা দিয়ে ব্যবসা ফাঁদেন, সাহেবের খাতাঞ্চি, মুহুরী হন, খাতা লেখেন, ক্যাশবাক্সের খপরদারি করেন। সাহেব পান পাঁচশো তঙ্কা তো তাঁরা পান পাঁচ। তাতেই খুশি। সাহেবকে দণ্ডবৎ করেন। আবার তাঁদের দেখাদেখি বেনিয়ান হবার সাধ যায় বাঙালীর। সাহেবের স্বপ্ন দেখেন। ভিখারী সাহেবকে রাজা করবেন, নিজেরা রাজা হবেন।

চাঁদ বেনে হলে এই পেল্লায় শহর দেখে যত না তাজ্জব বনতেন, তার চেয়ে বেশি তাজ্জব বনতেন এই মজাদার ব্যবসার ব্যবসায়ীদের দেখে। তাজ্জব বনতেন তাঁর ব্যবসায়ী বংশধরদের দেখে। তাঁরা নারিকেল দিয়ে হীরে এনেছেন, গুয়া দিয়ে এনেছেন মুক্তা, বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভরিয়েছেন। আর এরা বাংলার জিনিস দিয়ে সেই কিস্মতের জিনিস তো আনেই না, বরং বাংলার লক্ষ্মীর ক্ষেতের কাঁচা মাল তুলে দেয়—আর সেই কাঁচা মালে যে জিনিস বিলায়েতে তৈরি হয়, তাই মাথায় করে নাচে। তা থৈ তা থৈ নাচে। এরা কি বেনিয়া? না, না!

চাঁদ বেনে চটলেও চটতে পারতেন, এমন কি বিপ্রদাস পিপলাইও হয়তো চটতেন—কিন্তু উপায় কি! আগে বাণিজ্যের ধারা বাংলা থেকে বইত ভিন্ দেশে, এখন রীতি পালটেছে, বাংলায়ই তা বয়ে আসে বিলেত থেকে। তাই বেনিয়ারা এখন বেনিয়ান। আর তাঁরাই ধলার সঙ্গে মিশে এই শহর গড়ছে।

পিরেলি কায়েত আর সোনার বেনে।
করলে আবাদ কলকাতা, বয়ে ধন এনে।

আর সেই ছড়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়—

ধন আনে তারা ধন আনে,
গোরার পায়ে সঁপে ধন গোলাম বনে।

চাঁদ বেনে দেখতে পান নি শহর, অবাক হবার সুযোগ পান নি—দেখলেও অবাক হতেন কি না কে জানে। ব্যবসার সুলুক-সন্ধান জানতে হেতাল-বাড়ি কাঁধে নিয়ে মধুকর থেকে নেমে আসতেন ডাঙায়। হয়তো তিনিও গিয়ে চাঁদপাল ঘাটে দাঁড়াতেন, রাইটার সাহেব ধরতেন, নাম লিখে নিয়ে বলতেন—

মাই লার্ড, ইওর সার্ভেন্ট। মাই ক্যাশ, ইউর ক্যাশ! আর তিনিও বনে যেতেন চাঁদ বেনে নয়, চাঁদবাবু-বেনিয়ান।

চাঁদ বেনে সে সুযোগ পেলেন না, তাঁকে সুযোগ করে দিতে নয়া মনসা-মঙ্গল লেখার কবিও পাওয়া গেল না।

আহা বেচারা!

যাহোক, তিনি না দেখুন, গঙ্গার ঘাটে, চিত্রপুরের ঘাটে বসে আজব শহর দেখল চাঁপালতা।

চাঁপালতার সঙ্গে চাঁদবেনের কোন সম্পর্ক নেই। চাঁদ ছিলেন শিবের ভক্ত, তারপরে কানি মনসার। আর চাঁপালতা একেবারে বিষ্ণুভক্ত। তাও নরদেহধারী বিষ্ণু, নদীয়া নগর নাগর শ্যাম শ্রীচৈতন্য। তাঁর শিষ্য প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র যাদের কোল দিয়েছিলেন, সেই পতিত বৌদ্ধদেরই সে গোষ্ঠী, তাদেরই মেয়ে।

নাম তার চাঁপালতা বটে, কিন্তু যে চাঁপাগাছে ফুল ফোটে, সেই চাঁপার লতা সে নয়। শ্রীকৃষ্ণের সখীদের একজনের নামে নাম। সেই যে—ললিতা, বিশাখা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, সুচিত্রা—তাঁদেরই আর একজন ছিলেন চম্পকলতা। সেই চম্পকলতা বাংলার আবহাওয়ায় মানুষের জিভের আড়ে চাঁপালতা, চাঁপি, চুঁপিতে দাঁড়িয়ে গেছে।

বাবাজী এখনো ডাকেন, ওলো চম্পকলতা! ললিত লবঙ্গ লতে!

আবার আখড়াধারী মোহান্ত একটু তরল করে বলেন, ওলো চাঁপালতা, আলোকলতা, আলোর ধনী, সুবদনী—সুবচনী!

আর মা ডাকেন—চম্পি—চাঁপা—চাঁপি!

আর সবাইও ঐ নামেই ডাকে। কেউ বা ঠাট্টা করে চোপিও ডাকে। চাঁপালতার নাকি ভারি চোপা—তাই ঐ নাম।

চাঁপালতা এসেছে চিৎপুরের ঘাটে—যেখান দিয়ে বাগবাজারের বিশুদ্ধ

হাওয়া খেতে সাহেব-সুবোরা ঘন-ঘন ঘোড়ায় চড়ে দুলকি চালে চলেন। যেখানে পিরেলি ঠাকুর, মিত্তির আর মল্লিকদের খানদানী ঘরের মেয়েদের পালকিসুদ্ধ চুবিয়ে গঙ্গাস্নান করায় কাহারেরা। যেখানে জাল ভেসে-ভেসে যায় জেলেদের—আর তাতে উলসে ওঠে গাঙের ইলিশ—গঙ্গার ইলিশ। চাঁপালতাদের নৌকা এসে লেগেছে সেই ঘাটে।

নৌকা বজরা নয়, হাফ-বজরা নয়। পানসী নয়, পিনিস নয়। একমাল্লা ডিঙিও নয়। মহাজনী ভড়ের মতো বেঢপ নাও। চলে গাধাবোটের মতো ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে, গোরুর গাড়ির মতো ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে। তবু গলুইতে তার কি বাহার। মকর-মুখো গলুইয়ে পিতলের চিত্তির-বিচিত্তির—যেন চকচকে ঝকঝকে গহনার জৌলুস।

মহাজনী ভড়ের মতো নৌকা বটে, তবে ভড় নয়। ভরার নৌকো। চাঁপালতা যাদের নাম শুনলে ওয়াক-ওয়াক করে বমি করবে, যেন সেই পাঁটা-ভরতি নৌকা। তবে তাতে থাকে পাঁটা-পাঁটী আর এতে আছে মেয়ে। বাচ্চা থেকে ধাড়ী, কড়ে থেকে বুড়ী। ও তো কথার কথা। বুড়ী বলেই কি আর বুড়ী—এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বুড়ী আর কি! তারাও যুবো বলে চলে যায়।

এ যেন এক ছত্রিশ জাতের শ্রীক্ষেত্র। বামুন আছে, বোষ্টম আছে, আবার হাড়ী মালোও যে না আছে এমন নয়। আবার কেউ যদি হঠাৎ বলে ওঠে, 'ছালনে আচ্ছা করে পেয়াজ লাগাও' তাহলেও চমকে ওঠার কিছু নেই। এখানে সবাই বামুন বলে চলে যায়, বামুনের ঘরে বিকোয়, মুঠো মুঠো টাকা ফেলে দিয়ে কিনে নিয়ে যায় টিকিধারীরা আর মনের সাধে ঘর-কন্না পাতে।

পূর্ববঙ্গে তো হামেসাই ভরার নৌকা ঘাটে ঘাটে দেখা যায়। বেচা-কেনাও চলে পুরোদমে। বামুনের ঘরে গিয়ে বামনী হয় সবাই। যত অজাত-কুজাত-বেজাত সবাই বামুন—এ যেন জগন্নাথের মন্দির আর কি!

এ-বঙ্গেও যে না আছে এমন নয়। এখানেও মেয়ের ব্যাপারীরা এই ব্যবসা করে। ঘাটে ঘাটে এসে লাগে নৌকা, ছেলেপুলে বিকোয়, বাঁদী বিকোয়, বান্দা বিকোয়—আবার বৌ বিকোয়।

ঝনাৎ করে তঙ্কা কি সিক্কা ফেলে দিয়ে নিয়ে যায়। কেউ বনে বিবি, কেউ বনে বাঁদী—কেউ বা গোলাম।

দরও বাঁধা। বয়সের অনুপাতে ষোলো থেকে একশো তঙ্কার মধ্যে। হঙ্ক এদের বাপ মা খুড়ো জ্যেঠা অভাবে বেচে দেয়, ভাতের জন্য বেচে—আবার কাউকে বা চুরি করে আনা হয়। শুধু যে বাঙালী মেয়েই এখানে বিকিকিনি হয় তা নয়, কাফ্রি ছেলে, কাফ্রি মেয়েও কম আসে না। সে আবার বিদেশীর ভরা, ভরার জাহাজ। সেগুলি বিদেশীদের ঘরে যায়। স্বদেশীদের কাজ ভরার নৌকার মাল কিনেই চলে।

সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার উইলিয়াম জোনস্ তো সেকথা বলেন। এও একবকম দাস-ব্যবসা। আববে যা চলে, পারস্যে যা চলে, চলে ইউবোপে, তাই-ই এখানে চলে একটু রকমফের হয়ে।

চাঁপালতা এসব জানে না, কিন্তু ভরার নৌকার নাম সেও শুনেছে। তাদের আখড়ার বাঙালদিদি বলেছিল। তার সেই পদ্মাপারের দেশে যেখানে 'আইমু, যাইমু' কয় সবাই—সেখানকার এক রংদার কাণ্ড।

ভরার নৌকা ঘাটে এসেছে। বেশ সুন্দর আর সোমত্থ বয়েসী দেখে এক বামুন তো কিনে আনলে বৌ। বেশ তো বৌ, নিন্দে করার কিছু নেই। আঁধার হয়ে এল, সাঁজের পিদিম দেখাতে হবে তুলসীতলায়। বৌকে শাশুড়ী বললে, যাও গো বৌ, পিদিম দেখিয়ে এস!

বৌ ঘোমটার ফাঁক দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

শাশুড়ী ভাবলেন—এ কেমন মেয়ে গো!

মেয়েকে ডেকে বললেন, বৌকে পিদিম দিতে বল্! আঁধার যে হয়ে এল।

ননদ গিয়ে বৌকে বললে, হ্যাঁলো বৌ, ঠায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা না, পিদিম নিয়ে তুলসীতলায় দেখিয়ে আয়!

বৌ ঘোমটার ফাঁক থেকে ফিসফিস করে বললে, পিদিম কাকে কয়—জানি না।

ননদ একটা পিদিম এনে দেখিয়ে দিলে।

অমনি বৌ বললে,—এই তোমার পিদিম—এতো চেরাগ!

ননদিনী-রায়বাঘিনী চেঁচিয়ে মাকে বললে, মাগো, এতো হিঁদুর মেয়ে নয়, বৌ দীপকে চেরাগ কয়!

তারপর কি হল? জিজ্ঞেস করেছিল হাসতে-হাসতে চাঁপালতা।

বাঙালদিদি হেসে উত্তর দিয়েছিল—কি আবার হবে। কিল খাইয়া কিল চুরি করছে বামনা। এখন তো বৌর এক পাল পোলাপান। তারা সব বামন।

সেদিন চাঁপালতা হেসে বলেছিল, ভরার নৌকা! নামও শুনি নি! তোমার বাঙাল দেশে যত অনাছিষ্টি কাণ্ড! মাগো মা!

সেই ভরার নৌকার পাঁঠী হবে, ভেড়ী হবে—সে স্বপ্নেও ভাবে নি। এখনি বা ভেবে কি হবে? যা আছে কুল-কপালে।

চাঁপালতা ছই-ছাপ্পড়ের বাইরে একটু জায়গা করে নিয়েছে, সেইখানেই বসে আছে।

দেখছে।

মাল্লামাঝিরা বলছে—এই নাকি কলকাত্তা।

কলকাতা!

সেই বহু শোনা গান মনে পড়ে। বাউল-দাদা গায়—

যদি পদ্মা পাড়ি দিবি,
তবে ঢাকা দেখতে পাবি,
মুখসুদাবাদ করবে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা
তিন শহরে আটা
সাঁতার দে যায় রসিক যেজন।

বাউলদাদা এসেই বলে, কই গো, আলোর ধনী, কই গো বনমালা! কই গো ঝুমকিলতা। অমনি সবাই ছুটে আসে। বনমালা, ঝুমকোলতা, ললিতা—সবাই।

বাউলদাদা অন্য গান গাইতে শুরু করলেই ওরা বলে, দূর, ও কি গান! তুমি ঐ পদ্মাপাড়ির গান শোনাও!

বাউলদাদা হাসে, বলে, সব সময়ে কি ও গান ভাল সই? যখন সময় জুটবে, তখন ও-গান শোনাব সই, পরান ভরে শুনবি।

না না, এখুনি শোনাতে হবে। সবাই সমস্বরে বলে।

মিটিমিটি হাসে বাউলদাদা, গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে উপচে পড়ে হাসি। একতারাটায় টংকার দেয়—আর সেই গান ধরে।

বোঝে না চাঁপালতা, এক কোণে দাঁড়িয়ে শোনে।

আর আর-আর মেয়েরা হাসে, হাসে, এ-ওর গায়ে লুটোপুটি খায়।

বনমালা তার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। তাকে সে একদিন বলেছিল, এত কি হাসিস লো গান শুনে! ও তো ঢাকার গান, মুখসুদাবাদ যাবার গান!

বনমালা হেসে বলেছিল, তুই কি বুঝবি, এতটুকু মেয়ে! আগে বর হোক, কেষ্ট জুটুক, তখন বুঝবি।

তোমার বুঝি জুটেছে! মুখ ভার করে বলেছিল চাঁপালতা।

আমার তো জুটল বলে! তখন দেখবি।

আগে-ভাগে জানতে দোষ কি? চাঁপালতা বলেছিল।

অতো জানে না লো সই, জানে না; গালে ঠোনা মেরেছিল বনমালা।

থাকগে, জানতে আমার বয়ে গেছে। মুখ ভার করে চলে এসেছিল।

রহস্যের গন্ধে সেদিন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল চাঁপালতার মন। গানটা সে মুখস্থ করেই ফেলেছিল। কলকাতায় যেতে চেয়েছিল। দেহতত্ত্বের গানের কলকাতা নয়, সত্যিকারের কলকাতা। দেহে যে কলকাতা আছে, ঢাকা আছে তাই বা সে কি করে জানবে।

জেনেছিল আর-একটু বয়সে, যখন সে ফোটো-ফোটো কলি। যখন সে যৌবন-বিকচোন্মুখ কিশোরী।

কিশোরী চম্পকলতা। কিশোরী যদি হয় তো বয়োঃসন্ধিক্ষণের কিশোরী। সেই যে—

উঠিতে কিশোরী
বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।

হ্যাঁ—সেই কিশোরী সে। সেই কিশোরী—রাই-কিশোরী। বসন্তী রঙের বাসে আর সম্বৃত হয় না দেহ, বুকে মনে হয় কিসের যেন দংশন জ্বালা, সে জ্বালায় মধু আবার বিষ। সেই জ্বালায় জ্বলতে থাকে; জ্বালা কমাতে চায়, পারে না। তাই কখনো বা বিনিসুতোয় মালা গাঁথতে বসে, কখনো বা চন্দন ঘষে পাটায়। খানিকটা চন্দন নিয়ে মুখে মাখে, বুকে মাখে। চন্দন গন্ধে একটু বা শান্ত হয় মন, একটু বা জ্বালা কমে।

কমে কি ?

না।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিজ্বালাতে যেছে কভু নাহি ভেদ ॥

তবু জ্বালা নিবৃত্তি করতে হবে—তাই জলে গিয়ে ঝাপটে বসে, ঢেউ সাপটে ধরে, সাপিনীর মতো কোঁকড়া ফণা-ধরা চুল লেপটে পড়ে। বাঙাল দিদি আবার ওকে বলে গুয়ারেখী চুল। সুপুরি যখন অংকুর, অমনি কোঁকড়ানো ছড়া হয় তার। তা দেখেই হয়তো এমনি উপমা। ঠিক তেমনি চুল। বুকের জ্বালাও যেন কমে যায়। কমে কি ?…এযে জ্বালা, জ্বালা—বিষম জ্বালা।

এই জ্বালায় আবার জ্বালা বাড়ায় মা কালিন্দী।

কালিন্দী বলে, দেখিস, সামলে-সুমলে চলিস। যাকে-তাকে মন দিয়ে বসিস নে! তোর জন্যে খড়দ'র মা-গোসাঞি দেখে রেখেছেন।

কি দেখে রেখেছেন মা ?

মর-ছুঁড়ী, তাও জানে না। বর লো বর! মুখ ঝামটা মেরে বলে কালিন্দী।

আমাদের আবার বর কি মা—আমাদের কেষ্টই তো বর!

আহা, তিনি তো আদি বর, মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলে কালিন্দী। কিন্তু আমরা পাপী-তাপী—আমাদের মানুষ-বরও চাই।

কেষ্ট ঠাকুর জগৎ পতি
গুরু ঠাকুর তার পরের পতি
তারপরে মানুষ পতি।

আমার বাবা কোথায় মা ? চাঁপালতা অমনি শুধায়।

কালিন্দী ঝংকার তুলে বলে, সে মিন্সে কি আর আছে, সে কবে মরে গেছে! হাড় জ্বালিয়েছে, মাস জ্বালিয়েছে, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়েছে—তবে মরেছে! তারপরে ভেক নিয়েছিলাম তেনার এক ভাইয়ের সঙ্গে, তিনিও কি রইলেন! তুই মা রূপের ডালি—তুই ভুল করিস নে।

চুপ করে থাকে চাঁপালতা, কথা বলে না।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। তারপরে চলেও যান।

চাঁপালতা ভুল করবে না ঠিক করেছিল সেদিন, খড়দ'র মা-গোসাঁই কবে আসবেন বুঝি সেই পথ চেয়েছিল। আর জলছিল নিজের বুকের আগুন-জ্বালায়।

সেদিন দুপুরে সে শুয়ে শুয়ে পড়ছিল সুর করে—

তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নব গুঞ্জা-সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ শোভে তনুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাথেতে মোহন বংশী পরম-সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে
মণিহার॥
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান।
মকর-কুন্তল শোভে কমল নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা
হাসিতে হাসিতে
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল
কোন ভিতে॥

···আর পড়া হয় না। পুথিখানা খসে পড়ে। চাঁপালতা মাথায় ঠেকিয়ে পুথিখানা রেখে দেয়। তারপর ফুল-ফুল নিকোনো মেজেয় শুয়ে থাকে। চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

তমাল-শ্যামল কিশোরের কথা ভাবে। যদি আসে কিশোর, যদি ঐ ভেজানো কবাট ঠেলে এসে হাজির হয়।

কার মতো দেখতে ঐ কিশোর?

ঐ যে গোপীনাথ আছেন অগ্রদ্বীপের—তাঁর মতো কালো কষ্টিপাথরে অমনি নিখুঁত কোঁদা রূপ?

না, ঐ যে নব দুর্বাদলশ্যাম কেষ্টনগরের কুমোরের গড়া ঠাকুরটি—কুলুঙ্গীতে মিটিমিটি হাসছেন—ওঁর মতো?

ভেবে কূলকিনারা পায় না চাঁপালতা—চোখ বুজে ভাবে। ঠাকুরের মুখ মানুষের মুখ হতে চায়, ঠাকুর চান মানুষ হতে। খড়দ'র মা-গোসাঞির বাছাই করা ছেলেই সে হয়ে দাঁড়ায়। শিউরে ওঠে, চাঁপা গাছে শিহর জাগে।

দরজাটা খুলে গেল, ভেজানো দরজা খুলে গেল—আস্তে, আস্তে—আস্তে।

কিশোর-যৌবনের দোলায় দোদুল শ্রীরাধিকা। মন্মথের পাট পহেলা নিয়েছেন কিশোরী। মন্মথ পাঠ পহিলা অনুবন্ধ।

তাই ভাবরমণে তিনি মগ্না, বিভোরা।

হীন তাঁর বসন, যৌবনকে সে বসনে বেড়ে রাখা যায় না, ঘিরে রাখা যায় না।

আর এমনি সময় এলেন কমল-নয়ান। কেওয়ারী ঠেলে এলেন!

শ্রীরাধার সে কি লজ্জা!

খাটো কাপড়—

এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস;
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥

কেউ যদি তেমনি আসে, যদি আসেন তমাল-শ্যাম, যদি আসেন কমল-নয়ান!

সে শ্রীরাধিকা না হোক, সেও তো চম্পকলতা—সেও তো শ্রীকৃষ্ণের সখী তারও তো সেই দশা—

খনে খনে দশন ছটাছট হাস।
খনে খনে অধর আগে রুদ্ধশ্বাস॥

সেও তো কখনো হাসে—কখনো কাঁদে, কখনো গাল দেয়।

কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি।

চোখ মেলল চাঁপা।

সত্যিই যে কেওয়ারী খুলে গেছে, কে যেন ঢুকছে!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, খাটো পাছোড়াখানি সামলে নিতে গেল। তারও যে রাই-কিশোরীরই দশা।

ইদিক ঢাকে তো উদিক ঢাকে না।

স্বপ্ন ভেঙে গেল, দিবা স্বপ্নের রেণু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। লগ্ন বুঝি তবু ভ্রষ্ট হয় নি।

চাঁপালতা বলে উঠল—তুমি এলে?

হিহি করে কার হাসি।

দিবাস্বপ্নের স্বর্ণরেণু উড়ে গেল, মিলিয়ে গেল। এখন নিলাজ দুপুর, নিঠুর দুপুর।

চাঁপালতা চমকে তাকাল। দেখলে ও-পাড়ার মাধব দাঁড়িয়ে আছে।

কাপড় পরেছে মেয়েলী ঢঙে, গালে-কপালে রসকলি আঁকা।

মাধব কাছে এসে বললে, কার কথা ভাবছিলি লো?

যার কথা ভাবি, তোর কথা তো নয়, ঝংকার দিয়ে উঠল চাঁপালতা।

মুখখানা বুঝি ম্লান হয়ে গেল মাধবের, বললে, কেন—আমার কথা কি ভাবতে নেই! আমাকে দেখলে চোপা করিস কেন?

চোপা করব না তো কি পিরিত করব! আবার বেজে উঠল স্বর। তোর কথা কি ভাবব, তুইও যা—আমিও তা! আমিও শ্রীকৃষ্ণের সখী চাঁপালতা আর তুই—কি তোর যেন নাম হল মাধব?

মাধব মৃদুস্বরে বললে, বিশাখা।

ও-মা—তাই বুঝি অমন মাকুন্দে চোপা করেছিস? তাই বুঝি অমন রসকলি পরেছিস? পাছোড়ায় ফেরতা দিয়েছিস?

ঐ তো নিয়ম—

নিয়মের মুয়ে ঝাড়ু মারি! বেটাছেলের আবার নিয়ম কি।

আমরা তো বেটাছেলে নই—আমরা সবাই মেয়েছেলে—পুরুষ এক তিনি।

তাহলে আবার ছোঁক ছোঁক করে ভরদুপুরে এখানে এলি কেন? বলেই খাটো শাড়ির আঁচলটায় বুক ঢেকে দিয়েছিল।—সখীভজা সখী ভজতে যা!

তোকে দেখতে! মাধব একটু মুচকি হেসে বললে।

মর মেয়ে-ন্যাকড়া—মুখপোড়া!

গাল খেয়ে হেসে বললে মাধব, আমরা যে সই, অমন গাল কি দিতে আছে ভাই!

না, গাল দেবে না, আদর করবে?

আদর আর করলি কবে! সেই ছেলেবেলা থেকেই তো গাল আর গাল!

গাল খেয়েও আসিস কেন?

আসি তোকে ভালবাসি বলে!

এই বলে খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল সখীভজা মাধব ওরফে বিশাখা সখী।

বিহ্বল হয়ে গেল চাঁপালতা, কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। যেন বিনা মেঘে বিজুরী চমকে গেল। সম্বিৎ নেই বুকে, রা নেই মুখে।

এমন সময় জটিলা-কুটিলা আসতে পারত, নিদেনপক্ষে বনমালা, ঝুমকোলতা—কিন্তু এল কালিন্দী।

এসেই বললে, ঐ মেধোটা এসেছিল কেন রে ভরদুপুরে?

চাঁপা উত্তর দিলে, আমি কি জানি!

তুই জানিস নে তো কে জানবে লো?

তাহলে জানি।

দ্যাখ, ঐ ছোঁড়াকে কাছে ঘেঁষতে দিবি নে। ওরা সখীভজা—আমাদের সঙ্গে ওদের আশনাই হয় না।

কেন হয় না মা—বললে চাঁপালতা,—ওরাও বোষ্টম মোরাও বোষ্টম।

বোষ্টম না হাতি! ওরা হল সখীভজা, আমরা জাত বোষ্টম।

বোষ্টমেরও জাত আছে মা?

থাকবে নি কেন রে? আমরা হলাম গিয়ে—সেই যে—

> বীরভদ্র গোসাঞি তার জানি আমি মন।
> বৈরাগীকে শিখাইলা মনের করণ॥

তাঁর শিষ্য। আর ওরা—

তা মা, ও আমার খেলার সাথী।

এখন বুঝি নীলে-খেলার সাথী হতে চায়! হুঙ্কার ছাড়লে কালিন্দী। ওসব চলবে নি। মালা চন্দন হোক, ভেক নে, গুরুপসাদী হোক তারপরে যত খুশি নীলে-খেলা করিস—এখন চলবে নি!

সেসব আবার কি? অবাক হয়ে বললে চাঁপালতা।

সব জানবি—সব দেখতে পাবি। মা-গোসাঞি আসুন! কিন্তু খবর্দার —ওর সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস চলবে নি। ওরা মোদের চেয়ে আলাদা!

কেন আলাদা, এ প্রশ্ন খচখচ করে বিঁধেছিল চাঁপালতার মনে। তাছাড়া কতগুলো কথাও সে শুনেছিল প্রথম। না। প্রথম শোনে নি। বনমালা-

ঝুমকোলতারা বলাবলি করে বটে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না। তাই গিয়েছিল আখড়ার বাবাজীর কাছে।

বাবাজী আখড়াধারী নন, আখড়ায় থাকেন। বুড়ো মানুষ। কৌপীন পরেন, তার উপরে গেরুয়া কন্থা বেঁধে নেন। জপমালা হাতে থাকে। ভিক্ষেয় বেরোন কিস্তি নিয়ে আর সবারই মতো। নারিকেলের মালা জুড়ে জুড়ে ভিক্ষার করঙ্ক বা কিস্তি। হাতে লাঠি থাকে, কাঁধে আবার ঝুলিও। আখড়ার পুরুষদের মতোই তাঁর বেশ। কিন্তু তাঁর খুব মান। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, রসমঞ্জরী সব তাঁর কণ্ঠস্থ। আর তা সবাইকে জলের মতো বুঝিয়েও দিতে পারেন। এমন কি আখড়াধারী দা-গোসাঞিও শোনেন, মন দিয়ে শোনেন। সকলেরই বৈষ্ণবী আছে, বাবাজী একা। তার মা কালিন্দীর সঙ্গে একবার কণ্ঠিবদলের কথা উঠেছিল, মাও বুঝি ঢলে পড়েছিল। অমন বাবাজীকে দেখে কার না মন টলে! ফুটফুটে গৌরবর্ণ দশাসই পুরুষ। মাথা কামানো—দাড়িগোঁফ নিখুঁত করে কামানো। দেখে ভক্তিই হয়, মুখখানি যেন ঢলঢল করছে। অমন রূপ দেখে কে না ঢলে—কে না টলে? কিন্তু বাবাজী কেন যেন রাজী হলেন না। হলে বেশ হত, সে বাপ দেখে নি, বাপ পেত। তবু বাপের মতো আদর করেন বাবাজী। সব মেয়েদেরই করেন, তাকে একটু বেশি। তাই সে যখন-তখন ছুটে যায় বাবাজীর কাছে, আবদার ধরে। আজও গেল।

বাবাজী পড়ছিলেন পুথি—

সহজের কথা শুন গো সোই।
সহজে পিরিতি ভয়ল এই॥
নিজ দেহ দি ভজিতে পারে।
সহজ পিরিতি কহিব তারে॥
সহজ বুঝিয়া যে হল রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
সহজ রসিক করয়ে স্থিতি।
রাগের ভয়ল এমতি রীতি।
সহজে মরমে মজিল যারা।
সাধন অঙ্গ বুঝিল তারা॥

চাঁপালতাকে দেখে পুথি বুজিয়ে রেখে বললেন, এস গো, রাই-কিশোরী, এসো গো হ্লাদিনী। এসো! আজ আবার কি দরবার?

চাঁপালতা এসে বাবাজীর কাছে বসে বললে, হাঁগো, বাবাঠাকুর, মোদের বুঝি সখীভজার সঙ্গে মিশতে নেই।

কে বললে! বাবাজী হেসে বললেন। রাই কিশোরী, আমরা সবাই যে কৃষ্ণের জীব, বোষ্টম—মোদের কি জাত-বিচার আছে লো!

জাত-বিচার নেই তো, মা ওকথা বলে কেন? বলে, সখীভজার সঙ্গে মিশতে নেই, কর্তাভজা, আউল-বাউলের সঙ্গে মিশতে নেই। অত বারণ আমি শুনতে পারব না!

বাবাজী বললেন, কে বারণ করবে! তুমি যে সাক্ষাৎ রাধা। তোমাকে বারণ করে দ্বাপরেই কি কেউ বাগ মানাতে পেরেছিল! ছুটে যাও নি মুরলী ধ্বনি শুনে!

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল চাপালতা, যাও—তোমার সঙ্গে কথা বলব না! তোমার শুধু ঠাট্টা!

ঠাট্টা নয় লো সই, ঠাট্টা নয়—কৃষ্ণের জীব, রাধার জীবের আবার ছোঁয়াছুঁয়ি, জাত-বিচার কি লো? আমরা সবাই এক!

তাহলে, সকলের সঙ্গে আমি মিশব। ফোলা ঠোঁট চিরে হাসি ঠিকরে বেরিয়েছিল।

মিশবে, দুশোবার মিশবে। কিন্তু একটা কথা গো রাই—

কি কথা?

বাবাজী কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, যাই-ই কর সখী, মন দিয়ো না। সে-মন তোমার খড়দ'র তমাল-শ্যামলের জন্য রেখো!

যাঃ—বলে ছুটে পালিয়ে এসেছিল চাঁপালতা। চাপালতা আজ্ঞা পেয়েছিল বাবাজীর, কিন্তু এ-আজ্ঞা তো বাবাজীর দেওয়া নয়। এ-আজ্ঞা দিয়েছিলেন ঠাকুর নিত্যানন্দ। সাধন-ভজন যে-খুশি, সে করবে। জাত কারো নেই—সবাই এক জাত। আর সবার পতি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর নীচে আছেন গুরু। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রকে তিনি মিলিয়ে দিয়ে এক সৃষ্টি করেছিলেন। সেই তন্ত্রে বলে না—

গ-কারে কয় সিদ্ধিদাতা

রেফ-এ কয় পাপনাশা

আর উ-কারে কয় শম্ভু।

সেই তান্ত্রিকদের গুরুকে এনে বৈষ্ণব সমাজে তিনি ঠাঁই দিয়েছিলেন। তাই তাঁর পুত্র বৌদ্ধ তন্ত্রাচারী-চারিণীদের কোল দিতে পেরেছিলেন। গুরু যখন এল, সঙ্গে সঙ্গে দেহের পথে দেহাতীতের ধ্যানও এল। তন্ত্র বৈষ্ণব ধর্মে ভিত্ গেড়ে বসল। দেখতে-দেখতে নানা সম্প্রদায় সৃষ্টি হল। সবাই প্রেমিক, সবাই চায় শ্রীকৃষ্ণকে দাস-দাসীভাবে ভজনা করতে, সবাই চায় সখাভাবে, সন্তানভাবে শ্রীকৃষ্ণকে; আর তার থেকেই এল পরকীয়া সাধন। কিন্তু সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ বেঁধে গেল। এক দল বলে, সখীভজা আমরা হব না; আর একদল বলে, আমরা হব না গুরুভজা। তাই জাতের কথা উঠে পড়ল; এ বলে আমরা উঁচু দরের, ও বলে আমরা উঁচুদরের। দুই দলের আখড়াই পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি,—দু'দলই প্রেমের সাধক—তব্ তারা ভিন্ন। তবু তাদের মেলামেশা বারণ। বারণ না হোক, মালাচন্দন, কণ্ঠিবদল বারণ। এদের সমাজেই এই দশা—অন্য সমাজ এদের ভাল চোখে দেখবে কেন? তাই নিত্যানন্দের ধর্ম, ঠাকুর বীরভদ্রের ধর্ম তাদের কাছে এক কথায়—

মাগুর মাছের ঝোল,
ভরযুবতীর কোল,
বোল—হরিবোল।

ওদের সাধন-ভজন ঝুটো, আচার-বিচার ঝুটো—শুধু ভরন্ত যৌবনা নারী নিয়ে মত্ত হয়ে থাকাটাই আসল কথা। আর সেই আনন্দেই হরিবোল বল রে মন।

চাঁপা নিজের সম্প্রদায়ের কথাই জানে না, অন্য সম্প্রদায়ের কথা তো তার অজানাই। তবে বিদ্রূপ সে শোনে পথেঘাটে। পথে বাঙালদিদির সঙ্গে বেরুলেই ঐ ছড়াটা শুনতে পায়।

মাগুর মাছের ঝোল···

গায়ে তারা কেউ মাখে না। ওসব বাবু-ভায়াদের ছড়া। ওরা বৈষ্টমী দেখলেই ফষ্টিনষ্টি করে, রংতামাসা করে। তবে এখানে তাদের

সংখ্যাই বেশি বলে ওরা পেছু লাগতে তেমন পারে না। দণ্ডের ভয় আছে, ডাণ্ডার ভয় আছে। তারা নয়া নবদ্বীপের মানুষ না হোক, সেই শ্রীধামেরই এলাকার মানুষ। গঙ্গার কূলে কূলে যখন বৃন্দাবন ধামে চলেছিলেন নদীয়া নগর নাগর শ্যাম, সেদিন এখানেও পদধূলি তাঁর পড়েছিল। এইখানে এসেই মুখশুদ্ধির হরতকি চেয়েছিলেন গোবিন্দ ঘোষের কাছে। তাই এ জায়গার নাম আছে ঠাকুরের সব পুথিতে ছড়িয়ে। নবদ্বীপ তো শ্রীধাম, কলিযুগে কৃষ্ণ হৈল চৈতন্য অবতার—তাই একে বলে শ্রীধাম। শ্রীপাট তো অম্বিকা—সেখানে দেখা দিলেন ঠাকুর নিত্যানন্দ—সেই যে ব্রজের কানাই-বলাই—একতনু দুই ভাই। শ্রীপাট তো খড়দহ—যেখানে ঠাকুর নিত্যানন্দ বাস করলেন, আর তাকেই শ্রীধাম করে তুললেন নিজের ধর্মপ্রচারে। শ্রীধাম আর শ্রীপাট না হলেও তাদের এ জায়গাও ছোট নয়। এ তো শ্রীধামেরই এক অংশ।

চাঁপালতা বেড়ে উঠেছে এখানে, সে এসব কথা শুনেছে, কিছু বা বুঝেছে, কিছু বা বোঝে নি। কিন্তু সেও রাই-এর অংশ—শ্রীকৃষ্ণ তার পতি একথা জেনেছে। আর জেনেছে মানুস পতি তো দুদিনের, দুদণ্ডের—তারপরে গুরু পতি, তারপরে জগৎ-গুরু শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু গুরু-প্রসাদী কি সে জানত না।

বাঙালদিদি; পদ্মাপাড়ের দিদি—যে তার গুয়ারেখী কেশ দেখে মুগ্ধ, সে-ই বলেছিল,

ওমা—জানিস না লো, কেউ কয় নি?

তুমিই বল না? তুমি তো জান?

আমাগো দ্যাশে ওসব নাই, এখানে দেখছি। বীরভূমে দেখছি।

বল না! অধীর হয়ে উঠেছিল চাঁপালতা

আমাগো বনলতা দিদির কাছে শুনছি! সে এক এলাহী ব্যাপার; তার হইছিল। বিয়া হইচে, মালাচন্দন হইচে—এমন সময় গুরু আইলেন। গুরুঠাউর। তার সাথে থাকতে হইব একরাত্তির। বনলতা দিদি তো কান্দেন কাটেন, শেষে তারে জোর কইর‍্যা গুরুঠাউরের ঘরে ঠেইলা দিয়া কবাট বন্ধ কইরা দিল। বনলতা তো কান্দেন আর কান্দেন।

গুরুঠাউর হাত ধইর‍্যা কন—

যিনি গুরু তিনি কিষ্ট না ভাবিও আন।
গুরু তুষ্টে কেষ্ট তুষ্ট জানিবা প্রমাণ॥

তবু শোনে না বনলতা, শ্যাষে গুরুঠাউর ম্যাক্কেবারে মোক্ষম কথা কইলেন, পাপ হইব মাইয়া, চল!

হাত ধরলেন বনলতার, আর সুড় সুড় কইর‍্যা গিয়া মাইয়া বিছানায় লইল। আমাগো পেরভু তখন বনলতার গায়ে হাত রাইখ্যা কইলেন, বল—আমি রাধা, তুমি শ্যাম, আমি রাধা, তুমি শ্যাম। কি আর করেন, কইলেন। আর তারপরে গুরু লীলাখেলা করলেন। খোলকত্তাল আর হরিবোল ঘন ঘন শুনা যাইতে লাগল।

ওমা, কি হবে গো! আঁতকে উঠেছিল চাঁপালতা।

ওমা, তুই শিউরাইয়া উঠিস ক্যান? এই তো আমাগো ধম্ম!

ধম্ম শুনে ভড়কে গিয়ে ছিল চাঁপালতা, কিছু বলে নি।

সে তখন তমাল-শ্যাম, নবজলধরশ্যাম এক কিশোরের ধ্যানে বিভোর। শ্রীপাট খড়দহে, না, অম্বিকায় সে কিশোর থাকে। সেই কিশোরকে পেলে হয়। গুরু-প্রসাদী হলে হবে। যখন ধর্ম—তখন মানতেই হবে। কিন্তু কচি কিশলয়ের মতো তো গুরুর রূপ নয়। তাঁর মুখ তো নবনীত শ্যাম দেহে মানায় না! তিনি তো বৃদ্ধ, তিনি তো নাদাপেটা ভুঁড়িরাম। তাই দিবাস্বপ্নের মধুরিমায় দুঃস্বপ্নের মতো এসে দেখা দেন। লীলা-খেলার মানে সে জানে, বৈষ্ণবের মেয়ে জানবে না! আখড়ায় ছেলেবেলা থেকে বাস—তাই জানতেই হবে। তাই শিউরে ওঠে চাঁপালতা। গুরু যেন হাত ধরেছেন, সে ছাড়াতে পারে না, কাঁদে। ছাড়াতে গেলেই পাপ। সে দিবাস্বপ্নের ঘোরেই কেঁদে ওঠে। আবার দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে যায়, সেই সুখস্বপ্ন এসে দেখা দেয়। কালিন্দী তীরে স্নান সেরে উঠল সে। অঙ্গে লেগে আছে পাতল-চীর, তাহে বেকত ভেল সকল শরীর। এমন সময় সে এল। তমাল গাছ থেকে কি নেমে এল, না কদম্ব গাছ থেকে? না নিকুঞ্জ বন থেকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি লজ্জা। পাতল বসনে বিপুল নিতম্ব ব্যক্ত হয়ে পড়েছে, তাই তার পরে আলুল চুল দিয়ে ঢেকে দিল। লজ্জা তো বাগ মানে না।

আবার নাগরও তেমনি।

উরোজ উপরে যব দেয়ল দিঠ।
উর মোড়ি বৈঠলু হরি করি পিঠ॥

হাসি মুখ চাট মধাই।
তবু তনু ঝাঁপন না যাই॥

বুকের দিকে তাকায়, মুখ ফিরিয়ে নেয় নাগরী। আর চঞ্চল প্রকৃতি মাধব হাসিমুখে তবু তাকিয়ে আছে। এ কি জ্বালা গো, এ কি জ্বালা! বসন তো লেপটে আছে। ঢাকা তো যায় না তনুদেহ। ওরে, তুই তো অগেয়ানী, তোর এত লজ্জা কি? এ তো নাগরের কৌতুক।

কৌতুকরসে মন মজে যায়, কিন্তু দিবাস্বপ্নে আবার দুঃস্বপ্ন—আবার সেই গুরু···হঠাৎ নাগরের মুখখানি মিলিয়ে যায় খড়দহের বাবা-গোসাঁই-এর মুখখানা এসে দেখা দেয়। তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—শ্রীরাধে! আঁতকে ওঠে, চোখ চায়।

এমনি মধুরে গরলে দিবাস্বপ্ন অমৃত হয়, আবার বিষ হয়। স্বপ্নের উপর চলে বাস্তবের কাঁচি। চাঁপালতা স্বপ্নকে ভালবাসে, বাস্তবকে ডরায়। সে মনে মনে বলে, হে মধাই, বাস্তব স্বপ্ন হোক, বাস্তব স্বপ্ন হোক!

মধাই কি তার কথা শোনেন?

কে জানে!

·

সেদিন আবার এল মাধব। সখীভক্তা মাধব দুপুরেই এল।

দুপুরে কাকপাখী ঝিমোয়, নদীর ঘাটে মাঝি ঝিমোয়, গুরুমশায় ঝিমোয় পাঠশালে বেত হাতে, আবার আখড়াও ভোগের প্রসাদ পেয়ে ভরপেটে ঝিমোয়, ঘুমোয়। মাধব তাই যখন আসে, এই সময় আসে। সে জানে আখড়া ঝিমোলে কালিন্দীও ঝিমোয়। আখড়ার মোহন্তের পদসেবা করতে করতে তারও ঢুল আসে। আর পুথি পড়তে পড়তে ঝিমোয় বাবাজী। সে তাই এল।

তখনো দিবাস্বপ্নে বিভোর চাঁপালতা, ভাবছে তার কালিয়া-কিশোরের কথা। সে যেন শ্রীরাধিকা। দর্পণে করছে সিঙ্গার—বেশবাস।

বেশবাস কেমন?

নীল রতনগণ বিরচিত ভূষণ, পহিরহ নীলিম-বাস।
মৃগমদে ভরু কুচ কনক-কলস, যাহে শ্যামর অধিক উল্লাস॥
নূপত বেকত করু কিঙ্কিণী নূপুর।

নীল রত্নে খচিত ভূষণ, নীল তার বাস কনক-কলসের মত দুই স্তন পূর্ণ হল মৃগমদে। কিঙ্কিণী আর নূপুর ব্যক্ত হবে, তাই তাকে লুপ্ত করে দিলে। মুখর, অধীর মঞ্জীর ত্যাগ করলে!

এমন সময় পা টিপে টিপে কে যেন ঢুকল।

চাঁপালতা নিমীল চোখে তখনো ভাব-সিঙ্গারে রত। ঘন আন্ধিয়ার হল, এখনি তো মুরলী বাজবে। তাই বললে,

এসেছ—তুমি এসেছ—এসেছ কানু!

এসেছি গো, এসেছি। মাধব মৃদুস্বরে বললে।

চমকে উঠল চাঁপালতা—ওমা কে গো!

চুপ, চুপ! আমি!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, আবার আউল বসন সম্বরণের পালা, তন্বীতনু ঢাকার পালা।

তুই!

হাঁগো, মুই!

তুই আবার এয়েছিস, মা দেখতে পেলে মুড়ো খেংরা!

মাধব হেসে উত্তর দিলে, তা তো অষ্টপহরই কপালে আছে, তবু কপাল ঠুকেই এলাম।

তোর কপাল তো বড় শক্ত।

একেবারে নীরেট কপাল!

এসেছিস কেন রে?

চল না, যাবি?

ওমা, সখীভজা মেয়ে-নাগরের সঙ্গে কোথা যাব? মুচকি হেসে ঢঙ করে বললে চাঁপালতা।

যেতে নেই বুঝি? একটু অভিমানে বললে মাধব।

মায়া হল চাঁপালতার। কাজল-শ্যাম রূপ নেই, তবু মাজা রং। মুখখানিতে আছে ঢলঢল লাবণ্য। এ-লাবণ্য আর কোনদিন চোখে পড়ে নি, আজ পড়ল।

বললে, তোর সঙ্গে কোথা যাব?

চল—আজ দুপুরে মোদের আখড়ায় শুকসারীর পালা—দেখতে যাবি?

আমি না ডাগর মেয়ে, আমার না মালাচন্দন আজ বাদে কাল—তোর সঙ্গে ধেইধেই করে নাচতে যাব ?

আমি তো তোর পর নই লো সই—মেয়েলী ঢঙে বলে উঠল মাধব। আমি তো খড়দ'র কেষ্টর কাছ থেকে তোকে ছিনিয়ে নিতে আসি নি ?

এলেই কি পারতিস ! হেসে উঠল চাপালতা। অমনি কুরুক্ষেত্তর বেধে যেত না !

তুই বললে পারি—কেমন যেন বিহ্বল চোখে চেয়ে উত্তর দিলে মাধব। চাঁপালতার শিরশিরিয়ে উঠল বুক। তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে দিলে বুকে।

ওমা, এযে কানাইয়ের মতো চায় ! উরোজ উপরে দেয়ল দিঠ্ ! ওমা, চোখ যে আগুন হানে গো !

তাড়াতাড়ি বলে উঠল চাঁপালতা—যা-ভাগ ! এখুনি মা জেগে উঠবে, শ্যাল-কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেবে।

দিলে দেবে—তুই যাবি কি না বল !

তুই বুঝি দূতী হয়ে এলি ?

হাঁ গো, আমি বিন্দে দূতী। তুই বলেছিলি—একদিন দেখতে যাবি—তাই নিতে এলাম। যাবি ?

যেতে তার খুব সাধ। বনমালারা যায়, বাঙালদিদিরা যায়, মা কালিন্দীও যায়। সখীভজা, কর্তাভজা, আউল, বাউল, সহজে, সাহেব-ধনী—সকলের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিভেদ থাকলেও বিরোধ নেই। তাই সে যার উৎসবে যায়, শুধু যখন গোপন উৎসব হয়, তখন যাওয়া বারণ। সেসব উৎসব বস্ত্রহরণের, কামিনীকুঞ্জরের—সেসব নিজের নিজের সম্প্রদায়েই আবদ্ধ। তবু এসব উৎসবেও কালিন্দী তাকে যেতে দিতে নারাজ। কি জানি—কখন কি হয়। মন না মতিভ্রম। আবও কিশোরীর মন, যুবো মেয়ের মন।

কিন্তু মা'র বাধা আছে বলেই তার যাবার সাধ। নিষেধ আছে বলেই নিষিদ্ধ ফল এত মধুর। প্রলোভন আছে বলেই তা বড় লোভন।

তাই বললে, দেরি তো হবে না মাধাই ?

দেরি কি, যাবি আর আসবি ! একি দূর পাল্লা ? এই তো হোথায়।

মাধবের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল পা টিপে টিপে চাঁপালতা। একটু গোপন নেশার আমেজ তাকে পেয়ে বসেছিল, নিষিদ্ধ নেশার ঝাঁজ।

অভিসারে বেরুতে গিয়ে শ্রীমতী রাধিকার কি এমনি হয়েছিল? হবেও বা।

ভরদুপুর। নীল আকাশে নেই সিঁদুরে মেঘ। তবু যেন ডর, তবু যেন কাঁপে বুক দুরুদুরু।

মাধব তাকে নিয়ে যায় নি আখড়ার আসরে। তাকে নিয়ে গিয়েছিল তারই পাশের এক ভাঙা ঘরে। মাটির দেয়াল ভাল করে লেপা নয়, এখানে থাকে আখড়ার যত জঞ্জাল। তাই দেয়ালে ধস নামলেও কেউ দেখে না, ফোকর হলেও কেউ বুজিয়ে দিতে যায় না। খড়িমাটি দেয় না গিরিমাটি দিয়ে লতাপাতার আলপনা আঁকে না। এ এক অব্যবহৃত ঘর। এখানে উৎসবের দু-একটা সরঞ্জাম থাকে। যেমন কামিনীকুঞ্জরের হাতির মুখোস, যেমন নৌকাবিলাসের নীলগোলা কাগজের নৌকো। আবার শুকসারীর খাঁচাও আছে।

মাধব বলেছিল, এইখানে বসে ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখবি।

ওমা, এই আঁধার ঘুরঘুট্টি ঘরে একা বসে থাকব? চাঁপালতা একটু ভয়ে ভয়ে বলেছিল। ভরদুপুরে অভিসারের সাহস তখন তার উপে গেছে

একা নয়তো দোকা পাবি কোথা?

তুই আসবি নে।

ওমা—তোর কাছে বসে থাকব তো রাধা সাজবে কে?

তুই তো বিশাখা—তুই আবার রাধা নাকি?

আমি ললিতে সাজি, বিশাখা সাজি, আবার রাধা সাজি, মাধব বলেছিল গর্বভরে।

একটু বা অনুচ্চ হাসি হেসে উঠেছিল চাঁপালতা, বলেছিল, আহা রাধার ছিরি দেখে মরে যাই লো। কি আমার রাধা—নেই রং, নেই সেই মুখ, নেই রূপ।

দেখবি, সাজলে হবে—রাগ করে বলেছিল মাধব।

হ্যাঁ, ঐ মেয়ে-নাগর আবার সাজলে রাধা হবেন?

দেখবি—দেখবি!

দেখব না ছাই। পুরুষ আবার রাধা হবে কিগো। রাধা হব আমি। ফস করে ঝরে পড়েছিল কথাটা।

মাধব বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, তা বটে, তোকে মানায়। দিব্যি মানায়। একদিন সাজবি? আমি কেষ্ট, তুই রাধা!

দূর মুখপোড়া! কোপভরে হেসে উঠেছিল চাঁপালতা। মেয়ে-নাগরের সাধ দেখ না।

মাধবের চোখের আলো অমনি দপ্ করে নিবে গিয়েছিল। সে বলেছিল, যাই। চলে গিয়েছিল।

চাঁপালতা চলে যায় নি। দেখতেই সে এসেছে, তাই আসর বসতে সে ফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

শুকসারীর বিবাদ নতুন কিছু নয়। একদল সাজে শুক, আর একদল সারী। কৃষ্ণ-পক্ষ আর রাধা-পক্ষ।

সারী বলে শুন শুক
তোমার কেষ্ট কালো।
আমার শ্রীরাধা রূপে
নিধুবন করেছে আলো।
শুক কহে আমার কেষ্ট মদনমোহন
যাহার রূপেতে মোহিত এ তিনভুবন!

সেই মামুলি গান, আর সেই বিবাদ। বিবাদ করতে-করতে দুইদল শান্ত হল। পালা শেষ হল।

আবার খোল বেজে উঠল, করতাল বেজে উঠল, আবার আর এক পালা।

যুগল-মিলন।

শ্রীরাধা বেরিয়েছেন কৃষ্ণ দর্শনে, যেন সুরধুনী বেরিয়েছে উৎস থেকে সিন্ধুতে মিলতে। বাজছে বাঁশী। তাই তো নেই তাঁর জ্ঞান, এলায়ে পড়েছে মাথের কেশ। হেলে-দুলে পড়েন চলতে, যেন বাণ-বিদ্ধা হরিণী।

চমকে উঠেছিল চাঁপালতা—এ রাই তো তার চেনা। এযে মাধব! হরিতাল গুলে গৌর করেছে কালো রং। মুখে মেখেছে সিঁদুর, তবু কি আছে যেন খোলে, করতালে, মুরলীতে। তাই সেও রাধা! সেও শ্রীমতী—গজরাজ-গতি পদ্মনাকারী শ্রীমতী। সে দেখতে লাগল।

শ্রীমতী এগিয়ে চলেছেন, আর বাঁশীর শব্দ আসছে কাছে এগিয়ে।

রাধা সুরধুনী, শ্যাম সিন্ধুসমান। সেই শ্যামের কলকল্লোল ঐ মুরলীতে। তাই তো উছল সুরধুনী-রাধা—তাই তো ঢেউ জেগেছে তার দেহে, তার কনকের গিরি কটোরায়।

ওগো ললিতে, দেখ্না লো!

দেখ্না লো, ও বিশাখে!

দেখ্না লো, সুচিত্রে!

দেখ্না লো, চম্পালতিকে!

চম্পালতা দেখেছিল নাগরে, দেখলে আজ চাঁপালতা।

সত্যিই দেখলে।

মেয়ে-নাগর নয়, সত্যই দূর্বাদল শ্যাম এক কিশোর। সত্যই শ্যাম, সত্যই নাগর। কেশ ঊর্ধ্ব-চূড়া, তাতে জাতি, যুথী, রঙ্গন, বকুল। তার উপরে শিখিপুচ্ছ চূড়া। গলায় গুঞ্জমালা, কপালে কুমকুম তিলক, যেন নীল মেঘে রক্ততারা, তার মধ্যে মৃগমদবিন্দু, তার চারিদিকে চন্দন বিন্দু। কানে ফুলের কুণ্ডল, হাতে কঙ্কণ মঞ্জরী। লাবণ্য যেন ঝলসে পড়ছে, লাবণ্যের ঊর্মি যেন বিজুরী ঝলকে।

চোখ ভরে দেখল অনুরাধা···

অনুরাধা নয়, অনুরাধারূপী এক সখীভজা।

চোখ ভরে দেখল সুচিত্রা···

সুচিত্রা নয়, সুচিত্রারূপী এক সখীভজা।

চোখভরে দেখল চম্পালতা···

চম্পালতা নয়, চম্পালতারূপী এক সখীভজা।

আর দেখল কিশোরী চাঁপালতা।

তারপরে মিলনের বাঁশী বাজল 'রাধা রাধা' বলে!

রাধা যেন স্ফীতা দুকূলপ্লাবিনী নদী—বাহু যেন তার তরঙ্গ ভঙ্গিমা। সেই তরঙ্গে ঘিরে ধরতে চায়, মিশে যেতে চায়। ওদিকে কল্লোল জেগেছে যেন কৃষ্ণ-সিন্ধুতে। মিলনের মুরলী বাজছে।

এস—এস! এস!

রাধা এগিয়ে এলেন; বামে এসে দাঁড়ালেন। যুগল মিলন হল। একি মিলন! নব কাদম্বিনীসহ যেন সৌদামিনী মিলেছে, যেন কনক-জড়িত

মরকত মণি। দেখলে বিশাখা, দেখলে ললিতা, চাঁপালতাও আবেশে বিভোর হয়ে দেখলে।

রাধা বললেন, রসরাজ, আজ তোমাকে বলব এক স্বপ্নকথা। আমার মন তো স্বপ্ন দেখে অধীর।

বিনোদিনী রাই,—কি স্বপ্ন দেখেছ বল শুনি! কৃষ্ণ শুধালেন।

রাধা উত্তর দিলেন—

ওগো বঁধু, কও দেখি, সে নাগর কে,
স্বপনে আজ দেখেছি যাকে।
সে কি তুমি না আমি বঁধু, নিশ্চয় বল আমাকে!
তোমার মতো অঙ্গের গড়ন, আমার মতো গৌরবরণ
সে যে ব্রহ্মার দুর্লভ হরিনাম বিলাইতেছে যাকে তাকে!

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সে তো তুমি, সে তো আমি। আর সেই তুমি আমি মিলে তো সেই গোরাচাঁদ।

আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।

আজ সেই প্রেমরস আস্বাদন করব, সেই রাগমার্গে আজ আমাদের সাধনা। আমি হব রাধা, তুমি হবে কৃষ্ণ; আবার আমি কৃষ্ণ, তুমি রাধা। দুজনে দুজনে মিলে যাব, মিশে যাব।

একথা শুনেছিল চাঁপালতা, কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছিল। যখন শ্রীকৃষ্ণ আবেগে রাধাকে জড়িয়ে ধরলেন, যখন রাধা বিবশ হয়ে এলিয়ে পড়লেন, তখনও তার চেতনা ছিল। সে তার চোখ দুটি মেলে ফোকর দিয়ে তাকিয়ে ছিল। বিবশ তনুমন, তবু কৃষ্ণের রূপ দেখতে তো আঁখি সজাগ ছিল—প্রতি অঙ্গ লাগি কেঁদে উঠেছিল প্রতি অঙ্গ। হয়তো দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেছিল, আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তেই চেপে ধরেছিল নাক-মুখ। কি জানি—কেউ যদি শুনতে পায়!

শুনতে কেউ পায় নি। না, একজন বুঝি পেয়েছিল।

না, মানুষ নয়। সে তো তখন দশায় পড়েছে। শ্রীরাধিকাও বুঝি মিলনক্ষণে এমনি দশায় পড়েছিলেন। এক অঙ্গে যুগল-অবতার শ্রীগৌরাঙ্গও

পড়তেন। তিনি তো নীলাচলের সাগরে সেই যুগল-রূপ দেখেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন তারই সন্ধানে।

মাধব দশায় পড়তেই পালা শেষ হয়েছিল। তখন আর সবাইও দশায়। ললিতা, বিশাখা, তুঙ্গবিদ্যা, বৃন্দে, কুবুজা, সবাই। কলাগাছের মতো দশায় পড়েছিল। দশায় পড়া তার দেখা, নিজে পড়ে নি। মা কালিন্দীকে পড়তে দেখেছে, বাঙালদিদিকে দেখেছে। কিন্তু সে জানে, ওরা দশায় পড়ে জাগন্ত অবস্থায়। চোখ বুজে থাকে, আবার মিটিমিটি তাকায়। শুধু বাবাজীকেই সে নড়তে-চড়তে দেখে নি। সমাধি পাওয়া তাকেই বলে।

মাধব নেই, তাকে একাই পালাতে হবে। এই সুযোগ।

বেলাও পড়ে এল। এখনি তাদের আখড়া দুপুরের নিদ্ থেকে জেগে উঠবে। মা উঠেই মেয়ের খোঁজ করবেন। সে তাই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসতে কিসে পা পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ বেরিয়ে এল—

ও—মা!

কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। উঠে পড়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে, উরুতে হাত বুলোতে লাগল। তারপর পা বাড়াতে যাবে, এমন সময়—

সে এসে দাঁড়াল।

বললে, কিগো সখী, দশায় পড়েছিলে নাকি? তা আসরে না গিয়ে এখানে কেন?

লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল চাঁপালতা, বসন টেনেটুনে দিলে।

তুমিও কি আমাদের পুরুষ-সখী নাকি গো—না সত্যিই সখী? সে আবার বললে।

নিরুত্তর চাঁপালতা। একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে, ধড়াচুড়া খুলে ফেলেছে শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু এখনো মোহন বেশ। থোপা থোপা কোঁকড়া চুল এসে পড়েছে মুখে। আর মুখে কি মিঠে হাসি!

কি গো, কথা বল না কেন? সেই মোহনবেশধারী বললে।—তবে বুঝি তুমি আমার শ্রীরাধা!

হাত ধরতে গিয়েছিল সে, হাত ধরতে দেয় নি চাঁপালতা, ছুটে পালিয়ে এসেছিল।

সে পেছু পেছু ছোটে নি, হাসছিল মিটিমিটি। পেছন ফিরে দেখেছিল চাঁপালতা। তারপর ছুটে চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে তো দিবাস্বপ্নে আর ছায়ার দরকার হয় নি। কায়া পেয়েছিল ছায়া। খড়দহের ছায়াও আর মনে পড়ে নি, শুধু কায়াময় সেই পুরুষ—শুধু কায়াময় সেই শ্রীকৃষ্ণ। মাধবকে তার কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য মন তখন উচাটন, নিঃশ্বাস সঘন। গঙ্গায় জল আনতে গেলে চায় আশেপাশে, সখীভজাদের আখড়ার পাশ দিয়ে গেলে চোখদুটি সেইদিকেই তাকিয়ে থাকে। দেখা পায় না। ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার আসে যায়, পথপানে চায়—দেখা পায় না। মেঘপানে কি তাকায়, দেখে কি খসায়ে চুল—হাসে কি? তাও হয়তো হাসে, কিন্তু দেখা পায় না।

দেখা পায় না, তাই তো মনে দুঃখের বারমাসী, বিরহের বারমাসী শুরু হয়ে গেল।

মাধবী মাস। চারিদিকে কুসুম বিকাশ।

মুকুল পুলকিত বল্লরী তরু অরু চারু চৌদেশে সজ্জিতা
হামসে পাপিনী বিরহে তাপিনী সকল সুখ-পরবঞ্চিতা।

এল জ্যৈষ্ঠ মাস, এল অন্তরে আষাঢ়। পাপিয়া পাখীর পিয়া ডাক শুনে চমকায় চিত্ত, কিন্তু প্রিয়ের তো দেখা পায় না।

শ্রাবন মাসে ডাহুকী ডাকে, ময়ূর নাচে—কিন্তু একা মন্দিরে জাগে সারারাত—দেখা পায় না। ভাদর মাসেও নয়। জলধারা যেন আঁখির রোদন হয়ে বয়—দেখা তবু নেই! শ্রীরাধা দেখা পান নি, চাঁপালতাও পায় না। দেখা নেই আশ্বিনে—কার্তিকে—দেখা নেই অঘ্রানে—দেখা নেই পৌষে—যখন প্রিয়ের আসঙ্গ লিপ্সায় কাটে যামিনী। আর দেখা নেই মাঘে—দিন রজনী গুনে গুনে শেষ করে, দেখা নেই ফাল্গুনে যখন ফাগুনে মন উতলা হয়ে ওঠে উতরোল হাওয়ায়। দেখা নেই—বিরহের বারমাস্যা গায় আপন মনে। বার মাসের বারমাস্যা তো দীর্ঘ, কিন্তু অন্তরের বারমাস্যা তো এই আসে, এই যায়—এই আবার আসে। চাঁপালতার মন সেই বারমাস্যা গায়।—পাপিষ্ঠ শুধু মাস নয়, মুহূর্তগুলিও—আর বিরহিণীর মরণের জন্যই বুঝি তারা আসে।

মর্মে মরে আছে, এমন সময় আবার দুপুরে একদিন মাধব এল।

বললে, তোকে আজ দেখতে এলেম।

আমাকে আবার কি দেখবি! উঠল না চাঁপালতা। শুয়ে শুয়েই বললে। আজ আর গায়ে লজ্জা নেই, বিরহিণীর আবার লাজ কি! সব লাজ তো এখন সেই নিঠুর কালার।

বাঃ, তোকে দেখব না! তোকে দেখতে ভাল লাগে, একটু রসঘন স্বরে বললে মাধব। একটু বা লজ্জা-লজ্জা ভাব।

মর মুখপোড়া—সাজি নি, গুজি নি, নীল শাড়ি পরি নি, কানড়-ছাঁদে কবরী বাঁধি নি—এমন আউল বেশ—তাও ভাল লাগে?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাধব, সে বললে, হ্যাঁ লো, ভাল লাগে। তোকে দেখে যে কানুাই পাগল।

শাড়িটা একটু টেনে-টুনে নিয়ে বললে চাঁপালতা—কানুাই আবার কে?

আমাদের সয়া কে মনে নেই?

কোন সয়া?

সেই যে গো পুরুষরতন, সেই যে যার পিরীতিতে জগৎ আলো।

অমন ভণিতা করে কথা বলিস নে মাধব—বল্—সে কে?

মাধব কানের কাছে মুখ নিয়ে হাত আড়াল করে বলে, সেই যে, যিনি কামিনী-কুঞ্জরে বসেন, যিনি কৃষ্ণ-কালী হন—

> কাল জলে হল যেন জবা বিকশিত…
> নীলমণি মধ্যে যেন নব গুঞ্জমালা।
> সারস—মধ্যেতে যেন শোভে মতি-পলা।
> আশ্চর্য ধরিল শোভা ভকত বৎসল।
> নীলগিরি মধ্যে ফুটে শোণিত কমল।

সেই তিনি ডেকেছেন।

আহা আমার নাগর রে! তুমিই বুঝি তিনি?

মুচকি হেসে লীলাভঙ্গে বললে চাঁপালতা।

জিভ কেটে বললে মাধব—ছি ছি ছি—ওকথা শুনলে পাপ হয়? আমি তো বিশাখা, তুই চাঁপালতা—আমরা সবাই সই—আর তিনি সয়া। সেই যে মোদের আখড়ায়…মনে নেই?

মনে কি আর পড়ে নি চাঁপালতার, তবু ভান করেছে। নারী ভানমতী।

দশ ভান শুধু নয়, লাখো ভান তার তূণে। আবার যখন ভান করে না, তখনো তার সরলতাও এক ভান হয়ে ওঠে।

চাঁপালতা উত্তেজিত। রাজ্যের লজ্জা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। সে বসন সম্বৃত করে নিয়ে বললে,

আছে।

আছে তো চল ধনী, ডাক এসেছে।

ওমা, ডাকলেই কি যাওয়া যায়? চাঁপালতা হাসল। জটিলা-কুটিলা আছে না, আয়ান ঘোষ আছে না?

থাকুক—সে তো বাধা নয়? তুই তাহলে পিরীতি জানিস নে! তুই শ্রীমতী নোস।

আমি শ্রীমতী হব কি করে—আমি যে চম্পালতা।

চম্পালতা আর বিশাখা আর ললিতা সবাই তো শ্রীমতী রাধা। বহুতে এক, একে বহু।

হেসে উঠল চাঁপালতা—তুই অনেক শাস্তর পড়েছিস তো? আমি কি তোর মতো অত জানি রে সখীভজা?

আহা—সহজে মেয়ে আবার জানে না—সব জানে ধনী, সব জানে তবু বলে, কিছু জানে না। নে—খপর দিয়ে গেলাম!

তুই তো বিন্দে দূতী, খপর দিয়েই খালাস—আমি এখন কি করি!

কি আবার করবি, ছুটে যাবি।

তাই যাব। ফিসফিস করে বললে চাঁপালতা। তাকে বলিস গোপীনাথের মন্দিরের কাছে দেখা হবে।

কবে?

কাল।

কাল তো অনেক কাল।

না সে কালিয়ার অনেক কাল, রাধার তো নয়। চাঁপালতা ছলছল করে উঠল।

ওমা—তুই না কি শাস্তর পড়িস নি!—এত জানলি কি করে? অবাক হয়ে বললে মাধব।

মেয়েরা জানে—তাই জানি।

আচ্ছা—কাল—কাল!

হ্যাঁ—কাল।

ছুটে চলে গেল মাধব।

আর বিরহ শয়ন থেকে উঠে পড়ল চাঁপালতা। ভাবরমণ থেকে উঠে পড়ল।

আর ভাব-বিরহ নয়, আর ভাব-রমণ নয়। এবার বাস্তব। আর সে-বাস্তব —কাল। কালিমার কাল নয়, শ্রীরাধার কাল। সে-কালের কত বাকি? বাকি আর কয়েক দণ্ড, কয়েক প্রহর।

সিঙ্গার কর চাঁপালতা, কেশ বাঁধ, বেশ পর! নীল শাড়ি যদি না থাকে, না-ই-ই থাকল, ধূপছায়া শাড়ি পর। যা আছে, তাতেই সাজ। সাজ তো অঙ্গ, নারীর রূপের অঙ্গ—রূপটান নয়, রূপ। আর মহলা দাও। কি মহলা দেবে?

কেন তোমার মহাজন পদকর্তারা তো বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন।

কণ্টক গাড় আঙিনায়, আর কমল পদতলে সেই কণ্টক মাড়িয়ে যাও। গাগরি থেকে ঢেলে দাও জল—আর সেই জলে পিছল আঙিনায় পা টিপে টিপে চল! দেখো, মঞ্জীর যেন রিনঝিন করে ওঠে না, তাকে বেঁধে রেখো, ঝেঁপে রেখো। মঞ্জীর খুলেও ফেলতে পার। না, না, তাহলে চলবে না। মিলনের ক্ষণে মঞ্জীরের বোল তো বাজবে ঝিমিঝিমি। আর তাতে মিলন মধুময় হবে। দেখো, নাকের বেসর পরতে ভুলে যেয়ো না। নাসার বেসরে দোল দেবে প্রিয়, আর সে দোলে সোহাগ উছলে উঠবে। কবরী বাঁধতে ভুলো না, ঐ কবরী আউল করে দেবে সে। সাবধান সই—চন্দন মেখো না গায়ে—চন্দনের পত্রলেখা এঁকো না বাম পয়োধরে! হিয়ায় হিয়ায় লাগিবে বলিয়া চন্দন মেখো না অঙ্গে।

সাবধান!

শ্রীরাধা মহলা দিয়েছিলেন বাস্তবে, চাঁপালতা সিঙ্গার করল মনে, মনে মনে মহলা দিলে। ভাব সিঙ্গার, ভাব-মহলাই তার কাছে বাস্তব হয়ে উঠল। বাস্তব মহলা দিলে না, দিতে পারলে না। তাতে বাধ সাধলে লোক-লজ্জা, মারমুখী মা। হয় তো শ্রীরাধাও এমনি করেছিলেন। ভাব-বিভোরা চাঁপালতা আগামী কালের পথ চেয়ে কাল গুণতে লাগল। আর সেই কাল এসেও গেল।

গোপীনাথের মন্দির। এ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের শিষ্য গোবিন্দ ঘোষ। তাঁর সংসারী মন, সঞ্চয়ী মন দেখে তাকে বৈরাগী হতে নিষেধ করেছিলেন মহাপ্রভু স্বয়ং। বলেছিলেন, আধখণ্ড হরিতকীর মায়া সামলাতে পারলে না, বিষয়-বাসনা তো তোমার যায় নি। তুমি এখানে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর, তাঁর সেবা কর। তাই করেছিলেন গোবিন্দ। আজ গোবিন্দ ঘোষ নেই, তাঁর মন্দির আছে, বিগ্রহ আছেন। বারুণীর উপলক্ষে সেখানে জমজমাট মেলাও বসে। আগে এই গ্রাম, এই মন্দির ছিল পাটুলির জমিদারের, এখন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের। তিনি বিগ্রহের সেবায় কুষ্টিয়া আর ক'খানি গ্রাম দিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুরকে নিয়েই বিভ্রাট। ঠাকুরের মূর্তিটি বড় সুন্দর। শিল্পী তাঁকে কষ্টিপাথরে নিখুঁত করে কুঁদেছেন, কেটেছেন, মনোরম করে তৈরি করেছেন। ত্রিভঙ্গ মূর্তি—সারা দেহে যৌবন, বনমালা গলে। রাধিকা নেই, গোপিনীরা নেই। কিন্তু যে কোন নারী সেই মনোলোভন মূর্তি দেখে নিজেকে ত্রিভঙ্গ গোপীনাথের পাশে রাধা বলে কল্পনা করে নিতেও বুঝি পারে। তাইত মূর্তি সুন্দর, নারীদের মনের রঙে আরও সুন্দর। এই মূর্তি দেখে হেষ্টিংসের মুনসী নবকৃষ্ণের ভারি লোভ হল। তিনি একদিন পুজো দিতে এসে নৌকায় তুললেন মূর্তি—তারপরে সোজা শোভাবাজারের রাজবাড়িতে এসে হাজির হলেন। এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র শুনলেন, মূর্তি নেই। তিনি অন্নজল ত্যাগ করলেন। এমন সময় স্বপ্নে এসে দেখা দিলেন ঠাকুর, বললেন, তুমি কলকাতায় চল, আমি রাজা নবকৃষ্ণের ঘরে আছি।

নবকৃষ্ণ খলিফা লোক। নিমক মহলের সরকার ছিলেন পূর্বপুরুষ, আর তিনি নিজে করতেন ক্লাইভ আর হেষ্টিংসের মুন্সীগিরি। ফারসী-আরবীর তালিম দিতেন সাহেবদের। হেষ্টিংস এখন বড়লাট, মহালাট, তাই নবকৃষ্ণের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তিনি রাজা বাহাদুর হয়েছেন, খেলাৎ পেয়েছেন, শেরপ্যাচ পেয়েছেন, শোভাবাজার মিলিয়ে বসেছেন। তিনি মূর্তি এনে সেই মূর্তির নকল আর একখানা গড়ে নিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বড় লাটের দরবারে নালিশ করলেন। বড়লাট হেষ্টিংস-বাহাদুর হুকুম দিলেন, রাজা, তোমার গড তুমি চিনে নাও! রাজা পাশাপাশি দুটি মূর্তি দেখে আসল নকল চিনতে পারলেন না। আবার রাত্রে স্বপ্ন দিলেন গোপীনাথ। বললেন, যার কপালে ঘাম দেখবে, সেই আমি।

পরদিন সকালে আবার মূর্তি দেখতে গেলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। গিয়ে দেখলেন, একখানি বিগ্রহের কপালে যেন স্বেদজলে অলকা-তিলকা।

কৃষ্ণচন্দ্র অমনি বলে উঠলেন, এই তো আমার তিনি, এই তো আমার গোপীনাথ! তাঁর জয় হল। তিনি কোলে করে মূর্তি নিয়ে এলেন। আবার গোপীনাথ ফিরে এলেন নিজের মন্দিরে; আবার মেলা মহোৎসবের ধুম পড়ে গেছে! এ তো হালের কথা। দুবছরও হয় নি, ঘটনা। ঠাকুরের গায়ে রাজা নবকৃষ্ণের দেওয়া অলঙ্কার এখনো ঝলমল করছে।

সবাই বলে, সাধ্য কি শোভাবাজারের রাজার—আমাদের বিগ্রহ কেড়ে নেয়!

সাধ্য কি!

জয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জয়!

আবার কুলোকে বলে, দেনার দায়ে রাজা বাঁধা রেখেছিলেন বিগ্রহ, দেনা শোধ হতে নিয়ে এসেছেন।

কুলোকে যা-ই-ই বলুক, মানুষের কথা—গোপীনাথ নিজেই ফিরে এসেছেন। গোবিন্দ ঘোষের ছেলে গোপীনাথ কি বাপের কাছছাড়া হয়ে থাকতে পারেন! গোবিন্দ ঘোষের তাহলে শ্রাদ্ধ করবেন কে? চৈত্র মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে তো তাঁর শ্রাদ্ধ। সে-শ্রাদ্ধ তো গোপীনাথজীই করেন। তখন শ্রাদ্ধের সাজে তাঁকে সাজানো হয়। তিল-তুলসী দিয়ে তিনি আদ্য শ্রাদ্ধ করেন গোবিন্দ ঘোষের। তখনো উৎসব হয়, আবার আছে ঝুলন, জন্মাষ্টমী। পর্ব না থাকলেও লোকের সমাগম কম হয় না। শুধু দুপুরে ভোগের পর আঙিনা, নাটমন্দির নিঝুম হয়ে যায়।

আজও নিঝুম হয়েই ছিল। আরও যেন নিঝুম মনে হয়েছিল আকাশের মেঘের ছায়ায়। তমা-ঘন তমাল কুঞ্জের ছায়া যেন নেমে এসেছিল। আলপনা কেটে দিয়েছিল তার উপরে চিলতে আলো এসে পড়ে। আলপনায় আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল মন্দির, নাটমন্দির, আঙিনা।

চাঁপালতা ভরদুপুরে বেরিয়ে এসেছিল পা টিপে টিপে। পরনে একখানা নীল শাড়িই ছিল। নীল শাড়ি—মেঘের মতো নীল—যে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নদীয়ার নিমাই—বুঝি তারই মতো নীল। সেই নীল শাড়ির শান্তিপুরের কাটনি-মেয়ে কেটেছে সুতো, তাঁতী বুনেছে। সেই শাড়ি

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের-শ্রীরাধা লছিমাদেবী বা রামীর অঙ্গে উঠেছিল কিনা তা সে জানে না। শান্তিপুরের শাড়ি মৈথিলী বিদ্যাপতি দেখেছিলেন কি না কে জানে। হয়তো ছাতনার চণ্ডীদাসও দেখেন নি। কিন্তু তাঁরা যেখানকার নীল শাড়িই দেখুন তাঁদের মানসী রাধার অঙ্গে শান্তিপুরী শাড়ি তো বেমানান নয়। সেই শান্তিপুরী পরেই সে বেরিয়ে এসেছিল।

ঘোর দুপুর, ভরদুপুর। মেঘ-দুপুর। মেঘের ঘাঘর বাজে। বাজে, বাজে, বাজে ঘাঘর বাজে। আর হাওয়া দেয় ফুরফুরিয়ে, বুঝি কিসের গন্ধ ছড়ায় ভুরভুরিয়ে। অভিসারের এই তো ক্ষণ।

গোবিন্দদাস অভিসারক্ষণের বর্ণনায় এনেছেন মাথতি তপন, তপ্ত ছিল তাঁর পথের বালু! না, সে কষ্ট তার হয় নি।

হলেই বা কি?

সে তো বৃষভানু-নন্দিনী, রাজার নন্দিনী নয়, ননীর পুতুল তার তনু নয়। বরং তনুটি তাঁর আখড়ার কাজ করে করে বেশ সবল, সতেজ। কুয়ো থেকে জল তোলা, মহোৎসবের মালপোর চালকোটা—সবই তাকে করতে হয়। তাই ননীর ডেলা নয়, যৌবন উন্মেষে সুন্দর সতেজ তনু। কিন্তু তাহলে কি হবে!

গোবিন্দদাসের রাধার মতোই 'গুরুজন নয়ন পাপগণ-বারত' এড়িয়েই সে চলতে চায়।

গুরুজন তার আছে বই কি! আছে মা কালিন্দী, আছে আখড়ার মোহান্ত, আছে পাপগণ—ঐ বাঙালদিদি, ঐ বনমালা—ওরা তো কলঙ্কের বারত বা বারতা রটাবেই। তাই ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে সে বেরিয়ে এল।

পথ দূর নয়, উড়ে যাবে।

কুহু যামিনী নয়, কুহু দিবসও তাকে বলা যায় না। শুধু মেঘলা দুপুর! শুধু—অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ!

আর তারই মধ্য দিয়ে চাঁপালতা—

অভিসারে করল পয়ান।

মন্দিরেই এল। এইখানেই মিলনের স্থল। এই সংকেত দিয়েছে সে নিজে। চাঁপালতা বন্ধ-কপাট মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম করে এদিক-ওদিক ঘুরছিল।

কারো দেখা নেই।

না মাধব, না সে।

ঘুরতে ঘুরতে সে অঙ্গন পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সেখানেও কারো দেখা নেই। শুধু ধুলোভরা পথ পড়ে আছে। তপ্ত পথ নয়, মেঘকজ্জল দিবসের স্নিগ্ধচ্ছায়াঘন পথ।

চাঁপালতা ফিরেই যাবে ঠিক করল। খণ্ডিতা নায়িকার কথা সে জানে না। শুনেছে বাবাজীর কাছে, শ্রীরাধার বিরহের বর্ণনায় শুনেছে। তারপর ভুলে গেছে। কি সে দশা কি করে জানবে কুমারী কিশোরী? কিন্তু আজ প্রতীক্ষায় বাণবিদ্ধ কুরঙ্গীর মতো ছটফট করতে-করতে টের পেল। খণ্ডিতা নায়িকা হয়েই কি ফিরে যাবে? অভিসারক্ষণ কি পণ্ড হবে?

না না, অভিসার তো প্রতীক্ষায় ভরা, অস্বস্তি দিয়ে গড়া। অভিসার তো তাই এমনি মধুর, কষ্ট না করলে কেষ্ট কে কবে পায়!

ক্ষণে ক্ষণে ভাবে, সে আসবে।

মান করবে চাঁপালতা।

মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। মুখ ফিরিয়ে থাকবে।

তারপরে সে মান ভাঙাতে চাইবে।

কি যেন সে মান ভাঙাবার রীতি?

পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলবে—

দেহি পদপল্লব মুদারম্।

জয়দেব সে পড়ে নি, কিন্তু শুনেছে। আর শুনে ভাল লেগেছে। বুকের ভিতর শিরশিরিয়ে উঠেছে পুলক। পুলকে নেচেছে সারা দেহ।

কিন্তু এলে তো হয়? তবে তো মান, তবে তো অভিমান! তবে তো মান ভাঙানো, তবে তো পায়ে লোটানো।

এমনি কি ভাবছিল চাঁপালতা? হ্যাঁ—ভাবছিল বই কি। জাত বৈষ্ণবী, আখড়ার আওতায় মানুষ, জন্ম থেকেই কৃষ্ণ-নিবেদিতা—ভাববে বই কি!

এমন সময় কে কু দিলে।

চমকে উঠল চাঁপালতা, এদিক ওদিক তাকালে।

আবার কু।

ডাকাতে কু নয়। মিঠে কু। কুহু-কুহু!

আবার এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি।

কেউ নেই।

চাঁপালতা মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

এমন সময় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মাধব, বললে,

কিরে, কতক্ষণ।

অনেকক্ষণ। তারপর?

আয়, সয়া ঐ হোথায় আছে।

চাঁপালতা চলল মাধবের পেছনে-পেছনে।

নীপ বন নেই, তমালতল নেই, তবু ছায়া এখানে ঘন। মেঘের ছায়ায় আরও ঘন। সেইখানে গিয়েই দেখা মিলল।

শ্রীকৃষ্ণের বেশে বসে নেই আজ সয়া। আজ পরে এসেছে নাগরের বেশ। শিখিপুচ্ছ নেই, মোহনচুড়া নেই, আছে একঢাল চাঁচর কেশ। সেই কেশ নাগরের বাবরী হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বুঝি আমলকী ঘষেছে কেশে। আর তার পটভূমিতে মুখখানি। কোমল শ্যামল, দেখতে ভাল লাগে। তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ঠিক তুলির লিখন যেন ভ্রূ, আর কৃষ্ণ অঞ্জনের রেখা যেন চোখ। সুনিবিড় রেখা। সেই রেখা চাঁপালতাকে দেখে দীঘল হয়ে উঠল। ছিল নিমীলিত কুঁড়ি, যেন উন্মীলিত ফুল হয়ে উঠল। আর সেই চোখের কি দৃষ্টি!

দৃষ্টি যেন চোখে এসে লাগছে, চোখে জলের ধারার মতো এসে পড়ছে। ভারি মৃদু ধারা। মিহিন, মৃদু। জানে না কিশোরী—চুম্বনের মতোই বুঝি মৃদু।

মুরলীয়া কালা বললে, কে গো, পুরুষ-সখী নাকি?

মাধব একগাল হেসে বললে, সয়ার যত কথা! ও কেন পুরুষ-সখী হবে গো! ও যে আমাদের চাঁপালতা।

চাপালতা মুখ নিচু করল লজ্জায়।

তা বেশ, ওগো মধু মাধবী, তুমি এখন যাও তো, আমি সখীর সনে দুটো কথা বলব।

মাধবের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে সে আবার বললে, ওগো ম্লান কেন মুখ? মিলনের কালে কি দূতী থাকে? দূতী তো সরে যায়। জটিলে-কুটিলের জন্যে পাহারা দেয়।

মাধব চলে গেল।

একা রইল চাঁপালতা। একা নয়, আর রইল সে। তার সয়া।

সয়া তাকে দেখছে। তার চোখ মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চাঁপালতা মোহমুগ্ধ, যেন ময়াল সাপ মোহভরা চোখে চেয়ে বশ করছে, টানছে তার দিকে। তার ঐ কুণ্ডলীতে কি সে ধরা দেবে?

সখা বললে, কি গো লজ্জা কি? অভিসারে এসে লাজ কেন সই?

কেমন যেন ভাল লাগছে। চাঁপালতার ভয় করছিল, ভয় দূরে গেছে, লাজ দূরে গেছে।

সে বললে, দূর, লাজ আবার হবে কেন?

তবে যে জড়োসড়ো—?

না।

হাত ধরেছিল সয়া।

মেঘ ডেকেছিল, শুরু হয়েছিল বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অভিসার সেরে সেদিন আখড়ায় ফিরেছিল চাঁপালতা।

আখড়ায় ফিরতেই বনমালার সঙ্গে দেখা।

ওমা!—বনমালা তাকে দেখে বলে উঠেছিল,অমন ভিজে সপসপে হয়ে কোত্থেকে ফিরলি লো?

একটু ভিজে এলাম, ভাল লাগছিল—চাঁপালতা উত্তর দিয়েছিল।

দেখি, দেখি—তোর মুখ দেখি, চিবুক ধরে চোখের দিকে তাকিয়েছিল বনমালা। তারপর বলেছিল—

শুধু শুধু ভিজিস নি লো! ও-ভেজার রকম জানি। ভিজে জবজবে হয়ে এলি, আর সারা অঙ্গে জ্বর লেগে আছে। এ-জ্বর কোথায় পেলি লো?

যাও ! তোমার যত্ত কথা—মুখভঙ্গী করেছিল চাঁপালতা ।

না, না যতকথা নয় লো, হক্ কথা । কোন কেষ্টর সঙ্গে পিরিত করে এলি—এদিকে তোরে কেড়ে নেবে যে, শ্রীপাট খড়দহে বাড়িছে সে ।

চাঁপালতা ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল ।

তারপর সখা আর সখী সংবাদ । সয়া আর সই ।

দিবা-অভিসার চলে । সবাই যখন ঘুমোয়, ওরা জাগে । ওরা মেলে ।

সয়া শ্রীকৃষ্ণ নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাকে সাজতে হয়, তাই সে ননীচোরার সব কৌশল, সব ছলাকলাই জানে ।

বাউল নয়, আউল বলেই জানে । আর গুরুগিরি করতে গেলে জানতে হয় । ছলাকলা প্রেমকে জীইয়ে রাখে, মরতে দেয় না । এ যে পুরুষের ভূষণ, নারীর রূপ না হোক, রূপটান—এত তার জানা । তাই সে কখনো বা মান করে, কখনো তাই অভিমান । কখনো বা কথা দিয়ে আসে না, ঘুরে যায় চাঁপালতা । কখনো বা আবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ।

চাঁপালতা কিশোরী—বৈষ্ণবের মেয়ে হলেও ছলাকলা জানত না । শুনেছে, শেখে নি । সেও শিখে নিলে ।

বলে, তুমি আমার বিনোদিয়া, আমার চিকন কালা । তোমাকে দেখে তো আমার চোখের আশ মেটে না ।

সয়া বলে, আর তুমি আমার বিনোদিনী রাই, আমার গলার মোতিম মালা ।

চাঁপা বলে, গরীব আমি—মোতিম মালা নিয়ে কি করব গো ? ও মালা তো চোরে চুরি করে নেবে ।

তাহলে গরীবানাই ভাল, তুমি আমার মালতীমালা ।

মালতীমালা কেমন করে গাঁথে জানো ? চাঁপা যেন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে রসে ।

জানি নে ! বিনিসুতোয় গাঁথে ।

ওমা—তুমি কিচ্ছু জানো না ! বিনিসুতোয় কখনো মালা গাঁথা যায় ? খিলখিল করে হেসে ওঠে চাঁপালতা ।

নাগর অবাক হয়ে তাকায়, তবে ?

গাঁথে মনের সুতোয় ।

নাগর নাগরালির স্বাদ পায়, বলে, কিসের মাঞ্জা সে সুতোয় ?

মাঞ্জা মনের রঙে, মনে রসে।

দুজনেই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

আবার কোনদিন হয়তো দুজনে চুপ করে বসে থাকে। এ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে চাঁপালতা,

একটু জল খাব গো !

গঙ্গা থেকে নারিকেলের মালায় করে জল এনে দেয় সখা। মুখের সমুখে ধরে।

মুখ ফিরিয়ে নেয় চাঁপালতা, বলে, অমনি করে তো খাব না !

তবে ?

তোমার তেষ্টা পায় নি ? দুজনে এস এক সঙ্গে চুমুক দিই !

তাই-ই দেয়। একই সঙ্গে একই পাত্রে চুমুক দেয়। কখন দুই ঠোঁট মিশে যায়। ওরা দুজনের মুখের জল দুজনে খায়, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চেখে-চেখে নেয়। যেন চড়ুই চাখে। চড়ুইপনা করে তারা।

পান যেন আর শেষ হয় না।

মনে হয়—দুজনে দুজনের অমৃত পান করছে।

এক জনের মুখ-মদ আর একজন শুঁকছে, পান করছে।

দুজনের মুখ-মদের মিলনে মিলন আরও মাতাল হয়ে উঠে।

কখনো বা দুজনে নেমে যায় জলে।

দুজনে দুজনকে জলের আরশিতে দেখে।

জল তো নয় থির। তাই ঢেউ আসে। ভেঙে ভেঙে যায়। আর ওদের দেহও ভাঙে। ভেঙে যায় মুখ, ভেঙে যায় বুক, দোলায় দোলায় ভাঙে। আর দেখে আনন্দ হয়। শেষে আর দেখা যায় না।

আবার রৌদ্রে তেতে-ওঠা জলে দুজনের যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। এ যেন এক উষ্ণ গর্ভ। তারই ভিতরে তারা ঘুরছে।

যেন একই গর্ভে তারা লীন। তারা মিলিত।

হল্লীশ নাচ নাচে না, চক্রকারে নৃত্য করে না। তবু তাদেরও আছে রাসলীলা। একা চাঁপালতা, ষোড়শ সহস্র গোপিনী হয়ে উঠে। এক উত্তাল অনবরত শুরু হয়। চলে কুচ স্তনাগ্রচুচে নিপীড়ন, করেন্দুর মতো মত্ত

করীবরকে ধারণ, মুখকমল মধুপান। গোপিনীগণ যেমন রাসাভাসে রসাভাসে মিলিত, তেমনি তারাও মিলিত হয়। চাঁপালতার চিকুর কুচাগ্রে এলিয়ে পড়ে।

এমনি করেই কাটে তাদের দিন। দিন নয়, দিবসের কয়েকটি প্রহর; যা কালিন্দী জানে না, জানেন না আখড়ার মোহান্ত; জানে মাধব।

সয়া নেই, দুদিনের জন্য গেছে। বিরহ শয়ানে শুয়ে ছিল দুপুরে চাঁপালতা।

এমন সময় পা টিপে টিপে এল মাধব।

মাধু, কি খবর রে? চাঁপা শুধালে।

কিসের খবর? 'কাল বলে কালা

মধুপুরে গেল

সেকালের আর কত বাকি'—সেই খবর?

চাঁপালতা চুপ করে রইল।

মাধব বললে, সই, খবর আছে, সয়া ফিরেছে। আজ যাবি, ঐ গোসাঞি পাড়ার বট গাছের কাছে।

কখন?

এখন নয় লো, রাতে।

রাতে?

হ্যাঁ লো, শুধু কি দিনেই অভিসার—রাতে যাবি নে!

যাব—কি করে যাব?

যাই—সয়াকে বলিগে—সখী আসবে না।

না না, তা বলিসনে! আমি যাব।

বেশ—ঐ কথাই রইল

যেমন নিঃসাড়ে এসেছিল মাধব, তেমনি নিঃসাড়ে চলে গেল।

চাঁপালতার শুয়ে থাকা হল না। সে উঠে বসল, ভাবনায় অধীর মন, ভাবনায় আকুল।

সে কি করবে ভেবে পেলে না। বসে-বসেই কেটে গেল, বেলা যেন দিনের মলিন মলিদা-মায়া দিয়ে শেষ হল। আঁধার নেমে আসে-আসে।

সে কলসী কাঁখে তৈরী হল।

এমন সময় মা কালিন্দী এসে দেখা দিলে, বললে, কি লা, কোথায় চলেছিস ?

জল আনতে যাব গঙ্গায়। মেয়ে উত্তর দিলে। বাবাজীর গঙ্গাজলের কলসী খালি।

তাহলে যাবি আর আসবি—দেরি করবি নে।

তাই গো, তাই হবে।

হ্যাঁ, দেরি করিস নে যেন।

চাঁপালতা কলসী কাঁখে বেরিয়ে পড়ল অভিসারে।

আখড়া থেকে গঙ্গা একটু দূরে।

ঘুরে ঘুরে পাড়ার পর পাড়া ছাড়িয়ে যেতে হয়। গোসাঞি-পাড়া পথেই পড়ে। সেই পথে অশথ আর বটগাছ ঝুরির জটা নামিয়ে বসে আছে।

সেখানে এসে সে থমকে দাঁড়ল।

কেউ নেই। বাদুড়েরা ফিরছে ডালের বাসায়, ঝুলে ঝুলে পড়ছে ডাল থেকে।

এই জায়গাটা তার চেনা। দুপুরে এখানেও তারা মিলেছে। মিলেছে সে আর সয়া। ঝুরি নেমে নেমে তৈরি হয়েছে এক কুঞ্জ। কলসীটা গাছের আড়ালে রেখে সেই কুঞ্জের ভিতরে এসেই সে ঢুকল।

ওমা, সত্যিই তো সয়া পেছন ফিরে বসে আছে!

চাঁচরকেশ নেমেছে পিঠ অবধি, আদুল গা।

সে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। মুখে হাসি, পা টিপে টিপে চলল। গিয়ে সয়ার চোখ টিপে ধরল।

তাকাতে দেয় না।

সয়া কিছু বলে না।

এবার বললে, বল তো কে ?

তুমি গো তুমি—কে যেন বলে উঠল।

অমনি চোখ ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পিছু হটে এল চাঁপালতা।

ওমা, কে গো ?

ভয় নেই, আমি।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল মাধব।

মেধো তুই! সয়া কই?

সয়া না আছে, আমি তো আছি। হেসে বললে মাধব।

মর, ঢঙ দেখ না!—

ঢঙ আবার কিলো, সয়া আর সই কি ভিন্ন, যে সয়া সেই সই। আমরা সহজে সহজ হই।

তোর শাস্তর রাখ তো মেয়ে-নাগরা! এখন বল—সয়া কই?

সয়া আর আসবে না। ওর দিকে তাকিয়ে বললে মাধব।

তাই তোকে সয়া করতে হবে? তীব্রস্বরে বলে উঠল চাঁপালতা।

আমি বুঝি সয়া হতে পারিনে। হাত ধরল মাধব।

মেয়ে-নাগরার সাধ দেখ না! বামন হয়ে চান্দে হাত!

চান্দে হাত দিতে কার না সাধ যায়!

ওর গায়ে হাত রাখতে গেল মাধব। এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিল। বললে—ছিঃ মাধব, তুই না বিশাখা, আমি না চম্পালতা, এক সয়ার দুই সই!

মাধব বলেছিল, সই হতে ভাল লাগে না, তাই তো সয়া হতে চাই।

ওমা—তা কি হয়—তুই তো সই।

কামনায় জর্জর হয়ে উঠল মাধব, বলল—সয়া কবে আসবে কে জানে! আমাকে সয়া ভাব না।

চাঁপালতা চমকে উঠে চেয়েছিল তার মুখের দিকে। এ আবার কোন্ মাধব? মাধব কি বদলে গেছে? মাধবের চোখে যে সয়ার মতোই আগুন। মাধবের নধর দুটি বাহু যে আলিঙ্গনের কামনায় থরথর।

ভয় পেয়ে ছিল চাঁপালতা, এ সখী-মাধব নয়, মাধবী নয়—এ পুরুষ মাধব। এ পুরুষ লোভী, কামুক। কামের ফণা উঁচিয়েছে।

সে তো নারী, জাত বেদেনী, সে ঐ ফণা ধুলপড়া, ছলাকলার ধুলপড়া দিয়ে নামিয়ে দিতে জানে।

সে তাই বললে, ওমা, মাধব—তুই অমন করছিস কেন? শাস্তর ভুলে গেলি? আমাদের ধর্ম ভুলে গেলি!

মাধবের পুরুষ যেন সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল, মন্ত্রশাস্ত যেন ফণধর ভুজঙ্গ। তার চোখের লালসার আলো দপ্ করে নিবে গেল!

এবার চাঁপালতা শুধালে, সয়ার খবর কি বল?

মাধব বললে, সয়া আসে নি, খড়দ'য় গেছে। ফিরতে দেরি হবে।

তাহলে আমি চলি, জল আনতে যাই। আন্ধার হয়ে এল।

চ' তোকে এগিয়ে দিই সই—মাধব সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। আমার হাত ধর্। নইলে ঝুরিতে বেধে আছাড় খাবি।

মাধব হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, নির্ভয়ে হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল চাঁপালতা।

জল নিয়ে ফেরার পথে বলেছিল, সয়াকে খবর দিস—বলিস্—সই যে আর তার বিহনে বাঁচে না!

বলব-বলব সই! হাতে হাত রেখে বলেছিল সখীভজা মাধব। মাধবী-রূপী মাধব।

আশ্চর্য! আহত ভুজঙ্গ মন্ত্রশান্ত হতে পারে, কিন্তু আঘাতের ব্যথা তো থাকবে। থাকবে তো তার প্রতিশোধস্পৃহা। তাও বুঝি নেই। না ছিল। চাঁপালতা কি দেখতে পায় নি?

আখড়ায় এসে শুনেছিল চাঁপালতা, খড়দহ থেকে গোসাঞি খবর পাঠিয়েছেন, দোলপূর্ণিমার মেলা সামনেই। সেখানে চাঁপালতাকে নিয়ে যেন আসেন মোহন্ত, সেই সময়ে মালা-চন্দন হবে।

মালা-চন্দনের কথা ভাবে নি চাঁপালতা। ভাবে নি খড়দহের পাত্রের কথা। ভেবেছিল—তমাল-শ্যামল তার সয়ার কথা। সেখানে তার সঙ্গে দেখা হবেই।

তারা আখড়া থেকে সবাই এসেছিল খড়দহে।

এই সময়ে সবাই আসে, আসে মাঘী পূর্ণিমায়, রাসযাত্রায়। আখড়াগুলো নিঝুম হয়ে যায়। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা আসে, সহজে, ন্যাড়া-নেড়ী, বাউল-আউল সবাই আসে। তারা দল বেঁধে নৌকা করে, পায়ে হেঁটে আসে।

মেলা দেখতে আসে। জবর মেলা। সেখানে হরেক রকমের মেঠাই, কেষ্টনগরের মাটির পুতুল, আর-গৃহস্থালির নানা টুকিটাকি পাওয়া যায়।

—পাওয়া যায় নানা পাখী, তারা রাধাকৃষ্ণের বোল বোলে। মানুষ বেসাতি করে, রাধাচক্রে ঘোরে। শ্যামসুন্দর বিগ্রহের পূজা দেয়, রাসমঞ্চে দেখে রাস, দোলমঞ্চে দেখে দোললীলা। আবার অহোরাত্র সংকীর্তন শোনে কীর্তনওয়ালা আর কীর্তনউলীদের মুখে, শোনে নামগান।

এই শ্রীপাট খড়দহ। এই শ্রীধাম খড়দহ।

শ্রীচৈতন্য আদেশ দিলেন অবধূত নিত্যানন্দকে, তুমি সংসারে ফিরে যাও ভাই! সংসারে সংসারী হয়ে প্রচার কর ধর্ম।

নিত্যানন্দ আদেশ নিলেন মাথা পেতে, তিনি এলেন গৌড়দেশে। সংসারী হবেন, কিন্তু সংসারের ভিত্তি কোথায় পাবেন? অম্বিকা গ্রামের দুই কন্যা জুটে গেলেন। বসুধা আর আর জাহ্নবী। দুই স্ত্রী হল। তাঁদের নিয়ে তিনি গেলেন পানিহাটি গ্রামে—সেখান থেকে গঙ্গাতীরে খড়দহে।

যেদিন খড়দহে এলেন সেদিন কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজ চমৎকৃত হলেন, চমৎকৃত জনগণ।

নবীন অবধূত চলেছেন পথে, তাঁর দুই পাশে দুই স্ত্রী, বাঁ কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি—ডান হাতে অবধূতের কিস্তি, গলায় আনন্দদেব শালগ্রামশিলা। মাথায় পাগড়ীর উপরে রক্ষিত গুরুর স্বহস্তে নকল করা শ্রীমদ্‌ভাগবত পুথি। সেদিন খড়দহে ভূমি পেলেন, খড়দহের পণ্ডিত শিরোমণি কামদেব তাকে বরণ করে তাঁর গলায় নিজের যজ্ঞোপবীত থেকে তিনগাছি সুতো নিয়ে গলায় পরিয়ে দিলেন, অবধূত হলেন সংসারী সন্ন্যাসী। শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা হল। আর সেই শ্রীপাট হল একদিন শ্রীধাম। সেদিন তিনি গুরুর প্রেমধর্মকে দিলেন এক নতুন রূপ—তাকে আরও ছড়িয়ে দিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, যারা বিদেশী শাসনে বৌদ্ধধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছিল—তাদের বৈষ্ণব সমাজে কোল দিলেন। সেদিন নিন্দে উঠল, সেদিন ব্যঙ্গের ধুম পড়ে গেল। কিন্তু নিত্যানন্দ হলেন নয়া প্রেমধর্মের প্রবর্তক। সহজিয়া রূপ ফুটে উঠল; বিরাগ আর অনুরাগ, ত্যাগ আর ভোগ এসে যেন গঙ্গাযমুনার মতো মিলে গেল। সেই থেকে খড়দহ বৈষ্ণব সমাজের শ্রীধাম। সহজিয়া, সখীভজা সবাই ছুটে আসে, শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দেখে; আবার শ্যামসুন্দরের মন্দিরে দেখে সেই প্রভু নিত্যানন্দের, তাদের ত্রাতা নিত্যানন্দের ভিক্ষার ঝুলি, তাঁর অবধূতের দণ্ড, তাঁর পাগড়ীর উপরে রক্ষিত শ্রীমদ্‌ভাগবতখানি।

ভক্তিভরে বিগ্রহকে প্রণাম করে, আবার দরবিগলিত ধারা দু'নয়নে বইয়ে দিয়ে দেখে এইগুলি। প্রকৃত ভক্তের ভাবান্তর দেখা দেয়, নিমীলিত হয়ে আসে চোখ, আবার নকল ভক্তও কাঁদে। চোখ বোজে।

চাঁপালতাও দেখলে, তার চোখ দিয়ে ধারা বইল, পুলক রোমে রোমে দেখা দিলে। সে তো কিশোরী, সে তো বালিকা—নিত্যানন্দের নামে তাঁর ভাবাবেশ হয়, শ্যামসুন্দরের নামে রসাবেশ হয়। শ্যামসুন্দরের মূর্তি মিলিয়ে যায়। সে দেখে সেই চাঁচরকেশ শ্যামকে। সে যে সাজা-শ্যাম, হয় তো মানুষের চোখে সাজা-সং। সে তো বোঝে না। সে ঠায় বসে থাকে মন্দিরে।

রাধাচক্র ঘুরে যায়, বার বার, ভানুমতীর খেল্ দেখায় বাজীকর, খাঁচায় বোল বলে হরবোলা, দোকানী হাঁকে পসরা, সওদা করে মানুষ। অহোরাত্র নামগানে মত্ত কীর্তনিয়ার দল; আখর দিয়ে দিয়ে গায় পদাবলী, গীতগোবিন্দ। কেউ বা সহজিয়া তত্ত্ব আওড়ায়। সুর করে বলে যায় পরকীয়াদের নাম।

শ্রীরূপ করিলা সাধন মীরার সহিতে
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণবাই-সাথে
লক্ষ্মীহীরা সনে করিলা গোসাঁই সনাতন।
মহামন্ত্র প্রেমে সদা সেবা আচরণ॥

তার কানে হয়তো গিয়ে ঢোকে, ঢোকে না। সেও তো সাধনে মগ্ন হতে চায়। সেও চায় প্রকৃতি হতে। কিন্তু কৃষ্ণ তো নেই। সে চায় গোসাঁই কৃষ্ণদাসের গোয়ালিনী পিঙ্গলা হতে, শ্রীজীব গোসাঁইয়ের শ্যামা-নাপতিনী হতে। সেও চায়।

কিন্তু মনের মতো পুরুষ চাই, চাই গুরু। সে-গুরু খড়দহের মা-গোঁসাঞি ঠিক করে দিলে হবে না।

তাই রাধাচক্র ঘোরে, রাধা সেখানে নেই। নাগরদোলা ঘোরে, নেই নাগর। ভানুমতীর খেলে আমের আঁটিতে নিমেষে ফল ধরে, কিন্তু সয়াকে তো সেই ভোজ রাজা আর ভানুমতীর খেল এক লহমায় এনে হাজির করতে পারে না। সয়া খড়দহে বুঝি নেই। সয়া চাই, গুরু চাই, তবে তো সে হবে প্রকৃতি। সে তো ঐ নাদাপেট বর নয়, যে মালা-চন্দনের জন্য উদ্‌গ্রীব।

তাকে সে দেখেছে তাদের ডেরায়। ওমা—কিবে রূপ! গোলগাল

চেহারা, লালা গড়ায় যেন জিভ দিয়ে। টাক পড়ে এসেছে মাথায়, তায় আবার বাবরীর সখ। মুখখানায় বসন্তের দাগ। ঐ পুরুষ নাকি কৃষ্ণ, তার স্বামী!

নিরালায় পেয়ে আঁচল ধরে টান মেরে বলেছিল—

কি গা, পছন্দ হয়?

কি বেহায়া মাগো, কি নিলাজ!

কানুও তো নিলাজ। কিন্তু সে-নিলাজ-লীলায় মধু আছে। চট করে সে ডাকাতের মতো আসে না, রুক্ষ হাতে চেপে ধরে না। সে হাত ধরে, মিঠিমিঠি চায়, মিঠে কথা কয়, আবার একসময়ে সে হয়ে ওঠে উদ্দাম, নির্দয়, নিলাজ, নিষ্ঠুর। মানে না, বিনয় মানে না।

……সেই তো শ্যাম, সেই তো কালিয়া, সেই তো কানু।

সে কানু কি ঐ?

হেঁচকা টান দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়েছিল চাঁপালতা।

হাত ধরেছিল এবার খপ্ করে সেই গোলগাল চেহারা।

অমনি হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল চাঁপালতা। চিৎকার করে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল—দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, হারামজাদী!

বৈষ্ণবী বিনয় এক আঘাতেই ভূমিসাৎ হয়েছিল, ছিঃ ছিঃ করে উঠেছিল চাঁপালতার মন। এই খড়দহের বৈষ্ণবের রীতি! এই থান প্রভু নিত্যানন্দ, বীরভদ্র তাঁদের পদরজে পবিত্র করে গেছেন—এই পুণ্যভূমিতে এমনি মানুষ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

চাঁপালতা জানে না, হয় তো শিখগুরু নানকও এসেছিলেন এই খড়দহে, প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

যদি জানত, গুরু নানককে চিনত, তাহলে আরও প্রচণ্ড ছি-ছিকারে মন ভরে যেত!

কিন্তু এই বা কম কি!

তার মনে সন্দেহ জাগল—

আমার তমাল-শ্যাম, সেও কি এমনি?

কে জানে!

সেই যে কাল বলে গেল, আর তো এল না। দেখা তো পেলাম না এই শ্রীধামে।

আবার খোঁজা শুরু হল।

রাধাচক্র ঘোরে, শ্যামসুন্দর আবীর-কুমকুমে সেজে ওঠেন, হোলীর রং সকলের বসনে, সকলের মনে। চাঁপালতার বসনে রং চলকে পড়ে; মনে রং নেই। দোলমঞ্চের ধারে, রাসমঞ্চের ধারে, গঙ্গার পাড়ে সে ঘুরে বেড়ায় আনমনা।

এমন সময় মাধব এসে খবর দিলে।

সয়া এসেছে রে সই।

সয়া!

হ্যাঁ লো, হ্যাঁ।

আমাকে নিয়ে চল্!

এখন নয়, সাঁঝের বেলা নিয়ে যাব।

সাঁঝের বেলা তোর সনে যেতে যদি ভয় করে?

মাধব হেসে বললে, ওমা, সইয়ের আবার ভয় কি লা?

কোথায় আছে সয়া? সয়ার কি আমার কথা মনে আছে?

মনে থাকবে না! কত বললে, আমার সই কোথায়? বললাম, সই যে পাগলপারা।

কি বললে? আগ্রহে অধীর চাঁপালতা, আগ্রহভরা তার স্বর।

সয়া বললে, সাঁঝের বেলা নিয়ে আসবি।

সাঁঝের বেলা কেন, এখনি চল। আবদার ধরলে চাঁপালতা। সে এখানেই আছে, এই মেলায়ই আছে?

না—মেলায় আসে নি।

মেলায় ত্রিভুবনের মানুষ এয়েছে, আর সয়া আসে নি?

মাধব বললে, এয়েছিল, আবার আখড়ায় গেছে। সেখানে অহোরাত্র নামগান হচ্ছে। লীলেখেলা হচ্ছে। তুই সাঁঝের দিকে থাকিস, সয়ার কাছে নিয়ে যাব।

আখড়ায় কে আছে রে মাধব? চাঁপালতা শুধালে।

সখীরা আছে।

সখী? একটু বা ঈর্ষার কোঁড় খেলে চাঁপালতা।

হ্যাঁ, সব পুরুষ-সখী, সব আমার মতো গোঁফ-কামানো সখী—সব হলো বেড়াল।

ছিঃ! মাধব! চাঁপালতা বলে উঠল।

বলব নি তো কি! যত মেয়ে-ন্যাকড়া!

তার এই বিদ্রোহ দেখে অবাক হল, বললে, তুইও তো তাই!

আমি তো তা হতে চাই নে।

হাত মুঠো করে বলেছিল মাধব, মাকুন্দ মুখে তার পুরুষের বিক্রম প্রকাশ করতে চেয়েছিল।

চাঁপালতা বলেছিল, তুই আবার পুরুষ হবি নাকি লো! ওমা, সখী আবার সখা হয়!

মাধব হাত ধরে বলেছিল, হতে তো চাই, তুই তো হতে দিবি নে।

হাতে হাত কাঁপছিল থরথর করে, ঘামে ভিজে গিয়েছিল হাত। ঐ হাত ধরেই সে বুঝতে পেরেছিল মাধবের বুকখানায় রক্ত তোলপাড় তুলেছে। পুরুষ হতে চায় তরুণ, কিন্তু সে তো অহল্যার মতোই ঊষর, তাঁকে নারী ছুঁয়ে দিলে তবে সে উর্বর হবে। কিন্তু হায়, চাঁপালতা যে তার জাদু ঐ ঊষর মাধবের জন্যে রাখে নি! কি হবে?

একটু বা ভয় করেছিল চাঁপার, সেই বট-অশথতলার ভয় পেয়ে বসেছিল। সে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। আবার কুঁকড়ে গিয়েছিল মাধবের পুরুষটা, মেকুরের মতোই ভয়ে মুখ লুকিয়েছিল।

চাঁপালতা বলেছিল, তুই সাঁঝ-নাগাদ আসিস! আমি যাব।

মাথা নেড়ে চলে গিয়েছিল মাধব।

চাঁপালতার দিন কাটল আখড়ায়, মন্দিরে। মেলায় বনমালাদের সঙ্গে, বাঙালদিদিদের সঙ্গে। তারপর সাঁঝ না হতেই সে বেরিয়ে পড়ল।

মাধব দাঁড়িয়েছিল মন্দিরের কাছে। সে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে এল।

চাঁপালতা শুধালে, কোথায় যাব?

মাধব উত্তর দিলে না।

চাঁপালতা অধীর হয়ে বললে, কই রে, সে কোথায়?

মাধব দেখিয়ে দিলে আঙুল দিয়ে।

সারি সারি নৌকা থেমে আছে সেই দিকে। তারপর ফস্ করে হাত ধরে বললে—

তার চেয়ে চল্ ফিরে যাই

কি পাগলামি করছিস মাধব? একটু বা বিরক্ত হল চাঁপালতা।

মাধব বললে, ফিরে যাওয়াই তো ভাল রে সই! জলে বিষ আছে, আছে জাত-সাপ।

কি হেঁয়ালি করছিস মাধব! চাঁপালতা ঝাঁজিয়ে উঠল।

তার চে চল ফিরে যাই!

ফিরে যাব না,—হাত এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে নৌকার সারের দিকে এগিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল মাধব।

পিনিস নয়, কোশা নয়, ছোট ডিঙি। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সয়া। তেমনি চাঁচর কেশ, তেমনি ঢুলুঢুলু চোখ। তেমনি মোহন বেশ।

সে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

ছুটে চলল চাঁপালতা।

মাধব আবার হাত ধরে বললে, যাস নে!

যাব না, সয়ার কাছে যাব না?

না।

কি হল রে তোর! হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চাঁপালতা আবার ছুটল।

যেখানে ডিঙি ছিল, সেখানে এল। সয়া তার হাত ধরে তুলে নিলে।

মাধব ছুটে এল, নৌকায় উঠতে যাবে, তাকে সয়া ঠেলে ফেলে দিলে।

নৌকা লগির গুঁতোয় পার থেকে দূরে সরে গেল।

মাধব হাবুডুবু খাচ্ছে জলে।

সয়া হেসে উঠল, চাঁপালতার মুখেও হাসি।

তবু মাধব সাঁতরাতে সাঁতরাতে এগিয়ে আসছিল।

সয়া লগি উঁচিয়ে বললে—

জল-সই করেছি, এবার তল-সই করব।

মাধব আর এগুতে পারলে না। চাঁপালতা দেখলে সে ফিরে যাচ্ছে পাড়ের দিকে।

চাঁপালতা হেসে গলা জড়িয়ে ধরল সয়ার।

তারপর?

তারপর সয়া নিয়ে গেল ছইয়ের ভিতরে। হাত ধরে বসিয়ে বললে—

আজ দোললীলা হবে গো শ্রীরাধে। কিন্তু তার আগে এই চরণামৃতটুকু খাও!

এই বলে একটা পাত্র নিয়ে মুখের কাছে ধরলে।

চাঁপালতা বললে, অমন করে ওকে তাড়িয়ে দিলে কেন সয়া?

ঐ হতভাগা, মেষে-ন্যাকড়া থাকবে কেন গো?

থাকলে কি হত?

জ্বলে পুড়ে মরত হিজড়েটা! ও তোমাকে ভালবাসে।

চাঁপালতা হেসে উঠে বললে, ভালবাসে! মর মুখপোড়া।

তারপর এক চুমুকে চরণামৃত পান করলে। পান করে বিকৃত করেছিল মুখ, তারপর চোখে দেখেছিল অন্ধকার। একটা পর্দা যেন দুলছে, দুলে দুলে কাছে এগিয়ে আসছে।

মাধব ভালবাসত, তাই বারণ করেছিল। সয়ার সঙ্গে ষড় করে ধরিয়ে দিয়ে আবার ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল। বারণ করতে গিয়েছিল—পারে নি, শোনাতে গিয়েছিল সব কথা। শোনাতে পারে নি, শোনে নি চাঁপালতা।

তারপর।

এই ভরার নৌকা। সয়া নেই। মাধব নেই, বনমালা নেই, বাঙাল-দিদি নেই, কালিন্দী নেই—কেউ নেই। শুধু আছে মেষের পাল। অচেনা মুখের সার।

আর সেই নৌকা বেয়ে বেয়ে এসে লেগেছে এই ঘাটে।

সেই কলকাতায় এসেছে। কোঁচড় ভরে তার দাম নিয়ে গেছে সয়া। কড়িতে, দামে, সিক্কায় হয়তো নিয়েছে, আর সেই কড়ি নিয়ে আবার সয়া সেজে পিরীত করছে।

সে এখন কি করবে?

তার কিছু করবার নেই। সে মাল, তার দর চড়বে, দরাদরি হবে, তারপর হয়তো কিনে নেবে কোন কুলীন ব্রাহ্মণ, কোন টোলের মহামহোপাধ্যায়। সে হবে তাঁর গৃহিণী। বৈষ্ণবী আচার ছেড়ে ব্রহ্মণ্য আচার ধরবে!

ঘুণাক্ষরেও জানাবে না। নয়তো বিকুতে পারে চড়া দরে কোন হীরাফুল, মতিফুলের কাছে। তারা তো আনাগোনা শুরু করেছে, নয় তো রূপ দেখে কিনবে কোন আর্মানী বিবি। তাকে নিয়ে যাবে আর্মানী বাজারের কোন সরাইখানায—সেখানে আর্মানী ঢঙ-ঢাঙ শেখাবে, নয়তো কোন নয়া নবাবের কাছেও বিক্রি হয়ে যেতে পারে সে। কি হবে তার কেউ জানে না। সেও ভাবে না।

বেলা বাড়ছে, নয়া শহর এখন জাগছে। এই শহরেই তার ভাগ্য লুকিয়ে আছে সে জানে। এই শহরে সে হারিয়ে যাবে। কিন্তু সে তো ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারবে না। সে পুরুষ নয়, মকরন্দ, লাডলী, হরানন্দ নয়, সে ফরঙ্গ-জেনানা মেরীও নয়। সে সাধারণ মেয়ে। তাই সে ভাগ্যের কাছে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে।

কিন্তু নাও তো পড়তে পার কন্যা। তুমিও তো রুখে দাঁড়াতে পার।

তুমিও তো জনারণ্যে অলক্ষ্যে মিশে গিয়ে তোমার ভাগ্যকে গড়তে পার। পার মেরীর শরীক হতে।

পারবে কি? কালো মেয়ে কি গোরার শরীক হতে পারবে?

তুমি জানো চাঁপালতা—তুমি জানো।

৬

সেই যে ধাঁধা, সেই যে হেঁয়ালি, সেই যে পক্ষী······

কি যেন ?

একটুখানি দড়ি।

গুটোতে না পারি।

সেই হেঁয়ালিভরা পথ।

পথ আর পথ, পথের পর পথ।

জলের পথ—মহাসাগরের পথ, সাগরের পথ, নদীর পথ, নদের পথ, খালের পথ। স্থলের পথ—নরপতির পথ, বাদশাহী পথ, জনপদের পথ, গ্রামের পথ; আবার মেঠো পথ, পায়ে-চলা পথ। প্রান্তরের পথ, বনের পথ। সব পথই ধেয়ে আসে, ছুটে আসে, এই পথে এসে মেশে। এই পথের যেখানে চৌরঙ্গী, চার মাথা—সেখানে এসে মিশে যায়, মিলে যায়, মহাসঙ্গমের সৃষ্টি হয়। এই সঙ্গমে গজায় শহর। প্রথমে হামা দিয়ে চলে, তারপরে গুটিগুটি চলা থেকে জলদি চলা রপ্ত হয়। তারপরে তো ছোটে। এদিকে, সেদিকে, ওদিকে, এদিকে। শহর বাড়ে, মানুষ বাড়ে। পট্টির পর পট্টি, বাজারের পর বাজার গজায়। আবার তার ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে মন্দিরের চূড়া, মসজিদের মিনার আর গির্জার টাওয়ার। শহর ছিটিয়ে, ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু শহর তো গজায়। তার রক্ষার কি উপায় ?

চাই কিল্লা, চাই গড়খাই; চাই বুরুজে-বুরুজে তোপ। তোপ দাগবে, শহর রাখতে, দুশমন রুখতে; তোপ দাগবে, শহরে লাট-বেলাটের আমদানি জানাতে।

শহর তখনো গজায় নি, গজিয়ে ছিল কিল্লা। তার নামকরণ হয়ে ছিল সাতসাগরের পাড়ে মসনদে যে সাদা রাজা বসে ছিলেন, সেই রাজা

উইলিয়ামের নামে ; উইলিয়ামের গড়, উইলিয়ামের কিল্লা নাম হয়েছিল। গঙ্গার ধারে গজিয়ে উঠেছিল বেঢপ কিল্লা। সারি সারি তোপ সেজেছিল। তার মধ্যে তোপে সুরক্ষিত হয়ে উঠেছিল সন্ত জনের গির্জার টাওয়ার, আর শ্রীল শ্রীযুক্ত লাট-বাহাদুরের বাসভবনটিও ছিল সেখানে। কিন্তু নবাব সিরাজের গোলাবাজীতে সেদিন কিল্লার মান রাখা যায় নি। শহরেরও নাম রাখা যায় নি। তাই পলাশীর পরে আবার নতুন কিল্লা গড়ার তোড়জোড় পড়ে গেল। পাঁজা পাঁজা ইট পুড়ল পুনে, হাজার হাজার কয়েদী আর মেহনতী মজুর মাটি কাটলে, ইট কাটলে, ইটের পাঁজা বয়ে এনে গড়লে এই নতুন কিল্লা—নয়া গড়। এও উইলিয়ামের গড়, আর সেই গড় গড়তে গিয়ে হাঙ্গামাও লেগে গেল। কোম্পানী-বাহাদুর তখন সিক্কা মারছেন নিজের টাকশালে, সেই সিক্কা দিয়ে মজুরী দিতে চাইলেন। অমনি হাঙ্গামা বেধে গেল। হাঙ্গামা বলে হাঙ্গামা! মজুরেরা বলে, ও সিক্কা নেবে না, এ-গের্দে ও সিক্কা চলবে না। কিন্তু কোম্পানী-বাহাদুর কোরা লাগিয়ে সিক্কা চালাতে চান! অমনি ধর্মঘট লেগে গেল। কাম করবে না, ঠুঁটোটি হয়ে বসে থাকবে।

এই হাঙ্গামার কথা শুনেছে পিতু নায়েক ব্রিজু প্রধানের কাছে। শুধিয়েছে, তারপর ?

ব্রিজু অন্য কথায় ঘুরে চলে গেছে। কিল্লার বর্ণনা শুরু করে দিয়েছে, বাপরে বাপ, সেকি পেল্লায় কাণ্ড! এ-গের্দে মেটিয়া বুরুজ, মেটিয়া কিল্লা ঢের আছে। ইটের কিল্লাও আছে, কিন্তু এমনটি আর নেই। দেখলেও গা ছমছম করে ওঠে, বুকটা হিম হয়ে যায়।

পিতু জানতে চেয়েছে, কেনে ?

কেনে ? ব্রিজু পরধান কথাটা লুফে নিয়ে বলেছে, কেনে ? কত নরবলি পড়ল জানিস নে! সায়েবরা কালির থানে নরবলি দিলে, আবার সেই অক্তে ভিজ্যে চুন-সুরকির আস্তর লাগালে! বাপস্!

পিতু নায়েক ব্রিজু পরধানের কথা মানে।

কে-ই বা না মানে ?

ব্রিজু এ-গের্দের সবজান্তা মনিষ্যি। বেঁটেখাটো চেহারা, মাথায় চকচকে টাকের চারিদিকে দুগাছি মাত্র চুল। আর মুখে তো চুলই নেই, দুগাছা ভেতো লোমের মতো দাড়ি, গোঁফও উইখেয়ো—এখানে আছে

তো ওখানে নেই। কিন্তু অমন চেহারা হলে হবে কি, ব্রিজু জানে-শোনে ঢের। এই সুনদ্বীপ কসবা-হিজলীতে যত কোম্পানীর নুন তৈরি হয়, সব রাজা যাদুরামের হাতে। সেই যাদুরামের নুন যখন হিজলী থেকে আমতা, আবার আমতা থেকে খিদিরপুরের গোলায় যেত, তার সঙ্গে আগে থাকত ব্রিজু পরধান। এখন বুড়ো-হাবড়া, এখন আর যায় না। আগে যেত। আর কোম্পানীর শহরের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো ছিল তার নখদর্পণে। এখন যায় না, কিন্তু গপ্প জমায়।

সাঁঝবাতি দিতেই দাওয়ায় বসে দা-কাটা তামাক টানে আর গল্প জমায়।

তখন কে না যায়! বুড়োরা যায়, আধা-বুড়োরা যায়, চ্যাঙড়ারা যায়। গিয়ে আসর জমায়। যায় পুরণ দত্ত, গোবিন্দি জানা, রসিক কেতবা, বিক্করম পাল, টুকু পরধান, রঘু ডিণ্ডা। আবার হানিফও আসে! কখনো বা আসে নিধু গুড়িয়া। আবার রাম পাণ্ডাকেও দেখা যায়। সে এখানকার চাপরাসী।

ব্রিজুই আসর জমায়, সবাই শোনে।

পিতুও আসরে যায়। এক কোণে বসে শোনে। আবার একসময়ে নিঃসাড়ে উঠে যায়।

কখনো বা শুনতে-শুনতে ঢুল আসে। চোখ রগড়ায়, তবু চোখ খোলা থাকে না।

ব্রিজু পরধান হেসে বলে, আমার কেচ্ছার নিদালু মন্তর আছে, তাই তুমি তো ঘুম্যে পড়লি লায়েকের পো!

পিতু আবার চমকে উঠে চোখ রগড়ায়।

আর হাসির হর্‌রা পড়ে যায়।

তবুও পিতু গরহাজির হয় না, রোজ যায়। যখন-তখন যায়।

খালাড়ীর কাজ ফেলে যায়, চাপরাসীর কাছে ধমক-ধামক খায়, আবার কখনো বা চাপরাসী পাণ্ডা এক চড় কষিয়ে দেয়। কখনো বা খালাড়ীর জমাদার রমণী ভঞ্জকে ধরে বেত খাওয়ায়। তবু যায় পিতু নায়েক।

কেন যায়?

শুনতে যায় ব্রিজু পরধানের কেচ্ছা?

শুনতে যায় তার মসন্দলীর পুথি।

ব্রিজু পরধানের মসন্দলীর পুথি আছে, আর সেই পুথি সে সুর করে পড়ে।

যখন-তখন পড়ে। বললেই হল, পরধান, পড় তো!

অমনি পরধান শুরু করে দেয়,

বন্দি বাবা মসন্দলী না করিও বাম।
কদমেতে লিখে রাখ অভাগ্যার নাম॥
আমি জানি তোমারে আমারে জানে কে।
মরিযা না মরে তোমার নাম জপে যে॥
পহেলা বারাম দিল বাহিরী মোকাম।
তারপরে বারাম দিল হিজলী মোকাম॥
চৌদিকেতে নোনা পানি মধ্যেতে হিজলী।
তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসন্দলী॥

মসন্দলীর কথা শুনতে গিয়েই তার পহেলা আলাপ। নিয়ে গিয়েছিল টুকু। তার কিরকম মেসো হয় ব্রিজু পরধান।

সেদিনও দা-কাটা তামাকের আসর ছিল জম-জমাট। সবাই বসেছিল, কলকে ঘুরছিল হাতে-হাতে।

টুকুর সঙ্গে তাকে দেখে সবাই একটু মুখ ফিরিয়ে চেয়েছিল। তারপরে আর দেখে নি।

ব্রিজু শুধু বলেছিল, কি টুকু, এ আবার কে এল?

এ পিতু নায়েক, মোর দোস্ত্। জলামুঠার খালাড়ীর কামে এযেলো।

খালাড়ীর কামে এয়েলো, কোথাকার লোক তুই বটে রে? ব্রিজু শুধালে।

লোক পটাশপুরের, পিতু উত্তর দিয়েছিল।

পটাশপুর তো ডাকুর আড়ং। বর্গী ডাকুর আড়ং। তা সেথান থে এখানে এলি?

কামে এয়েছি।

এ বাওয়া ডাকুর কাম লয়, আজা বাহ্রুআমের কাম। কোম্পানী বাহাদুরের ঠেঁগে খত দিয়ে লিয়েছেন, এক ছটাক-নটাক লুনও কাউকে বেচে দেবেন না, তাই তো কোম্পানী দিয়েছে। সেই কামে পটাশপুরের লোক বাগাল হল!

পিতু নায়েক বললে, আসলে পটাশপুর পরগণায় ছিল মোর ঠাকুর্দা। এখন মোরা আছি সুজামুঠায়, তার আগে ছিনু মইষাদলে।

তাই বল্, তোরা তাহলে মসন্দলীর পরজা।

মসন্দলী তো পীরবাবা, পরজা হব নি!

হা হা করে হেসে উঠেছিল ব্রিজু, যেন খটাশের হাসি।

তা পরজা তো মালুমই হল, তোর অমন বাঘের মতো শরীল, তু তো মসন্দলীর বাঘ। বাঘের মতো তাকদ আছে তো র‍্যা?

তা লেই আবার! কোন জোয়ান আছে, আসুক না। পিতু হাঁটুতে তাল ঠুকে বললে।

বাঃ শাবাশ! মসন্দলীর বাঘ কি আর বুনে থাকে, এই তো বাঘ!

সেইদিন থেকে তাকে মসন্দলীর বাঘ বলেই ডাকে। এই নামেই খালাড়ীতে তার পরিচয়। সবাই ডাকে বাঘ, নাম তার হারিয়ে গেছে।

বাঘের দেবতা কালুরায়-দক্ষিণ রায়। কালুরায়ের বাঘ ছিল রূপাচান্দা, তার চেয়ে কমজোরী সে নয়।

টুকুর বৌ একটু যেন তড়বড়ানি, কলকলানি, একটু বা ছেনাল। সেও জানে মসন্দলীর কথা। কে না জানে! তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ছিলেন এই হিজলীর ভূইঞা-রাজা। তিনি ছিলেন যেমন বীর, তেমন সাধুপুরুষ। এখানকার লোকে মসনদ-ই-আলাকে বলে মসন্দলী বা মছন্দরী। এই মসন্দলীই পীরবাবা। তাঁর পূজা দেয়, তাঁর কাছে মানত করে। মসন্দলীর ছিল বাঘের মতো শক্তিশালী একদল আদিবাসী অনুচর। সেই বাঘ বলে ব্রিজু পরধান তাকে ঠাট্টা করে, সবাই করে, পাঁচিও করে। বলে—

ওমা, তুমি বাঘ হলে নাকি গো লায়েকের পো! তা মসন্দলীর কোন বাঘ —হুমা, না, দুমা?

তা আমি কি জানি।

দুমা তো দুম দুম করি আস্তে, হুমা তো হুমহাম করি গরজায়। তুমি কোন্ বাঘ?

আমি জানি না।

তুমি হুমা দুমা দুই—দুই বাঘ। য্যাকের ভিত্‌রে দুই?

য্যাকে দুই হলাম কেনে?

কেনে কি করে বলব! তুমি তাই।

তোমার ডর করে না! পিতু ফস্ করে বলে ফেলে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে টুকুর বৌ পাঁচি। ওমা, ডর করবে কেনে গা! বাঘের লোখ লেই আমার?

লোখ থাকে আপনা মনিষ্যিকে আঁচড়াবে, কামড়াবে, মোর কি করবে?

পিতুর বাঘের মতো চেহারা হলে কি হবে, সে বড় শান্ত, সে আর কথা বলতে পারে না।

ওমা গো, থোঁতা মুখ ভোঁতা হল কেনে লায়েক? হেসে ওঠে পাঁচি। আপনা মনিষ্যি বুঝি জোটে নি? তা ব্রিজু পরধানের ঘরকে তো যাও, সিঁধেল চোর হলে পার!

বাঘ সিঁধেল চোর লয়—পিতু একটু রহস্যই করে বসে।

ওমা, তাহলে গোহাল থে গোরু বাছুর চুরি করে নে যায় কেনে? সে তো বাঘডাশা, বাঘ, সোঁদর বনের বাঘ লয়।

না হয় বাঘডাশাই হল মোদের লায়েক। পরের বৌয়ের পাছান-পাছান ঘুরে কেনে, পরের ঝিউরির দিকে লজর যায় না?

পিতু জিভের ধার সইতে পারে না, লজ্জায় পালিয়ে আসে।

টুকুর বৌটা রসকরা কথা কয়, ডাকবুকো মেয়ে। মুখে কিছু বাধে না আকথা-কুকথাই হয় তো কয়ে বসবে।

পিতু নায়েক সেই থেকে যায়, ব্রিজু পরধানের ঘরে সিঁধ দেবার মন থাকলেও, দেয় না। দিতে পারে না। শুধু ইতিউতি তাকায়। কিন্তু কাউকে নজরে পড়ে না। বেগমমহালের বেগমের মতো কড়া পাহারায় তার ধন আগলে রেখেছে বুঝি ব্রিজু। বুঝি মসন্দলীর মতো মানুষের হাতে দেবে বলেই তার সাধ।

ছুঁড়ীটাই বা কি! একবার ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় না, কলসী কাঁখে ঠাটে-ঠমকে জল সইতে যায় না।

দেমাক আছে বাপের, দেমাক আছে মেয়ের।

হরি সাউয়ের কন্যা ছিল রূপবতী। তাকে তাজ খাঁ মসন্দলী জোর করে বিয়ে করেছিলেন। মসন্দলীর তো প্রতাপ ছিলই, তাঁর বাপদেরও প্রতাপ কম ছিল না।

হরি সাউ মুসলমান রাজাকে মেয়ে দিয়েছে বলে তাকে একঘরে করেছিল তেলীদের সমাজ। কেউ বিয়ের ভোজ খেতে আসে নি। ভাত-

তরকারি বাসি হয়ে পান্তা হয়েছিল, পচে গিয়েছিল। শেষে মসন্দলী বাঘদের লেলিয়ে দিলেন। তারা ভয় দেখাতে সবাই এসে মুঠো মুঠো সেই পচা পান্তা খেয়েছিল। পিতু ভাবে, যদি মসন্দলীর বাঘ হয় মন্দ কি! বাঘের দাপটে সবাই তটস্থ হয়ে থাকবে। কিন্তু দাপট দেখাতে কোথাও পারে না।

খালাড়ীতেও না, আবার খালাড়ীর বাইরেও না।

খালাড়ীতে সে ঠিকা কাজ করে।

বিক্করম পাল বলে, মোরা আজ্জেরি, মোরা কবে থেকে লুন মারতে শিখেছি। মোদের বাপ-দাদা লুন মেরেছে। পাঙ্গি লুন আর করকচ তৈয়ার কর‍্যে হাত খয়্যে গেছে! তো-বেটারা কোত্থে উড্যে এসে জুড়্যে বসলি! তোরা জানিস কি। লুন জ্বাল দিতে জানিস, না জোয়ার এলে বাঁধতে জানিস্! অকম্মার ঢেঁকি! আবার রোজ খাবার যোম।

পিতু বলে, মোরা কি আজকের ঠিকা, মইষাদলের রাণী জানকীর কাম করি নি!

যা যা—মইষাদলে আবার কাম! ওখেনে ক'ছটাক নমক তৈয়ার হয় রে ঠিকা!

পিতু কি বলতে যায়, অমনি টুকু ডাকে, আরে ইদিকে এসো বাঘের পো! ইদিকে এসো হুমা-হুমা!

পিতুর আর বলা হয় না, সে চলে যায় টুকুর কাছে।

টুকু হাঁড়ি চড়িয়ে নুন জ্বাল দিচ্ছে। পাঙ্গি লবণ তৈরি করছে।

জ্বালের কাঠ চিরে দিতে হয়। উনুনে পাঁজা পাঁজা সেই কাঠ পুরে দেয় টুকু।

বলে, আজ সাঁঝে যাবি তো?

ফুরসত পেলে তো।

কেন—রাম পাণ্ডার বুড়ী ডেকেছে নাকি?

যা!

যা লয়, যা লয়, যা করো সাঙাত, মোরটির দিকে নজর দিবেক নাই।

পিতু আবার বলে, যাঃ,—তারপরে ছুটে চলে যায়।

পিতু আসা মাত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে, তার চেহারাটা দুশমনের মতো হলে কি হবে, মানুষটি একেবারে কাদার তালের মতো নরম। করকচের মতো

কড়া নয়। তাই সবাই বেগার দিতে ডাকে। তার কাজ জোয়ারের জল সাগর থেকে যখন আসে, তখন খাতে বেঁধে রাখা। কিন্তু সেই কাজের পর আর-আর কাজেও যোগান দিতে হয়।

কেউ বলে, আমার জ্বালানির কাঠ চিরে দাও!

কেউ বলে, আমার লুনটার জ্বাল দেখ্‌না বাঘ!

সাগর কয়াল ডাকে, ওরে বাঘের পো, কাঁটায় চড়বে মাল, এবার মাল চাপিয়ে দিয়ে যা।

বাঞ্ছারাম ডাকে, মাল কাঁড়ি হবে, এদিকে একটু হাত লাগা।

আবার নিমু ডাকে, রোদে শুকোনো কবকচ একটু ছাড়িয়ে দিতে।

সবাই সব কাজে ডাকে। আবার খালাড়ীর চুলিয়ার ফুট-ফরমাসও খাটতে হয়।

আর এত সব করে দিলে সে পায়—ছ গণ্ডা কড়ি।

কিন্তু তাতেই আজ্জেরিদের হিংসে।

বলে, ঠিকানা সব লুট-পুটে নিলে!

আবার অন্য ঠিকাদের কাছে যায় না, তার কাছেই হাত পাতে। [illegible] পাতে ভগবান নাইক, জয়দেব সাউ—নিমু পরধান। বলে, দেনা দু গণ্ডা—আসছে হপ্তায় শুধে দেব।

পিতু দেয়। সে জানে আসছে হপ্তা আর আসবে না।

হপ্তায় দুসের নুন বরাদ্দ আজ্জেরিদের। তার থেকে এক মুঠো নুন চাইতে গেলে পিতুকেই তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

পিতুর তবু ভাল লাগে। এই নুন মারা কামই তারা চিরকাল করেছে; অন্য কাজ জানা নেই। এ কাজ জলামুঠায় যেমন, সুজামুঠায় তেমনি, আবার মহিষাদলেও তাই। আবার সেই যে পুববাংলার নোয়াখালি আর চট্টগ্রাম—সেখানেও একই রকম। আরব সাগরের পারেই কি আর আর একরকম? সেখানেও রকমফের নেই।

কথায় বলে নুন-ভাত। নুন-ভাত পেলেই মানুষ তুষ্ট। নুন যোগায় তারা, ভাত যোগায় চাষী। চাষী যেমন লাঙ্গল দেয় ক্ষেতে, ফসল ফলায়, তারা তেমনি সাগরের জল ক্ষেতে বেঁধে রেখে শুকোয়, জ্বাল দেয়; নুন তৈরি করে। এ-ব্যবসা চাষীদের যেমন বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে ওয়ারিশান

সূত্রে পাওয়া কাজ, এদেরও তেমনি। ওদের বলে চাষী, কিষাণ, লাঙল-ঠেলা কাস্তে ধরা মনিষ, জন—এদের বলে মুনমারা মলঙ্গী। এ অঞ্চলের কথায় মলোগা। এদের জাত ছিল, মুনমারার কাজ নিয়ে জাতপাত হয়েছে। এখনো নামের শেষে নায়েক, পাল, সাউ, প্রধান জুড়ে দেয়, কিন্তু সবাই মুনমারা—মুনে তাদের জাত মজে-হেজে একাকার হয়ে গেছে।

কবে মুনমারা শুরু হল, সেকথা পিতু জানে না, টুকু জানে না, বিক্রম, নিমু সাউ, বাঞ্ছারাম কেউ জানে না—এমন কি সবজান্তা ব্রিজু পরধানও না। তবে সন্ধ্যের দিকে তারা যখন জটলা পাকিয়ে বসে, তখন আজ্জেরিরা নিজেদের দুঃখের কথা কয়, ঠিকারা কয়। এরই মধ্যে বুড়ো-হাবড়া কেউ বলে—আজ্জেরির কি দুখখু ছেল! আজার হালে থাকতাম মোরা! লোনা জমি তখন চাইলেই মিলত। এই তো মোর ঠাকুর্দা এয়েলো কেওরামালে, এসে জমি চাইল। অমনি জমি পেয়েলো, জ্বালনি কাঠের বন পেয়েলো, আর চীনা কাড়ি, লোহার হাণ্ডা, দাওলি, সাগরি, হাঁড়ি কিনে লেগে গেল নিমক তৈয়ার করতে। জমির মালিক জমিদার বুললেন, খাজনা দিতে হবেক দু মণ লুন, আর যত তৈয়ার করতে পারবে, তত নাফা, তত মুনাফা।

আবার কেউ না বলে, জমিদারের পেট ভবত, মোদেরও ভরত।

তারপরে উষ্মা দেখা দেয় কিন্তু তা প্রকাশ কবার ভাষা নেই, সেই সংহতি-শক্তি নেই। আজ্জেরিরা ঠিকাদের হিংসে করে।

যে উষ্মা দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে পারত, সেই উষ্মা পরিণত হয় নিজেদের ভিতরে কাজিয়ায়। আর সে-কাজিয়া আবার কাজের চাপে মিলিয়ে যায়।

সমুদ্রে আসে জোয়ার। বেলাকূল তাম্রলিপ্তির বুকে আসে জোয়ার। হিজলীর বুকে, ইংলীর বুকে আসে জোয়ার। পাঙ্গাভূমি প্লাবিত করে দিয়ে জোয়ার বয়ে যায়। সেই জোয়ারের জল তারা খালাড়ীর খাতে জীইয়ে রাখে। এ-খাত থেকে ও-খাতে নিয়ে যায়। কিছু বা রোদে শুকিয়ে-শুকিয়ে করকচ হয়; সেই করকচ খায় শুচিমতী বিধবারা হবিষ্যান্নের সঙ্গে। আবার কিছুটা হাঁড়িতে জ্বাল দেওয়া হয়। সেই পাঙ্গী নিমকের স্তূপ হয়, কাঁড়ি হয়। কয়াল মাপে। চুলিয়া দাঁড়িয়ে দেখে, অংশীদার ইতমানদারও আসে। আবার থাকে সরকারের ইজারাদারের লোক।

নুন মাপা হয, নুনের কাঁড়ি তৈরি হয়। এবার গোরুর গাড়ি আসে। কুলিরা গোরুর গাড়িতে মাল বোঝাই করে। গোরুর লেজ মলে দেয় গাড়োয়ান, গোরু চলতে থাকে। হোলায় চলে গাড়ি। মাল ঝরতে থাকে পথে। ঝরতি মাল কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাই কুড়োতে আসে মেয়েরা, ছেলেমেয়েরা। কাড়াকাড়ি করে। হোলায় আবার কাঁড়ি হয়। মাল কমে যায়, ভিজে মাল হাওয়ায় শুকিয়ে আসে। সেই মাল থাউশুকটি। আবার কিছু মাল বা গলে যায়। সে মাল থাকুযামারা। আবার সুজামারা মালও মেলে। কাঁড়ির চারিদিকে যে মাটির গড় দেওযা থাকে, তারই সঙ্গে কিছু লবণ লেগে থাকে। তা নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

নিমক গোলায় গিযে ওঠে, তারপর গোলা থেকে চালান যায় নৌকায়। সুবর্ণরেখা, হলুদিয়া পার হযে যায়, নয় তো সমুদ্দুরের পথ বেয়ে চলে যায়। খেজুরী হয়ে। হিজলীর নুন যায়, বেলাকূল তাম্রলিপ্তির নিমক যায়। আগে যেত বেলাকূল পার হয়ে বাহির সমুদ্রে, দূর দেশে। এখন যায় কোম্পানীর শহবে। তাব নিমক মহালে।

নুন ছিল মানুষের নিজের জিনিস, আরব সাগরের তীরের, বঙ্গোপসাগরের তীরের মানুষেরা তা মারত, তৈরি কবত; আবার যাদের ধাবে কাছে সাগর নেই, তারা সেই নুন কড়ি দিয়ে কিনত। যারা কিনতে পাবত না, তাদের মেয়েবা নারিকেলের গেঁড়া পুড়িয়ে নুন তৈরি করত। চলে যেত নুনের কাজ। নুন-ভাতের কাজ। তারপরে ভূস্বামীদের দৃষ্টি পড়ল। জমি বিলি-বন্দোবস্ত নিতে হল, আরব সাগরের পারে আগুরী আর বঙ্গোপসাগরের ধারে মলঙ্গী জাত তৈরি হল। তারা জমি নেয়, খাজনার বদলে নুন যোগায় রাজাকে। সেই নুন রাজা বেচে সদাগরদের কাছে। সদাগরেরা সে নুন বোঝাই ডিঙি নিয়ে যায় ভিনদেশের পাটে। সেখান থেকে নুন দিয়ে হীরে-মাণিক আনে। এমনি করেই চলে দিন। সুলতানী আমল এমনি করেই কাটল।

মুঘল আমলে বাদশাহ বসলেন দিল্লীর তখ্‌তে। তিনি হুকুম দিলেন, নিমকের মহাল বসবে, বাদশাহের নিমক বাদশাহ রাখবেন। পুরোনো দিনের নিমকের উপস্বত্বভোগী রাজারা অমনি বাদশাহের তাঁবেদার হয়ে নুন

যোগাতে লাগলেন। নিজেদের ধন পরের হাতে বাধ্য হয়ে তুলে দিলেন। শাহানশাহ বাদশাহের ফৌজদারের তো পোয়াবারো। তারা বাদশাহী পাঞ্জার জোরে লুটতে লাগল। মলঙ্গীদের নুনমারার সুখ গেল, নুন-ভাত খাবার সুখ গেল। নুন চাই, আরও বেশি নুন চাই! আজেরিরা ছিল ভূমিদাস, হল ক্রীতদাস। পুরুষের পর পুরুষ ধরে নুন মারতে লাগল জমিদারের জন্য, ফৌজদারের জন্য—আর বাদশাহের জন্য। সেই নুন নৌকায় ভরতি হল, ভরে উঠতে লাগল নিমক মহালের নুনের গোলা; সেই নুনের রাজস্বে ভরে উঠল বাদশার কোষাগার। এদিকে আজেরিদের হাঁড়ির হাল। পালিয়েও তখন সুখ নেই। পালাতে গেলে ধরে-বেঁধে আনে ফৌজদারের পাইকরা। ঠিকাদেরও দশা ভাল নয়। তবে মন্দের ভাল, হাতে কটা কড়ি পায়।

এবার বিদেশীরাও এসে দেখা দিল নিমকের হাটে। এরা বিদেশী-খ্রীষ্টান। এদের পূর্বপুরুষকেই একদা যীশু বলেছিলেন—লবণ যেমন সেরা, তেমনি তোমরাও পৃথিবীর সেরা। কিন্তু আজ আর সে সেরা লবণ তারা নেই, নুনের ধক্ চলে গেছে। তারা এখন ময়লা নুন, ধকহীন নিমক। চার্ণক সাহেব বাদশাহী নিমকের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছিল, আর তারই পরে এক রাইটার সাহেব গদি পেয়ে নুনের ব্যবসা নিজের এক চেটিয়া করে নেবার মতলব করলেন। ইনি সবৎজঙ্গ-ক্লাইভ। কিন্তু কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর্সরা কেরানীদের এই ব্যবসার বিরুদ্ধেই ছিলেন। কেরানীদের মাইনে কম বলে তারা এই ব্যবসা করত। কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স বাহাদুর দেখে রাগে গজগজ করতেন। শেষে পলাশীর কয়েক বছর পরেই তাঁরা এক অনিবার্য হুকুম পাঠালেন—রাইটার-কেরানীদের এ-ব্যবসা চলবে না। সবৎজঙ্গ নিজে ছিলেন রাইটার, হয়েছেন পলাশীজেতা জাঁদরেল জেনারেল—তখনো তিনি বেনিয়াগিরি ছাড়েন নি। তিনি ডাইরেক্টর্স বাহাদুরের হুকুম করলেন অমান্য। সোজাসুজি অমান্য করতে ভয় হল। বেনিযার রাজত্ব হলেও রাজা আছেন, আছেন পার্লামেন্ট। সেখানে জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে জেরার তোড়ে নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হবে। না—ব্যবসা করেও সুখ নেই, লড়াই জিতেও সুখ নেই! কিন্তু তাই বলে এত টাকা ছেড়ে দেবেন সে

বান্দা আর যেই হোক, সবৎজঙ্গ তো নন। তিনি তাই এক চাল খেললেন আর সেই চালে কোর্টকে মাত করে দিলেন। তিনি লবণ, সুপারি আর তামাকের ব্যবসার জন্য গড়লেন সাদা বেনিয়ার এক সমাজ, এক এসোসিয়েশন। আর একথাও জানালেন, এই সমাজ যত নিমক বিক্রি করবে, সেই নিমকের উপরে শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হারে মাশুল দেবে সরকারকে। সরকার ঠাণ্ডা হলেন, কিন্তু একেবারে বুঝি হলেন না। সাময়িকভাবে শান্ত হলেন মাত্র। মাঝে মাঝেই কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর্স হুমকি দিতে লাগলেন। শেষে এক হুকুমনামা জারী হল, লবণ প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসের ব্যবসায় কোম্পানীর কর্মীদের ত্যাগ করতে হবে।

তখন সবৎজঙ্গ এদেশে নেই, এদেশ থেকে হঠাৎ-নবাব হয়ে গেছেন ওদেশে। লণ্ডন শহরে বার্কলে স্কোয়ারে বিরাট বাড়িতে ডিসপেপসিয়া আর ভাটিগোতে ভুগছেন। ওষুধ খাচ্ছেন, ভাল হচ্ছেন, আবার অসুখের আক্রমণে শয্যাগত হয়ে পড়ছেন। লর্ড ক্লাইভ তখন তিনি, তাঁর বংশধরেরা আর্ল অফ পাউইস হবে তার ভিত গেড়ে দিয়েছেন। তিনি আর তখন নুনের খেল-এ নেই। এসোসিয়েশনে তাঁর মতো ধুরন্ধর কেউ ছিল না বলেই কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর্সের হুকুমনামা চাল দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তখন নিমক পোক্তানির কাজ নিয়েছেন সরকার স্বয়ং, আর সিংহনাদে হুকুমনামা জারী হল, লবণ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, কোম্পানী বাহাদুরের জিনিস— তা কোম্পানী বাহাদুরের লাভের জন্যই তৈরি হবে। লবণের ইজারাদারেরা সেই লবণ খালাড়ী থেকে তুলে এনে নির্ধারিত মূল্যে দাখিল করবে। আর তা কোম্পানীরই গোলাজাত হবে।

বাদশাহী আমলে কাশ্মীরী, শিখ, মুলতানী আর ভাটিয়ারা লবণ কিনত, আবার তাদের মধ্যে যারা বড় ব্যবসায়ী, তাদের খেতাব ছিল ফকর-উল-তজ্জর বা মালিক-উল-তজ্জর—তারা ছিল নিমকের বাদশা। তাদের দিন গেল। এবার কোম্পানীর রাইটাররা হলেন নিমকের রাজা বা সল্ট কীং—সল্ট ম্যাগনেট। নুনমারাদের চুষে-শুষে লণ্ডন শহরে ইমারত গড়লেন, সম্পত্তি খরিদ করলেন। তাঁরাই হলেন আর্ল, তাঁরাই হলেন লর্ড। বনিয়াদী আর্লরা কেউ বা ছিলেন রাজাদের জারজ সন্তান, কেউ বা নীলরক্তের ঘরানা, তাঁদের জাতে উঠলেন এই কেরানী-বেনিয়ারা। কিন্তু সরকারের

হুকুমজারী হতে যারা নয়া আর্লগিরির মক্স করতে রাইটার হয়ে এসেছিল, তাদের আর আশা রইল না।

নয়া আর্লদের শাহানশা-বাদশা সবৎজঙ্গ-ক্লাইভ বাহাদুর কি সেকথা শুনলেন তাঁর রোগশয্যায়? তখন আক্রমণের পর আক্রমণ চলছে রোগের। ঘুম হয় না, আছে অগ্নিমান্দ্য। জেনারেল তিনি, চিরদিন সিধে হয়ে চলেছেন, বুক চিতিয়ে, শির খাড়া করে বসেছেন। কিন্তু এখন শির তুলতে গেলেই মাথা ঘোরে, ঝিমঝিম করে। তাই সবসময়ে চোখ বুজে থাকেন, ঘুমোতে চান। তিনি ঘুমের জন্য খান লডেনাম। সেই লডেনামের বিষে বিষ নষ্ট হয়, ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর কানেও বুঝি পৌঁছুল খবর।

১৭৭২ সালের খবরটা হজম করতে বুঝি পারলেন না। গেল, নয়া আর্ল হবার যে সোজা সড়কের তিনি পত্তন করেছিলেন মনাঙ্গদের মেহনতীর উপর দিয়ে—তা বুঝি গেল। কেউ আর তো তাঁর আত্মার বংশধর হয়ে দেখা দেবে না। অগ্নিমান্দ্য এতে আরও বুঝি চরমে উঠল, ভাটিগোর আক্রমণ আরও প্রবল হল। শেষে ১৭৭৪ সালের ২৭শে নভেম্বর এল।

সেদিন সবৎজঙ্গ অস্থির, অধীর। মনে হল, সব ঝুটা। শুধু সাচ্চা ঐ ভাটিগোর আক্রমণ। আর সে-শত্রু এগিয়ে আসছে। মাথা তুললেই আসবে, নুইয়ে দেবে মাথা—লুটিয়ে দেবে। মিছে নবাব সিরাজের মুরশিদা-বাদের কারাগারের হীরে-মাণিক, মিছে হিজলীর নুন বেচা সোনা, মিছে নারাখালি-বাখরগঞ্জের সুপারি বেচা সিক্কা, মিছে কাটনী-চোষা দাদনির চাল—মিছে এই আর্লগিরি—সব মিছে। শুধু সত্য ঐ রোগ। তিনি খেলেন চড়া মাত্রায় লডেনাম। ডাক্তার বারণ করেছিলেন, তবু শুনলেন না। তাঁর হয়তো মনে হল, সিরাজের আত্মা আসছে তার ছিন্ন কবন্ধ নিয়ে, সে এসে চেপে ধরবে—চেপে ধরবে শুধু সিরাজ নয়, ঐ যে ক্ষেতের চাষী, ঐ যে নুনমারা মলোঙ্গী—ঐ যে সুপারি বাগিচার সুপুরি-পাড়ানি। ঐ যে কাটনী, ঐ যে তাঁতী। আর তাই লডেনামের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ঘুম তো আসে না। ঘুম···ঘুম···লডেনাম। ঘুম তো উধাও! ঘুম নেই সবৎজঙ্গের, ঘুম নেই শোষকের, শাসকের। কি যেন সেই ইংরেজ মহাকবির কথা—

ঘুম নেই ম্যাকবেথের। ম্যাকবেথ ঘুমকে খুন করেছে।

ম্যাকবেথ যদি করে থাকে, সবৎজঙ্গও করেছে, ক্লাইভও করেছে।

লেডী ক্লাইভ বসেছিলেন শয্যার পাশে, বসেছিলেন দু-একটি বন্ধু। তাঁদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে বললেন সবৎজঙ্গ-ক্লাইভ, তারপর উঠে বসলেন, তারপরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বহুক্ষণ কেটে যায়, আসেন না। কি হল লর্ড ক্লাইভের? রোগী মানুষ, কি হল? সবাই উৎকণ্ঠিত। শেষে একটি বন্ধু বললেন বেগম-সবৎজঙ্গকে, লেডী ক্লাইভকে—আপনি গেলে ভাল হয়। গিয়ে দেখুন, কোথায় আমাদের লর্ড?

বেগম ছুটলেন। আঁতিপাতি করে খুঁজলেন। বাদশার দেখা নেই, নিমকের বাদশা, তামাকুর বাদশা, তুলোর বাদশার দেখা নেই। শেষে একটা ঘরের দরজা খুলতে দেখা মিলল। বাদশা ভুঁয়ে লুটোচ্ছেন, তাঁর গলা কাটা। বেগম মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ঝি-চাকরেরা ছুটে এল।

একটি ঝি—কি যেন নাম তার? প্যাটী ডুকারেল না কি—বাদশা সবৎজঙ্গের খানিকটা রক্ত তার হাতের আঙুলে কি করে লেগে গিয়েছিল, সে অজান্তে সেই রক্ত-মাখা আঙুল চাটলে।

নুনের স্বাদ কি সে পেল?

পেল কি বাঙ্গালার তামাকু আর সুপারির স্বাদ?

পেল কি বাঙ্গালার মানুষের রক্তের স্বাদ?

বোধহয় পেল। নুনের বাদশা বাদশাহী ফতে হবার সঙ্গে সঙ্গে এমনি করে আত্মহত্যা করলেন। তাও আবার ঝকঝকে পিস্তলের নলে নয়, পাখের কলম-কাটা ছুরি দিয়ে গলা কেটে। ঐ ছুরি তিনি বহুদিন ধরেই নাড়াচাড়া করতেন। মাঝে মাঝেই ধার পরীক্ষা করতেন। আজ সেই ছুরি দিয়েই আত্মহত্যা করলেন। পিস্তলের গুলিতে যৌবনে একবার নিজের জীবন নিতে গিয়েছিলেন, পারেন নি। পিস্তলের গুলী ছোটে নি কিন্তু আজ নিশ্চিত লক্ষ্যে ঠাণ্ডা ছুরি গিয়ে কণ্ঠনালীতে বিঁধল। সবৎজঙ্গ-ক্লাইভ নিজের ছুরিতে নিজেকে জবাই করলেন। বাঙ্গালার নিমকশাহীর পয়লা বেনিয়া, পয়লা নম্বর রাজার লীলা-খেলা এমনি করেই শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু নিমকের খেল তো শেষ হল না। কোম্পানী এবার সে খেল দেখাতে লাগলেন। এখনো দেখাচ্ছেন। ইজারাদারেরা সে খেল দেখাচ্ছেন। দেখাচ্ছেন জলামুঠার যাদুরাম, দেখিয়েছেন মহিষাদলের

রাণী জানকী, দেখাচ্ছেন লবণের এজেণ্ট সাহেবরা আর কালা বেনিয়ানেরা ! আবার সে খেলে যোগ দিতে আসছে কিছু কিছু কালাবাজারী। তাদের সঙ্গে যোগসাজসে আছে নিমকমহালের দারোগা। আবার মরাঠারাও সে খেলকে রাজনীতির চালে বদলে দিচ্ছে। পটাশপুর পরগণা তাদের হাতে। সেখানে বসে বসে তারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বড়ে টিপছে, আড়াই চাল চালছে।

পিতু নায়েক এত কথা জানে না। সে কেন, মলঙ্গীদের চৌদ্দপুরুষ কোনদিন এসবের ধার ধারে নি, এখনো ধারে না। তবু সুখ-দুঃখের কথা উঠলে তারাও পুরোনো দিনের কথা কয়। আর সেই পুরোনো কাসুন্দীতে ইতিহাসের দু-একটা মিলও দেখা যায়। কিন্তু মেলাবার জন্যে তাদের মাথা ব্যথা নেই। ইতিহাসের ধারায় তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে-খেতে চলে, ইতিহাস জানবার দায় থাকলেও দায়িত্ব নিতে চায় না; চাইলেও পারে না। তাদের ইতিহাস নেই, আগামী নেই—শুধু আছে জলজলাট বর্তমান। তবু পুরোনো কাসুন্দীর মতো পুরোনো দিনের কথা যে না ঘাঁটে এমন নয়। বুড়োরা ঘাঁটে, দু-একটা ঠিক-ঠাক বলে, কোনটায় বা অনেকখানি কল্পনা মেশায়, কোনটায় বা পূর্বস্মৃতির ময়ান দেয়। সে-স্মৃতি আবার বয়সের ছানিতে ঝাপসা। বুড়োরা বলে, যুবোরা শোনে। তারপর বেমালুম ভুলে যায়। তবু শুনতে আসে। ভিড় করে আসে। তাই প্রতি খালাড়ীতেই এমনি আসর বসে। এখানেও আছে ব্রিজু প্রধানের আসর।

পিতু সেই যে পহেলা দিন গিয়েছিল, তারপরে রোজ না হোক, প্রায়ই যায়। সবাই যায়। বুড়োরা যায় তামাকুর নেশায় মশগুল হতে, যুবোরা যায় পত্র-আড়াল দিয়ে তামাকুর প্রসাদ পেতে। আবার যায় ব্রিজুর ঘরের ভিতরে যেটি হারেমবাসিনীর মতো আছে, তাকে দেখতে। ব্রিজু প্রধান বলে তার বেটী। কিন্তু সবাই জানে, ব্রিজুর বৌ ছিল বাঁজা। ব্রিজুর কোন ভাইয়ের বেটীই হবে। বছর দুয়েক হল তাকে শূন্য ঘরে এনে বসিয়েছে। তা বসাক, কিন্তু বুড়ো তাকে তেজপক্ষের মাগের মতো লুকিয়ে রাখে। দেখা যায় না। একটু সাড়াও বুঝি পাওয়া যায় না। না, সাড়া পাওয়া তার যায় বই কি। মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর থেকে শব্দ আসে। হাতা-খন্তি নাড়ার শব্দ। কখনো বা ফোড়নের ঝাঁঝও জানান দিয়ে যায় সে আছে।

বিকেলের দিকে এলে দেখা যায় লাল ডুরের আঁচল চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। তাকে চট্ করে দেখা যায় না বলেই তাকে দেখার জন্য এত আকুলি-বিকুলি। আর দেখে না বলেই সে রহস্যময়ী, সে রূপবতী। যেন সেই মসন্দলীর কথার হরি সাউয়ের কন্যার মতো সুন্দরী। পুরুষরা দেখে না, মেয়েরাও না। তাই পুরুষ কেউ আড্ডায় গিয়ে জুটলেই ঠাট্টা করে, ঈর্ষাও করে। নিজের ভাতার হলে তো কথাই নেই, মুখ-ঝামটা দেয়, গোসা করে। পরপুরুষ হলে শুধু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরে। আর চিপটেন কেটে কথা কয়। তবু পুরুষরা যায়, তারা তাদের বাগ মানাতে পারে না।

টুকুকে টুকুর চটুলা বৌ পারে না, গোবিন্দি জানাকে পারে না তার বুড়ী বৌ; নিমুকে পারে না তার ছুঁড়ী বৌ। আর পিতুর বৌ নেই। কিন্তু কি জানি কেন, তাকেও থামাতে যায়। এক শুধু টুকুর বৌ নয়, রাম পাণ্ডার বৌ শোভাবতীও যায়। শোভাবতী ময়ূরভঞ্জ জেলার মেয়ে। মুখে সবসময়েই পানদোক্তার টোপলা। চাপরাসীর বৌ বলে দেমাক নেই। সবার সঙ্গে মেশে, ময়ূরভঞ্জের আদিবাসীদের ছড়া কাটে। পিচ পিচ করে পানের পিক ফেলে।

সেও বলে, কি গো নাগর, কুআড়ে যাউছ? অন্ধারো হেবঠারু মনো বুঝি ছোঁক ছোঁক করুছি।

পিতু হাসে। লজ্জার হাসি হাসে।

শোভাবতী বাজুবন্ধ নেড়ে বলে, বাঘ তো অছ, কামড়ো দেই পারিবু কি তুম্ভে? না—পারিবি নাই?

পিতু চুপ করে থাকে, হাসে।

হাসি কেনে নাগর! শোভাবতী হাসে। বলে, পান খাও!

বটুয়া থেকে পান পাতা বের করে, সুপুরি বের করে, ধারালো জাঁতি নিয়ে সুপুরি কুঁচোতে বসে যায়।

তারপরে ছড়া কাটে।

মানুষটা ভাল। একটু গাবাগুবো, মোটাসোটা, গোলগাল, মনটা ভারি সাদা। মনে খোঁচ নেই।

পিতু তার-দেওয়া পান খায়, পানের বোঁটায় মাখা চুন খায়, ছড় শোনে; তবু যায়। টুকুর বৌয়ের ঠাট্টা শোনে, তবু যায়। সেই যে

বলে, বেগুন পাতায় ভাত দিয়ে ওষুধ করেছে, তেমনি ওষুধ করেছে, বশ করেছে যেন ব্রিজু। সে কেন, সবাইকেই করেছে। এমন যে চাপরাসী গান পাণ্ডা, তাকেও; আবার না কি কসবা হিজলীর চৌকির দারোগাকেও করেছে। সেও আসে যখন-তখন, সলা-পরামর্শ করে। ব্রিজু বশ করেছে কি? না, তার ঐ ছুঁড়ী? ঐ যে, যে ঝাঁপের আড়ালে বসে হাতা-খন্তি নাড়ে, ফোড়ন দেয়, সম্বারা দেয়; যার লাল ডুরের আঁচলখানা ঝলক দিয়ে যায়, চোখের তারা ঝলসে দিয়ে যায়। পিতু নায়েক, ওরফে মসন্দলীর হুমা-ঘুমা খতিয়ে দেখে না, দেখার সাধ্যও তার নেই। তার মগজে মনস্তত্ত্বের ওসব ধুকড়ি চাল ঠাঁই পায় না।

তবু কিসের টানে যেন যায় ব্রিজুর ডেরায়, গিয়ে দাওয়ায় খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে। ব্রিজুর কথা শোনে, আবার কানে আসে কার যেন নড়ে-চড়ে বেড়াবার শব্দ। খুটখাট, টুকটাক্, টুং-টাং, ঠনঠন। আর-সকলের মতোই শোনে, কান পেতে শোনে। আবার চলে আসে।

সেদিনও ঐ শব্দ শুনতেই গিয়েছিল। বারবর্দারী মুহুরের তাকে একটু নেক-নজরে দেখেন। নুন পাঠানোর হিসেব লেখেন তিনি। তাঁর ফাই-ফরমাস খেটে দিতে হয়। মাঝে মাঝে নুনের নৌকার খবর নিতে এ-ঘাঁটিতে সে-ঘাঁটিতে পাঠান। সেদিন তাকে মানকশ পাঠিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। খালাড়ীতে সেদিন তার ছুটি। তাই সে বিকেল না হতেই চলল ব্রিজুর বাড়ি।

ব্রিজু দাওয়ায় বসেছিল। আজ সে একা। এখনো কেউ এসে জোটে নি। সে একখানা জাল সারাচ্ছিল, কাঠি বসাচ্ছিল খেপলা জালে।

পিতুকে দেখেই বলে উঠল, আরে, এস এস লায়েক! এত সাতসকালে যে!

মানকুশ গিয়েলো, চলে আলাম, মুহুরের বাবুর কাম ছিল।

তা বেশ! জালে কাঠি লাগাতে লাগাতে খুদে চোখ দুটি দিয়ে জুলজুল করে তাকালে ব্রিজু। বসো লায়েকের পো!

চারিদিকে কাঠি আর সুতোর ছড়াছড়ি। পিতু সে সব বাঁচিয়ে এক পাশে মাটিতে বসতে গেল।

ব্রিজু হা-হা করে উঠল, সে কি লায়েকের পো, মাটিতে বসবে কেনে? ওরে—একখানা চ্যাটাই দিয়ে যা লো!

ঝাঁপখানা ভেজানো। ঘরের মধ্যে, তেমনি টুক-টাক শব্দ। হঠাৎ সে-শব্দ থেমে গেল।

সেদিকে একবার তাকিয়ে পিতু ব্রিজুর দিকে মুখ তুলে বললে, তা পরধান মোশায় যে জাল মেরামতি করছ? জাল বাইতে যাবেক নাকি?

ব্রিজু হেসে বললে, কেন, পরধান কি জাল বাইতে পারেক না! কেবল কি দাঁড়ের টিয়া-ময়নার মতো বুল বুলে! ওরে মসন্দলীর বাঘ, মোরা গাঙের পাড়ের মানুষ, কসবা-হিজলীর মানুষ, মাছ ধরতি মোরা জানবেক নি তো কে জানবেক রে!

তা বটেক! পিতু আস্তে আস্তে বললে।

কিন্তু পরধানকে নাড়া দিলে, সহজে সে থামে না। বললে, তুমি বসো লায়েকের পো! এখনো চ্যাটাই দিলেক নাই! ওলো-ময়না, চ্যাটাই দিয়ে যা!

ঝাঁপখানা ধীরে ধীরে খুলে গেল। আর খুলতেই লাল ডুরে এক ঝলক ঝিলিক তুলে এসে একখানা চ্যাটাই ছুঁড়ে দিলে দাওয়ায়।

পিতু বোকা মানুষ হলেও, সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। সে লাল ঝিলিক দেখলে, আবার যখন ঝাঁপ বন্ধ হয়, তখন ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চোখের আগুনের ঝিলিকও দেখতে পেলে। তার গা যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরধানের বুঝি চোখ এড়ায় নি। কিছুই বুঝি তার চোখ এড়ায় না। সে বললে, মেয়া মোর ভারি নাজুক! ঘোঙটা দিয়ে থাকে রাতদিন, কারো নজরে পড়তে চায় না। তবে নক্ষী মেয়ে! ওর একটা হিল্লে করতে পাল্লে মোর আর কি! মোর তো ঝাড়া হাত-পা!

পিতু প্রসঙ্গ উঠতেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। ব্রিজু এমন প্রসঙ্গ তার সাঁঝের আসরে তোলে না, মেয়েকেও ডাকে না। কি জানি তার উপর কিসের দরদে আজ মেয়েকে ডেকে চ্যাটাই দিয়ে যেতে বললে। তাই আশা তো হতেই পারে।

পিতু কথায় ওস্তাদ নয়, তবু সে বললে, তা বিভার বয়স তো হল পরধান। ডাগর মেয়া। এবার বিয়া দাও!

ব্রিজুর উই-খেয়ো গোঁফে হাসি খেলে গেল, বললে, পাত্তরটি কেটা হবেক গো! মলোগীদের মধ্যি যুগ্যিটা কেটা!

পিতুর যেটুকু আশা ছিল, ভুস করে উপে গেল। যেমন উপে যায়

হাণ্ডির জল জাল পেয়ে। হাণ্ডিতে তবু লুন থাকে, কিন্তু এযে কিছুই থাকে না।

ব্রিজু পিটিপিটি তাকায়, মিঠিমিঠি হাসে, আবার বলে—

দেখছ নি লায়েকের পো—জালখানা এক্কেবারে লতুন করে ফেলেছি। কোন সনের জাল! যেবার রসুলপুরে গিয়েলো, তখন কিনেলো। তখন মেয়াটা হয় নাই। প্যাটে।

জাল বাইতে গাঙে যাবেক নাকি পরধান? পিতু শুধালে।

হেঁ-হেঁ করে হেসে উঠল ব্রিজু। ঠাট্টা-মসকারা করবেক নি লায়েকের পো! এই জাল নে খেপে খেপে গাঙে গিয়েলো, কত মাছ ধরল! তেরপাখিয়া, হলদে গাঙে, তেখালীর খালে, কোথায় না ধর্লেক। বিরজু আজকের মানুষ লয়।

একটু বা লাজ বাসে পিতু, বলে, লা, লা, সিকথা লয়!

লা বুলবে কেনে—আজ তো পরধানের সে তাকদ লেই। সবাই বুলে—তুমি লায়েকের পো বুলকে নি কেনে? এই পরধান যুবোকালে কুথায় না গেছে। শুমগড়, দোরো, কেওরামাল, কুথা না চক্কোর দিয়েছে। শুমগড তো ছেলো তার হাতের তেলোয়। কোম্পানীর আজব শহরে গেছে। মাছ ধরেছে গাঙে গাঙে। ইয়া ভেকটি আর শালিয়া ধরেছে কুড়ি-কুড়ি, তেলতাপুড়ি ধরিয়্যছে, চিঙড়ি তো বাদই দাও। লায়েকের পো আজ কিনা বুলে—জাল বাইতি পারেক পরধান?

পিতু আরও লজ্জিত, সে বলে, আমি সেকথা বুলি নেই।

আরে তুমি না বুলো—বুলে তো লোকে।

আর বুলবনি পরধান—ঘাট মানি।

আচ্ছা, আচ্ছা, ব্রিজুর ঠোঁটে আবার হাসি ফুটে উঠল। এক ছিলুম সাজ তো দা-কাটা। ভাল করে সাজবেক লায়েকের পো। এক টানেই আগুন না লিবে যায়।

পিতু বলে, সাজবো কি, তুষে যে আগুন লাই!

আগুন ময়না দিবেক!

পিতু আবার উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, আবার চুরের ঝিলিক হয় তো দেখা দেবে, কিন্তু দেয় না। ঝাঁপের আড়াল থেকে নারিকেলের মালায় কাঠ-কয়লার আগুন দুখানি হাত ঠেলে দেয়। হাত দুখানির দিকে তাকিয়ে থাকে

পিতু। নিটোল হাত, ফরসা নয়, শোভাবতীর মতো ফরসা নয়, টুকুর বৌয়ের মতো আবার ছালমেটেও নয়। বেশ মাজা-মাজা কালো। ঐ হাত চেপে ধরলে বুঝি গা কাঁটা দেবে, বুঝি বুকে বিজলী চমকাবে।

হাতের দিকে তাকিয়ে লোভ হয়, কিন্তু পারে না। সে সাহস তার নেই। হাত সরে যায়, নারিকেলের মালার আঙ্গার নিয়ে এসে সে কলকেয় চাপায়, ফুঁ দেয়।

পিতু সেই থেকে রোজই বিকেলে আসার চেষ্টা করে, সকালে আসার চেষ্টা করে। মুহুরেরকে গিয়ে ধরে, মানকুশ যায়, নারায়ণপুর যায়, আবার যেন ঘোড়া-দাবড়িয়ে ফেরে। কিন্তু মাঙ্কেরাপট্টায় গেলে আর সেদিন ফিরতে পারে না। সেদিন মুহুরেরকে শাপায়, গাল দেয়।

আবার যেদিন যায় না, সেদিনও কাজে মন বসে না। চালার নীচে ঝোড়া ঝোড়া নুন এনে কাঁড়ি করে রাখে। বাহার কাণ্ডি বা কাড়ি জমে ওঠে। আসতে আসতে কত যে ঝরতি-পড়তি হয়, তা খেয়ালই থাকে না।

মুহুরের ওজন লেখে আর বলে, কিরে বাঘ, আজ যেন জুত পাচ্ছিস নে!

শরীলে জুত নেই মুহুরের মোশায়।

জুত নেই—দশমুনী লাশ—জুত নেই!

না জুত লেই! শূন্য ঝোড়া নিয়ে আবার যেন ধুঁকতে ধুঁকতে পিতু ফিরে যায়।

আবার কোনদিন বা যদি বিকেলে যেতে পায়, যদি এক ঝলক দেখা পায়, তার পরের দিন তো পিতু যেন উড়ান দিয়ে চলে। সে দশজনের কাজ একা করে। পিতুর দিন এমনি করেই কাটে, দিন কাটে মলঙ্গীদের।

খালাড়ীতে আসে জোয়ার, সেই জোয়ারের জল এ-খাদ থেকে সে-খাদে যায়, জমা হয়। তারপরে চীনা কাড়ি বা বিরাট হাঁড়িতে চাপানো হয় সেই জল। লোহার হাতা দিয়ে নেড়ে দেওয়া হয়, কোলপা দিয়ে লেগে গেলে কেঁখে নেওয়া হয়, তারপরে নুন তৈরি হয়। সেই নুন ঝোড়ায় ঝোড়ায় এনে কাঁড়ি করে রাখা হয়! আর কয়াল সেই নুন মাপে, কাঁটায় হাত দিয়ে টেপা নিমক রেখে দেয়। তারপর আসে কুলি, হোলায় যায় মাল, ঝরতি নুন পড়ে, পড়তি নুন ঝরে। ছেলেমেয়ে বৌ-ঝিরা কুড়োয়!

তারপর গোলা থেকে চালান যায় নৈকায়-নৌকায়। মানকুশ পার হয়ে, যায়, মাঙ্কেরাপট্টারে এসে থামে। নুনের শেষ চৌকি সেখানে। সেখানে নিমক মহালের দারোগা নুনের নৌকা পাস করে দেয়। নুনের নৌকা কোম্পানীর শহরের দিকে পাল তুলে চলে। আগে বাদশাহী নিমকের বহর চলত, এখন চলে কোম্পানীর বহর। দিনের পর দিন এমনি চলে। মলঙ্গীদের দিন চলে। পিতুরও দিন যায়।

তবু যেদিন মুহরের, সেরিস্তাদার, কি দেওয়ান, কি ওড়িয়া কেরানী শাহাবান্তারের ফুট-ফরমায়েস খাটতে এখানে-ওখানে যায়, সেদিন খালাড়ীতে না এসে সোজা ব্রিজুর বাড়ি ছোটে। ব্রিজুর দেখা পায়, ময়নার দেখা পায় না। শুধু লাল ডুরের আঁচলখানা ঝিলিক দিয়ে যায়। আর সেই ঝিলিকের লাল মুখে মেখেই বুঝি সে ফেরে। নইলে কি করে টের পায় টুকুর ছেনাল বৌ পাঁচি—কি করে টের পায় পাণ্ডাব বৌ শোভাবতী।

টুকুর বৌ বলে, কি গো হুমা-ভুমা, লাল অং মুখে মেখ্যে কুথে অং করে আলে?

শোভাবতী চিপটেন কাটে—নাগর, ফুলশেজে কবি শুইথিলা নাকি, তাই অং লাগুছি।

মুখে রং লাগুক না লাগুক, আগুনের আঁচের টের তো পায় পিতু। ছুটে পালায়।

কিন্তু রং যতই লাগুক, যতই আগুনের আঁচে পুড়ুক, এখনো তো পিতু তাকে চোখে তেমন করে দেখে নি। নয়না বাণ তার বুকে এসে বিঁধেছে, কিন্তু ময়না এখনো বন কী চিড়িয়া। দাঁড়ের চিড়িয়া হয়ে বসে নি।

তাই ব্রিজু পরধানের বাড়ি যায়, কখনো মুখে কামনার রং মেখে আসে, লাল ডুরের রং মেখে আসে; কখনো আবার থাউশুকটি নিমকের মতো খটখটে শুকনো বুকে ফিরে আসে। তখন বুঝি তার কালো মুখখানা ময়লা পাঙ্গার মতো হয়ে যায়, বুকখানায় করকচের মতো করকর করে। সেদিন নিজের কুঁড়ে ঘরে ঝাঁপের বাঁশ ঠেলে দিয়ে তেলচিটে মাদুরে শুয়ে পড়ে। কাশিযোড়ার মাদুর সে বড় শখ করে কিনেছিল, সে মাদুরের পাটি আতরে গেছে, ফাঁক হয়ে গেছে, লাল নক্সা মিলিয়ে তেলে কালো হয়ে গেছে। কাশিযোড়ার মাদুরের আর-এক নাম ছিল মসনদ বা মসলন্দ। এই

তেলচিটে মাদুরে রাজার মসলন্দের নামের গৌরব আর নেই। তবু এই তা
শয্যা। শোভাবতী তো ঠাট্টা করে বলে,

মসলন্দি পাতি ফুলশেজ বিথাইলে
রজা অসি সেঠারে শুইলে
রাত্র অর্ধে কন্যা সে স্বপ্নে দেখা দিলে
বোলন্তি রজন তোমা দেউ অছি কহি
তোঁহার সঙ্গেতে লীলা করিবুঁই মুহিঁ।

ছড়া, ছড়াই। ছড়ার গোরু গাছে চড়ে, প্রস্তাবের কন্যা স্বপ্নে এসে
দেখা দেয়, কিন্তু ময়না তো উড়ে আসে না। স্বপ্নে এসেও জুড়ে বসে না।
তাই পিতুকেই যেতে হয়। রাতের আড্ডায় তো যায়ই, আবার যখন-তখন
ফাঁক পেলেই যেতে হয়।

সেদিনও বারবর্দারী মুহরের-এর কাজে তাকে যেতে হয়েছিল
ভিন্‌গাঁয়ে। মুহরের কামালউদ্দীনের কবিলা থাকে সেখানে। তার বড়
জ্বর। ফল-পাকুড় দিতে পাঠিয়েছিল, হেকিমি দাওয়াইয়ের কড়ি দিয়েছিল
সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরে আসতে-আসতে চারপহর হয়েছিল বেলা
কাজে আর যেতে হয় নি। সে কামালউদ্দীনকে খবরটা দিয়ে সোজা
ধুলোপায়ে চলে এসেছিল ব্রিজুর বাড়ি।

সেই চালা ঘর, সেই দাওয়া। তেমনি তুষের মালসা; বাঁশের আড়াআড়ি
বৈঠকের উপর থেলা হুঁকো বসানো, বাঁশের চোঙে চিটেমাখা দা-কাটা
তামাক ঝুলছে এক কোণে একটা গজালে। তেমনি ছেঁড়া শপখানা পড়ে
আছে। কিন্তু শপের গদীয়ান মসন্দলী ব্রিজু পরধান নেই। এমন বড়
একটা হয় না। সুজামুঠা থেকে জলামুঠায় এসে সে এরকম কখনো দেখে
নি। ব্রিজু সবসময়েই থাকে দাওয়ায়। কখনো বা পুথি পড়ে, কখনো
বা দা দিয়ে কাঠের মুগুড়ের উপর রেখে তামাক কাটে; কখনো বা সেই
তামাক চিটেগুড় মিশিয়ে মাখে, আবার তাতে পাকা কলা, মজা কলার
ময়ান দেয়। তাই তো তার তামাক অমন মিঠা। নিধু গুড়িয়ার গুড়ের নাহান।

পিতু পরধানকে দাওয়ায় না দেখে ফিরে যাবে কিনা ভাবলে। তারপর
ভাবলে, পরধান ঘরের ভিতরে আছে। সে দাওয়ার সমুখে এসে ডাকলে:
ও পরধান-মোশা, বাড়ি আছ ?

পরধানের সাড়া নেই।

আবার হাঁক পাড়লে পিতু, ও পরধান-মোশা গো! ও-মোশা!

এবারেও সাড়া নেই। কিন্তু ভিতরে অস্ফুট শব্দ শোনা গেল। কেমন যেন খসখস শব্দ, কেমন যেন চুড়ির বোল।

পিতু একটু থেমে আবার বললে, পরধান-মোশা ঘরে লেই?

একটু খুক করে কাশির শব্দ হল, আর কিছু নয়।

পরধান মোশাকে বুলবেক, পিতু লায়েক এয়েলো—পিতু এই বলে পা বাড়ালে, ফিরতি পথের এক পা।

অমনি ঝাঁপের আগড় ঠেলে বেরিয়ে এল লাল শাড়ির ঝলক। লাল ডুরের ঝিলিক। কামালউদ্দীনের লাল বরুকে সে দেখেছে। সেও লাল ডুরে পরে, এক গলা ঘোমটা দেয়, আবার ঘোমটা তুলে কথাও কয়। লাল বিবির রং কটা নয়, মেটে। ফাকুর-ফুকুর তাকায়। গলার হাঁসুলীর চাঁদির জেল্লা দেখায়। এ মেয়ে কি তেমনি!

মেয়ে ঘোমটার ঝিলিক দিয়ে ঝাঁপের আড়াল-আবডাল থেকে বললে, পরধান ঘরে লাই।

পিতু কান পেতে শুনলে। এমন কথা বুঝি শোনে নি।

শুনেছে, শুনেছে! নমকের কাঁড়ির উপর দিয়ে যখন হাওয়া বয়ে যায়, এমনি ঝিরঝির করে নমক ঝরে। থাউশুকটি নমক ঝরে ঝরে পড়ে। আবার থাকুযামারা নমকের মতো সে স্বর মিলিয়েও যায়। যেন জলে জল হয়ে যায়।

এ স্বর লাল বরুর স্বর নয়।

ছেনাল পাঁচির স্বর নয়।

ময়ূরভঞ্জ জিলার গোলগাল শোভাবতীর স্বর নয়।

এ-স্বর একবারে নোতুন, একেবারে আনকোরা।

তঙ্কার মতো মিঠে বোল বোলে, সিক্কার মতো বোল বোলে। কান পেতে শুনতে হয়, শুনতে ভাল লাগে।

তাহলে চলি। বুলবেক, পিতু লায়েক এয়েলো!

ওমা! তা বসে যাবেক লা, পরধান তো আয়েলো বুলে।

লা, বসবেক নাই।

কেনে—বসবেক লাই—হুমাহুমা ডর বাসেক নাকি?

পিতু চুপ, মুখে রা নেই।

তাহলি মসন্দলীর বাঘ তুমি লও, তুমি মসন্দলীর চুহা।

চুহা? অবাক হয়ে বললে পিতু।

হাঁ গো, লা'যেকের পো। বাঘ না হলে তো চুহা বনে যায়।

খিলখিল হাসি ঝাঁপের আড়াল থেকে বয়ে এসেছিল, গাঙের লোনা জোয়ারের মতো। তাকে গড় দিয়ে রাখে এমন সাধ্যি তার নেই। সে সেই হাসির জোয়ারে যেন হাবুডুবু, ডুবুডুবু। ভিজে উঠেছে বুঝি তার গা, কালো চিকচিকে গায়ে জল দেখা দিয়েছে।

সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

চুহা—সেই যে ঐ যারা হিন্দি-মিন্দি কয়, তারা বুলে। পেটফুলো গণেশের পায়ের নীচে কি থাকে?

পায়ের নাচে থাকে উঁন্দুর।

উঁন্দুরই তো চুহা!

তারপরে ঝাঁপের আগড় বন্ধ হয়ে যায়। আর সাড়া-শব্দ মেলে না। পিতু পা বাড়ায়, কাঁপতে-কাঁপতে পা বাড়ায়।

এমন সময় ব্রিজু এসে দেখা দেয়।

কি গো লায়েকের পো, আজ এত সাত-তাড়াতাড়ি যে!—ব্রিজু বলে।

গেয়েলো বাবরদারী মোহরের কাছে, সেই তেঁহার কপিলার জ্বরে, ফল-পাকুড় দিয়ে আলাম। ভাবলেক, যাই পরধান-মোশার বাড়ি ঘুরে যাই। এসে দেখি, কেউ লাই।

কেউ লাই, দাঁড়ের চিড়িয়া কুথায় গেল? ব্রিজু একবার বন্ধ ঝাঁপের দিকে তাকালে, আর-একবার পিতুর দিকে।

কেউ লেই পরধান-মোশা, কেউ লেই। হাঁক পাড়লাম, কেউ বুলি বুললে না।

তাহলি চিড়িয়া ডর পেয়েছে, হমার ডাকে ডর বেসেছেক। আবার খটাশের হাসি হেসে উঠল ব্রিজু।

আমি যাই, পিতু বললে।

যাবেক কেনে, বসো, তামাকু সাজ, খাও, খাওয়াও।

না, ভাল না শরীল।

না না, মস্করা লয়, কথা আছে।

দুজনে বসল ছেঁড়া শপে। নিজের হাতে ছিলিম সেজে পিতুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ব্রিজু বললে, ধকল গেছেক লায়েকের পো, তুমিই আগে টানো!

না—আমি পরসাদ পাব!

না, না, আগে টান, একটু থির হও। বাঘের কলিজা তর্ হোক! বাঘের কলিজা অমন চিঙ্ড়ে মাছের মতো কেনে? তাতে কি মরদের চলে—মলোগীর চলে।

তবু পিতু তামাকটা ধরিয়েই দিলে ব্রিজুর হাতে। ব্রিজু খানিকক্ষণ কষে টানলে ভুড়ুক, ভুড়ুক, তারপরে বললে,

মোদের লায়েকের পোকে তো সব্বাই পেয়ার করে?

পিতু চুপচাপ মাথা নাড়লে!

ব্রিজু হুঁকোর মুখ দেবার ফুটোটার চারিদিক মুছে বললে,

হুঁ, তা জানি। মোকেও অমনি পেয়ার করত এমন যে আজা যাদুরাম, তেঁইও করতেন। এখন তো সায়েব-সুবোর কারবার। কোম্পানীর খাস ব্যাপার। তা ভাল, নেক-লজরে না পল্লে চলবে কেনে। এখন তো যুবো বয়েস, এখন তা রোজগার চাই। কত রোজগার হয় লায়েকের পো? এই যে ফুট-ফরমায়েস খাটো বেগার খাটো, এতে পয়সা সিক্কাটা বকশিশ মেলেক?

পিতু চুপচাপ।

ব্রিজু নিজেই আপন মনে বললে, তা মিলবেক লেই কেনে? তবে লবাবী-আমলী তো লেই, তখন আজা যাদুরামই ছিলেন সব। তেঁই আর ফৌজদার যেমন নমক থেকে নাফা করতেন, আবার তেমনি সব্বাইকে দান খয়রাতও করতেন। সে আমও লেই, সেই অযোধ্যাও লেই! তবু রোজগার হয় বই কি।

তা হয়. সিকেটা, কড়িটা হয়। পিতু মাথা নেড়ে বললে।

হলেই ভালাই, না হলে তো ঠিকেরও যে-দশা, আজ্ঞেবিরও সেই দশা। তা ঘর-সংসার তো করতে হবেক, জমিজমা তো লেই। এই ময়লা ফরসা নমকের করকচের ঝোড়াই বইতে হবে। উপরি না হলে চলবেক কেনে?

উপরি আর হয় কোথায়? লুন-ভাত খেতে মজুরি তো সব চলে যায়। তা আবার ঘর-সংসার! পরধান-মোশায়ের যেমন কথা! পিতু বললে।

হয়, হয়, ওতেই হয়, করেক-কম্মেক নিতে হয়। তোমার উপর মোর মন পড়েছেক, তাই বুলি—এই তো যুবো বয়েস, এখন রোজগার কর! বিয়া কর!

দুর পরধান-মোশায়—কি যে কন! মোরে কে বিয়া দিবেক?

দিবেক—দিবেক—আগড়-দেওয়া ঝাঁপের দিকে ট্যারচা চোখে তাকিয়ে বললে ব্রিজু।

আর তখনি সেখান থেকে খুক্-কাশির শব্দ শোনা গেল। কাশি চাপার কাশি—না—হাসি-চাপার কাশি!

ব্রিজু যেন এই সংকেতের অপেক্ষাই ছিল। সে বললে, এই তো মোর মেয়্যা ময়না, উতো ডাগর হল, ওর বিয়া দিতে হবেক লাই?

এবার ঝাঁপের আড়ালে খুক খুক শব্দ হল। যেন উছলে-পড়া হাসি কে কাপড় গুঁজে দাবাচ্ছে, থামাচ্ছে।

পিতু যেন কেমন হয়ে গেল। যেন সেই করকচের কিরকিরি শুরু হয়েছে বুকে। দানাগুলো ছুঁচের মতো ফুটছে। সে বললে, আজ উঠি পরধান-মোশা!

কথা তো হল নি লায়েকের পো! ব্রিজু বললে।

কাল—কাল হবেক—আরেক দিন হবেক।

এই বলে দাওয়া থেকে নেমে এক ছুটে পালিয়ে গেল পিতু লায়েক। সে যে মসন্দলীর হুমা-হুমার কেউ কে বলবে। সে যেন চুহা, সে যেন মেকুর।

ক'দিন আর ব্রিজু পরধানের আসরে যায় নি পিতু। যেতে পারে নি। শাহাবাস্তারের স্ত্রী বিলাসবতী এসেছেন বালেশ্বর থেকে। খালাড়ীর কামের পরে তাঁর নয়া সংসারের ফুট-ফরমাযেস খাটতেই সে ব্যস্ত। বিলাসবতী বড় কোপবতী। পানের থেকে চুন খসলেই তুলকালাম কাণ্ড করেন। অমন যে শাহাবাস্তার, যাঁর ভয়ে খালাড়ীর সবাই কাঁপে, যিনি কথায় কথায় বরখাস্ত করেন, তিনিও বিলাসবতীর বেসরের ঝামটার ভয়ে তটস্থ

এক-পায়ে যেন খাড়া হয়ে আছেন হুকুম-বরদার হয়ে। তাঁরই এই দশা খিদমতগারের তো হবেই। কথায় কথায় দণ্ডবৎ করতে হয়, কথায় কথায়, মণি-মা বলতে হয়। তবু পিতুর উপরে সদয়। বেগার খাটতে এলেও সে বটুয়ার পানটা-আশটা পায়। আবার হেসেও কথা বলেন। কিন্তু বড় হুঁশিয়ার হয়ে, বড় হোঁস করে কাজ করতে হয়। আর ফাঁকি দিলে চলে না। নিত্যি ঠিক-সময়ে হাজিরা চাই।

ক'দিন তাই সে আর নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পায় নি। খালাড়ীর কাম ফেলেই ছুটে গেছে। শাহাবাস্তার তো যে-সে নয়, গ্রিণ্ডলে সাহেবের পরেই তাঁর প্রতাপ। আর তাঁর ঘরনীর প্রতাপ তো তাঁর চেয়েও বেশী।

ক'দিন পরে সংসার থিতু হতে তবে তার হাঁপ ছাড়বার সময় মিলল। চারিদিকে তাকাবার ফুরসত হল।

টুকু পরধানের বৌ খবরটা দিলে, ওগো হুমা-হুমা, তোমার জন্যি যে আরিন্দে পেঠিয়েছেলেক গো!

কে আবার আরিন্দে পাঠালেক! পিতু বললে।

যে পাঠাবার লোক, সে-ই পাঠায়।

পিতু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

শোভাবতীও পিতুর সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সে বললে, তুমি জানো না! মাইচা, মেয়ার খপর না রাখলুঁ তো কেটা রাখিবুঁ?

পাঁচি রঙ্গ করে বললে, মাইচা, মাইচা! শেষে মেয়ার জন্যি পাগলা হয়ে গেলা বাঘের পো।

পিতু রেগে উঠে বললে, কি অং কর! সত্যি বল না, কে খপর পেঠিয়েছেক?

কেনে—বিলাসবতীর মহালে খপর যায় নি?

না তো!

ব্রিজু পরধান বাড়ি লেই, তার বিটি ডেকেছেক।

পিতু অমনি পা বাড়ালে।

অমনি পা বাড়ালে বাঘ! হিহি করে হেসে উঠল পাঁচি।

শোভাবতী রঙ্গ করে বললে, কি বলুছি পাঁচি, রাও না করিবে?

রা কাড়ে নি পিতু, সে ছুটে চলে এসেছিল।

সেই দাওয়া, দাওয়ায় মানুষ নেই। সেই রুদ্ধ ঝাঁপ, বন্ধ ঝাঁপ, তার আড়ালে-আবডালে কেউ আছে কিনা কে জানে!

তবু দাওয়ায় সে তরতর করে উঠে এসেছিল।

তামাক-কাটা মুগুরটা একপাশে পড়েছিল, দেখতে পায় নি। তারই উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। আর তখন মুখে একটা অস্ফুট আর্তনাদও উঠেছিল।

ওঃ মাগো!

অমনি ঝাঁপের বাঁশের আগড় খুলে গিয়েছিল। বেরিয়ে এসেছিল সে!

সে কে?

সেই ডুরে শাড়ির আঁচল। সেই লাল ঝিলিক। সেই লাল ঝলক।

আজ খেজুর-ছড়ি শাড়ি তার পরনে। লাল ঝিলিক নেই, ঝলক নেই। ঠমক নেই, ঠসক নেই। বড় পাঁচ-পাঁচি। বড় সাদাসিধে।

পিতুর তবু ভাল লাগল।

ঠমক থাকলে ডর লাগে, পরানটা শিরশিরিয়ে ওঠে। এ বরং ভাল।

দাওয়ায় বসতে বললে ব্রিজু পরধানের বেটী!

বাঘ কি বসবেক নেই, দেঁড়িয়ে থাকবেক? একখানা চ্যাটাই পেতে দিলে সে।

পিতু বসল না, দাঁড়িয়েই শুধালে, কি খপর বল!

খপর মন্দ! আরিন্দে পেঠিয়ে পেঠিয়ে তো হেদিয়ে গেলাম, বাঘের দেখা নেই।

কাম ছিল।

আমিও তো কামেই ডেকেলাম।

কি কাম? পরধান-মোশা কুথা?

তারই তো কথা। বাপের বড় জ্বার। লক্ষ্মীপুরে গিয়েলো জ্বার হইচে। এখন বাঘ যদি মন করে তো কামটি হয়।

কি—বল!

মোকে লিয়ে যেতে হবে সিথা।

সে কি হেথা, সে কত ধুর!

ধুর পাল্লায় বুঝি বাঘ যায় না, হালুম করে গিয়ে পড়ে না। সে তো

রূপনারাণের ধারে চৌকির কাছে। সিথা মোর দাদুর বাড়ি। সেথা গিয়েলো, গিয়ে জ্বারে পড়লো। মুখে জলই বা দেয় কে, কে কি করে? ঘোমটার ভিতরে ব্রিজুর মেয়ের স্বর যেন কেমন ভারি। মনে হয় সর্দি লেগেছে।

আমার কামের ফুরসত তো লেই।

তুমি ফুরসত করে লও!

তা দেবে কেনে?

শাহাবাস্তার দেবে। তুমারও কেউ নেই বাঘ, মোরও কেউ নেই। একটু বা নাক টানলে ব্রিজুর বেটী, বুঝি কাঁদছেই।

পিতুর বুকটা যেন কেমন করে উঠল। গাঙ্‌ থেকে জোয়ার এলে যেমন উথল-পাথাল করে তেমনি। সে চুপ করেই রইল।

বা কাড়ে না কেনে লায়েক? তবে কি মোকে লিয়ে যেতে ডর? একটু যেন রঙ্গে রঙ্গিলা হয়ে উঠল ব্রিজুর ছুঁড়ীটা। ডব কি? তুমি তো বাঘ আছেক, লোখ আছেক। তুমার ডর কি? আবার সেই তেমনি খুক্‌ খুক কাশি। কাশি না হাসি—কে বলবে!

পিতু আর দোমনা হল না, সে ঘাড় নেড়ে রাজী হয়ে গেল। আজ নয়, কাল যাবে।

ব্রিজুর বেটী—না—তার ভাইয়ের বেটী ঘোমটার ভিতর থেকে ফিক্‌ করে একটু হাসি ছিটিয়ে দিলে। আর সে হাসিতে ভিজে উঠল পিতুর মন। সেই ভেজা মন নিয়েই সে ফিরে এল। আর রাত কাটালে।

ভোর না হতেই শাহাবাস্তারের ঘরনী বিলাসবতীকে ধরে, শাহাবাস্তারকে ধরে ছুটি করিয়ে নিলে।

রওনা হবার সময় পাঁচির সঙ্গে দেখা।

সে বললে, দেখো গো, হুমা-হুমা, আবার হালুম করে পড়ে গরাস করে বসো নি।

পিতু বলতে গেল, গরাস করে ফেললে তো ভাল, কিন্তু বলতে পারলে না।

পাউখা ঘাটে বাঁধা। আগেই উঠে বসেছিল ব্রিজু পরধানের বেটী। পিতুও উঠে বসল।

পথে শুধু নদী আর নদী আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পরগণা। নদী আর খাল তাকে জুড়ে দিয়েছে।

সুবর্ণরেখা বেয়েই চলল পাউখা। হেলতে-দুলতে চলল।

বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি, সেখানে অদ্ভুত এক বাদামের গাছ। নাম তার কাজু বাদাম, হিজলী বাদাম। বড় বড় গাছ, রসে ভরা ফল ধরে, ফলের বাইরে থাকে আঁটি। সেই আঁটিই কাজু বাদাম। এ-বাদাম পরগণা-হিজলীতে আপনি গজায় নি। ফেরঙ্গরা কোন্ এক দেশ থেকে এনে এর বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু এখানে নয়, গোয়ায় দিয়েছে, ইসলামাবাদ-চাটিগাঁয় দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বাদাম এখানে এসে হয়েছে ইংলী নাট—হিজলী বাদাম। সেই গাছে গাছে ভরে গেছে বালিয়াড়ি। গাছে গাছে ভরে গেছে আর আছে নদীর এখানে-ওখানে নুনের খাত—খালাড়ী। আবার আশেপাশের বাগ-বাগিচাও আছে। সেখানে মৌমাছির চাক।

পিতু এ অঞ্চল দেখেছে, দেখে দেখে তার চোখ পচে গেছে। আর দেখার চোখই কি তার আছে! তাই সে গামছা পেতে পাউখার পাটাতনের উপর সটান শুয়ে পড়ে চোখ বুজে ছিল। ওদিকে ছাপ্পরের ভিতরে কি করছে ব্রিজু পরধানের বেটী?

সেদিকে পিতুর কান আছে, মন পড়ে আছে।

সেই যে মেয়ে এসে ছাপ্পরের আড়ালে ঢুকেছে, তারপরে আর টুঁ শব্দটি নেই। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, হয়তো, বাপের জ্বরের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না। হয়তো বা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছে!

পিতু কান খাড়া করে আছে, ঘুমোতে চাইলেও পারছে না। পারছে না ঐ মেয়ের কথা ভেবে, পারছে না মৌমাছির জ্বালায়। চাক থেকে ছুটে আসছে মৌমাছি, গুনগুন করে ঘুরছে। ভনভন করে মুখে বসতে চাইছে। মুখে তো আর তার মধু নেই, তবু বসবে, তবু জ্বালাবে।

হঠাৎ অস্ফুট একটি চিৎকার। তারপরেই—

মর মুখপোড়া! মুয়ে লুড়ো জ্বেলে দিবেক। এখেনে কেনে?

পিতু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

এবার ছাপ্পরের তলা থেকে ভেসে এল কান্না।

পিতু কি করবে ভেবে পেলে না।

মসন্দলীর বাঘ হলে কি হবে, তার ভারি লজ্জা। বাঘের মতো অমন চেহারায় কি করে যে অমন লজ্জা থাকে, কেউ ভেবে পায় না। টুকুর

বৌ পাঁচি না, রাম পাণ্ডার বৌ শোভাবতী না, এমন কি কোপবতী বিলাস-বতীও না। অন্যে হলে ছাপ্পরের ভিতরে গলে যেত, গিয়ে শুধাত, কি হল? তারপরে দরকার হলে সান্ত্বনাও দিত। কান্না থামত।

সাধ তার আছে বটে, মনও পোড়ে, কিন্তু তবু সাহস হয় না। এখানেও হল না।

আবার কান্না, ও হুমা-ঝুমা গো, ত্যাখনা এসে, মুখপোড়া কি করছেক!

পিতু নিজের অজান্তেই ঢুকে পড়ল ছাপ্পরের তলায়।

তারপরেই দেখা।

ঘোমটা খোলে নি ব্রিজু পরধানের মেয়ে, শুধু আধ-ঘোমটা থেকে সিকি ঘোমটায় নিয়ে এসেছে। খেজুর-ছড়ি ডুরের পাড় ঘিরে আছে মুখখানা। আর সেই মুখের চারিপাশে ঘুরছে একটা কালো মৌমাছি। মৌটুসটুসে মৌটুসী ফুলের চারিদিকে যেমন ঘোরে, যেমন বসতে চায়, তেমনি ঘুরছে, বসতে যাচ্ছে। পরধানের বেটী যত হাত নাড়ে, তত উড়ে এসে জুড়ে বসে। পিতুকে দেখেই বললে, কি জ্বালাতন করছেক গো! মড়া যায় না, যাবে না। নাকে কান্নার আড়ালে এক চিলতে হাসিও ঝরে পড়ল। ওটাকে মেরে ফেল লায়েকের পো!

পিতু এগিয়ে এসে মৌমাছিটাকে তাড়াতে গেল। মৌমাছিটা ভারি দুষ্ট। উড়ে যায় তো আবার ভনভন করে আসে। এসে পিতুর কাছেও যায় না। ঐ মৌটুসী ফুলের মতো ঠোঁটে বসতে যায়, বসেও পড়ে। আর পরধানের মেয়ে হাত নাড়ে, আবার উড়ে যায়।

দেখতে ভালই লাগে। মৌমাছির এ রঙ্গ দেখতে কার না ভাল লাগে! পিতুর কিন্তু লাগল না। সে কোত্থেকে মাল্লাদের একখানা হাতপাখা যোগাড় করে তক্কে-তক্কে বসে রইল। তারপর পরধানের বেটীর হাতের ঝটকা খেয়ে যখন মোচোর মৌমাছিটা উড়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে পাটাতন-সই করলে এক ঘায়ে।

ব্রিজুর বেটী, না ব্রিজুর ভতীজী—মরা মাছিটার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, আঃ তুমি বাঁচালেক গো!

পিতু তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। তার রা নেই। এমন রূপ তো সে দেখে নি। এ যেন হরি সাউয়ের মেয়ে রূপবতী, না, তার চেয়েও সুন্দরী!

মেয়ের হঠাৎ যেন খেয়াল হল। শিথিল ঘোমটা টেনে দিলে—আব্রুর আড়ালে মৌটুসী ফুল মিলিয়ে গেল।

ওমা—অমন করে তাকায় কেনে বাঘ, ওত পেতে আছেক নাকি! লাফ দেবেক, ঘাড়ে পড়বেক নাকি?

পিতু নিজেকে ভুলে গিয়েছিল, হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা ভাবে নি। শুধু দেখছিল।

বাঘ কি কপিশ চোখ চেয়ে অমনি করে দেখে তার শিকারকে?

না, বাঘ তো নয়, দেখে হরিণ। হরিণীর গা লেহন করার সময়ে অমনি করে তাকায়, দেখে। পিতুও দেখছিল।

হঠাৎ আব্রুর আড়াল সে-দেখা ঘুচিয়ে দিলে। সে থতমত খেয়ে গেল।

পরধানের মেয়ে বললে, যাও, হেথা কেনে? মোর লজ্জা করে!

পিতু ধীরে ধীরে ছাপ্পরের তলা থেকে বেরিয়ে এল।

ছাপ্পরের বাইরে বসে-শুয়ে দিন কেটে গেল। এর মধ্যে মাল্লারা নাস্তা করলে, তারাও চিঁড়ে-গুড় খেয়ে নিলে। আমন চিঁড়ে, সরু চিঁড়ে—বার দুয়েক নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে নিজের জন্যে কিছুটা রেখে সে ছাপ্পরের তলায় বাকিটা ঠেলে দিলে। একখানা হাত এসে নিয়ে গেল। কিন্তু আর শব্দটি নেই। সাড়াই পাওয়া গেল না সারা দিনমান।

সুবর্ণরেখা কখন ফুরিয়ে গেছে, হলদীর মুখ কখন পেরিয়ে এসেছে। এখন খাল বেয়ে চলেছে পাউখা। বালিয়াড়িও আর আঁধারে দেখা যায় না। শুধু ঝাপসা-ঝাপসা গাঁয়ের ঘাট, তারপরে আবছা-ঝাপসা গাঁ। কোথাও বা জোনাকির মতো গাছপালার ভিতরে ঝিলিক দিচ্ছে পিদিমের আলো। পাউখা চলচে আর নিবে যাচ্ছে, আবার জ্বলছে।

পাউখা চলছিল গাঙে সারি সারি, বজরা আর ভড়ও দেখা যাচ্ছিল। এখনো আবছা আঁধারে দেখা যায়। আবার ছিপ এসে হাজির হয়।

পাউখার কাছে এসে বলে—কোথাকার পাউখা?

মশাল আলোয় ঝলমল করে ওঠে চারিদিক।

এ থানাদারের ছিপ, নিমক মহালের ছিপ।

মশাল আলো ফেলে তন্ন তন্ন করে দেখে। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যায়।

কোম্পানীর নুনের ব্যবসার এ এক ছিদ্র; চোরাকারবারীরা এই ছিদ্র দিয়ে গোলা থেকে নুনের ঝোড়া পাচার করে দেয়। সেই ছিদ্র আড়াল করে রাখার জন্য নিমক মহালের দারোগা, পুলিসের দারোগাকে ঢাল হিসেবে খাড়া করে রাখতে হয়। আবার মাঝে মাঝে এপথে নৌকায় ডাকাতও পড়ে। যাত্রীর যথাসর্বস্ব লুটে-পুটে নেয়।

মাল্লারা একথা জানে, পিতুও জানে, আর পরধানের মেয়েও জানে।

সে আঁধার হতেই পিতুকে ডাকলে, ছাপ্পরের ভেতরে এসে বসো নি লায়েকের পো! মোর ডর করে। গা ছমছম করে।

পিতু ডাকতেই ছুটে গেল।

ছাপ্পরের ভিতরে পিদিম জ্বলে নি। মাল্লাদের বারণ। পিনিস, বজরায় জ্বলে বাত্তি, ঝাড়লণ্ঠনও জ্বলে। কিন্তু সালতি, ডিঙি, পাউখায় বারণ। ওতে মাল্লাদের চোখ ধেঁধে যায়। নৌকা বাইতে অসুবিধে হয়। জ্বাললেও আড়াল করে রাখতে হয়। তাই পরধানের মেয়ে আলো জ্বালে নি।

আঁধার, আবছা আঁধার। তার মধ্যে আবছা দেখা যায় মেয়েকে। পিতু এসে বসতেই, সেই আবছা মেয়ে সরে বসল। ঘোমটা মাথায় তুললে। মাথার চারদিকে ঘিরে রইল, যেন পাঁচির সিকি-ঘোমটা। একটু ফুরফুরে বাতাসেই উদলা হয়ে যাবে। কেশাবতীর কেশ দেখা দেবে, মেঘবরণ কেশ দেখা দেবে।

পিতু আর কন্যা চুপচাপ।

কন্যা হেসে বললে, মোর ডর করে। সাঁঝবাতি দিতেই ডর করে।

তাই বুঝি মোকে ডাকলে!

ডাকবেক লাই, বেটাছেলে থাকলে তো ডর থাকে না। তা আবার বাঘের মতো বেটাছেলে।

পিতু তবু চুপ করে রইল। আবছা আঁধারে, ঝাপসা চোখে দেখছে মেয়েকে। মুখ গলে গলে যাচ্ছে আঁধারে, তবু দেখছে।

পরধানের বেটী আজ মুখরা। হয়ত ভর বেসেছে বলেই মুখরা। শুধু কথা বলছে। বললে, তুমি রা কাড়ছ নি কেনে? মোকে বুঝি ভাল লাগেক নাই—লয়?

পিতু তবু চুপ, সে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

তা পাঁচির চেয়ে আমি কি খারাপ দেখতি? ঐ গালফোলা শোবাবতীর চেয়ে খারাপ?

পিতু মাথা নাড়লে।

মাথা নাড়লে তো হবেক নেই, দুটো কথা খসাও!

কি আবার বুলব!

কেনে, মোর কাছে এলে কথা ফুরিয়ে যায় নাকি?

যায়ই তো!

তাহলে বসি আছ কেনে? য়োজগার কর না কেনে! মোকে ধরে নিতি সাধ যায় না?

য়োজগার তো করি।

অমন য়োজগারের মুয়ে আগুন! ছ' গণ্ডা, ন' গণ্ডা কড়িতে মোরে পালতি পারবেক লেই! মোরে পালতি মোহর চাই।

পিতু কথা বলতে জানে না, নাগরালি শেখে নি, তবু তাকেও যেন কথা বলার ভূত পেয়ে বসেছে। বললে,

মোহর কুথা পাই?

মোহর আছে মুহুরেরেব কাছে, সেখান থে নিলেই পার।

লুঠেরা হব?

ওমা—খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়ে! রূপবতীকে লুঠ করতি এয়েলো, রূপা না হলি চলবে কেনে! তুমি চুহা না, তুমি গাধা! এই বলে একটা আদরের ঠোনা মারলে গালে।

পিতু চমকে গেল। সে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল।

ব্রিজুর বেটী দূরে সরে গিয়ে বললে, না, এখন লয়, আগে য়োজগার কর।

পিতুর মরদটা আবার কুঁকড়ে গেল। আবার চুপ করে বসে রইল! তারপর এক সময়ে উঠে এল। ব্রিজুর বেটী আর বাধা দিলে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল পিতু। দুপুর রাতে কি-একটা গোলমালে জেগে উঠল। সে উঠে বসল।

পাউখার আশেপাশে কারা যেন কথা কইছে।

মাল্লারা পাটাতনের তলা থেকে নিঃশব্দে কি যেন নামিয়ে দিচ্ছে। ঝোড়া বলেই তো মনে হয়। এত ঝোড়া ছিল পাউখার পাটাতনের তলায়!

পিতু একবার তাকিয়ে দেখলে, ছাপ্পরের নীচে কেউ আছে বলে মনে হয় না। সে এবার উঠে দাঁড়াল।

একজন মাল্লা বললে, কাম ফরসা, যাও কুথা ? ঘুম্যে থাক !

পিতু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

মাল্লা আবার হাসল, কিছু বললে না।

সত্যই কাম ফরসা। ফতে। একখানা ছিপ এসেছিল। মশাল জ্বালে নি। নিঃশব্দে ঝোড়ার পর ঝোড়া তুলে নিয়ে চলে গেল। শুধু দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল দূর থেকে। ছপ, ছপ, ছপ!

পিতুদের পাউখা আবার চলতে লাগল।

সাড়া নেই ব্রিজুর বেটীর, রা নেই মাল্লাদের মুখে।

একটা জায়গায় এসে তারা নৌকা ভেড়ালে, আর নৌকাটা একটু দুলে উঠল। কে যেন এসে উঠল নৌকায়।

পিতু অন্ধকারে ঠাহর পেলে না। লোকটা এবার ছাপ্পরের উপর দিয়ে, ছাপ্পর বেয়ে নেমে এল। চাঁদের মেটে জ্যোৎস্নায় তাকে দেখা গেল। সে ব্রিজু পরধান। পিতুর মুখে রা নেই।

কি বাঘ বুলি নেই যে ? ব্রিজু পরধান শুধালে।

তোমার না জ্বার ?

জ্বার তো ভালুকে জ্বার। হো-হো করে হেসে উঠল পরধান। সে জ্বার কবে ছাড়ি গেছেক ! মোর মেয়্যা এয়েলো তো ?

ঐ তো হোথাকে আছে।

ব্রিজু পরধান ছাপ্পরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পিতু চোরাকারবারীদের দলে ভিড়ে গেল। নিজের অজান্তেই ভিড়ে গেল। ভাগও সে পেল টাকাটা সিকেটা। ব্রিজু পরধান দলের সর্দার না

হোক, সে দলের কেউকেটা। সর্দার হয়তো ঐ পুলিসের দারোগা, নিমক মহালের দারোগা। হয় তো খালাড়ীর কুটকিনদার, কি হয় তো শাহাবান্তারই স্বয়ং। সে ওসব জানে না। সে মইয়ের নীচা ধাপ। উঁচা ধাপে কি আছে জানে না। কারা আছে জানে না। খালাড়ীর কাজ করে, আর ছুটি পেয়ে খেপের পর খেপ দেয়।

কোনদিন বা যায় গঙ্গার খাতে-খাতে কাউখালির পথে, পাউখা ভেসে ভেসে চলে। এ সেই হিজলীর নাও, যার নাম কোম্পানীর দলিল-দস্তাবেজে পার্গা। এ-এক বেঢপ নাও, ভড় নয়, ভরা নয়। নুনের নাও। সেই নাও চলে আর মাল পাচার করে। কখনো বা খেজুরী যায়, কখনো বা মাল নামিয়ে দেয় সাগরের বালুচরে। এপথের নকসা মাঝি-মাল্লাদের কণ্ঠস্থ, ঠোঁটস্থ। ফ্যানডেনব্রক এ পথে যখন এসেছিলেন, এখানে ছিল না এমন বড় রাজ্য, তিনি সাগর-নদীর কথাই বলেছিলেন। হিজলীর নাম করেন নি, এমন কি ইংলীর নাম পর্যন্ত নয়। জর্জ হিরোশ তার আগেই এসে তাঁর মানচিত্রে হিজলীর নাম করেছিলেন। আবার রেনেল সাহেবও সে নাম করেছেন। রেনেল একখানা নৌকা আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর কোম্পানীর নকসা করছেন। এই মাঝি-মাল্লারাই তাঁর নকসার খোরাক যোগাচ্ছে। এরা নকসার ধার ধারে না, ক্ষণে ক্ষণে চার্ট দেখে না। এরা 'বদর বদর' বলে নাও ছেড়ে দেয়, গাজির নামে খুলে দেয়। এরা যেন জলের জীব, ডাঙার কেউ নয়।

এদের সঙ্গে ঘোরে পিতু নায়েক। আজ যায় খেজুরী তো কাল যায় মাস্কেরপট্টা, পরশু যায় রূপনারায়ণ চৌকি, তারপরে কখনো বা মাল নিয়ে মহিষাদল থেকে ঘুরতে-ঘুরতে ক'দিনের পথ পটাশপুর।

পটাশপুর বর্গীডাকুর আস্তানা। তারা এখানে থিতু হয়ে বসেছে। এ-জায়গা পিতু নায়েকের আদি বাস। তার বাবা বর্গীর হাঙ্গামায় পালিয়ে আসে। এইটুকু সে জানে।

তখন কারা পালিয়ে এসেছিল সে কথা তার জানা নেই। বাপ নিমু নায়েক তখন নেহাত ছোট, একেবারে গুঁড়োগাড়া। তার কাছে সে শুনেছে।

সে কি কাণ্ড রে পিতে! কায়েথ বামুন পালালেক, বেনেরা পালালেক,

মোরা মুনমারা ঠিকে, মোবা কি বস্তে থাকব! মোরাও পেলিয়ে আলাম, রাণী জানকীর আচ্ছয়ে এসে ওঠলেম। তারপরে আলাম সুজামুঠায়, সেই থেকেই আছি।

পটাশপুর সেই থেকে তার চেনা, সেখানে বর্গীরা থাকে। কি যেন তাদের সব নাম। তাদের নামের সঙ্গে মিল নেই। শুধু জী আর-জী।

পিতু পটাশপুরে যায় না। কোম্পানীর রাজ্য সেখানে নেই। সে আশেপাশে যায়। সেখানে থেকে নিমকের ঝোড়া খালাস করে দেয় অপর লোকেরা। সেই বস্তা নিয়ে সে কোম্পানীর রাজ্যে এসে চোরা-কারবারীদের হাতে তুলে দেয়। নিমক মহালের দারোগা সেই মাল কোম্পানীর মালের থেকে সস্তা দামে বিক্রি করেন পাইকারের কাছে। সিন্ধি, পাঞ্জাবী শেঠেরা কিনে নেয়। ভিন মুলুকে চড়া দরে বেচে। বর্গীদের এই কারসাজি কোম্পানী টের পায়, কিন্তু উপায় তো নেই।

বর্গীদের খুব দাপট। তারা বাঙ্গালা মুলুকে এসেছিল পাহাড় ডিঙিয়ে; ঘোড়া দাবড়িয়ে। চৌথ আদায় করতে এসেছিল বাদশাহের ফরমানের জোরে। আর সেই দলে ছিলেন বীরের মতো বীর ভাস্কররাও পণ্ডিত। নবাবের কাছে চৌথ না পেয়ে তিনি বাঙ্গালা ছারেখারে দিলেন। উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুরে বেয়ে এল তাঁর বর্গীসেনার দল, তারা পশ্চিম বাংলা ছেয়ে ফেললে। নবাব আলিবর্দী তখন বাঙ্গালার মসনদে। বর্গীরা স্রোতের মতো ধেয়ে আসতেই নবাবের সৈন্তেরা তাঁদের ভয়ে পালাল।

তখন নাবাবের লস্করে পাইল হও বড়।

হেন বেলা তের হইল্যাতে ধরিলা ডেহর।

'হর হর মহাদেও' গর্জনে বাঙ্গালা কেঁপে উঠল। ভাস্কর বললেন, চৌথ চাই! চৌথাই না দিবে যবে। যুদ্ধ করিব তবে।

নবাব শেষে শঠতা করে ভাস্কর রাও পণ্ডিতকে নিজের তাঁবুতে ডেকে এনে হত্যা করলেন। বর্গীর হাঙ্গামা জুড়িয়ে গেল। কিন্তু এখনো তারা উড়িষ্যায় আছে, বাঙ্গালায় মেদিনীপুরে আছে—এই পটাশপুর পরগণায় আছে। তাদের ফৌজদার আছে, নায়েক আছে, আবার কোম্পানীর শহরে আছে তাদের উকিল। শাহজী, শাম্ভাজীরা নিজেদের এলাকায় বসে রাজনীতির দাবা-বড়ে টেপেন, আংরেজশাহী খতম করে দিতে চান। আর

মারাঠা লাবণী গেয়ে ওঠেন সাঁঝের বেলা—বাঙ্গালীকে বাঁচিয়ে তুলতে চান ঘা মেরে মেরে। লাবণীর শ্লোকে থাকে জ্বালা—

কোম্পানী-বহাদুরকা হুকুম
অব তলোয়ার ন বাঁধো বঙ্গালী
সব চুড়ীয়াঁ পহেনো আওর আউরত বনো,
রে বঙ্গালী চুড়ীয়াঁ পহেনো আওর আউরত বনো।

কবি গঙ্গারাম মোকাম মনসুদাবাদ মুখসুদাবাদে বসে বসে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' লিখেছিলেন, লড়াইয়ের ধারা-বিবরণী কাব্যে পুরে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মৈমনসিংহ-পরগণার বাঙাল কবি আর নেই, তাই মারাঠার এই খেলের কথা লেখার লোকও নেই। কেউ মাথা ঘামায় না। বরং মারাঠাদের এলাকার নিমক পেয়ে তারা খুশি। কোম্পানীর নুনের ধক বেশী থাকুক আর না থাকুক, দাম বেশী, তারা কিনতে গেলে তাদের কড়িতে কুলোয় না। তাই মারাঠাদের চালান-দেওয়া এই চোরাই মাল কেনে। আর খুশি হয়ে নুন-ভাত খায়।

পিতুও এ কাজ পেয়ে বুঝি খুশি। সে পটাশপুরের আশেপাশের এলাকায় খালে পাউখা ভিড়িয়ে বসে থাকে। সঙ্গে থাকে ডুরেশাড়ি-পরা ব্রিজুর মেয়ে। ব্রিজু পরধান তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ঘুড়ির মতো লাটাই থেকে সুতো ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। সে মেয়ে গোঁত্তা খাবে না, কাটবে না, ছিঁড়বে না, আবার নাটাইয়ের সুতো গুটোলেই যার ঘুড়ি তার ঠিকানায় আসবে। ঘুড়িই বা কেন, পিতু মনে মনে ভাবে আর হাসে। এ যেন লক্কা কবুতর। আকাশে উড়ে উড়ে পলট দেবে, উলট দেবে, আবার খোঁপে ফিরে আসবে। লক্কাই বটে, না লোটন, না ঝোটন?

ঝুঁটি তো ওর চুল, পালক তো ওর শাড়ি। ঘাড় বেঁকিয়ে যখন কথা কয়, ঠিক কবুতরের মতো দেখায়। গলার কাছে একটা জড়ুল আছে, সেটা যেন কবুতরের গলার খয়েরী দাগ, পিতুর ইচ্ছে করে, আলতোভাবে ওখানটা ছুঁয়ে দেয়। একটু বা আঙুল দিয়ে রগড়ে দেয়।

রগড়ে দিলে কি কবুতরের মতো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে মেয়ের? আঙুলে কি তা টের পাওয়া যাবে? আর সেই কাঁটা কি ওর নিজের লোমের গর্তে গর্তে কাঁটা হয়ে দেখা দেবে। সেই শীতকালের শীতকাঁটার মতো গায়ে কি উঁচু হয়ে উঠবে! কে জানে!

আর তো ত্রিজুর বেটী অজানা নয়, ক্ষেপে ক্ষেপে আলাপ ঘন হয়ে এসেছে, জান-পহচান হয়েছে। এখন আর আঁধার হলে ডর করে না মেয়ের। তবু ডাকে। বলে—

ও বাঘ, ও হুমা-হুমা!

হুমা অমনি গিয়ে ছাপ্পরের নিচে সেঁধোয়।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রঙ্গিলা মেয়ে হাসে আর বলে, রোজগার তো করছ—কবে বিয়া হবেক? পরধানকে শুধাবেক না?

পিতু বলে, পরধান তো বলে, হবেক, হবেক! তাড়া কিসের?

ওমা—পরধানের তাড়া নেই তো মোদের বসে থাকতি হবেক? মোদের তাড়া নেই?

পিতু চুপ করেই থাকে।

মেয়েটা ছেনাল পাঁটির মতো ছেনালপনা করে বলে, বাঘের অক্ত কি ঠাণ্ডা, এট্টুও টগবগিয়ে ফোটে না!

এই বলে দোল খায় তার শরীরটা, হেলে পড়ে। পিতুর কাঁধে গিয়ে প্রায় হেলে পড়ে মাথা।

পিতুর সাধ যায়, মাথাটা বুকে চেপে ধরে। কিন্তু পারে না। আবছা আঁধার হলেও মাল্লারা জুলজুল করে তাকায়। ওরা কি বলবে?

পিতুর তবু এই পাউখায় ঘোরা ভালই লাগে। যেদিন ত্রিজুর বেটী ময়না যায় না, সেদিন তার খারাপই কাটে। সবই যেন ভুয়ো মনে হয়। তার কেমন ডর-ডর করে। ছিপ এলেই বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে ওঠে।

কিন্তু ময়না থাকলে তা হয় না। নিমক মহালের ছিপ এসে মশালের আলো ফেললেও সে ডরায় না। সে বাঘ। তেমন-তেমন যদি হয়, মসন্দলীর হুমা-হুমার মতো সে বুক দিয়ে আগলে রাখবে ময়নাকে। হুমা-হুমার মতোই ফুঁসে উঠবে।

পিতুর দিন এমনি করেই কাটে।

পটাশপুরে তারা ঘন ঘন যায় না। যায় কাউখালির পথে, যায় নারাণপুরে; যায় ঘাটালে।

পটাশপুরে ঘন ঘন যেতে মানা। কোম্পানীর বাজের চোখ, সেখানে সেই বাজের চোখ নিয়ে বসে থাকে থানাদার। বসে থাকে চৌকিদার।

চোরাকারবারের তারাও শরিক, তাদের ভয় নেই। কিন্তু ভয় টহলদারী ফৌজকে। তারা কখন যে ছিপ নিয়ে এসে হাজির হবে কে জানে!

তাই ব্রিজু আজকাল পটাশপুরের পথে যেতে দেয় না। তার উঁচা ধাপ থেকে সেই হুকুমই বুঝি হয়েছে। যেতে দেয় অন্য জায়গায়। কিন্তু পিতুর ইচ্ছে করে না। সে-পথে আজকাল আর ময়না যায় না। একাই যেতে হয়। আবার ক'দিন থেকে সে-পথও বন্ধ।

ব্রিজু বলে, লারে, বড় ফৌজ টহল দিচ্ছেরে বাঘ, রোজগার গেল!—মুখ ভার করে থাকে।

ময়নারও মুখ ভার। ঘোমটা আর উঠে আসে না। চারিদিকে ঘোমটার পাড় মালার মতো ঘিরে থাকে না। কেমন যেন কুঁচকে থাকে, আঁকাবাঁকা হয়ে থাকে। পিতুকে দেখেও ঘোমটা সরায় না।

পিতু নিরিবিলি পেয়ে একদিন বললে, তু যে কথাই বুলিস নে!

কথা বুলবেক কি, কথা তো নেই, উদাস স্বরে উত্তর দিলে ময়না।

কথা নেই কি! মোদের বিয়া হবেক নেই!

বিয়ে করবেক—খাওয়াবেক কি মোকে! ময়না ঝাঁজিয়ে উঠল।

খাওয়াব খালাড়ীর কাম করে।

খালাড়ীর কামে তো ছ'গণ্ডা কড়ি, ওতে নিজেরই প্যাট চলেক না, তা পরধানের মেয়াকে খাওয়াবেক!

তাহলে কি হবে?

পীরবাবা জানেন!

পিতু আর কিছু বলে না।

খালাড়ীর কাম করে; বিলাসবতীর ফাই-ফরমায়েস খাটে। আবার সাঁঝবাতি দিতেই ব্রিজু পরধানের আসরেও যায়।

পরধানের বেটী ময়না বেরোয় না, খুক খুক কাশে না। তবু কান পেতে থাকে। কাটে দিন।

সেদিন চাটিতে টুকু পরধান জ্বাল দিচ্ছিল নুন, আর সে কাঠ পুরে পুরে দিচ্ছিল চুলিতে। এমন সময় লাঠি ভর দিয়ে ব্রিজু এসে হাজির।

কি গো পরধান-মোশা, পিতু বললে, কি মনে করে?

আসতে লেই নাকি? পরধান বললে। মোরা বুড়ো-হাবড়া হলাম গিয়ে মুনমারার কামে—আর এখন খালাড়ীতে আলেই তো-বেটাদের চোখ চড়ক গাছ হবে কেনে?

পিতু বললে, এতো মোদের বরাত মানি! তবু হাথীর পা পড়লেক।

হাথী না হাথী, খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল ব্রিজু, হাথী এখন মোশা—মোশা!

চালানি কারবার চলছে কেমন? ব্রিজু শুধায়।

ভালাই আর নেই রে, নেই! সব বরবাদ হয়ে গেল। ইদিকে মেয়াটার বাপের অসুখ, লিয়ে যেতে হবেক। আমি তো বাপ লই—বাপ আমার ভাই। কে যায়, তাই লায়েকের পোর কাছে আলাম।

তা, মোরাও তো চরণদার হতে পারি তোমার বিটির। টুকু হেসে বললে।

ব্রিজুও হাসলে, বললে, একশোৎবার পারিস। তা তোরা সংসারি নোক। নানান ঝামেলি। তার উপর মোর বিটির তো লায়েকের পোকেই পসন্দ।

তা ওকে কার না পছন্দ বুল! মোর বৌ, রাম পাণ্ডার বুড়ী বৌ, এমন যে শাহাবাস্তেরের ধাড়ি, তেনারও পছন্দসই নোক আমাদের বাঘা।

হ্যাঁ, উকি যে সে বাঘ—ও মছন্দলীর বাঘ হুমা-হুমা, কালুরায়ের বাঘ রূপচান্দা।

তা ভাল, কবে যাবেক বাঘ? টুকু শুধালে।

আজ যাবে, আজই সনঝেয়। লায়েকের পো, তুমি ফুরসত লও!

ব্রিজু চলে গেল। পিতু ছুটল শাহাবাস্তারের কাছে।

সাঁঝবাতির পিদিম দিতে না দিতেই তারা পাউখায় উঠল। আজ লাল ডুরে পরেছে ময়না, গলায় যেখানটায় কালো জড়ুল, সেখানটায় চকমক করছে রূপোর হাঁসুলী। হাতে উঠেছে বাজু। পায়ে মল—আবার চুটকি!

বড় মাল্লা মস্করা করে বললে, কি গো পরধান-কত্তা, মেয়া আব্বার বেমারি দ্যাখতে চলল, না খসমের ঘর চলল!

ব্রিজু হেসে বললে, খসমের ঘরকে যাবে কেনে মোর মেয়া—খসম লিয়ে মোর ঘর করবেক।

ঘর-জামাই রাখবেক বুঝি! আর খসম তো মেয়ার সাথে সাথে চলবেক! হাহা করে হেসে উঠল বুড়ো মাঝি, বড় মাঝি।

ব্রিজুর মেয়ে শুধু পিতুর দিকে ঘোমটার ফাঁক চিরে একটা তীর ছুঁড়ে মারলে। তারপর ঠমকে-ঠমকে পা বাড়িয়ে নৌকায় পা দিলে।

পিতুও পেছনে পেছনে উঠে এল।

ব্রিজুও এল। এসে কানে কানে বললে,

জবর মাল আছে, মাল পাচার করতে পারেই বাদশা! হুঁশিয়ার!

পিতু মাথা নাড়লে।

ব্রিজু নেমে এল।

পাউখা খুলে দিলে। পাউখা সাঁঝের আঁধারে ভেসে চলল।

নারাণপুরে নয়, রূপনারায়ণ চৌকিতে নয়। ঘাটালে নয়। আজ অন্য দিকে ঘুরেছে নাওয়ের মুখ।

ছলছল করে জল ভাঙছে, তরতর করে এগোচ্ছে।

কোন দিকে যাও নাও?

যেদিক থেকে বর্গীরা এসেছিল।

যেদিক থেকে চৌথ আদায়ের ডাকে বাঙালীর ঘুম ভাঙাবার আজান এসেছিল।

পটাশপুর হিজলী রাজ্য, মেদিনীপুর জেলারই এক পরগণা। এটি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে। চারিদিকে কোম্পানী-বাহাদুরের এলাকা, তার মধ্যে এই পরগণাটি। এটির মালিক মারাঠারা। সেই নবাব আলিবর্দীর আমল থেকেই এ-পরগণা তাঁদের হাতে। আলিবর্দীর সিপাহ-সলার মুস্তাফা খাঁ ভাস্বরাও পণ্ডিতকে হত্যা করেছিলেন বটে, কিন্তু মারাঠাদের বাঙলা থেকে তাড়াতে পারেন নি। তাঁরা বহাল তবিয়তে সেখানে রাজ্য করছেন। আছেন ফৌজদার, আছেন কিল্লাদার। পটাশপুর আর কোম্পানীর এলাকার সীমা-সহরদ্দ মাপা-জোপা নেই। এ-গাঁয়ে যদি মারাঠাদের এলাকা হয়তো, ও-গাঁয়ে আংরেজের এলাকা। এখানে যদি 'হর হর মহাদেও' শোনা যায়, সাঁঝে মারাঠা লাবণীর কথকতা

হয় তো, ওখানে তার ধ্বনি নিষিদ্ধ। ওখানে আংরেজের গুণগানের গাওনা না হোক, আংরেজের ফৌজ, তহশিলদার, ইজারাদারদের জ্বালায় তটস্থ থাকতে হয়। কোথাও বা আবার মারাঠা আর কোম্পানীর এলাকা ছত্রিশ ভাজার মতো মিশে আছে। শুধু একটা প্রাকৃতিক সীমা আছে। সে সুবর্ণরেখা নদী। সুবর্ণরেখার পশ্চিম পাড় মারাঠাদের এলাকা। কিন্তু এখানেও গোলমাল। কোম্পানীর কিছু জায়গা পশ্চিম পাড়েও ছড়িয়ে আছে; আবার মারাঠাদের কিছু জায়গা পূর্ব পাড়েও আছে। এতে হাঙ্গামা লেগেই থাকে। আর সুবিধেও হয়েছে পাজী-বদমায়েসদের। ডাকাতদের সুবিধে হয়েছে, চোরাকারবারীদের সুবিধে হয়েছে। এখানে একটা দুষ্কর্ম করে তো ওখানে পালিয়ে গিয়ে রেহাই পায়। আবার ওখানে করে তো এখানে আসে। এখানকার ফেরারী, ওখানকার শান্তশিষ্ট বাসিন্দে, ওখানকার ফেরারী এখানকার। ফেরারী সবাই হয়ও না, নির্ভাবনায় নিজের নিজের কাজ চালায়। বামাল ধরা পড়লে দারোগার হাতে কড়িটা-সিক্কাটা গুঁজে দেয়। এমনি করেই চলে।

সুবর্ণরেখার দু পাড়ের এই হাল ব্রিজু জানে, তার উপরওয়ালারা জানে। তারা এ-কারবারের কারবারী। এখানে তারা খেপ দিয়েছে বহুবার। কিন্তু কোম্পানী একটু সজাগ হতেই হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এমনকি, পুলিসের দারোগা, নিমক মহালের দারোগারাও এখন একান্ত কর্মনিষ্ঠ। তারাও আর চোরাকারবারীদের সঙ্গে যোগসাজসে থেকে নিজেদের আচ-কানের জেব ভরাচ্ছে না। আবার কেউ কেউ বা একেবারে নোকরিতে ইস্তফা দিয়ে সুবর্ণরেখার পশ্চিম পাড়ে উধাও হয়েছে। এই যখন হাল, তখন মাল পাচার বড়ই হুজ্জুতের ব্যাপার। কিন্তু বড়-একটা দাঁওয়ের লোভে ব্রিজুকে বাধ্য হয়ে নামতে হয়েছে কাজে। এ তার উপরওলার হুকুম। না নেমে উপায় কি! আর সেই হুকুমেই দাবার পিল হয়ে চলেছে পিতু লায়েক আর ব্রিজুর বিটি।

সুবর্ণরেখা বেয়ে যাবার পথে কিছুই ঘটল না। একখানা তেলিঙ্গা সিপাহী-ভরতি ছিপও দেখা গেল না। শুধু পাউখার পর পাউখা চলেছে।

ব্রিজুর বিটি তবু ভয়ে চুপ, পিতু চুপচাপ। মাল্লা-মাঝিও তাই।

কিন্তু নির্বিঘ্নেই কাজ সমাধা হয়ে গেল। ওরা রইল এ-পাড়ে। ও-পাড়

থেকে মুনি-ঝোড়ায়-ঝোড়ায় মাল এসে পাউখার পাটাতনের নীচেটা ভরে উঠল। তারপর নৌকা খুলেও দেওয়া হল।

সুবর্ণরেখা বয়ে যায়, সাগরের জলে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। পাউখা ভেসে চলে। কিন্তু ছিপ নেই, তরতর করে আসে না ছিপ, এসে ঘিরে ধরে না।

পটাশপুর থেকে জলামুঠা এক-ঢিল পথ নয়। জোয়ারে এগোয় পাউখা, পালে এগোয়, আবার গুণও টানা হয়। যত দূর তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুতে হবে, মাল তুলে দিতে হবে মালিকের হাতে।

চৌকির পর চৌকি, ফাঁড়ির পর ফাঁড়ি পথে। ফাঁড়ি এগিয়ে এলেই সবাই তটস্থ হয়ে যায়, আবার পেরিয়ে গেলেই ভয় উপে যায়। তবু কারো মুখে কথাটি নেই।

মাঝি-মাল্লার মুখে না ; তারা শুধু অস্ফুটস্বরে বলে—বদর-বদর !

পাঁচ উয়াক্ত নিঃশব্দে নামাজ পড়ে। 'লায় লাহা ইল্লাল্লা' এ আজান শোনা যায় না। হয়তো মনে পাপ আছে বলেই উচ্চারণ করতে গিয়ে বেধে যায়। গোনাহ্-র ভয়ে সে স্বর মক্কা-শরীফে মুসলিম জাহানের ঐকতানের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে না। গোনাহ্-র জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে ভারি হয়ে। তাই পারে না।

পিতুও তার ছত্রিশ কোটি দেবতাদের ডাকতে যায়, পারে না। আর ব্রিজুর বেটী ডাকে কি না কে জানে। সে সেই যে পাটাতন নিয়েছে, উঠেও বসে না। আঁধার হতে ডর পেয়ে ডাকেও না পিতুকে।

পটাশপুর থেকে এমনি করে জলামুঠায় পাড়ি দিয়েছে পাউখা। চলেছে তো চলেছেই। বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে, চৌকির পর চৌকি পেরুচ্ছে আর চলেছে। আর বেশি বাকি নেই। রাত দুপ্রহরের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। এখনো তালগাছের আড়াই হাত, তেলতেলে আড়াই হাত। এইটুকু পেরুতে পারলেই মাল পাচার হবে। যে যার বখরা নিয়ে ঘরে ফিরবে। তাই জোরে পড়ছে দাঁড়। গুমোট হাওয়াও বুঝি কেটে গেছে। মাঝিমাল্লারা দাঁড় বাইছে আর সারি গাইছে। কেউ বা ছালন চাপিয়েছে তেলতাপুরি মাছের। পেঁয়াজ-লসুন আর লঙ্কার খোশবায় ছুটছে ভুর-ভুরিয়ে। পিতুও উঠে বসেছে। আঁধার হয়ে আসতে আর বাকি নেই।

এমন সময় ডাকলে ব্রিজুর বেটী,

ও বাঘ—ও বাঘ !

ক'দিন ডাকে নি, কাছে ঘেঁষতেও দেয় নি। শীতের সাপের মতো খোলস ছেড়ে বুঝি ঘুমিয়ে ছিল। আজ বুঝি আবার উঠে বসেছে, ফণা ধরে ফোঁস-ফোঁসাচ্ছে। পিতু ডাক শুনল কান পেতে। তার শিরাগুলো এখনো টান-টান হয়ে আছে, এখনো টান শিথিল হয় নি। সে-টান শিথিল হবে মাল পাচার হলে। সে সেই দুপুর রাতে। টান শিরা আরও টান হয়ে উঠল ডাক শুনে।

সে আর দেরি করলে না, সুড় সুড় করে গিয়ে ঢুকল ছই-ছাপ্পরের ভিতরে।

ব্রিজুর বেটী তাকে দেখে আঁচলে বুক ঢাকলে, আউলা ঘোমটা টেনে দিলে। বললে,

তবু ডাক শুনতি পেলেক, মোর ভাগ্যি মানি।

পিতু বললে, কবে না শুনেছি তোর ডাক।

কই—এ কয়দিন তো মনেই পড়েক লাই ?

তুমি ডাক নি কেনে ?

না ডাকতে বুঝি আসতে লেই !

পিতু চুপ করে রইল।

তা চালান তো লিযে আলাম, ব্রিজুর মেয়ে ময়না বললে, এবার বিয়া কবে হবেক ?

সে পরধান জানে।

ওমা—তোমার বিয়া পরধান জানবেক কি ? খিলখিল করে হেসে উঠল ময়না।

পরধান না জানে তো তার মেয়্যা জানেক !

কাছে একটু সরে এসে বসল ময়না, হেলে পড়ে আর কি গায়ে ! পিতুর শিরাগুলো গুণদড়ির মতো আরও টান-টান হয়ে উঠল। টোকা দিলে বুঝি টনটন করে বেজে উঠবে। শরীরের রক্ত ফুটছে চাটির নিমকের মতো। আর উপায় নেই।

কিন্তু গ্রাহ্য নেই মেয়ের। সে আরও সরে আসতে চায়। সে খপ করে পিতুর হাত ধরে বললে, আচ্ছা বাঘ, যদি এমন হয়, বেবাক ফাঁকি

হয়ে যায়! যদি ব্রিজু পরধানের মেয়্যা ফুসমন্তরে উড়াল দিয়ে চল্যে যায় —কি হবে?

পিতু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, গ্যাখ ময়না, মস্কারা লয়। ওসব বুলবি নে!

বুলব নি কেনে? আমি যদি ফাঁকি হই!

তোর ফাঁকি টের পাইয়ে দেব! পিতু গর্জে উঠল। পিতুর চোখ বুঝি আবছা আঁধারে জ্বলে উঠল। সেই চোখ দেখে সরে এল ব্রিজুর বেটী ময়না।

দুজনেই চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পরে পিতু বললে, মোকে ঘাঁটাস নি ময়না। ময়নার ঘাড় ভাঙি দেবেক। পরধান বিয়া না দেয়, জোর করি ছিন্যে লিব!

ময়না বললে, ছিন্যে লিবে—মোকে! এত তাকদ!

হাঁ, তাকদ কিনা দেখবি!

এই বলে পিতু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল।

লায়েকের সাহস যে ভারি! দূরে সরে গিয়ে বলে উঠল ময়না, পরধান আস্ত রাখবেক নি।

পরধান তোকে আমাকে দেছে!

দেছে—ফাঁকি দেছে! তোমাকে ফাঁকি দেছে!

ফাঁকি দিলেই হল!

পিতু গর্জে উঠল বাঘের মতো। সে ধরতে গেল ময়নাকে।

ময়না গলুইয়ের দিকে গুঁড়ি মেরে পালাতে গেল। পিতু তাকে টেনে আনতে যাবে, এমন সময় বুড়ো মাঝি বলে উঠল, ও লায়েকের পো! জলদি জলদি! ছিপ আসছেক!

পিতু তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এল।

কালো রাত, কালি গোলা জল, আর সেই জলের বুকে জাগছে আলোড়ন। দূর থেকে একখানা ছিপ ভেসে আসছে, তীরের বেগে ছুটে আসছে। তার মশালের আলোয় আঁধার ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গেছে।

এগিয়ে আসছে ছিপ, ওরা তাকিয়ে রইল, দাঁড়ি দাঁড়ে হাত দিয়ে বসে রইল। বৈঠে হাতে বসে রইল মাঝি। পিতু দাঁড়িয়ে রইল। ময়নাও ছাপ্পরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ছিপ এগিয়ে আসছে, তরতর করে জল কেটে এগিয়ে আসছে। ডাকাতের ছিপ হতে পারে, লুটেরার ছিপ হতে পারে, আবার কোম্পানীর ছিপও হতে পারে। উপায় তো নেই, চুপ করে থাকতে হবে। বসে দেখতে হবে।

ছিপ এগিয়ে এল, এসে নৌকার পাশে ভিড়ল।

চারিদিকে মশালের আলোয় ঝলমল।

কে যেন ছিপের ভিতর থেকে বললে—কার পাউখা ?

আজ্ঞা যাদুরামের পাউখা, বুড়ো মাঝি বললে।

যাবে কোথা ?

যাবে জলামুঠায়।

কি আছে ?

কিছু না, শুধু কজন মানুষ।

আমরা তল্লাস করব।

আউরত আছে, মাঝি জানালে।

থাক্ আউরত, আমরা দেখব।

মশাল নিয়ে ক'জন উঠে এল পাউখায়।

একজন দারোগা, তারপরে দুজন কুচকুচে কালো দুশমনের মতো তেলিঙ্গা সিপাই!

ময়না ছাপ্পরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ঘোমটা টেনে ছইয়ের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

দারোগা এসেই পাটাতনের উপরে এক লাথি মারলে। পাটাতন সরে গেল। আর তার নীচে বেরুল সারি সারি একমনি-দেড়মনি ঝোড়া। বাঃ খাসা তো পাউখা, খাসা তো! হেসে উঠল দারোগা!

তেলিঙ্গারা তাদের বেঁধে ফেললে। পিতু, মাঝিমাল্লারা—কেউ বাদ পড়ল না। ময়না ঝাঁপ খেতে গিয়ে ছিল গলুই থেকে, তাকে টেনে নিয়ে এল একটা তেলিঙ্গা সিপাহী। তার ঘোমটা খুলে পড়েছে, কাপড়-চোপড় প্রায় উদলা। সে ঘোমটা টেনে দিতে চাইছে।

দারোগা বলে উঠল, বাঃ খাসা আউরত! এই বলে বুকের কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেললে ফরফর করে।

এযে মালসার ভিতরে মালসা তার মধ্যে রং তামাশা! এযে ভানমতীর জাদু! এযে তাজ্জব ব্যাপার!

ময়নার উঁচু বুকের রেখা দেখা যেত ডুরের আড়াল থেকে, যৌবন যেন ছেপে উঠত, সে বুক আর নেই। দুটি নারিকেলের মালা খসে পড়ল, আর তার নিচে দুটি নুনের সুগোল পুঁটলি।

দারোগা অশ্লীল হাসি হেসে একটা অশ্লীল গাল দিলে।

তেলিঙ্গারাও কালো মুখে হলদে দাঁত মেলে হোহো করে হেসে উঠল।

দারোগা হুকুম দিলে, কাপড়া উতারো!

ডুরে শাড়ি এক হেঁচকা টানে খুলে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে পডতে লাগল নুনের পোঁটলা। পেট-কাপড থেকে পড়ল ছোটবড় পোঁটলা-পুঁটলি।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল দারোগা আর সেপাইরা। ছিপের মশালগুলির আলো এসে একসঙ্গে পড়ল ময়নার উপর।

না, ময়না নয়, নুনের আড়ং। ময়নাবালা নয়, একটা চ্যাঙড়া ছোকরা। একটা মেয়ে-ন্যাকড়া, মাইচা। ব্রিজুর বিটি নয়, বিজুর ভাইজ নয়। হয়তো ব্রিজুর ভাইপো। নামও ময়না নয়, মতি; কাপড় খসেছে, শুধু পরনে নেঙটি।

দারোগা বললে, দ্যাখ্-নেঙটির ভেতরেও আছে না কি!

নেঙটিও টান মেরে খুলে ফেললে তেলিঙ্গা।

অমনি করে হীরের লোভে বোম্বেটেরা আরব সাগরে, স্পেনের উপসাগরে—কোথায় না তল্লাস করত পুরুষের পোষাক। মেয়েদের পোষাকও তল্লাসি চলত। এমন কি তাদের অঙ্গ-তল্লাসিও বাদ যেত না। কোথায় কোন গোপন অঙ্গে পুরে রেখেছে হীরে কি মুক্তো, আঙুল দিয়ে তল্লাস করত।

এরা হীরের লোভে করছে না, মুক্তোর লোভে করছে না, এরা করছে নুনের জন্যে, চোরাই নুনের জন্য।

ওরা ওদের পাউখা পাকড়াও করে নিয়ে এল চৌকিতে। সেখানে বাঁশ দলা হল, বেত মারা হল, কাটা ঘায়ে নুন ছড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর চৌকির বাইরে গাছতলায় ফেলে রাখলে। ঐ ব্রিজুর বেটী ময়না না-ব্রিজুর ভাতিজা মতিকে তুলে দেওয়া হল তেলিঙ্গা সিপাহীদের হাতে। তারা ওকে নিয়ে যা-খুশি তা করবে। আউরত না হলেও তাদের আসে যায় না।

তারা ওকে আউরতের মতোই আঁচড়াবে, কামড়াবে, ওকে ভোগ করবে। অশ্লীল অস্বাভাবিক যৌন-লালসা পরিতৃপ্ত করবে। মতিকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু হল, সে একটি কথাও বললে না। লোফালুফি চলল, সে সাড়া দিলে না। শক্ত জান, কড়া জান তার। পিতুর জান কড়া নয়, সে এলিয়ে পড়লে, লুটিয়ে পড়ল। সে আর দেখতে পেল না।

রাত ভোর হয়ে এসেছে। সুবর্ণরেখা ছলছলিয়ে উঠছে ভোরের জোয়ারে। গাছে ডাকছে পাখী। মাঝিরা পাউখা ভিড়িয়ে জোয়ারের আশায় বসেছিল, এখন তারা খুলে দিয়েছে নাও। জোয়ারের জল এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। যেখানে বালুর রেখা ছিল সেখানটা ভিজিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে। ভোরাই হাওয়ায় নাচছে, ফুঁসছে জল, সাগরের উচ্ছ্বাসে গান গাইছে।

ভোরের হাওয়া বুঝি বিশল্যাকরণী নিয়ে এল। জ্ঞান হল পিতুর। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। হাতে পায়ে, বুকে, পিঠে জ্বালা, কাটা ঘা নুন খেয়ে আরও চিড়বিড় করছে। সে চারিদিকে তাকাল।

বুড়ো মাল্লা পড়ে আছে। আর কেউ ধারে কাছে নেই। পিতু উঠে দাঁড়াল। মাথা ভার, তবু সে চলতে লাগল।

একটা শেয়াল শুঁক শুঁক করে ঘুরছে, সে-একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মারল, শেয়ালটা পালিয়ে গেল। সে এগিয়ে এল। দেখলে, একটু দূরে বালির উপর আর-একজন পড়ে আছে। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় উঠল অস্ফুট চিৎকার।

ও-মা!

কে যেন কাত্‌রাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের কেউ হবে। সে আবার পা বাড়িয়ে দিলে।

আবার চিৎকার।

সে না এগিয়ে পারল না। এসে দেখলে সেই 'ব্রিজুর বিটি' পড়ে আছে। ন্যাংটো। উদাম। ভোরের আবছা আঁধারেও দেখা যায়। ওর মুখে বুকে আঁচড়-কামড়ের দাগ, এক চোখের ডেলা বেরিয়ে পড়েছে। সে চলেই যাবে ভেবেছিল, তবু কাছে এল। ঝুঁকে পড়ল। ময়না এক চোখ দিয়ে চেয়েও

তাকে চিনল। কাতরাতে-কাতরাতে বললে, মা মোর নারাণপুরে থাকে, তারে বুলো—তোমার বেটা নুন-ভাতের যোগাড় করতেক মারা গেল।

আর বলতে পারল না, ঠোঁট শুধু নড়ে নড়ে উঠল কয়েকবার।

পিতু সুবর্ণরেখা থেকে জল এনে দিলে, জল ঠোঁটের দুকষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

পিতু আর দাঁড়ালে না, সে চলতে লাগল। পটাশপুরের দিকেই যাবে ভেবেছিল, কিন্তু যায় নি। সে-পথে হাঙ্গামার ভয়। সে ফেরারী, তাই সে গা ঢাকা দিয়ে পথ চলেছে। ভড় দেখলে উঠেছে, পাউখা দেখলে উঠেছে, এমনি করে এসেছে এই আজব শহরে। পথে কোনদিন বা খেয়েছে, কোনদিন খায় নি! কিন্তু স্বপ্ন দেখেছে। কার স্বপ্ন, কিসের স্বপ্ন?

দেখেছে, নুন ভাত খাচ্ছে, মুঠো মুঠো নুন-ভাত। থাবা-থাবা নুন-ভাত। আর দেখেছে, নুনের খালাড়ী এখন তাদের, সমুদ্দুরের জল এখন তাদের, কেউ নেই বাধা দেয়। তারা জল বাঁধে গড় দিয়ে, জ্বাল দেয় চাটিতে, আর সেই নুন মনের সাধে খায় আর বেচে। নেই শাহাবাস্তার, নেই কুটকিনদার, নেই কেউ!

আবার 'ময়না'কেও স্বপ্নে দেখেছে। ময়না যেন লাল ডুবে পরে এসে বলে, খাও না বাঘ, যত ইচ্ছে খাও!

ঘুম ভেঙে গেছে পিতুর, স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

এখনো সে সেই স্বপ্ন দেখে, আবার কখনো বা হয়তো আজব স্বপ্ন এসে দেখা দেয়। তার মাথা-মুণ্ডু সে বোঝে না।

নুনের উপর বাঘের দল পড়েছে হালুম করে। না,তারা কালু রায়ের রূপাচান্দা নয়। মসন্দলীর হুমা-দুমা নয়। এ-বাঘের রং সাদা। যেন গোরা বাঘ। আর তেমনি লালমুখো, ঐ গ্রিণ্ডালুর মতোই লালমুখো। তারা যখন ভ্রুকুটি করে, লাল মুখ দেখায় বাঁদরের মুখের মতো। এ আবার কিষ্কিন্ধ্যের বানর নয়, একেবারে আলাদা জাত। সেই বানরেরা খালাড়ীর কাম বন্ধ করে দিলে। তারপর কোথা থেকে নিয়ে এল জাহাজ-বোঝাই করে সাদা সাদা নুন। বাজার পয়মাল করে দিলে নিমকে। আর সেই নিমক মানুষ খেতে লাগল। নুনমারাদের কাম গেল, হাহাকার উঠল।

তারপর ঘুম ভেঙে যায় পিতুর। চোখ রগড়ে উঠে পড়ে, ভাবে কোন বাঘ। এ কোন বানর?

কূল-কিনারা পায় না।

সে তো জানে না, সাগর পারে দেশের এক মানুষ, এই বানরদের নাম দিয়েছেন—ওরাংওটাং। এরা ওরাংওটাংই বটে!

সে জানে না, তবু হয়তো স্বপ্ন দেখে আবার।

কে এক বুড়ো চলেছেন লাঠি হাতে। কিন্তু মুখে কি আলো! আর তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো চলেছে তারা।

তিনি বলছেন, নুন মোদের, মোদের দিতে হবেক!

মহিষাদল পেরিয়ে, সুজামুঠা জলামুঠা হয়ে তিনি চলেছেন, তমলুক পেরিয়ে চলেছেন। নুন জ্বাল দিচ্ছেন হাণ্ডিতে আর সেই নুন বিলিয়ে দিচ্ছেন।

অবাক কাণ্ড!

বানরেরা সরে সরে যাচ্ছে, বাধা দিচ্ছে না। তিনি চলেছেন।

তারপরে আবার হয়তো স্বপ্নের সুতো খানখান হয়ে যায়।

সে পথে পথে দেখে বানর। বানরের দল, গোরা-বানরের দল। গোরা বাঘের দল।

এই শহরে এমনি করেই কাটছে তার দিন।

ওরাংওটাংদের কথা বলেন সাতসাগরের পারের লোকসভায় বসে বার্ক সাহেব, বলেন এই বেনিয়া কোম্পানীর বাঘদের কথা। সে জানে না, শোনে না, শুনলেও বুঝতে পারে না। তবু সেও দেখে বানর। সেও দেখে বাঘ।

এই বাঘদের জন্যেই সে নুনের চোরাকারবারের নীচু ধাপ। এই বাঘদের শিকার হয়েছে 'ময়না'। সে নুন-ভাত নিজে পায় নি, মাকে যোগাতে পারে নি বলেই শিকার হয়েছে। আর এরা তাকে বাঘের মতো গ্রাস করে নি, বানরের মতো আঁচড়ে-কামড়ে মেরেছে। এই বানরদের কি সে চিনতে চায়?

সে মছন্দলীর বাঘ, গোরা বাঘকে সে চেনে না।

বানর চেনে, কিন্তু ওরাংওটাং চেনে না।

তবু সে হয়তো স্বপ্ন দেখে।

৭

নীলাম্বর পানিও এসেছে এ-শহরে।

না এসে তার উপায় কি!

এ-শহরে তার সোনার বেনে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা এসে জাঁকিয়ে বসেছেন। কেউ বাগবাজারে, কেউ সোনাগাছিতে, কেউ বা চিত্রপুরে তাঁদের হাট বসিয়েছেন। এমন কি এই যে গলগাতান বা কলকাতান—এটা আংরেজরা গড়ে নি, গড়েছেন তাঁরাই। তাঁরাই আদৎ ক্যালকাটানিয়ান—আসল কলকাতাই। তবে এর মধ্যে যে দু-চার জন কুলীন-কায়েথ, দু-একজন বামুন বা এক-আধজন পাঞ্জাবী না ছিল এমন নয়। কিন্তু মোটামুটি তাঁরাই এ-শহরের পত্তন করেছেন। অবশ্য তাঁতীও তাঁদের সঙ্গে ছিল।

এ-শহর তার কাছে তাই আজব মুলুক নয়। ভিনদেশও নয়। বরং পরিচিত শহর, আপনার বন্দর। আংরেজের বন্দর তো বটেই, আংরেজের শহর তো বটেই—কিন্তু তাদেরও শহর-বন্দর, তাদেরও নয়া সপ্তগ্রাম।

সাহেবরা কুঠী বসিয়েছেন, তারাই কাঁচা মাল এনে উজাড় করে দিয়েছে। আবার পাকা মাল তাঁতের মলমল, চরকার রেশমও ঢেলে দিয়েছে। এই তো তার বাপ পীতাম্বর পানিই দিয়েছেন।

য়্যাডমিরাল ওয়াটসন সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাজ-কারবার ছিল। তিনি তাঁকে রেশমের ব্যবসায়ে নামান। সেই থেকে এই কলকাতার সঙ্গে তাদের জানা-শোনা। বাপের কাছে শুনেছে, তখন কিছুই ছিল না শহরের। শুধু টিম-টিম করত কুঠী, আর বেঢপ বাতিল কেল্লাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার বাপ সেনহাট থেকে এসেছিলেন ত্রিবেণীতে—সেই যেখানে যমুনা-গঙ্গা আর সরস্বতী এসে মিলেছে, আবার তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।—সেখানে বড়

বন্দর। বন্দরে উঠতে হলে আছে ঘাট। সে-ঘাট গড়েছিলেন নাকি উৎকলের রাজা মুকুন্দদেব। সেই ঘাটের সোপান আজও ক্ষয়ে যায় নি। সেই ঘাটে সদাগরদের ডিঙা এসে ভেড়ে, আবার সঙ্গম-স্নানেও আসে মানুষ। তার বাবা সেখানে তো ঘাটের পাশে চক-মিলানো বাড়ি তুলে ছিলেন। শুধু ত্রিবেণীতেই তিনি বসে থাকতেন না, বজরা ভাসিয়ে সরস্বতীর ধারা ধরে আসতেন ব্যাতোড়ে। বেতড্ড-চড়ক ছিল যার নাম। এখন ব্যাতোড়। এখানে আছেন জাগ্রতা দেবী বেতাইচণ্ডী, ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা দিতেন। তার পরে ঘুষুড়ি হয়ে চলে যেতেন কোম্পানীর শহরে। সেখানে কুঠীর সাহেব আংরেজ নাওয়ারার সর্দার ওয়াটসনের সঙ্গে তাঁর দোস্তি হয়ে গিছল। তাই যে মাল ওলন্দাজদের, আর্মানীদের বেচতেন না, সেই মাল এনে এখানে উজাড় করে দিতেন। ওয়াটসন সাহেবও পীতাম্বর পানির পিঠ চাপড়ে আদর করতেন। বাপের মুখেই শুনেছেন, ওয়াটসন বলতেন, টুমি হামার গোল্ডেন য়্যাস আছে!

সাহেব বোধহয় ঈশপের গল্প পড়েন নি—তাহলে বলতেন—

টুমি হামার সোনার ডিম-পাড়া সোয়ান আছে।

সত্যিই ডিম পেড়েছিলেন তাঁর বাপ পীতাম্বর পানি, ডিম পেড়েছিলেন অমুক মল্লিক, তমুক শেঠ; সোনার কুঁকড়া, কি সোনার রাজহাঁস বনে গিয়ে ছিলেন। আর সেই ডিম কুড়িয়ে নিয়ে যেতেন ওয়াটসন সাহেবেরা। তাঁরা ডিম পাড়লেন, তা দিলেন আর সেই ডিম ফুটল—সে সেই সাত সাগরের পাড়ে ইংলণ্ডে। আর ফুটল বলে ফুটল। সেই সোনার ডিম থেকে ফুটল কলকারখানা। নইলে আবিষ্কার তো আগেই হয়েছিল।

হারগ্রীভস্ সাহেব মাথা খাটিয়ে বের করেছিলেন তাঁত-কল, স্পিনিং জেন্নী। ওয়াট সাহেব সরা-চাপা হাঁড়ির ভেতরে বাষ্প ঠেলে উঠতে দেখে, বাষ্পের শক্তির কথা ভেবে-ভেবে বের করে ছিলেন স্টীম ইঞ্জিন। কিন্তু সে শুধু ভাবনা, শুধু আবিষ্কার হয়েই ছিল; কেউ তাদের কাজে নামাতে পারে নি। তাদের ফোটাতে পারে নি। এবার সোনার ডিম এল জাহাজ বোঝাই হয়ে বাঙ্গালা মুলুক থেকে। আর সেই সোনার ডিমে তা দিতেই তারা ফুটল। যারা ডিম পেড়েছিল, যারা ডিম বয়েছিল, সেই সুবর্ণগর্দভেরা কিছুই জানতে পারলে না।

এমন কি এখনো জানে না। পীতাম্বর পানি জানতে পারেন নি। ত্রিবেণীর বাড়ির এক ছাতিম গাছের তলায় তিনি দেহ রেখেছেন। তিনি ডিমের কুসুমের ভাগ না পান, ডিম পাড়তে গিয়ে যেটুকু ধান খেয়েছিলেন, তাতেই যথেষ্ট। তাতেই তালুক-মুলুক করে গেছেন। তাতেই দাপট দেখিয়েছেন। প্রজার ভিটেমাটি চাটি করেছেন।

ঐ যে পাঠানদের গাঁ পোলোগ্রাম। সেই গ্রাম তিনি কিনলেন। সবাই বললে, জোটের মহাল কিনো না পানি। ওখানে পাঠানেরা জোট পাকিয়ে আছে, জট পাকিয়ে আছে ওখানে সব। ও-গাঁ কিনলে এক পয়সা আসবে না, মাঝখান থেকে পাইক-বরকন্দাজের পেটে বহু টাকা যাবে।

কিন্তু কর্তা কি শোনেন, তিনি জেদী মানুষ। কিনেও ফেললেন।

সে-গাঁয়ে গোমস্তা ঢুকতে সাহস পায় না, নগদী পাইক সেঁধোতে পারে না। পাঠানেরা মেরে তাড়ায়।

শেষে এক বাদলা দিনে কর্তা নিজে পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে চড়াও হলেন, আর সেই ঝুপঝুপিয়ে ঝরা বৃষ্টির মধ্যে সবাই যখন কাঁথা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, গাঁয়ে আগুন জ্বলে উঠল। গ্রাম পুড়ল, বেশ কিছু জবরদস্ত পাঠান মরল, বাকিগুলো জরু নিয়ে পালাল। আর গাঁয়ের ত্রিসীমানায়ও এল না।

কর্তার জেদ ছিল খুব। পোলোগ্রামে সরষে বুনলেন ভিটেমাটি চাটি করে। সেখানকার মাটি দিয়ে ইট পোড়ালেন। সেই ইট নিয়ে ত্রিবেণীতে এসে গড়লেন নিজের মহাল। সে মহাল আজও আছে, লালরঙের ইমারত। রক্তের মতো লাল। কিছুটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে, কোথাও বা ইটের উপর বট-অশথের চারা গজিয়েছে। ত্রিবেণীতে এখনো পীতাম্বর পানির নাম মুছে যায় নি।

বুড়োরা বলেন, পীতাম্বর পানি মানুষের মতো মানুষ ছিলেন।

কেউ বলে, গোরা সাহেব কি সাধে আর পেয়ার করত, উনিই তো গোরাদের বাঁচিয়েছিলেন। তারপর ফেঁদে বসে সেই কলকাতা আক্রমণের কথা নবাব সিরাজদ্দৌলার। কলকাতার কিল্লা দখল করতে আসছেন নবাব। নবাব পথে কিল্লার আধমাইল দূরে বাজার পুড়িয়ে দিলেন। আংরেজরা ভয় পেয়ে মেয়েছেলেদের এনে কিল্লায় পুরলে। এমনকি কালা কেরেস্তানরাও

কিল্লায় এসে রইল। আর ওয়াটসন্ সাহেব, হেষ্টিংস সাহেব জাহাজ ভাসিয়ে ফলতায় গিয়ে রইলেন। সেখানে খেতে পান না আংরেজরা। সেদিন খাবার যুগিয়েছিলেন নবকেষ্ট আর এই পীতাম্বর পানি। তাঁরা তাই আরও পেয়ারের হলেন। কিন্তু পীতাম্বর পানি মোকাম বাগবাজারে, কি চিৎপুরে দৌলতখানা বাগিয়ে বসেন নি। তিনি সেনহাট থেকে ত্রিবেণীতে এসেছিলেন, সেখানেই রইলেন। সেখানেই তালুক-মুলুক কেনেন। সেখান থেকেই সাদা বেনিয়ার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে ছিলেন।

আর তা পারবেনই বা না কেন?

ত্রিবেণী থেকে কলকাতা কতটুকুই বা দূর।

কোশা ভাসলে কলকাতাই বা কি, জহাঙ্গীরনগরই কি এমন দূর পাল্লা!

সেখানেও হরওয়ক্ত যেতেন পীতাম্বর পানি। সঙ্গে নীলাম্বরও যেত। সঙ্গে মাঝি-মাল্লা তো থাকতই, আবার দূর দেশে যাবে, তাই বন্দুকও ছিল। দিশি বন্দুকই বেশি। দিশি কারিগরের গড়া লোহার নল, তাতে গুঁজে দেয় বারুদ—আর দমাদ্দম দাগে। আবার দু-একটা বিদেশী রাইফেলও যে না ছিল এমন নয়। তার কল-কব্জাই আলাদা, আলাদা তার গড়ন। তার গুলীও আলাদা। একটু বারুদের টিপ পরিয়ে দাও মুখে, তারপর টানো ঘোড়া। আর বাঘের মতো গর্জন করে উঠবে। আবার ছিল তোপ। বিষ্ণুপুরের কামারের তৈরি তোপ, ঢাকার কারিগরের লোহা-ঢালাই তোপ। কালু খাঁই তোপ, দলমাদলি তোপ।

কোশায় পদ্মা পাড়ি দিয়ে পীতাম্বর যেতেন জহাঙ্গীর নগরে, যেতেন বুড়িগঙ্গার বুকে পাড়ি দিয়ে সোনারগাঁয়ে। তারপর তিতাবাদীতে গিয়ে তাঁতীদের ঘরে ঘরে ঘুরতেন। নীলাম্বরও ঘুরত তাঁর সঙ্গে। ছেলেকে জহাঙ্গীরনগরের আর্মানীটোলার বাসাবাড়িতে রেখে যেতেন না, ব্যবসার স্থলুক-সন্ধান শেখাতে সঙ্গে নিতেন।

পীতাম্বর ঘুরে বেড়াতেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত নীলাম্বর।

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা আর মেঘনার সঙ্গমে হাজার দুয়েক বর্গমাইল জুড়ে তাঁতীদের গ্রাম। মুড়াপাড়া, সোনারগাঁ, তিতাবাদী, ডেমরা, বালিয়াপাড়া, মৈকুলী, খাগরাই—কোথায় না যেতেন তাঁরা।

কাটনি মেয়েরা কাটে চরকায় সুতো। গুনগুন করে ঘোরে চরকা,

যেন ভোমরায় গান গায়। কখনো বা সন্ধ্যার শিশিরের সঙ্গে মিল রেখে কাটে, কখনো বা পরীদের স্বপ্ন সুতোয় ধরা দেয়, কখনো বা মেঘ এসে সেখানে বাসা বাঁধে, কখনো বা জল। এমনি বোঝা যায় না। তাঁতীরা যখন বোনে, তখন বোঝা যায়।

এমন যে পাতিশা আলমগীর, তাঁর মেয়ে জেবউন্নিসাও এ কাপড় পরতেন; একদিন সাত ফেরতা দিয়ে এই কাপড় পরে দাঁড়ালেন গিয়ে পাতিশার সমুখে। পাতিশা তো 'তোবা-তোবা' করে চোখ ঢাকলেন। তারপর বলে উঠলেন,

শাহাজাদী—একি বেসরমি কাণ্ড—একি বেয়াকুফি! বেপর্দা হয়ে এসেছ কসবীর মতো!

জেবউন্নিসা বলে উঠলেন, খোদাবন্দ, আমি তো কাপড় পরেই এসেছি। এ যে জহাঙ্গীর নগরের আবরোয়ান। এতো জলের ধারা। ধারার মতোই আমার অঙ্গ ঢেকে আছে, তনু ঝেঁপে আছে।

পাতিশা চোখ খুললেন, দেখলেন, মুগ্ধ হলেন।

এ মসলিন এমনি। সাতসাগরের পাড়ের স্পিনিং-জেনী এ মসলিন তৈরি করতে পারে নি। তাইতো কুঠীয়াল সাহেব ওয়াটসন পীতাম্বর পানিকে বলেছিলেন,

গোল্ডেন সোয়ান, হামাদের মেশিন তো ইহা পারিল না। এযে ওভেন এয়ার—হাওয়াই জাদু—ইহাকে কি মেশিনে ধরা যায়!

ধরতে এখনো পারছে না ম্যানচেষ্টার, তাই মসলিন এখনো চালান যায়; আর সেই মসলিনের দাদনি দিতে এখনো কোশা করে ছোটে বেনিয়ারা; কুঠী গড়ে ঢাকায়, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তাঁতীগ্রামে—তাঁতীপাড়ায়।

এ যেন তাঁতীদের, তাঁতিনীদের এক ব্রত। সূর্য ওঠার আগেই কাটুনীরা কাটতে বসে সুতো। সূর্য ওঠার পরে ভাল সুতো হয় না। জলে ভিজিয়ে রাখে সুতো। চরকা তো থাকেই আর থাকে ডলনকাঠি। একটি ছুঁচের নিচে একটু গোল মাটির ডেলাই ডলনকাঠি। টেকো ঘুরাতে হয় ডলন-কাঠির সাহায্যে। ভোর হতেই চরকার গুনগুনানি থেমে যায়। বর্ষীয়সী কাটুনীরা আর কাটে না। কেউ বা এক প্রহর বেলা অবধি কাটে।

সুতো কাটা হতে ফেটী বা মুটী করে রাখা হয়। এবার তাঁতীরা বাঁশের

এক চরকিতে সেই সুতো জড়িয়ে টানা দেয়। টানায় যায় ভাল সুতো, বাকিটা পোড়েনের জন্যে থাকে।

টানার সুতো তিনদিন ভিজিয়ে রাখা হয় পরিষ্কার জলে, তারপর চরকিতে করে আবার শুকোতে হয়। রোদে শুকোলে আবার রাখা হয় কাঠকয়লার গুঁড়ো মেশানো জলে। তারপরে ধুয়ে ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নেয়, তারপরে তাতে মাড় মাখানো হয়। ভাতের মাড় হলে চলবে না। খৈয়ের মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে ধুপের গুঁড়ো। সেই মিহিন মাড় মাখাতে হবে। পড়েনের সুতোও অমনি করে তৈরি করে।

এবার তাঁতে চড়ে। আসে দাদনিদারেরা দাদনি দিতে। তারাও পেতেন, গেঁজের থলে খুলে বাপ পীতাম্বর কড়ি দিতেন, দাম-সিক্কা দিতেন। আর সেই মাল ওয়াটসনকে বেচে পেতেন মোহর। ওয়াটসন পেতেন কত লক্ষ স্টার্লিং কে জানে!

তাঁতীদের তখন বোলবোলাও, কাটনিরাও খারাপ নেই। এক তোলা সুতোর যা দাম পায় তাতেই চলে।

এক কাটনি-দিদি তাকে খুব ভালও বাসতেন। সে বাপের সঙ্গে তিতাবাদী গেলে খুব খাওয়াতেন-দাওয়াতেন।

মিহি সুতো কাটায় তিনি ছিলেন পটু, তাই তাঁর সুতোর চাহিদা ছিল জেলা জুড়ে। আর তাঁতী-দিদিও দুহাতে খরচ-খরচা করতেন। তখনো আর্করাইটের কল দেখা দেয় নি, কাটনিরা ভাবতে পারে নি, তাদের মিহি সুতোর কদর এমনি করে কমে যাবে। কলের সুতোয় তাঁতী বুনবে তাঁত, আর কাটনি-মেয়েরা চোখের জল ফেলবে আর ভাববে, সাগর পারের দেশের কাটনি-মেয়েরা এমন মিহিন সুতো এমন কম দামে দেয় কি করে! তাহলে তারা তাদের চেয়েও অভাগী। আর অমনি চিঠি লিখবে কাগজে ঢাকার কাটনি, নদে-শান্তিপুরের কাটনি। তারা লিখবে—'জানিতাম বিলায়তে তাবৎ লোক বড় মানুষ, বাঙ্গালী সব কাঙ্গালী। এখনে বুঝিলাম আমা হইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে। কেন না, তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সুতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানি। এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে-বাজারে বিক্রয় হইল না, একারণ এদেশে পাঠাইয়াছেন। এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না। তাহা না হইয়া কেবল

আমারদিগের সর্বনাশ হইয়াছে। সে সুতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা দুইমাসও ভাল ব্যবহার করিতে পারে না।' কিন্তু তখনো কাটনিদের এ খেদোক্তি, তাঁতীদের খেদোক্তি শোনা যায় নি। তখন মলমল-মসলিনের দর য়ুরোপে চড়া; আবার মালদহেরও রেশমেরও খুব চাহিদা।

পীতাম্বরের সঙ্গে নীলাম্বর মালদহেও যায় নি এমন নয়। সেখানে তুত গাছে পুলো পোকারা ডিম পাড়ে, আর সেই ডিম পাড়বার আগেই তারা দাদনি দিয়ে রাখত। পোকারা ডিম পাড়ত, আর সেই ডিম থেকে ফুটত পোকা। সেই পোকা তুতগাছের পাতা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত আঙারে ঘুমে। তারপরে ঘুম ভেঙে গেলে তারা বেড়ে উঠত, তিন-চার আঙুল পর্যন্ত হত। বাঁশের খোপ করে এবার ছেড়ে দিত সেখানে পোকাদের। পোকারা মুখ দিয়ে সুতো বের করে সেই সুতোয় ঢেকে দিত নিজেদের দেহ। এমনি করেই তৈরি হত গুটী। তারপরে সেই পোকা মেরে ফেলে তুত-চাষীরা গুটীগুলো জলে সিদ্ধ করে নিত। আর গুটী থেকে তৈরি হত সুতো। সেই সুতোয় তসর-গরদ। আবার রেশমের সুতোও বিক্রি হত। ওয়াটসন সাহেব কিনতেন আংরেজের হয়ে, ওলন্দাজেরা কিনত, দিনেমারেরা কিনত—কারা না কিনত!

পীতাম্বর কাপড় আর রেশম বেচে ক্রোড়পতি হয়েছিলেন, ত্রিবেণীতে চকমেলানো বাড়ি করেছিলেন। ওয়াটসন, ফতেচাঁদ-জগৎশেঠ, পাঠান-মোগল ব্যবসায়ী, ফরাসী ব্যবসায়ী, ওলন্দাজ কোম্পানী—সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবসায় ছিল। আর সেই সূত্রে কোথায় না যেতে হয়েছে বাপের সঙ্গে নীলাম্বরকে। গেছে জহাঙ্গীরনগর, গেছে ইসলামাবাদ-চট্টগ্রাম, গেছে মালদহ, গেছে মোকাম মুখসুদাবাদ, এসেছে মোকাম কলকাতায়—যাকে আংরেজরা বলে কলকাতান।

বাপ ছিলেন ব্যবসাদার, আর ব্যবসাদার বলে ব্যবসাদার। পাগড়ী আর আচকান-পরা নতুন দালাল বেনিয়ানদের টিট্ করে দিয়ে ছিলেন। তাঁর হাতের এক চিলতে রোকা পেলে যে কেউ অমন হাজার হাজার আসরফি গুণে দিত। একবার মোকাম মুখসুদাবাদের স্রফ বা পোদ্দার বুলাকিদাস অমনি এক জাল রোকা দেখে পঞ্চাশ হাজার আসরফি গুণে দেন। তারপরে জানা যায় সে রোকা পীতাম্বর পানির নয়। তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন বুলাকিদাস। সব শুনে পীতাম্বর অমনি পঞ্চাশ হাজার আসরফি পাঠিয়ে

দেন। পীতাম্বর শুধু যে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই-ই নয়। তিনি জমিদারি চালও রপ্ত করেছিলেন ভালই। সে চালে সুবে বাঙ্গালার যে কোন ছোট বড় রাজাকে মহারাজা মাত করে দিয়েছিলেন। নীলাম্বর তা প্রথম টের পেয়েছিল তার বিয়ের সম্বন্ধের সময়।

বিয়ের সম্বন্ধের জন্য ঘটক-ঘটকী পাঠানো হয়েছিল দিকবিদিকে। ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম, বণিকদের যেখানে যে পটী আছে সেখানেই। লাহা, শীল, মল্লিক, দত্ত, কোন পালটি ঘরই বাদ যায় নি। যাদের খুব দপদপা, শুধু যে তাঁদের ঘরে গুয়া-পানের নিমন্ত্রণ গিয়েছিল তা নয়। যাঁদের হীন দশা, তাঁরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। মেয়েতে মেয়েতে ভরে গিয়েছিল তাঁর বাড়ি। তাঁর বাগান-বাড়িতে মেয়েদের অভিভাবকদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রোজ সিধে যেত, আর এক-একজনের জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলেন একটি করে রসুয়ে বামুন।

তাও রসুয়ে বামুনই কি এখেনে পাওয়া যায়! রাহা খরচা দিয়ে আনতে হয়েছিল উড়িষ্যা থেকে। পালকি ছিল তাঁর অমন পঁচিশখানা। ষোলো পঁচিশে যত হয়, তার চেয়েও বেশি ছিল কাহারের দল। তারাও উড়িষ্যার লোক, তারাই যোগাড় করে এনে দিয়েছিল।

আর ঘটা করে চলেছিল কনে দেখা। মা বিনোদিনী নিজে বাগানবাড়িতে কনে দেখতে যেতেন না। আজ অমুক দত্তের, কাল তুমুক শীলের মেয়েকে পালকি করে নিয়ে আসা হত অন্দরমহলে। পালকি এসে থামত খিড়কির দুয়োরে। মেয়েকে নিয়ে দাসী নামত। তারপরে বিনোদিনীর দরবারে এনে পেশ করত। বিনোদিনী বসতেন মসলন্দে মখমলের খোলের গের্দা ঠেস দিয়ে, তাঁর পেয়ারের ঝি সুবালা বসত তাঁরই পায়ের কাছে পানের বাটা নিয়ে। পান খেতেন, রুপোর পিকদানে পিক ফেলতেন আর মেয়ে দেখতেন।

চুল খুলে দেখতেন, পিঠ ছাড়িয়ে হাঁটু অবধি চুল পড়ে কিনা খোঁপা খুলে দেখতেন। চুলে গুছি দেওয়া কিনা তাও দেখা হত। আবার হাঁটিয়ে দেখতেন। খড়ম-পা কিনা পরীক্ষা করা হত। রংটি পাকা কিনা তাও পরখ করা হত মুখ ধুইয়ে। আবার চোখ চাইতে বলা হত। বিনোদিনী দেখতেন, চোখের দৃষ্টি ট্যারচা কিনা, মেয়ে ট্যারা কিনা। লক্ষ্মী-ট্যারা হলে

ভাল, কিন্তু অলক্ষ্মী ট্যারা হলে চলবে না। মেয়ে ঢ্যাঙা হলেও বাতিল করে দিতেন। মেয়ে বেশ বেঁটে-খাটো হবে, বেঢপ হবে না। ঠিক যেন চীনে পুতুলটি। সেই তাঁর পছন্দ।

কনে দেখা হয়ে গেলে সুবালা উঠে যেত। আর তারপরেই রুপোর থালায় আসত ফুলের মতো ফুলকো লুচি। ছোট ছোট লুচি। লুচি একখানা কি দুখানা, বড়জোর তিনখানা। আর আসত থরে থরে সাজানো রুপোর ছোট ছোট বাটি, তাতে হরেকরকম তরকারী, ভাজাভুজি, ঝাল মিষ্টি। সবই নিরামিষ। আমিষের নামগন্ধ নেই। বৈষ্ণবের ঘরে ওটি হবার যো নেই।

বিনোদিনী বসে থেকে মেয়েকে খাওয়াতেন, মেয়ের সঙ্গের মা, মাসী বা পিসীকে খাওয়াতেন। তারপর মেয়েকে ডেকে বলতেন,

ইদিকে এসো তো মা! স-কে ছ-করে বলতেন।

মেয়ে গুটি গুটি কাছে আসত, এসে টিপ করে প্রণাম করত। প্রণাম করা হয়ে গেলে চিবুকখানি ধরে একটু আদর করতেন, থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে একটু চুমকুড়ি দিতেন। তারপরে একটা রেশমের থলির ফাঁস খুলে একটা আকব্বরী মোহর গুঁজে দিতেন হাতে।

মেয়ে হাত পেতে নিত, মা মাসী বা পিসির মুখ কালো হয়ে যেত। তাঁরা জানতেন, এ-বংশের এই রীতি করেছেন পীতাম্বর পানি। এ নজরানা নয়, নয় মুখ-দেখুনি—এ বাতিলানা।

দলে দলে মেয়ে এমনি বাতিল হয়ে ফিরে গিয়েছিল। সারা সমাজে হই-চই লেগে গিয়েছিল। কেউ কেউ পীতাম্বর পানির এই সামন্ত রীতিকে ভাল চোখে দেখেন নি। একটু বা চটেই গিছলেন। আবার গরীবগুরবোরাও ছিল। তারা যথালাভ ভেবে সেই মোহর নিয়ে এসে লক্ষ্মীর কৌটোয় রেখে দিয়েছিল; কেউ বা অভাবের তোড়ে পড়ে ভাঙিয়েও ছিল সেই মোহর।

শেষে অনেক মেয়ে দেখা, অনেক কনে চাখার পর নীলাম্বরের পাত্রী জুটেছিল। সাতগাঁওয়ের নীলমণি দত্তের মেয়ে ইন্দুরেখা। বংশ ভাল, আবার টাকাকড়িও অঢেল। বাপ ফেরঙ্গদের সঙ্গে মুক্তোর ব্যবসা করে পয়সা করেছেন। আরব সাগরের মুক্তো শুধু নয়, ফেরঙ্গদের দেশের সাগরের মুক্তো নিয়েও তাঁর কারবার। সেই মুক্তো কেনেন, রাজা-মহারাজা-ধনীদের

কাছে বেচেন। তা শেরপ্যাঁচে পরেন তাঁরা, আবার তাঁদের ঘরনীরা, কন্যারা গলায় দোলান। সেই মুক্তো বেচেই অঢেল টাকা। মুক্তোর জহুরীও তিনি কম নন। মোকাম মুখসুদাবাদের নবাব, কি কোন শেঠ, কি কোন ধনী জমিদারেরর মুক্তো কেনার শখ হলে তাঁকেই ডাকেন! একবার অযোধ্যার নওয়াবের কাছ থেকেও ডাক এসেছিল, আর একবার এমন যে দিল্লীর পাতিশা, তিনিও ডেকেছিলেন। এ হেন নীলমণি দত্ত একপুরুষে বড়মানুষ পীতাম্বর পানির বৈবাহিক হবেন, একথা কেউ ভাবে নি। মোকাম মুখসুদাবাদেই তাঁর প্রধান কুঠি। কাশিমবাজারে তিনি এক দৌলতখানাও গড়েছেন। সেখানে স্ত্রীপুত্র-কন্যা নিয়ে থাকেন। সাতগাঁও নামে বাড়ি, কাদের বাড়ি এইখানে। সেখানে পুরানো বাড়িতে বট-অশত্থ গজিয়েছে; কিন্তু এখানে সবই নয়া। ইট বা পাথরে কোথাও এতটুকু কলঙ্কের দাগ নেই। পীতাম্বরের কাশীমবাজারের আংরেজের কুঠিতে হামেসা যাতায়াত ছিল, ছেলে নীলাম্বরও তাঁর সঙ্গী হত। সেই সূত্রে দেখেছেন, আলাপ করেছেন; আবার একই সমাজ বলে বাড়িতে এনেও আপ্যায়ন করেছেন। নীলাম্বর ফুটফুটে ছেলে, বুদ্ধিমানও বটে—তাই ভালও লেগেছে। কিন্তু কোনদিন ইন্দুরেখার সঙ্গে মানাবে—একথা মনেও আসে নি। আর ইন্দুরেখা তখন ছোট—খুবই ছোট। কিন্তু নীলাম্বরের কনে দেখা নিয়ে সমাজে তোলপাড় উঠতেই তাঁর হুঁশ হল। হুঁশ হত না, গৃহিণীই করালেন। কন্যার তখন গৌরীদানের বয়েস প্রায় পার হয়-হয়। স্ত্রী হুঁশ করিয়ে দিলেন। নীলাম্বর পাত্র যোগ্য, পরম সুন্দর যুবা, বৈষয়িক-বুদ্ধি অর্জন করেছে, আবার লেখাপড়ায়ও ভাল, বাদ্যযন্ত্রেও সুনিপুণ। কিন্তু ইতস্তত করলেন নীলমণি। মেয়েকে পীতাম্বরের বাড়িতে নিয়ে দেখাতে তার মানে লাগে, মানহানি হয়।

স্ত্রী রাধিকাসুন্দরী যাও রাজি ছিলেন, কিন্তু নীলমণি একেবারে বেঁকে বসলেন। শুধু বললেন, মেয়ে আইবুড়ো থাকে সেও ভাল, কিন্তু আমার মেয়েকে পানির বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাব, আর পানির মাগ কিনা মোহর হাতে গুঁজে বাতিলানা দেবে! না—হবে না!

কিন্তু রাধিকাসুন্দরী মোটা কোমরে আঁচল জড়িয়ে বললেন, হতেই হবে—ঐ নীলাম্বরকেই পাত্র চাই!

ক'দিন গুজগুজ ফুসফুস চলল। শেষে কাশীমবাজারে পীতাম্বরের কুঠিতে রোকা নিয়ে গেল এক পাইক। শেঠ আমিরচাঁদের এক চাচাতো ভাই এসেছেন মোকাম অমৃতসর থেকে। তিনি নীলমণির হীরে-জহরতের বড় খদ্দের। তিনি তসর-গরদ, রেশম মলমলও কিনতে চান। পীতাম্বর যদি আসেন তো কথা হতে পারে।

পীতাম্বর নিজে তখন কুঠিতে নেই, তিনি গিছলেন কোম্পানীর শহরে। তাই নীলাম্বরকেই আসতে হল।

নীলাম্বর আসতে মহা সমারোহে তাকে খাওয়ালেন নীলমণি, রাধিকাসুন্দরী তাকে নিজ হাতে পাখা করলেন। আর এই সুযোগে ইন্দুরেখাকেও দেখিয়ে দিলেন। ইন্দুরেখা এখনো বালিকা, কিন্তু দুধে-আলতা তার রং। নাকটা তেমন কানাইবাঁশী কলার মতো না হলেও ভুটানি-বোঁচা নয়। বেশ ফুটফুটে মেয়ে। আধো-আধো কথা কয়। আবার চটপটেও আছে।

সে নীলাম্বরকে পেয়ে বসল। বলে, আমাল বল হবে?

নীলাম্বর হেসে তাকে কাছে টেনে আনলে, বললে, হব! কিন্তু আমাকে রেঁধে খাওয়াতে পারবে কনে?

খুব পালি! এই বলে ইন্দুরেখা কেষ্টনগরের কুমোরের গড়া একরাশ হাঁড়িকুড়ি নিয়ে এল। আবার ছোট্ট রুপোর হাতা, বাউলিও ছিল।

পাকা মেয়ে, পাকা গৃহিণীর মতো পাতা কুটে রান্না চড়ালে, রাঁধলে, পীতাম্বরকে আসন পেড়ে খেতে বসিয়ে দিলে। বললে, খাও বল!

নীলাম্বর সেই পাতা নিয়ে হাসতে-হাসতে মুখেই পুরে দিলে।

ইন্দুরেখা অমনি ধমক দিলে, তুমি কিছু জানো না বল! ওগুলো খায় না।

আমি সত্যিই খাব! নীলাম্বর হাসল।

চোখ বড় বড় করে তাকালে ইন্দুরেখা—ওমা—লাক্ষস নাকি!

হাঁ গো, আমি রাক্ষস! তোমাকে এবার টুপ করে গালে পুরে দেব!

ইন্দুরেখার পাকামি ভেসে গেল, সে ছুটে পালাল। ওমা—মাগো, লাক্ষস!

নীলাম্বর নীলমণি দত্তের ওখান থেকে কাজ সেরে ফিরল। মলমলের বিরাট এক ফরমায়েস বাদশার, অযোধ্যার নবাবের। সেগুলি তাদের কুঠিই পেল। পীতাম্বর ফিরে এসে শুনে খুশি হলেন। নীলাম্বর মা-বিনোদিনীর কাছেও ইন্দুরেখার কথা বলে নি। বলবেই বা কি, শিশু নিয়ে ভোলার

বয়েস তো তার নয়। শিশু নিয়ে পুতুল খেলার বয়েস তার নেই।
শিশুর পুতুল হবারও শখ নেই।

সে সারা বাঙ্গালা মুলুক ঘুরেছে এই বয়সে। কাটনি-তরুণীদের দেখেছে, পুলোদের মেয়েদের দেখেছে। তাদের ভেতরেও দেখেছে অপরূপা মেয়ে। আবার মোকাম জহাঙ্গীর নগর-মুখসুদাবাদ-কাশীমবাজারেও কম দেখে নি। বোরকা-পরা হারেমবাসিনীদের দেখেছে, আরবী, ইরাণী মেয়েদের দেখেছে, দেখেছে পাকা আনারের মতো রং আর্মানী বিবিদের। কোম্পানীর নগরে দেখেছে আংরেজ বিবিদের ফীটনে যেতে। আবার নিজের সমাজের ডাকসাইটে সুন্দরীদেরও কম দেখে নি। তাদের কারো কারো রং তো আর্মানী বিবিদেরও হার মানায়। যেন তসবীরের মেয়ে তারা, তাদের নিয়েই তার রূপের আদর্শ গড়ে উঠেছে। এক আট বছরের শিশুকে দেখে ভাল লাগল, কিন্তু একে ভালবাসতে হবে নারী হিসেবে—একথা তার মনেও এল না। সে তাই বেমালুম ভুলে গেল।

কিন্তু ভবী তো ভোলবার নয়। এক্ষেত্রে ভবী হলেন নীলমণি দত্ত ও দত্তজায়া রাধিকাসুন্দরী।

তাঁরা পীতাম্বর পানিকে ধরে বসলেন। নীলাম্বরকে গৌরীদান করে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করবেন। পীতাম্বর পানি অনেক ভাবলেন। সামন্ত প্রথার যে বুনিয়াদ উত্তর পুরুষের জন্য স্থাপন করেছেন, সেটি ভাঙতে হবে জেনে একটু বা ব্যথাই পেলেন। কিন্তু বেনিয়া-বুদ্ধি এসে সামন্ত প্রথাকে নস্যাৎ করে দিলে। নীলমণি দত্ত সমাজে নামী পুরুষ। তাঁর কুবেরের ধন। জগৎশেঠেদেরও নাকি অত ধন নেই। তিনি যদি রত্নসাগর হন তো তাঁরা রত্নপুকুর। আবার আংরেজ মহলেও তাঁর খুব পসার। এর বিবিকে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো উপহার দেন, ওর বিবিকে দেন নীলা। লাট-বাহাদুর ভেরেলেস্টের বিবিকে সাতনরী মুক্তোর মালা দিয়ে তো একেবারে লাট-সাহেবকে বশ করে ফেলেছেন। তাই ভাবলেন, চুলোয় যাক আমার প্রথা, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব না। যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। নীলাম্বরের বিয়ে নীলমণির মেয়ের সঙ্গেই ঠিক হয়ে গেল।

নীলাম্বরের নিজের বিয়ে। তার মন না থাকুক, বিয়ের ধুম তো মনে আছে।

আরবী কিস্‌সার মাফিক নীলমণি দত্ত তৈরি করেছিলেন বিবাহমণ্ডপ। তার চারিপাশে ঘেরা বাগিচা। সে বাগিচার ফলফুলের গাছ আর ফলফুল সবই নকল। কিন্তু কে বলবে, গাছের গোলাপ গোলাপ নয়, কামরাঙ্গা, আম, আনারস সত্যিকারের নয়। সেই বাগিচায় সন্ধ্যে হতেই গেলাসী ঝাড়ে মোম জ্বলে উঠে আকাশের পূর্ণিমার রোশনাইকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। আর বিয়ের পর একমাস ধরে চলেছিল তয়ফাউলীর নাচের আসর, কালোয়াতি গানের আসর। আবার ভাঁড়দের সং। শহরের যাবতীয় সাহেবান, আলীশানেরা এসেছিলেন; সাহেবলোক, বিবিলোক, বাবালোকের ভিড় লেগে গিয়েছিল। বরের মিছিলের সঙ্গে ছিল পালকি, ঘোড়া, আর চল্লিশটি হাতি। তাদেরই হাওদায় বসে দুলতে দুলতে চলেছিলেন বরযাত্রীরা। এই হাতিগুলি ইসলামাবাদের রাজার সম্পত্তি। কোম্পানী ইসলামাবাদ দখল করে সেগুলি পান। বেনিয়া কোম্পানী এগুলি নিয়ে বিপদেই পড়েছিলেন। এগুলোর খদ্দের মেলে না, চট করে জোব্বার জেব এগুলো ভাঙিয়ে ভরতি করা চলে না। তাই ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও এমন রইস আদমী কেউ নেই যে, চল্লিশটা হাতি খরিদ করবেন। কোম্পানীর মাল মজুদ, অথচ বিক্রি করা যাচ্ছে না। হাতিগুলির খোরাক দিতে হচ্ছে, সেও হাতির খোরাক তো বটেই। কোম্পানী মহাফাঁপরে পড়লেন। শেষে কলকাতার কর্তাদের মনে উদয় হল, এগুলো নিশ্চয়ই বাদশাকে উপহার দেবার জন্য ইসলামাবাদের রাজা রেখেছিলেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল, ইসলামাবাদের রাজা এগুলো নিজের খরচায় মুখসুদাবাদে পাঠাবেন, সেখান থেকে আবার নবাব বাদশাকে সেগুলি নজরানা দেবেন। সেই হাতিগুলি তখন নবাবের পিলখানায় ছিল, ভেরেলেস্ট সাহেবকে ধরে নীলমণি দত্ত সেগুলি বিবাহের মিছিলে নামিয়েছিলেন।

হাতি চলেছিল গজেন্দ্রগমনে, ঘোড়া চলেছিল কদম চালে, পালকি চলেছিল আর ফিটন। সোনা আর রূপার সোঁটা-আসা হাতে সোটাবরদার, আসাবরদারেরা চলেছিল। আর বাজছিল নহবতে নহবতে সানাই, আরও কত কি বাদ্যযন্ত্র। পথের দুধারে আতশের নানা কারখানা। যেখানে সেখানে আগুন ধরিয়ে ছোঁড়া হচ্ছিল আতশবাজী। নানা রঙের আভায় ঝলসে উঠছিল মিছিল। পথের দুধারে বাড়ির ছাদে, গাছের উপরে উঠে দেখছিল

তামাশগির মর্দআদমী আর আওরতেরা। ভোজও দিয়েছিলেন নীলাম্বর। নিমন্ত্রিত অতিথি তো ছিলেনই, আবার অ-নিমন্ত্রিত রবাহুতের সংখ্যাও কম ছিল না। তারা খেয়েছিল, আবার পিতলের ঘড়া, শাড়ী, চেলী নিয়ে দুহাতে আশীর্বাদ করতে-করতে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু সুবর্ণবণিক সমাজের লোকেরা খান নি, তাঁরা শুঁকেছিলেন। খেতে এসে শোঁকাই তাঁদের রীতি। কবজি-ডুবিয়ে খাওয়া, এমন কি আঙুলে করে ছোঁয়াও তাঁদের বারণ। ওতে বনেদিয়ানা থাকে না। চাল চুলোয় গিয়ে সেঁধোয়।

তাঁরা এলেন, পাতে বসলেন। রুপোর থালায় কি দেওয়া হয়েছে দেখলেন, রুপোর বাটিতে থরে থরে কি সাজানো হয়েছে একবার উঁকি মারলেন। তারপর উঠে এলেন। এসে সোনার পরাতে তবক-মোড়া পানের রুপোর লবঙ্গটি খসিয়ে রেখে পানটি মুখে দিয়ে চলে এলেন। নীলাম্বরের কাছে এ-রীতি অচেনা নয়। তাদের সমাজে এটা চালু। তারা অমনি শুঁকে উঁকিঝুঁকি মেরে উঠে এসে বলে, হ্যাঁ, খাইয়েছে বটে অমুকের বাড়িতে!

আর তাঁদের ঐ দেখা-খাবার উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। সেগুলি কাঙালিকেও দেওয়া হয় না। সেগুলি দরিয়ামে ডালো!

নীলাম্বরের বিয়েতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নীলমণি দত্ত কত ব্যয় করতে পারেন, কত অপচয় করতে পারেন, তারই বহর দেখিয়েছিলেন। আর সে বহর দেখে তাক লেগে গিয়েছিল সুবর্ণবণিক সমাজের, কায়েথ-সমাজের, তিলী-সমাজের। নকুধর এমন খাওয়াতে পারেন নি। পারেন নি নয়ানচাঁদ মল্লিক, পারেন নি গঙ্গাজল-বেচা বোষ্টমচরণ শেঠেরা; এমন কি পারেন নি ঘোষ-বসু মিত্রজারা। আর আতশবাজীর রঙের কিল্লাই কি এমন কেউ পোড়াতে পেরেছেন! তাও না। নীলমণি দত্ত সবার উপরে টেক্কা দিয়েছিলেন! তার মুরুব্বী ভেরেলেস্ট সাহেব নাকি তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, ব্লু জুয়েল, টুমি টো ফেয়ারীল্যাণ্ড—হোরীস্টান বানাইয়াছ! টোমার সাঠে পাল্লা ডিটে কেহ পারিবে না। নো ওয়ান। নান্!

সেই বিয়ের বৌ ইন্দুরেখা।

বিয়ের জাঁকজমকে, দান-সামগ্রীতে, হীরে-মুক্তো-জহরতের ভারে তলিয়ে

গিয়েছিল ইন্দুরেখা, হারিয়ে গিয়েছিল। ষোড়শী হবার আগে তার আর খোঁজ পড়ে নি। খোঁজ করবার ফুরসত পায় নি নীলাম্বর।

বেটাছেলে উঠতি বয়েস, রোজগারের মুলুক-সন্ধান জানার কাল। বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকার সময় তো নেই। তাই 'আমাল বল' সেজে 'আমাল বৌয়ের' সঙ্গে দিন দুয়েকের খুনসুটি খেলা খেলেছিল নীলাম্বর, তারপর ভুলেই গিয়েছিল। ভোলার কারণও ছিল।

সে আর্মানী মেয়ে মরিয়ম। কাঁচা হলুদের মতো তার গায়ের রং নয়, এ রং আলতা-গোলা, সিঁদুরে মেঘের মতো। সেই মেয়েকে সে প্রাণ সঁপে দিয়েছিল।

জহাঙ্গীর নগরে তাদের বাড়ির পাশে ফাঁকা মাঠ, তার ওপাশেই আর্মানী বিবি রোজিয়োর কুঠি। বিবি রোজিয়োর স্বামী ছিলেন খোজা নিকোলাস ফেনোস। আর্মানী দেশের রাজধানী খাস এরিবান থেকে তিনি আসেন নি। তাঁর পূর্বপুরুষরা বন্দী হন ইরান মুলুকের বাদশাহের হাতে। সেখান থেকে চল্লিশ হাজার আর্মানীকে ধরে তিনি নিয়ে আসেন ইরানে। তাঁরা ইস্পাহান আর জুলফায় বসবাস করেন। তাঁরা বেনিয়া হয়ে দাঁড়ালেন। দল বেঁধে এ-দেশে ও-দেশে ব্যবসা করতে লাগলেন। খোজা নিকোলাস ব্যবসা করতেই এদেশে আসেন, আর গোলাপ জল, চুনি, শুকনো মেওয়া, আদার ব্যবসা করে ফেঁপে ওঠেন। আবার তুলো আর রেশমের চালানি ব্যবসাও করতেন। খোজা নিকোলাস জহাঙ্গীরনগরে আর্মানী গির্জার লাগাও যে গোরস্তান আছে, সেখানেই দেহ রাখেন। তাঁর সঙ্গে পীতাম্বর পানির মিতালি ছিল। এখন তাঁর বিধবা রোজিয়া বিবি আর ব্যবসা চালান না। স্বামী যা রেখে গেছেন, তাই ভেঙেই খান। ছেলেমেয়েকে খাওয়ান। তবু মিতালি আছে। পীতাম্বর পানি এখানে এলে মাঠের ও-পাড়ের বাড়িতে দুদণ্ড যান, আলাপ করেন। কিছু বা ভেটও পাঠান। আবার রোজিয়ো বিবিও পাঠান ইস্পাহানের শুকনো মেওয়া, আরও কত কি! নীলাম্বরের সেই সূত্রেই পরিচয়। সেও এখানে এলেই যায়, বিবিকে সেলাম জানায়। বিবির মেয়ে মরিয়মও আসে, কাছে বসে। চোস্ত উর্দুতে কথা বলে। ছেলেও আসে। দুদণ্ড আলাপ করে, তারপরে লাটাই-ঘুড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু বিয়ের পরে জহাঙ্গীরনগরে এসে বিবির বাড়ি গিয়ে সে প্রথম আবিষ্কার করলে মরিয়মকে।

মরিয়ম আর সে-মরিয়ম নেই। যৌবনে পদার্পণ করেছে। আর বিবি এখন তাকে খানদানী খোজা আরাতুন, কি খোজা সরহন্দ, কি খোজা পিক্রসের ঘরে বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত। আর্মানী সদাগরদের প্রায় ব্যবসাই কোম্পানীর হাতে চলে গেছে, কোম্পানীই এখন রেশম, তুলো, নিমক সব কিছুর ব্যবসায় হাত দিয়েছেন। কোম্পানীর রেসিডেণ্টেরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন সর্বত্র। তাই কত আর্মানীকে এখন মদের দোকান খুলে বসতে হয়েছে। কতজন আবার নবাবের ফৌজে নাম লিখিয়েছেন, মুসলমানী নাম নিচ্ছেন। এই তো খোজা গ্রিগরী হয়েছেন গুর্গনখাঁ, নবাব মীর কাশেম-আলীর সিপাহসালার। মুঘলদের ইন্তেকাল হয়ে এসেছে, তবু মুঘলাই চালও ধরেছেন অনেকে। আবার অনেকে এখনো আংরেজের ভজনা করছেন। খোজা পিক্রস তাঁদেরই একজন।

বিবির বাড়িতে পর্দা ছিল না, এবার পর্দানশীন হয়েছেন তিনি। নিজে বোরকা পরেন নি, মেয়েকেও এখনো ধরান নি; কিন্তু ধরাতে চাইছেন। খানদানী আর্মানী ঘরগুলো দেউলে হয়ে এসেছে এখন। মুঘলের তবু দবদবা আছে। তাই মুঘলের দিকেই তাঁর তাগ। আবার সাহেব-ভজাও শুরু হয়ে গেছে। নিজের বয়াটে ছেলেটা এতদিন বসে বসে খেত, এবার তাকে দিয়েছেন এক সাহেবের দলে ভিড়িয়ে। বিবি রোজিয়ো সংসারকে একটু গোছ-গাছ করার চেষ্টা করছেন। এমন সময় নীলাম্বর এল জহাঙ্গীরনগরে।

বিবির বাড়িতে এসে সমাদর পেলে, বিবি তার বিয়ের কথা শুধালেন, বৌয়ের কথা শুধালেন। তারপরে এল মরিয়ম।

মরিয়মকে দেখে চমকে উঠল নীলাম্বর। এই কি সেই মরিয়ম! নীলাম্বর ফারসিনবীশ, উর্দুনবীশ, আবার আংরেজীও কম জানে না। পহেলা হুরীর কথাই ভিড় করে এল মনে, আবার ভাবলে, ও ছিল চেরাব, দেবশিশু, এখন তো এঞ্জেল—দেবী। আর বেশি কিছু ভাবতে পারলে না।

মরিয়ম হাত তুলে সালাম করে বললে, কেমন আছ? সাহেবানের তবীয়ত আচ্ছা তো।

হ্যাঁ, তুমি!

আছি ভালই।

নীলাম্বর বললে, ফিরোজা রঙের পেশোয়াজে তোমাকে তো ফিরোজা হুরী বলে মালুম লাগছে।

তাই নাকি! একটু হাসলে মরিয়ম, তারপরে আপনা থেকেই মুখ নীচু করলে।

তুমি জানো না? নীলাম্বর শুধালে।

আগুন রঙের গালে আরও যেন আগুন ধরে গেল।—চুপ করে রইল মরিয়ম।

নীলাম্বর আবার শুধালে, আরাতুনের মহালে কবে যাবে মরিয়ম?

মরিয়ম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, সে তো ভেঙে গেছে। রইস বাপ গেছেন, আমরা তো ফকির। আরাতুনের মহালে যেতে হলে এখন বাঁদী হয়ে যেতে হয়।

নীলাম্বর বললে, বাঁদী কোন দুঃখে হবে, তুমি হবে বেগম।

হ্যাঁ, আমাকে বেগম করবার জন্যে রুমের বাদশাদের চোখে তো নিদ নেই!

রুমের বাদশার চোখে নিদ না থাক, নীলম্বরের নিদ তো ফিরোজা হুরী কেড়ে নিয়েছে।

নীলাম্বর ভাবে নি, ভেবে বলে নি, নাগরের মতো ঠোঁটের ডগায় চকচকে ঝকঝকে কথা সে সাজিয়ে রাখে নি। তবু মরিয়মের রূপ তার ভিতরের নাগরকে নাড়া দিলে, সেই নাগরালিই ঝরে পড়ল। মরিয়ম একটু অবাক হয়ে গেল, সে অবাক চোখে তাকালে।

আর্মানীটোলা রূপের হাট, রঙের হাট। এ-হাট থেকে নওয়াবের সেরাই মহালে, বাদশার রঙমহালে বহু হুরীই বিকিয়ে গেছে। সরহন্দ-আরাতুন-আগা বারসাকেরা নিজেদের মেয়ে দিয়ে বাদশার ফরমান পেয়েছেন, আবার অপরের অপহৃতা মেয়ে এনেও ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলেছেন। আংরেজেরা এসে তাই তাদের সঙ্গে দোস্তি করলে। তাই খোজা সরহন্দ অমন কলকাতা শহরের বিলি-ব্যবস্থা করে দিলেন খোদ ফররুকশায়রকে ধরে। দোস্তি কিন্তু চিরদিন টিকল না। আস্তে আস্তে ব্যবসা তাদের হাত থেকে তাদেরই

অজান্তে কেড়ে নিলে আংরেজরা। এখন তাই আর্মানী পাদরিকেও মদের দোকান দিতে হয়, আর্মানী সদাগরকে করতে হয় সাহেবের নোকরি। তাদের সব কেড়ে নিয়েছে আংরেজ, কিন্তু রূপের পসরা কেড়ে নিতে পারে নি। এখন রূপা নেই, রূপ আছে। আর সেই রূপের নুরজেহান তো মরিয়ম। সেই তো জগৎ আলো, জগৎ জ্যোতিঃ। ছোঁড়ারা মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে-ওড়াতে বলে,

খোদার কসম, হুরীকা মাফিক খপসুরৎ।

শুনে গালে একটু আঁচ লাগে লজ্জার, শুধু ঐ টুকুই। কিন্তু রূপের প্রশংসা শুনে অবাক হয় না। আজ অবাক হল মরিয়ম। তাই বললে, আমার মতো হুরী তুমি দেখ নি? তোমার মহালে তো বিবি আছে।

নীলাম্বর হেসে বললে, যাবৎ বিবি বড হবে, তাবৎ মিঞা গোর নেবে।

অবাক হয়ে ভ্রূ তুলে তাকাল মরিয়ম।

নীলাম্বর হেসে বললে, তাজ্জব বোনো না। এখনো সে আবদার ধরে। বলে, আম্মা মুঝে আচ্ছি বল দেলাদে! সোহর জানে না, মহব্বৎ কি জানে না—নেহাত নালায়েকী, নেহাত আনাড়ী।

আনাড়ী বলে কি জরু নয়? মরিয়ম শুধালে। তাকে তো হেলাফেলা করা ঠিক নয়। যে করে সে তো জালিম।

আমি করি কিন্তু আমি কি জালিম? আমি কি মর্দ্দ?

মরিয়ম নীলাম্বরের চোখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি নও, তুমি তো নীল, তুমি তো ফিরোজা মণি, তুমি সাফায়ার, ব্লু সাফায়ার।

আর তুমি তার ভিতরের লাল আগুন। তুমি তার রক্তমুখ।

আমি!

হ্যাঁ, তুমি।

গোনাহ্ হবে না? সন্ত গ্রিগরী কি কুপিত হবেন না?

না, না, কুপিত হবেন না, এই বলে হাত বাড়িয়ে দিল নীলাম্বর, কিন্তু মরিয়ম ধরা দিলে না। সে সরে গেল। শুধু বললে, নীল, আমাকে ভাবতে দাও।

নীলাম্বর মরিয়মের মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বললে না। সে চলে এল।

নীলাম্বর আর কাজকর্ম করে না, তাঁতীদের, দাদনির হিসেব রাখে না।

রংপুরের ক্ষেতের তামাকের পাতা কেমন হল, কেমন গুটি মিলল পুলোদের কাছে, তার খবরও নেয় না। বাপ পীতাম্বর আরিন্দা পাঠান মুর্শিদাবাদ থেকে, শ্বশুর নীলমণি জামাতা-বাবাজীর কুশল কামনা করে পত্র দেন, কিন্তু তার ওসব খেয়াল নেই। সে বাসাবাড়িতে তার নিজের ঘরে বন্দী হয়ে থাকে।

সে গান গায়, বাজায়। উঁচুদরের গুণপনা দেখাতে পারে না। সমাজে কালোয়াত বলে তার খ্যাতি নেই, কিন্তু রাগ-রাগিণীর সে সমঝদার। সুর সে ওস্তাদকে প্রণামী আর নজরানা দিয়ে আয়ত্ত করেছে। আর অবসর সময়ে তারই আলাপে সে বিভোর হয়ে থাকে। সে উঁচুদরের শিল্পী না হোক, উঁচুদরের রসিক তার মন। সেই মন নিয়ে সে যন্ত্র ছোঁয় আর সে-যন্ত্র বেসুরো বোল বোলে না। যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠও বেতালা হয়ে মেলে না। তাই নিশীথ রাতে, যদি জহাঙ্গীরনগরের আর্মানীটোলার কারো কান সজাগ থাকে তো সে শুনতে পায়।—হয়তো পায় না। দুপুর রাতের আচমকা জাগরণে সে-সুর স্বপ্ন বলেই মনে হয়। আবার ঘুমে ঢলে পড়ে।

কিন্তু যন্ত্র সে ছোঁয় নি, তার মনে আলাপ তুলেছিল রাগ-রাগিণী। স্বর আর তাদের শ্রুতি দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু, মধ্যা এসে ভিড় করেছিল, তারা ঝরে পড়তে চেয়েছিল গুনগুন করে, কিন্তু মন বাধা দিয়েছিল। দুঃখী মন বাধা দিয়েছিল। অথচ জগৎ-সংসারের দুঃখীজনের জন্যেই তো দেবাদিদেব শঙ্কর গীতবাদ্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তবু দুঃখী মন তো চায় না। তাই অবহেলিত হয়ে থাকে তার যন্ত্রগুলি। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—কোন স্বরই তো গুঞ্জন তোলে না। তাই সে চুপ করে শুয়ে থাকে।

সেদিন ভোর রাতে হঠাৎ কি মনে হতে জেগে উঠল। বাইরে এসে দাঁড়াল।

মিনারময় শহর এখনো অন্ধকারে ডুবে আছে। সে অন্ধকার ঘন নয়, তরল। শুধু তরল নয়, ঝাপসা। আবছা। এখনি মুয়াজ্জিন জানাবেন আজানের আহ্বান। মসজিদের মিনার থেকে সে-আহ্বান তরল অন্ধকারের বুক চিরে তীর হয়ে ছুটবে, যেখানে যত মুসলিম আছে, সকলের কাছে গিয়ে পৌঁছবে। সবাই গাইবে লায়ে লাহা ইল্লাল্লার বন্দনা গান। এখনো তো সে-সময় হয় নি। কিন্তু আর দেরিও নেই। আবছা অন্ধকার, নিস্তব্ধ অন্ধকার ভরে উঠছে অস্ফুট শব্দে।

মন যেন জুড়িয়ে গেল। বুড়িগঙ্গার বাতাস এখানেও আসে। বাদাম-তলীর ঘাট বেয়ে জিন্দাবাহারের সরু গলি এড়িয়ে এখানেও আসে। এই মিনারময় শহরের আর্মানী মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই বাতাস এসে মনে লাগল, হৃদয়তন্ত্রীতে তুলল রণন-ঝনন। আর নীলাম্বর সেই হৃদয়ের রণন-ঝননকে রূপ দিলে তার যন্ত্রে।

সুর যেন লয় পেয়েছিল মনে। হারানো সুর ফিরে পেয়েছে, হারামণিকে ফিরে পেয়েছে। শুদ্ধ-গান্ধারে এ সুর যদি থাকে তো জুড়ে বসে না, কোমল রেখাবে নেমে নেমে আসে। কোমল নিখাদে বুঝি লাগে না। মধ্যমে ফিরে যায়, আসে, পঞ্চমে ওঠে। আনন্দের উদাত্ত কল্লোল যেন। পঞ্চমেই স্থিতি চায়, কিন্তু পঞ্চমে তো থাকতে পারে না। পঞ্চম বড় মুখর, বড় চড়া! আনন্দ উত্তুঙ্গে এমনি, কিন্তু আনন্দে যে মৃদু বিষাদের ছায়া—যে-বিষাদ পরম স্নিগ্ধ শান্তি—সে তো কোমল হতে চায়—নামতে চায়। কোমল ধৈবতে মিশে যেতে চায়।

ভোর হয়ে এল। মিনারময় শহর এখনো নাগবন্ধ ঘুমে, আসমানে এখনো সাদা পোঁচ-লাগা কালো, সাদা মেটে-কালো। মানুষ এখনো নিজের কামনার পরিপূরক ঘুমে আচ্ছন্ন। এখনো আড়মোড়া ভাঙে নি মানুষ, এখনো আড়মোড়া ভাঙে নি শহর। তবু ভোর হল। ভোর ভৈঁ। ভোরের ভৈঁরো বেজে উঠল।

নামিয়ে রাখল যন্ত্র, আনন্দ মুখর মন, শান্ত মন।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, বাজাও! আরও বাজাও!

চমকে উঠল নীলাম্বর, তাকিয়ে দেখলে কিংখাবের পর্দা, তারই উপর যেন ছবি ফুটে উঠেছে। ছায়ার ছবি নয়, আলোছায়ার খেলা নয়। ছবি, প্রাণবন্ত ছবি।

নীলাম্বরের আনন্দিত মন, স্নিগ্ধ মন, পবিত্র মনে বুঝি দোলা লাগল কামনার। তবু বললে,

কি বাজাব—এতো সারেঙ্গী নয়, গজল তো এ তারে বাজে না।

গজল শুনতে তো আসি নি নীল, ছবি বললে।

তবে কি শুনতে এসেছ?

তোমার আনন্দের ভাগ পেতে এসেছি। আমি কি সে-ভাগ পাব না?

পারে, পারে। আনন্দ তো একা আমার নয়, তোমার আমার—সকলের।

তাকে হাত ধরে এনে বসালে নীলাম্বর জাজিমের উপরে।

দুজনে চুপ করে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই থেকে মরিয়ম হল তার ভোরের ভৈঁরো। তার গৌরী। আশাবরী আর জয়ন্তী রূপ মিলে গৌরী—শরৎচন্দ্রের মতো সুন্দর, মুখে যার দাড়িম্ব-বীজের আভা—এ যেন সেই গৌরী। এ গৌরী কুমারী। কিন্তু এ গৌরী তো সখী হতে পারে, প্রিয়তমা হতে পারে, পত্নী হতে পারে! গৌরীরাগিণী তো মালকোষরাগের প্রিয়তমা। সে তার নাম দিলে গৌরী।

গৌরী পেশোয়াজ পরেই অভিসারে আসে তার বাসাবাড়িতে, কাঁচল আর ওড়না গায়ে জড়িয়ে আসে। কিন্তু এখানে এসে রাগিণী সাজে সে। সঙ্গীতশাস্ত্রের রাগের প্রিয়তমা রাগিণীদের রূপ ধরে। আর নীলাম্বর নিজেও রাগের রূপ ধরে। তারপর বসে যন্ত্র নিয়ে। আলাপে আলাপে আত্মনিবেদন করে। আবার কখনো বা হিন্দু-সংস্কার সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখন সে আর্মানী, তখন সে ইস্পাহানের শেখ। সারেঙ্গী বাজায় মরিয়ম, সে গায় গজল। সে আওড়ায় বয়েৎ। কখনো বা সে বনে যায় এরিবানের সেই খাঁটি মানুষ। মদে রুটি ভিজিয়ে খায় উৎসবে, প্রিয়াকে খাওয়ায়। তখন সে সাজে আগা বারসাক কি নিকোলাই আবাতুন।

দুদিনের বাসা, নিজের ঘরের দিকে সে নজর দেয় নি। কিন্তু ঘর সাজাতে তার মন গেল।

ঘর সাজাবার মহার্ঘ্য দ্রব্য তার ছিল, ছিল মোমের গেলাস-ঝাড়, ঝাড়-লণ্ঠন, ছিল কিংখাবের পর্দা, ইস্পাহানী গালিচা: কিন্তু ছিল না মন। সে-মন 'আমাল-বল'-বলা ইন্দুরেখা দিতে পারে নি, দিলে আর্মানী মেয়ে মরিয়ম। দিলে গৌরী। সে সেই মনের রঙে রাঙিয়ে দিতে চাইল ঘর।

কিন্তু নীলাম্বরের মনের কোন রং পাকা?

রং তো ক্ষণে ক্ষণে বদলায়।

ভোরের ভৈঁরোর সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির পুঞ্জ আঁধার টুটে যায়। তখন তো ঊষার স্বর্ণাভ আলোর মতোই ঝলমল করে ওঠে। তারপরে সে সোনা পূর্বরাগের রং ধরে। আবার যখন দুপুরে আসে মরিয়ম, তখন সেই

সোনা তো অরবিন্দের মতোই রক্তিম হয়ে ওঠে। মিলন হয় সেই রঙে। মিলন-শতদলের সেই তো রং। আবার বিকেল গড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যায়, তখন তো নীল হয়ে যায় হৃদয় বিরহ-বেদনায়। আলো জ্বলে ঘরে, গেলাসের ভিতরে মোম জ্বলে ওঠে, নীলে মন ছেয়ে থাকে। ঘন হয়ে ওঠে নীল জ্বালা। কোন নীল? ক্ষেতে যে নীল চষে চাষী, সেই নীল—না—আকাশী নীল? না—ঘন নীল, যার ভিতরে আছে কালো দ্যুতি?

ভেবে পায় না নীলাম্বর। তাই সাদাই তার ঘর। সব রঙের খেলা চলবে তার উপরে। সেই তো আসল রং, আরগুলি তো তারই উপরে কারিকুরি—কারুকৃতি। সে মোমের আলো জ্বালিয়ে রঙিন পর্দা টাঙিয়ে সেই কারুকৃতি-মায়া সৃষ্টি করে। সোনার মায়া, মিলন-শতদলের মায়া, বিরহের নীল মায়া সৃষ্টি করে, আর নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

মরিয়ম বলে, আমাকে তুমি ভালবাস, না—ঐ রঙের ভেল্‌কি তোমার পসন্দ?

নীলাম্বর উত্তর দেয়, ঐ রং তো তুমি, ঐ রং তো আমার মন—ঐ রং যদি ভেল্‌কি হয়—তাহলে আমিও তাই—তুমিও তাই।

ভেল্‌কিই বোধহয়, মরিয়ম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, ভেল্‌কি তো থাকে না, মিলিয়ে যায়

যদি যায়ই, তাতে দুঃখ কি!

দুঃখ করব না?

না, দুঃখ করব না। ঐ ভেল্‌কির স্মৃতি নিয়ে থাকব

থাকবে—থাকতে পারবে?

না পারি ভুলে যাব।

ভুলে যাবে? মরিয়ম আর্তস্বরে বলে ওঠে

না গিয়ে উপায় কি!

তুমি কি মর্দ্দ—তুমি কি পাষাণ?

আমি তার চেয়েও যদি নিষ্ঠুর হই, হেসে ওঠে নীলাম্বর।

পাষাণেও তো রেখা পড়ে, নক্‌সার দাগ থাকে

না, এ নিরেট পাষাণ!

উঠে পড়ে মরিয়ম। নীবিবন্ধ খসে পড়ে, পেশোয়াজ পরতে যায়। তাকে টেনে আনে নীলাম্বর।

বলে, মিছে কথা মরিয়ম, আমার মিছে কথা। তোমার ঈশার দোহাই, মিছে কথা!

অমনি মুখ চেপে ধরে মরিয়ম, ঈশার দোহাই দিয়োও না! যদি মিছে হয়ে যায় তো সেদিন ঈশায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাব।

সেদিন উদগ্র বাহু আর তেমন করে বাঁধতে পারে না। অধর সেদিন ওষ্ঠ থেকে বারে বারে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সারেঙ্গী অকারণে মিলনের ক্ষণে বিরহের ঝংকার দেয়। মরিয়ম উঠে চলে যায়। আর নীলাম্বর চারিদিকে ঘন নীল পর্দা ফেলে দিয়ে এলিয়ে পড়ে জাজিমের উপর। শরাহত কুরঙ্গের মতো ছটফট করে, মকরকেতনকে শাপায়। নিজের মনকে শাপায়। মিলনের ক্ষণে একি নাগরালি তাকে পেয়ে বসল? একি কথা তার জিভে এল! একথা যে অনুচ্চারণীয়। অথচ মন তো উচ্চারণ করে। বার বার বলে, এ-প্রেমের পূজার ফল কি। সে মনকে বাধা দেয়, কিন্তু মন বাধা মানে না। বাগ মানে না। তাই মনের কথা মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয় জিভে—মুখে।

তবু দিনে নিভৃত ঘরে, সাদা দেয়ালে রঙিন পর্দামোড়া ঘরে তারা মেলে। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমানের পালা একই সঙ্গে চলে।

হয় তো তা আরও কিছু দিন চলত, কিন্তু হঠাৎ এক আকস্মিকতা এসে পর্দাঘেরা তাদের ঘর উড়িয়ে নিয়ে গেল। পিতাঠাকুর পীতাম্বরের দিক থেকে ঝাপটা এসেছিল, কিন্তু ঝড় নয়। তিনি ফকিরদের উপদ্রবে শঙ্কিত। রংপুর দীনাজপুর, জলপাইগুড়ি এলাকায় কোথা থেকে এসেছে ফকিরের দল। তারা প্রায় নগ্ন হয়েই থাকে। আংরেজরা বলে, তারা নাকি তিব্বতের দক্ষিণে থাকে। তারাই এসে হাজির হয়েছে। এসে দখল করেছে ক'টি প্রধান শহর। সেখান থেকে চালাচ্ছে ধ্বংস। কলকাতার নয়া কিল্লার লেফতেনেণ্টরা ছুটছেন তাদের দমনে, কিন্তু দমন করা কি সহজ! তাদের হাতে দিশি বন্দুক তো আছেই, বিদেশী আংরেজের বন্দুকও দু-চারটে আছে। তারা যে কোন মুহূর্তে চড়াও হতে পারে ঢাকার উপর। আংরেজশাহী বাতিল করে ফকিরশাহী বসাতে পারে। সেই ভয়েই অস্থির পীতাম্বর।

নীলাম্বর কুঠি চালায়, সে খবর রাখে। সে শুনেছে অবাঙালী এই ফকিরের দলের কথা। তারা আংরেজের ধ্বংস চায়। আর তাতে দেশী মানুষের ভয় নেই, কিন্তু আংরেজের খয়েরখাঁদের ভয় আছে। তার বাপ পীতাম্বর তো তাই। সেও তাই, সেও আংরেজকে ভজে। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা স্বস্তি আছে। এ-স্বস্তি তামাম বণিক-গোষ্ঠীর আছে। আর্মানী বণিকেরা এক সময়ে ছিল মুঘল আমলের সেরা সদাগর, আংরেজ এ-দেশে এসে তাদের কাছেই প্রথম ব্যবসার তালিম নিয়েছিল। আজ পাশা উলটে গেছে। আর্মানীদের ব্যবসা তাদের হাতে চলে গেছে। তাই মরিয়মের বাবা নিকোলাই ফেনসের এই দশা। তবু পিক্রুজ, আরাতুনেরা এখনো তাদের পা চাটছেন, এখনো আংরেজের হাতে খাচ্ছেন। আর কালা সদাগরদেরও সেই দশা। পীতাম্বর বোঝেন কিনা সে জানে না, কিন্তু সে বোঝে—তাদের পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে, তারা লুটিয়ে পড়ল বলে। তাই ফকিরশাহীর কথায় ভয় পেলেও কেমন একটা আনন্দও তার হয়। একবার ভাবে আংরেজশাহী খতম হোক না, আবার নিজেদের সবকিছু চলে যাবার ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। তাই সে কুঠির কাজ সারতে লাগল।

কুঠির কাজ সারে নীলাম্বর। দাদনিদের তাড়া দেয়। ঢাকার বাজারে তামাক আর সুপারির দর দেখে। সকাল এভাবেই কাটে, দুপুরে আসে মরিয়ম। তারপরে বিকেল গড়িয়ে যায় সন্ধ্যায়। আবার খাতা নিয়ে বসে দ্বিগুণ উৎসাহে নীলাম্বর। মরিয়মের কথা ভুলে যায়, দাদনির হিসেবের জালে চাপা পড়ে মন। হঠাৎ আবার সেই জাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে মরিয়মের মুখখানা ভেসে ওঠে। তখন হয়তো রেড়ির তেলের বাতি নিবু নিবু হয়ে আসে। খাজাঞ্চীকে বিদায় দিয়ে নিজের কক্ষে ফিরে যায় নীলাম্বর। ঘন নীল পর্দা ফেলে দেয় চারিদিকে। গেলাসে মোমবাতি জ্বলে। আর মোমের আলো ঘন নীলকে ফিকে করে না, কেমন যেন আরও ঘন করে তোলে। আর সেই নীল মায়ায় বসে সে বীণা তুলে নেয়, কোনদিন বা সারেঙ্গী বাজায় পিড়িং পিড়িং করে। কখনো বা সেতারে সুর বাঁধে, আলাপ করে।

সেদিনও সুর বাঁধছিল সেতারে, আলাপ করছিল নীলাম্বর। এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল।

এমন সময় কেউ আসে না। বাসাবাড়ির চাকরেরা কাজ শেষে ঘুমিয়ে পড়ে; শুধু দরোয়ানেরা জাগে দেউড়িতে। কিন্তু তারা কেউ বিশেষ কারণ না হলে মনিবের দুয়ারে এসে হামলা দেয় না, তাকে বিরক্ত করে না। আর কেউ এলে এত্তেলা দিয়েই আসে।

নীলাম্বর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিলে।

মরিয়ম দাঁড়িয়ে আছে।

তবে কি রাতে অভিসারে এসেছে মরিয়ম? তার দিলে জেগেছে আশীক্—তাই ছুটে এসেছে।

সে হাত ধরে তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল।

মরিয়ম এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

অবাক হয়ে নীলাম্বর বললে, কি হয়েছে?

মরিয়ম কথা বললে না, শুধু মুখ গুঁজে ফুলে-ফুলে কাঁদছে।

তার পরে ভাঙা স্বরে জানালে, তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিল তার ভাই, ফকিরেরা তাকে কেটে ফেলেছে। সাহেবও জখম হয়েছেন। এইমাত্র সাহেবের দপ্তর থেকে এসেছে চিঠি। মরিয়ম নিজের কাঁচুলির ভিতর থেকে বের করে দিলে। কালো কালির পাড়টানা চিঠি। নীচে সইকরা জে, রেনেল; বিবি রোজিয়োকে লিখেছেন, আপনার পুত্র আর ইহলোকে নাই। দুশমন ফকিরদের হাতে নিহত হইয়াছে। আমিও আহত হইয়া ফিরিয়াছি। আমার দপ্তরে কাহাকেও পাঠাইবেন, তাহার জিনিসপত্র দিয়া দিব। ঈশ্বর তাহার আত্মার মঙ্গল করুন!

চিঠি পড়ে দেখলে নীলাম্বর, তারপর মরিয়মকে সবলে তুলে নিলে বুকের উপর। তার মুখখানি তুলে ধরে বললে, ছিঃ কাঁদে না মরিয়ম!

মরিয়ম উত্তর দিলে, আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গেল নীল! কাঁদব না!

না—তুমি কাঁদলে যে আমিও কাঁদব!

না, না, তুমি কেঁদো না—তোমার কান্না যে আমি সইতে পারব না নীল!

আমিও তো সইতে পারি না মরিয়ম।

আর কাঁদব না! মরিয়ম চোখ মুছতে গেল, কিন্তু আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

তাকে সান্ত্বনা দিলে নীলাম্বর। তার চুলে বিলি কাটলে। তার কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলে। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল মরিয়ম তার কোলে। তাকে কোলে নিয়ে সারারাত বসে রইল নীলাম্বর। এও এক আনন্দ, এও এক আশীষ্‌। দুঃখ আছে বলেই এ আশীষ্‌ গভীর।

রোজিয়ো বিবি কাঁদছেন, মরিয়ম কাঁদছে। পুরুষ কেউ নেই। তাই নীলাম্বরই গেল রেনাল সাহেবের দপ্তরে।

রেনেল সাহেব ছিলেন লস্কর, হয়েছেন কোম্পানীর সুবে বাঙ্গালার সার্ভেঅর-জেনারেল। বাঙ্গালা দেশের গঙ্গা ভাগীরথীর জরিপ করেছেন, জলঙ্গী অবধি গেছেন; আবার এখন ঢাকায় দপ্তর খুলে জরিপ করছেন। বয়েস বেশি নয়, একেবারে তরতাজা যুবক। তাঁরই সহকারী ছিল মরিয়মের ভাই। থিয়োডোলাইট আর চেন কাঁধে টানত না, তার জন্যে তো কুলি আছে। সে ছিল তাঁবুর তদারকে।

রেনেল সাহেবকে খবর দিতেই, তিনি নীলাম্বরকে ডেকে পাঠালেন।

নীলাম্বর গিয়ে দেখলে, সাহেব খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। সাহেবের বুকে-পিঠে ব্যাণ্ডেজ। হাতেও ব্যাণ্ডেজ।

নীলাম্বর যেতেই তিনি বললেন, গুড মর্নিং বাবু।

জণ্টুরা বাবু বললে খুশি হয়, তাদের বাবু বলতে হয়, তা সাহেব জানেন। নীলাম্বর আংরেজী কেতায় দোরস্ত, সেও গুড মর্নিং জানিয়ে সেলাম ঠুকলে।

সাহেব আরাম হয়ে উঠছেন, ঘা শুকিয়ে এসেছে। বললেন, ভেরী স্যাড বাবু, ফেনস ঐ নাঙ্গা ফকিরদের হাঠে খতম হইয়া গেল! রংপুরের ঢোরলা আর শ্যাঙ্কোস নদীর জরিপ হামরা করিটেছিলাম। সেঠায় নেকেড ফকিরেরা আসিয়া হানা দিল—দে হ্যাড আর্মস—টাহাডের বণ্ডুক ছিল—ডে হ্যাড ইংলিশ মাসকেটস্‌। হামাদের লেফটেনাণ্ট মরিসন টাহাডের টাড়াইয়া ডিলেন। হামরা আবার যেঠায় ঢোরলা ব্রামাপুট্রে মিশিযাছে, সেঠায় তাম্বু ফেলিলাম। য়্যাণ্ড দি নেকেড ফকীরস্‌—দি জিপসীস অফ হিন্দুস্টান, স্যারাউণ্ডেড অফ্‌ লাইক লোকাস্টস। হামাডের পঙ্গপালের মতো ঘিরিয়া ফেলিল। হামাডের ঘোড়া পলাইল, সোর্ড ডোলাইয়া ফকিরেরা ছুটিয়া আসিল। ফেনস মরিল, হামি জখম হইল। হামার ডান দিকের কাঁটের হাড়

কাটিয়া টলোয়ার চলিয়া গেল, রিবের বোন জখম হইল, এলবো কাটিল, মাঠা কাটিল। হামাকে প্যালানকিনে যখন টোলা হইল, আমার গেয়ান ছিল না। ঢাকায় আসিয়াও চেটনা হয় নাই। আই ওয়াজ আনকনসাস!

নীলাম্বর বললে, সাহেব, আপনি অসুস্থ, আমি উঠি, ফেনসের জিনিসপত্র যা আছে, দিয়ে দিতে হুকুম করুন।

না, না, বাবু বোস। রেনেল সাহেব যেন মুখর হয়ে উঠলেন। রিউমার রটিয়াছে, টাহারা হেঠায় চড়াও হইবে। ডোণ্ট ফীযার, হামরা টাহাডের শিক্ষা ডিব। পুওর নিকোলাই।

জেমস রেনেল বাঙ্ময় হয়ে উঠলেন, তিনি বললেন, সারা হিন্দুস্টান জরিপ করে তিনি মানচিত্র তৈরি করবেন। শুধু ব্রহ্মপুত্র নয়, শুধু মেঘনা নয়, গঙ্গা-ভাগীরথীর নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করবেন, জিস দেশমে গঙ্গা বহতী হায় —তার মানচিত্র তৈরি করবেন এই তাঁর স্বপ্ন। এ স্বপ্নের পেছনে আছে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রেরণা। ব্রিটিশ সিংহের রক্তআঁখির লাল শুধু সুবে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায়ই থিতু হয়ে থাকবে না, সে-লাল ছড়িয়ে পড়বে হিন্দুস্তানের সর্বত্র। আর তিনি সেই লাল মাখিয়ে আঁকবেন তাঁর হিন্দুস্তানের মানচিত্র; আবার স্মৃতিকথাও লিখবেন, তার নাম হবে মেমযর্স অফ্ এ ম্যাপ অফ্ হিন্দুস্তান।

নীলাম্বর অভিভূত হয়ে শুনল রেনেলের স্বপ্ন, রেনেল বিদায়ের সময় শুধু বললেন,

বাবু, জেণ্টুদের ভয় নাহি, টাহাডের হামরা ডেখিবে।

নীলাম্বর ব্যবসায়ী, সে মুখে বললে, আপনারা না দেখলে আর কে দেখবে!

রাইট-ও! রেনেল এলিয়ে পড়লেন বিছানায়। চোখ বুজে এল। হয়তো স্বপ্ন দেখছেন হিন্দুস্তানের, চেন ফেলে ফেলে গঙ্গার আকর ব্রহ্মকুণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন। থিয়োডোলাইটে মাপছেন, আর সেখানে উড়ছে পত-পত করে ব্রিটিশ যুগ্ম-সিংহ-লাঞ্ছিত পতাকা!

সাহেব চোখ বুজলেন, নীলাম্বর চলে এল।

রোজিয়ো বিবি ঢাকার পাট তুললেন। তিনি যাবেন ইসলামাবাদ-চট্টগ্রামে। সেখানে তাঁর ভাই আছেন। সেখানে তুলোর ব্যবসা করেন, হীরে-জহরতের ব্যবসা করেন।

বিদায়ের দিন মরিয়ম সারারাত রইল নীলাম্বরের কাছে।

সে কাঁদল, নীলাম্বরকে আদর করল, ভালবাসল। যাবার আগে বললে, আমার নসিব, তাই তোমাকে বিদায় দিতে হল। আবার যেন তোমাকে পাই।

নীলাম্বর বললে, কোথায় আর পাবে? তুমি তো হবে কোন মোঘল মহালের পর্দানশিন জেনানা। নয় তো কোন খোজা আরাতুনের বিবি।

তাই তো এই পদক এনেছি, একটি পদক গলা থেকে খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলে মরিয়ম। সোনার সুতলিতে গাঁথা পদক, তাতে ঝকঝক করছে একখানা রক্তমুখী নীলা।

মরিয়ম বললে, এই পদক আমার পূর্বপুরুষ জিন্দাকালে এনেছিলেন এরিবান থেকে। সেখানে এস্‌মিয়াদজিন গীর্জায় ছিল এই পদক। এই পদকের জোরে তাঁর বরাত খুলে গিয়েছিল। কিন্তু সে-বরাত আমার বাপ রাখতে পারলেন না। পদক তো সর্বনাশ নিয়ে এল। তুমি নীল, তুমি নীল হীরে—এ পদক তুমি নাও! তোমার মহাসৌভাগ্য আসবে।

নীলাম্বর বললে, সর্বনাশা পদক আমাকে দিলে, আর মহাসৌভাগ্যের কথা বলে গেলে। কিন্তু তার আগেই তো তুমি আমার সর্বনাশ করেছ। তোমাকে আমি তো জোর করে ধরে রাখব মরিয়ম।

এই বলে আবেগে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বললে মরিয়ম, ছিঃ—তোমার না ঘরে বিবি আছে!

বিবি থাক, তোমাকেও আমি বিবি করব! আমাদের ঘরে বহু বিবিতে দোষ নেই।

তোমার ধর্ম যে আলাদা।

ধর্ম যদি বাধা দেয়, তোমার ধর্ম আমি গ্রহণ করব।

তা হয় না!

কেন হবে না?

ধর্ম মানি না মানি, ধর্মত্যাগী হলে যে মানুষের বিশ্বাস গেল। আর সেই অবিশ্বাসীকে কি করে বিশ্বাস করব? শুধু মনে হবে—ও তো বিশ্বাস ভঙ্গ করবে।

তোমার ঈশার কসম—

ছিঃ কসম খায় না! আমি জানি, তুমি আমাকে বেমালুম ভুলে যাবে। তাই তো ঐ পদক দিলাম। গলায় দোলাবে, আমাকে মনে রাখবে।

যদি মনে না থাকে?

তাহলে তো চুকে গেল। পদকখানা ফেলে দিয়ো।

না, না, চুকে তো যাবে না।

আবার নিবিড় আলিঙ্গনে মত্ত হয়ে উঠেছিল ভুজবন্ধ, আবার বুকে বুক, মুখে মুখ মিলেছিল। পদকের ভিতরে যে আগুন, সে আগুন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সে আগুনে দুখানি অরণিকাষ্ঠ পুড়েছিল, পুড়ে ছারখার হয়েছিল।

মরিয়মরা চলে গেল, নীলাম্বরও বাপ পীতাম্বরের তাগিদে চলে এল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদে আসতেই ইন্দুরেখা এসে দেখা দিল।

সেই আহ্লাদী খুকী এখন যুবতী। 'আমাল বল' আর বলে না, ন্যাকা কথা শুধরে গেছে, তবে ন্যাকা কথা আছে। সে এল কাশীমবাজার থেকে ঘর-বসত করতে।

নীলাম্বর তাকে নিয়েই মেতে উঠল।

ইন্দুরেখাকে সে মনের মতো করে সাজায়। কখনো বা আংরেজ বিবির গাউন এনে দেয়, মুখে বুকে নিজের হাতে লাল রং মাখায়। আবার কখনো বা মুঘল মেয়ের মতো কাঁচুলি আর পেশোয়াজ পরায়। আসমানি কি নারঙ্গী রঙের ওড়না জড়িয়ে দেয় গায়ে। সেদিন হঠাৎ মরিয়ম বলে মনে হয়। ইন্দুরেখা এসব সয়ে যায় হাসিমুখে। আবার নিজের মন-মতোও সে সাজে। কপালে পরে টিপ, খোঁপা বাঁধে রুপোর ফুল আর কাঁটা দিয়ে তাতে সোনার চিরুনি গুঁজে দেয়। তাতে লেখা থাকে—পতিপরমগুরু। চওড়া পাছা পাড় শাড়ি পরে, আবার মেহেদী দিয়ে রাঙায় নিবিড় নিতম্ব সেখানে নক্সা এঁকে দেয় নাপতিনী আলতা পরাতে এসে। বেলফুলের গোড়ে মালা জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখে। তাও খোঁপায় জড়ায়।

এ-বেশও ভাল লাগে নীলাম্বরের। এ-যেন তার জানা। সে কাঁটা খুলে ফেলে একে-একে। চিরুনি খসিয়ে ফেলে। তারপর চুল এলিয়ে দেয়।

লজ্জা ইন্দুরেখা করে না। কাঁচল খসে পড়ে ফুলের পাপড়ির মতো। কিন্তু নিবিড় নিতম্ব বেড় দিয়ে এক ফেরতার বাহারে যে পাছা পাড় ঝিলিক দেয়, তারই আড়ালে মেহেদীর নক্সার লজ্জা লুকিয়ে থাকে। সেইখানে স্পর্শ করলেই তার লজ্জা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

তবু তো বাগ মানে না পুরুষ, সে খসাতে যায় সেই লজ্জা, মেহেদীর বঙ্কিম-লজ্জা দেখতে চায়। নীবি-মোক্ষেই সে মোক্ষ পেতে চায়। মোক্ষ পায়ও।

এমনি করে কাটে তার দিন। মরিয়মের কথা জলের লিখনের মতো মুছে গেছে। পদকখানাও সে খুলে রেখেছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু মুখখানা ভেবে পায় না। আর দেহের কথা মনে হলে, ইন্দুরেখার দেহের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। শুধু একাকার হয় না উরুর উপরে সেই লালচে কালো তিলটি। সেটি ইন্দুরেখার উরুতে খুঁজলেও মেলে না। লাল রঙের সুগোল উরুতে একটা লালচে-কালো তিল। যেন এক কুচি আম্বার। সে-তিলে সে চুমু খেয়েছে, কেমন যেন একটা স্বাদ তার মুখে লেগে আছে। কেমন একটা গন্ধ, আংরেজের লাল সরাবে বুঝি সে-গন্ধ আছে; আছে মজা ফুলে। সে-গন্ধ মরিয়মের নিজস্ব, ইন্দুরেখা সে গন্ধ কোথায় পাবে। দুজনেই ফুল, চামড়ার ফুল, মাংসের ফুল—কিন্তু দুজনের গন্ধ আলাদা, স্বাদ আলাদা। এক স্বাদ পেয়ে আর-এক স্বাদ পেতে চায়; আব হাজারের স্বাদ পেতে চায়। নীলাম্বরও চায়।

বাধাও কিছু নেই। ওটা বড় মানুষের চাল। চারটি বৌ থাকলেও, আর চারটি মেয়েমানুষ বাঁধা রাখে। যার যত মেয়েমানুষ, তার ততো মান। তার ততো মাইফেল জমজমাট। মেয়েমানুষ শুধু বাঈজী নয়, আর্মানী, ফিরিঙ্গি কসবীও আছে। নীলাম্বরের আর্মানী রং ধরেছিল মরিয়মের কাছ থেকে, তাই আর্মানী বিবির কাছেই গেল পহেলা। কিন্তু সেখানে গিয়ে মরিয়মকে পেল না।

ইন্দুরেখা সবই জানত, কিন্তু বড় মানুষের ঘরের এই রীতি, এই চাল। তাই চুপ করে রইল। ফরাশডাঙার শাড়ির আঁচল চোখে উঠল একবার, চোখ মুছলে। তারপর স্বামী যখন ভোর রাতে মাইফেল সেরে মাতাল হয়ে ফিরে এল, তখন তার মুখ ধুইয়ে, মাথা ধুইয়ে, তেঁতুল-গোলা-জল খাইয়ে তাকে শান্ত করলে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

মাকে সে একাজ করতে দেখেছে, মাসীকে দেখেছে, পিসিকে দেখেছে। এ তার জানা। পুরুষ পরশপাথর, ছুঁয়ে দিলেই নারী ধন্য হয়। তারপরে না ছুঁলেই বা কি! কত মানুষের সোয়ামি যে বাগানেই পড়ে থাকে, বাড়িতে আসে না। বৌকে ধরে মারে। তার সোয়ামি তো সেখানে রামের মতো, বাড়িতে ফেরেন, তার গায়ে হাতটি দেন না।

নীলাম্বর কিন্তু লজ্জিতই হল। সে আশা করেছিল, ইন্দুরেখা কিছু বলবে।

তাই সে শুধালে, কি গো, কাল খুব হাঙ্গামা করেছি!

ইন্দুরেখা চুপ।

আর হবে না, ঘাট মানছি! হাতজোড় করলে নীলাম্বর। বল, হাতে না হয়, পায়ে ধরছি।

আ—ছিঃ ছিঃ—ইন্দুরেখা তার মুখ চেপে ধরল।

নীলাম্বর বললে, শোন, কথা আছে। আমি এক আর্মানী মেয়েকে ভালবাসতাম। সে চলে গেল। কাল তাই আর-এক আর্মানী বিবির কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাল লাগল না। তাকে তো পেলাম না। আর তার কথা ভাবব না। তুমি এই পদকখানা নাও। এখানা তার দেওয়া।

গলায় পরিয়ে দিল পদকখানা।

ইন্দুরেখা বললে, এ যে দামী নীলা!

হ্যাঁ, কিন্তু নীলা আমার সইল না, তুমি পর।

আমারই কি সইবে? ভয়ে ভয়ে বললে ইন্দুরেখা।

সইবে—সইবে—তুমি নীলমণির কন্যা, নীলাম্বরের বৌ—তোমার সইবে না তো কার সইবে!

স্বামীকে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলে ইন্দুরেখা।

নীলা! আংরেজরা বলে স্যাফায়ার। এও এক পাথর। য়্যালুমিনার পিণ্ড। প্রকৃতির খেয়ালে সেই য়্যালুমিনার পিণ্ডে নীল দ্যুতি দেখা দেয়। মানুষ সেই য়্যালুমিনার পিণ্ড তুলে আনে খনি থেকে, কেটে আনে। তারপর কেউবা রাজমুকুটে ধারণ করে; কেউ বা কণ্ঠভূষা হারে দোলায়; কেউ বা অঙ্গুরীয়তে পরে; কেউ বা আবার দেবদেবীর পাথরে কোঁদা চোখে মণির মতো বসিয়ে দেয়। য়্যালুমিনার পিণ্ডের শোভা বাড়ে;

কিন্তু গ্রহাচার্যগণ এরই মধ্যে খুঁজে পান মঙ্গল-অমঙ্গল। হয়তো, কোনদিন ঐ য়্যালুমিনা পিণ্ডের একটুকরো ধারণ করার পরে কারো এসেছিল আকস্মিক সর্বনাশ, কারো বা আকস্মিক সৌভাগ্য—সেই থেকেই কাক-তালীয়বৎ ঐ পিণ্ডের সঙ্গে সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য, শুভ আর অশুভ যুক্ত হয়ে আছে। এ-দেশে, ও-দেশে, সব দেশেই তার পয় আর অপয় নিয়ে কেসসা-কাহিনী। মানুষের মনে তা বদ্ধমূল হয়ে আছে। কারো বা নাম-রাজা-বাদশা-গড়া নীলা, কারো বা নাম—বুদ্ধের অশুভ চক্ষু, কারো বা নাম অভিশপ্ত নীলা। পোখরাজ আর হীরেরও এমনি পয়-অপয় জুড়ে দিয়েছে মানুষ, কিন্তু এ-ব্যাপারে নীলার জুড়ি মেলে না।

কোথাকার য়্যালুমিনার পিণ্ড বিকিয়েছিল এরিবানের হাটে, আর তা কবে কিনে ক্রুশের সঙ্গে গলায় ঝুলিয়েছিল এক আর্মানী সদাগর। অমঙ্গলকে এমনি করেই রুখেছিল। যেদিন পারস্যের আক্রমণে নাজেহাল হতে হল, বন্দী করে তাকে চালান দেওয়া হল ইস্পাহানে, সেদিনও সেই পদক ছাড়তে পারে নি। ইসলাম আচার গ্রহণ করে ক্রুশখানা হয়তো খুলে ফেলেছিল পদক থেকে, কিন্তু পদকখানি ছিল। আর সেই পদকের পয়েই ফলাও করে গোলাপ জল, চুনি-পান্নার ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলেছিল। সেই নীলা ওয়ারিশানদের দিয়েও গিয়েছিল। নীলা পয় এনেছে, আবার আঘাতও হেনেছে। কিন্তু আঘাতের কথা ভুলে গেছে। তখন ঈশা-মুশাকে ডেকেছে। তবু নীলার পয় যায় নি। সেই নীলা মরিয়ম প্রিয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। আবার নীলাম্বর সে নীলা পরিয়ে দিল ইন্দুরেখার গলায়।

য়্যালুমিনার পিণ্ড করলে কিনা কে জানে। কিন্তু পীতাম্বরের কাশিম-বাজারের কুঠিতে লাগল আগুন, পুড়ে গেল গাঁট-গাঁট ঢাকাই মলমল আর মালদহী রেশম। পীতাম্বর পানির সামন্ত স্বপ্ন ভেঙে গেল, তিনি ফকির হয়ে পথে দাঁড়ালেন। তার উপরে ইংরেজ, ওলন্দাজ কুঠিয়ালরা তাঁর নামে মামলা শুরু করে দিলে। আর সেই মামলায় সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি ত্রিবেণীর গঙ্গার ধারে দেহ রাখলেন। নীলাম্বর ফকির হল। কিন্তু তখনো আমীরের জামাই। নীলমণি দত্ত মেয়ের মুখ চেয়েই তাকে সাহায্য করবেন এই তার আশা। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি পড়ল। ইন্দুরেখার বড় ভাই হীরে চুষে আত্মহত্যা করলে। নীলমণি কুঠি বেচে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে চলে

গেলেন। যেখানে মাধুকরী হয়ে সস্ত্রীক ধর্মকর্ম করছেন। কুঠি নীলার আগুনে পুড়ল কিনা কে বলবে, পুড়ল বুঝি নীল চোখের আগুনে। যেদিন প্রথম কুঠি গড়েছিলেন বেনিয়া কোম্পানী, সেদিন সব দেশের সদাগর ছিল তাঁর ভাই-বেরাদর। কিন্তু বণিকের পালা শেষ করে যখন সাম্রাজ্যবাদীর ভেক নিলেন, তখন অন্য সদাগরদের সইবেন কেন? কোম্পানী ব্যবসাপত্র একচেটিয়া করে নিতে লাগলেন। আর্মানীদের দিন গেল, সুবর্ণ বণিকদের দিন গেল। পীতাম্বর একথা বুঝতে পেয়েছিলেন সর্বস্বান্ত হয়ে, আর নীলমণি বুঝতে পেরেছিলেন যখন ছেলে আত্মহত্যা করলে। নীলাম্বর বুঝতে পারলে, যখন পায়ের নিচেকার মাটি সরে গেল।

সেনহাট থেকে এসে ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে পীতাম্বর চক-মেলানো বাড়ি করেছিলেন, এখন শুধু সেই বাড়িখানিই আছে। আর সব গেছে, এমন কি সেই পোলোগ্রামও আর নেই। মল্লিকেরা কিনে নিয়েছেন।

সেদিন মেঘ করেছিল আকাশে। সন্ধ্যে নেমেছিল ত্রিবেণীর বাঁধা ঘাটের উপর। আমবাগানে ঝাপসা ছায়ার ঝুরি নেমেছিল। নীলাম্বর বসেছিল বাহির বাড়ির জলসাঘরে। সেখানে গিয়ে সে কালেভদ্রে বসে। গেলাব-মোড়া তানপুরা, সারেঙ্গী, সেতারগুলো পড়ে থাকে, ছোঁয়ও না। জাজিমে ধুলোর আস্তরণ ঘন হয়ে ওঠে, সে দেখেও দেখে না। আজ কি জানি কেন, সকালে খানাবাড়ির প্রজা কুঞ্জ ভুঁইমালীকে ডেকে এনে সেগুলি ঝাঁটপাট দিইয়েছিল। একমাত্র চাকর আছে নফরা, তাকে দিয়ে ঝাড়পোঁছ, গোছামুছি করিয়েছিল মানুষ-সমান আরশিগুলি। এ-আরশি এ-মুলুকে মেলে না। সেই যে ভিঞ্জিয়া-ভিনিস—যেখানে পথ ঘাটে শুধু জল, আর জল। আর সেই জলের পথ বেয়ে এসে ভেড়ে ভিনদেশী সদাগরদের জাহাজ, সেখানে বিকিকিনি হয়। সেখান থেকে বহু লক্ষ তঙ্কা দিয়ে এই আরশিগুলি কিনে এনেছিলেন পীতাম্বর। শিসমহল গড়ে তুলেছিলেন এই জলসাঘরে। তয়ফাদের হাতের মুদ্রা, নয়নাবাণ, পায়ের কাজ এই আরশিগুলি থেকে ঠিকরে পড়ত সেদিন। পেলা পড়ত, বাহবা উঠত। আজ সে-ঘর নির্জন। শুধু আরশি-গুলি আছে, আর আছে গেলাব-মোড়া বাদ্যযন্ত্রগুলি! আর কিছু নেই।

আজ সন্ধ্যে হতেই এসে সে ঘর খুলল। ঝাড় লণ্ঠনে, গেলাসঝাড়ে

জ্বলে দিলে মোমবাতি। রামধনু রঙের লহরে ভেসে গেল ঘর। ময়লা গেলাব খুলে ফরসা গেলাব পরালে। গেদ্দায় পরালে নক্সী-কাটা রেশমের অড়।

ফরাশ নেই। নিজেই জ্বালালে মোম। আতরদান খুঁজে-পেতে এনে রাখল। আতর নেই, গোলাপজলের পাশে নেই গোলাপজল। সে ভাণ্ডারে খুঁজে-খুঁজে দেখলে। আতর পাওয়া গেল, মহার্ঘ আতরের এক বরাট পিতলের ঘড়া। তার সবটুকু খরচ হয়ে গেছে, শুধু তলানি পড়ে আছে। সেই তলানিটুকুই ঢেলে দিলে, আতরদান ভরে উঠল। গোলাপ নির্যাসও মিলল। খানিকটা সূক্ষ্ম পেঁজা তুলো এনে রাখলে পরাতে। এবার উঠে গেল পোষাক মহলে। সেখানে আমামা পাগড়ী, শেরপেঁচ, ট্যারচা, নক্সীদার টুপি, আর নানা রেশমে পশমের খেলাতের সমারোহ। এক পুরুষে পীতাম্বর খানি এত বেশ যোগাড় করেছিলেন—ভাবতেও তাজ্জব বনতে হয়। সে একটা মলমলের পাঁচকলিদার পাঞ্জাবি আর ট্যারচাটুপি পরে নিলে, গায়ে জড়ালে রেশমী বালাপোশ। এখনো শীত যায় নি, ফাল্গুন এখনো আগুন হয়ে ওঠে নি; ত্রিবেণীর মজাহাজা সঙ্গম থেকে এখনো হিমেল হাওয়া আসে, হাড়ে কাঁপুনি তোলে।

বালাপোশখানা গায়ে দিতে গিয়ে শিউরে উঠল গা, কাঁটা দিলে। বাপ তখন আমীর আদমী, লক্ষ্মীকে বেঁধে ফেলেছেন রেশম আর সুতোয়। সেদিন নবাবের কারিগরকে দিয়ে এই বালাপোশখানি তৈরি করেছিলেন। বেছে বেছে নিজের মন-মতো রেশমের উপর ইন্দ্র-ধনুর রং খেলিয়েছিলেন খালদহের তাঁতী দিয়ে। নবাবের বালাপোশের চেয়ে বেশি কিম্মতের হয়েছিল কিনা কে বলবে, তবে নবাবী বালাপোশ হয়েছিল। নবাব মীর কাশেম আলী এ বালাপোশ পেলে গায়ে জড়াতেন, এমন কি দিল্লীর বাদশা'ও 'তোফা' বলে তুলে নিতেন।

কিন্তু অমন বাহারে বালাপোশ হলে কি হবে, ওজনে একটু ভারি হল। মিহি আকন্দ তুলো দিয়েছে কারিগর, মিহিন তুলোর বালাপোশ ওজনে হয়েছে ছয় ছটাক, দেড় পোয়া। অথচ হওয়া উচিত ছিল এক পোয়াভর। তাই বালাপোশ গায়ে উঠল না পীতাম্বরের, তিনি সেখানা আলনায় রেখে দিলেন, আলনায়ই রইল। রাত হলে যখন ফরাশ জ্বেলে দিয়ে যেত রেড়ির তেলের বাতি, তখন তার রূপ দেখে চোখ সার্থক করতেন।

একদিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখলেন, বালাপোশখানা আলনার উঁচু ধাপ থেকে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসছে। পীতাম্বর ভাবলেন, হাওয়ায় বুঝি এমনি হল। কিন্তু তা তো নয়। তুলে রাখলেন বালাপোশখানা। আবার আস্তে আস্তে নেমে এল। এ হাওয়ার কারসাজি নয়, বালাপোশখানাকে দানায় পেয়েছে বুঝি।

পীতাম্বর দত্যি-দানা বিশ্বাস করেন না। বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি কারিগরকে খবর দিলেন। কারিগর এসে উলটে-পালটে বালাপোশখানা দেখলে, তারপরে মেহেদীর খুন মাখা দাড়ি নেড়ে এক গাল হেসে বললে, জনাব, এর ভিতরে কারসাজি ঢুকেছে, ভেলকি সেঁধিয়েছে।

কি ভেলকি—কি কারসাজি?

সে দোপাট্টার সেলাই খুলে ফেললে, আর তার ভিতর থেকে বেরুল বাচ্ছা এক কেউটে। লিকলিকে কেউটে, হিলহিলে সাপ, কিন্তু কি তার ফণা! সেটাকে তখনি মেরে ফেলতে গেল সবাই। পীতাম্বর পানি বারণ করলেন, বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। মা-মনসার জীব, ও চলে যাক! রুপোর বাটি ভরতি দুধ-কলা এনে দেওয়া হল, সাপ খেয়ে সুড়সুড় করে চলে গেল।

কারিগর এবার বালাপোশের রহস্য ফাঁস করলে। বালাপোশের তুলো পেঁজা হলে তাতে মাখায় হেনার আতর। গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে দেয়। সেই হেনার খোশবাই পেয়ে এসে তাতে ডিম পেড়ে রেখে গিয়েছিল কেউটে সাপ। সেই ডিমের একটা কি করে চলে যায় পেঁজা তুলোর সঙ্গে। সেই ডিম থেকে বালাপোশে ছানা ফুটেছে। আর সে দিনের বেলা চুপ করে থাকে, রাত হলে আড়মোড়া ভাঙে।

পীতাম্বর আবার বালাপোশখানা নতুন করে করালেন, সাপের খোলসের মতো হাল্‌কা রুপোলি পাড় দিয়ে তার চারিদিকে ঘিরে দিলেন। এই বালাপোশখানা ছিল তাঁর বড় আদরের। তিনি শীতের দিনে এইখানাই গায়ে দিতেন, হাজার হাজার আশরফির কাশ্মীরী জামিয়ার অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকত। পীতাম্বরের বন্ধু ছিলেন ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামকমল। তিনি এখানির নাম দিয়েছিলেন কঞ্চুক। তার মানে সাপের খোলস।

সেই খোলস গায়ে জড়ালে নীলাম্বর। তারপর ধীরে ধীরে অন্দর মহলে এল। অন্দর মহলেরও দবদবা নেই। এখন আর আত্মীয়া আর

আশ্রিতাদের ভিড় নেই। যাঁরা অনন্যোপায়, এমন দু-একজন মাত্র আছেন। ষোলো ঘুঁটি বাঘচাল খেলার কোট মেঝেয় আছে, কিন্তু সে কোটে সোনার ঘুঁটি দিয়ে কেউ খেলতে বসে না। মাঝে মাঝে আত্মীয়াদের মেয়েরা ডাঁটা শাক টুকরো-টুকরো করে কেটে নিয়ে খেলে। মার আমলে সোনার ঘুঁটি নিয়ে খেলা হত। পীতাম্বর তো বলেছিলেন, তাঁর যদি বাদশাহী থাকত, তিনি সুন্দরী নারীকে ঘুঁটি করে খেলতেন। এক-একজনকে পরিয়ে দিতেন এক-এক রঙা পোষাক আর চালতেন। সে-সাধ পূর্ণ করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি মার সঙ্গে যখন খেলতেন, তাঁর সোনার ঘুঁটিতে দামী পাথর বসানো থাকত। আংরেজদের তাসের খেলাও শিখিয়ে ছিলেন নীলাম্বরের মাকে। আবার বলতেন, সাহেবরা জুয়ো খেলে। সে-খেলাও শেখাবো।

শিখিয়েছিলেন কিনা জানে না নীলাম্বর, তবে তাসের নানা খেলা মা জানতেন। সে তাঁর কাছ থেকে শিখেছিল। আজ আর তাসেব দেখা মেলে না। বাঘচালের কোটগুলো দরদালানে, ঝুল-বারান্দায় পড়ে আছে, রেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, রং উঠে গেছে। এমন কি মার নিজের ঘরের মেঝের ছকও আবছা।

ঢাকার বাসাবাড়িতে, কাশীমবাজারের কুঠিতে নীলাম্বর কাটিয়েছে জীবন। ত্রিবেণীর এবাড়িতে সে এসেছে মাঝে মাঝে। তখন বাহির বাড়িতেই দিন কেটেছে, রাতে গেছে অন্দর মহলে। এখনো রাতেই আসে। আগেকার জমজমাট পুরীতে সে আসত না আত্মীযাদের ভয়ে, এখন আসে না শূন্য পুরীতে নিজের মনের ভয়ে। এলেই অতীত দিন তাকে ঘিরে ধরে, তার রিক্ততাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

তবু আজ সে এল।

ইন্দুরেখা তার ঘরে একা বসেছিল। একজন আশ্রিতা সলতে পাকাচ্ছিল হাঁটুর কাপড় তুলে, আর গল্প করছিল। ওকে দেখেই আশ্রিতা কাপড় টেনে দিলে উরুতে, ঘোমটা টেনে দিলে। সলতের ফালি ন্যাকড়াগুলো ফেলে সে উঠে মাঝখানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইন্দুরেখা একটু ঘোমটা টেনে দিলে মাথায়, অবাক চোখে তাকালে।

নীলাম্বর সটান ঘরে ঢুকেই তার হাত ধরে বললে, চল!

কোথা! অবাক চোখ আরও অবাক, আরও আয়ত।

চল! আজ জলসা আছে।

জলসা?

হ্যাঁ, জলসাঘর সাজিয়েছি।

কিন্তু জলসায় তো মেয়েমানুষের যাওয়া বারণ।

আবার মেয়েমানুষ না হলেও তো জলসা জমে না, নীলাম্বর বলে উঠল

আমি তো সে-মেয়েমানুষ নই, ইন্দুরেখা উত্তর দিলে।

মেয়েমানুষের কি আবার রকমফের থাকে, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই চল!

আমি যাব না।

যেতে হবে। আমি হব সারেঙ্গী, আর তুমি হবে বাঈ। নাচবে-গাইবে আবার আমিই বাবু সেজে পেলা দেব। হীরে-জহরত দেব।

এমন সাধ কেন গেল? ইন্দুরেখা বললে।

সাধ যায় গো, যায়! ফকির হতে পারি, তাই বলে আমিরির সা থাকবে না!

না হয়, তয়ফা হলাম, বাঈ হলাম, ইন্দুরেখা বললে, কি পেলা দেবে তোমার ভাঁড়ার তো ফাঁকা, ভাঁড় তো খটখটে।

নীলাম্বর চিৎকার করে উঠল, গেঁজে থেকে ঢেলে দিলে অনেকগুে সিঁদুরমাখা মোহর। চালের রেকে জমেছিল মোহর, সিঁদুরে চা পড়ে ছিল। বের করল দুখানা কমল হীরে। বললে, বাপ তয়ফাউলি মেয়ের নথ-খসানিতে দিয়েছিলেন মোহরের মালা, আর আমি নীলমণি দত্তে মেয়েকে মুজরো-হুজুরোয় দেব এই মোহর, এই সাত রাজার ধন কম হীরে।

নীলমণি দত্তের মেয়ে তো তয়ফা নয়। ইন্দুরেখা স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলে

জ্বলে উঠল নীলাম্বর, হারামজাদী, তয়ফা নোস, তার চেয়েও তুই অধম

লাল শরাবের বোতল থেকে লাল আরক সে পান করে এসেছে, সে আরকের নেশায় সে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ইন্দুরেখাকে।

তাকে নিয়ে এল জলসাঘরে। লাল শরাবের বোতল থেকে ঢে দিলে তার গলায় খানিকটা শরাব। ইন্দুরেখাও উদ্দাম হয়ে উঠ

পেশোয়াজ পরালে, পায়জামা পরালে, কাঁচল এঁটে দিলে তার বুকে নীলাম্বর। সুর্মা এঁকে দিলে চোখে। সে পোষমানা দাঁড়ের টিয়ার মতো দ্বিরুক্তি করলে না।

তারপরে সারেঙ্গী নিয়ে বসল নীলাম্বর, তবলায় চাঁটি মারতে লাগল।

ভিনিসীয় আরশিতে নিজেকে দেখলে ইন্দুরেখা।

এ কে?

আর্মানী, না য়িহুদা?

নিকি-না-দিলজান বাঈজী! না বিবি বেগবান? না—

ঘোলাটে চোখে দেখলে ইন্দুরেখা। তারপর কখন সারা দেহ নেচে উঠল। পায়ের পাতার নীল শিরায় শিরায় যেন নাচন শুরু হয়েছে, সেই নাচন আঙুলের ডগায় ডগায় সঞ্চারিত। সেই সঞ্চারিত আবেগ শিরা বেয়ে বেয়ে আবার ফিরে চলল পায়ে, জানুতে, জানু বেয়ে উরুতে; উরু থেকে কটিতে। দুলে উঠল কটিতট, দুলে উঠল স্পঞ্জ-সমান নিতম্ব; আবার কটি বেয়ে বুকে উঠে এল, দুলে উঠল কাঁচল। কাঁচলের আড়ালের দুই স্তন, দুই চুচুক। আরও উপরে অধর আর ওষ্ঠ ছুঁয়ে নাসাগ্রে স্ফুরণ তুলে, চোখে কটাক্ষের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে, উঠে এল ব্রহ্মতালুতে, আবার সেখান থেকে নামতে লাগল। কাঁপছে সারা দেহ, আপনা থেকেই দেহ ভাঙছে। মনে হচ্ছে যেন অস্থিহীন দেহ, আর সেই দেহ নাচছে, চোখ নাচছে, স্তন নাচছে, কটিতট, নিতম্ব নাচছে, উরু নাচছে, জানু নাচছে, নাচছে পা। সব ঘুঙুর বাজছে ঝুম; ঝুমা ঝুম; রুমা ঝুম···রুমা রুমা ঝুমা ঝুমা···ঝুম ঝুম, ঝমঝুম। নীলাম্বর লাল শরাবে পূর্ণ করে পানপাত্র এগিয়ে দিল ইন্দুরেখার মুখে। ইন্দুরেখা পান করলে, মুখ এবার একটুও বিকৃত হল না।

ছন্দ যেন সুর পেয়েছে। ইন্দুরেখার ঘুঙুর বোল তুললে আবার। এ-বোল বেতাল বোল, তবু যেন তাল আছে। নইলে নীলাম্বর গুণী, সে কেন বাজিয়ে চলেছে? তালকানা তো সে নয়, তাল কাটায় ভ্রূ তো কুঁচকে উঠছে না।

ঘুঙুর বোল বলছে, উন্মাদ হয়ে উঠছে মন, উতলা ইন্দুরেখার দেহ। কাঁচলে বুঝি বাগ মানে না, পেশোয়াজের খোলসে বুঝি ধরে রাখা যায় না। ছন্দপরী হয়ে উঠেছে দেহ।

নীলাম্বর বলে উঠল, কেয়াবাৎ! গানা-উনা শুনাও তো!

ইন্দুরেখা লাস্যভরে একবার তাকালে। আয়ত লোচনে সুর্মার রেখা আরও যেন নিবিড় হয়ে এল কালো মণির আলো ঠিকরে পড়ে। আর সেই কালোই আলো হয়ে, বিদ্যুৎ হয়ে নীলাম্বরের চোখে গিয়ে নামল। সারেঙ্গী তুলে নিলে নীলাম্বর। ইন্দুরেখা আসমানি রঙের জরীর বুটিদার ওড়নাখানা যেন লীলাভরে উড়িয়ে দিলে। দুখানা পাখনার মতো ছড়িয়ে পড়ল ওড়না। তারপরে আবার গুটিয়ে নিয়ে বাঈজী-ঢঙে বললে ইন্দুরেখা—ফরমাইয়ে জনাব!

নীলাম্বর অবাক হল, কোথায় শিখলে ইন্দুরেখা এ আদব-কায়দা। এতো অন্দরের জিনিস নয়। এ তো বাহির মহলের চিজ। তবে কি অন্দর আর বাহির একাকার হয়ে গেছে এই যুগে! বাঈজীর ভান কি অন্দরবাসিনীরা রপ্ত করছে!

নীলাম্বর এক মুহূর্ত ভাবলে, তারপর লাল শরাবের বোতলটা গলায় ঢেলে দিয়ে মেতে উঠল এই খেলায়। সে বলল,

শুনাও তো ঠুংরি!

ইন্দুরেখা তরল কণ্ঠে হেসে উঠল, তারপরে হাতজোড় করে বললে, মাফি মাঙ্গি! আমি তো জানি না।

যা জানো গাও! ইন্দুরেখা আর এক পাত্র পান করলে লাল শরাব। হাঁটু গেড়ে বসলে, ওড়নায় ঢেকে নিলে দেহ। সম্বৃত মূর্তি। কি যেন ভাবলে চোখ মুদে, তারপর গাইলে :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান-পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
কি আর বলিব সই কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি চিতে সেই সে করিব।

তারপরে কি যেন হল ইন্দুরেখার! সে ঢলে পড়ল, নীলাম্বরের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে অস্ফুট স্বরে বললে,

আমাল বল!

নীলাম্বর সারেঙ্গী ফেলে দিয়ে তার মাথা নিজের উরুর উপরে তুলে নিয়ে বললে—আমাল বৌ!

তারপরে দুজনেই ঢলে পড়ল দুজনের গায়ে।

চোখ মেলল নীলাম্বর। সন্তর্পণে ইন্দুরেখার মাথাটা নামিয়ে দিলে গেদ্দার উপর, তারপরে উঠে দাঁড়াল। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মুখ কেমন যেন বিস্বাদ। সে টলতে টলতে উঠে সোরাইয়ের কাছে গেল। সোরাইয়ে ঠাণ্ডা জল। জল পাত্রে গড়িয়ে নিয়ে পান করলে। একবার পান করে তৃষ্ণা মেটে না, বার বার পান করলে। তারপর মুখে-চোখে, মাথায় জল বুলিয়ে দিলে। শান্ত হয়েছে দেহ, শান্ত মন।

এবার সে ফিরে এল ইন্দুরেখার কাছে। তার চুল এলিয়ে পড়েছে বেণী খুলে, দলিত বেশভূষা, কাঁচল খুলে গেছে, পেশোয়াজের বন্ধ শিথিল। ওড়না-খানি ছিন্ন পালকের মতো ছড়িয়ে আছে। সুর্মার রেখা ধেবড়ে গেছে, চোখ বোজা। তবু অধরে হাসি। অধর যেন কি একটা শব্দ উচ্চারণের মাঝখানে থেমে গেছে, ফাঁক হয়ে আছে। কি যেন সে শব্দ—মেরা শৌহর? না, না, আমাল বল!

নীলাম্বর তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপরে গেঁজের থলেটা খসিয়ে রাখলে ইন্দুরেখার শিয়রে। ইন্দুরেখার গলা থেকে পদকখানা খুলে নিতে গেল। গলায় হাত দিয়েছে, ইন্দুরেখার হাতখানা এসে পড়ল হাতের উপর। কি যেন বিড়বিড় করে বলে ইন্দুরেখা পাশ ফিরে শুলো।

এক মুহূর্ত চুপচাপ।

নীলাম্বর পদকখানার সংযোগের গ্রন্থিটি আস্তে আস্তে খুলে নিলে; ইন্দুরেখা আর সাড়াশব্দ করলে না। পদকখানা হাতে করে সে উঠে দাঁড়াল। গেলাসঝাড়ে এখনো জলছে মোমবাতি। তারই আলোতে য্যালুমিনার নীল পিণ্ড জ্বলে উঠল; যেন অশুভনেত্র কোন অপদেবতার। সে অপদেবতা কে সে ভাবতে পারলে না। কবে যেন দেখেছে, কোথায় যেন দেখেছে ঐ নীল চোখ! সে পদকখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল, আবার কি ভেবে পাঞ্জাবির জেবে পুরে ফেলল।

তারপরে আর একবার তাকালে ইন্দুরেখার দিকে।

ইন্দুরেখা আবার এ-পাশ ফিরেছে।

আবার সেই মুখখানি দেখা যাচ্ছে। অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা তাম্বুে রক্তিমতাকে বুঝি ভিজিয়ে সরস করে তুলেছে।

একবার নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখলে নীলাম্বর, তারপর ধীরে ধীে বেরিয়ে গেল।

৮

এই খালে ঘেরা খালকাটা ক্যালকাটা—কলকাতা।

এ এক আজব শহর, সাহেব-বিবির শহর। আবার কালার শহর
[...]রের শহর—মুসলমানের শহর, জেণ্টুর শহর। ধলার পাট তো কালার
[...]টি। এক কথায় গোরা-কালার চক।

এই চকের খবর আছে, কিন্তু খবরের কাগজ নেই। ফার্সিনবীশরা যাকে
[ব]লেন অখবার। নেই খালকাট্টাই অখবার, খালকাটা সমাচার, ক্যাল-
[কা]টা নিউজ।

তাই এ-শহরের খবর জানতে হলে তেমন-তেমন গুজবনবীশের খবর
করতে হয়। তারা তো জাঁকিয়ে বসে আছে সরাইখানা আর বাজার-
গুলি। সেখানে সবাই আসে। মুরেরা আসে, জেণ্টুরা আসে; রাজা-মহারাজা,
[ন]বাব, হোমরা-চোমরা আদমিদের বান্দারা আসে। আবার বাঁদীরাও আসে,
আসে সাহেব-বিবিদের খিদমৎগারেরা। মশলচী, মশালচী, কেউ বাদ যায় না।
কাফ্রি বান্দা-বান্দিদেরও এই সব জায়গায় অবাধগতি, আবার র‍্যাটান বা
[...]বেতের ভয়ে ফেরারীরা এসে এইসব জায়গায়ই লুকোয়। এমনি সব সরাইখানা
আর বাজার তাই গজিয়ে উঠেছে শহরের সর্বত্র, শহরতলিতেও। সেসব আড্ডার
আড্ডাধারী কখনো বা মেহেদীরঙা মুর মুসলমান—যাদের বলে সাহেবরা
মুর, কখনো বা রংমাখা আর্মানী বিবিরা। সেখানে কাফি তৈরি হয়, পিসপাস
পাওয়া যায় আবার মোরগ-মসল্লামও বাদ যায় না। আরবী হালুয়া
যদি পাওয়া যায় তো অবাক বনতে হয় না। এ-ছাড়া আছে খানদানী
হোটেল, সেগুলি গোরাদের জন্যে। সেখানে কালা আর কুত্তার সমান আদর।
তারা ঢুকতে সাহস পায় না। সেখানে আংরেজী খাবার—ইংলিশ ডিশ।

ভেড়া, হাঁস, কবুতরের রোস্ট, কেক, জ্যাম্, মার্মলেড আর মিল্ক পঞ্চ। আর আছে সুরার সদাব্রত। এমনি হোটেল আছে হার্মনিক, আছে লা গেলেইস আর লণ্ডন ট্যাভার্ণ। সেখানে শ্রীশ্রীযুত নবাব-গভর্নর জেনারেল বাহাদুর আসেন, আসেন কৌন্সিলের সভ্য ফ্রান্সিস-বারওয়েলরা, তাঁদের বিবিরা। আবার সেরা আদালত সুপ্রিম কোর্টের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হাকিমেরাও আসেন। তারাই এখন সেরা কাজী। মিঃ জাস্টিস। তাঁরা যা বলেন, তাই-ই আইন। ইংলণ্ডের আইন জানে না মুরেরা, জেণ্টুরা, তাঁদের মুখের কথাই ইংলণ্ডের আইন বলে মেনে নেয়। ইংলণ্ডের আইন আর তার দণ্ডবিধি কালার উপর তাঁরা অবাধে চালিয়ে দেন। জেণ্টুর চিরাচরিত মনু আর মুরের আইনি-আকবরীকে বাতিল করে দেন।

সাহেব-বিবিরা আসেন, শরাব খান, গল্পগুজব করেন, আবার ব্যাঙের বাজনা আর মশার ঐকতানের তালে তালে নাচেন। তবে নাচের সময় মশার হুল থেকে বাঁচবার জন্যে পায়ে পেজবোর্ড কেটে লেগিং বা পদ-ত্রা· লাগান। আর নাচেন।

বাজনা বাজে, ইতালীয় সুর। আর সেই সুরে সুর মেলায় এস-প্লানেডের থেকে ভেসে আসা শেয়ালের হুক্কাহুয়া, ব্যাঙের ঘ্যাঙানি আর মশার গুনগুনানি।

লা গেলেইস আর হার্মনিকারই রমরমা খুব। এখানে ক্যালকাটা নিউজ মেলে। ক্যালকাটা গসিপ-এরও আড়ত। আর সে গসিপ বা গুজবের রাজা বোল্টস্ সাহেব। সকলের ব্যাপারেই তিনি নাক গলান। খবরের তাঁর এজেন্সীও আছে, আছে সংবাদ-সরবরাহকারী সংবেদক বা রিপোর্টারের দল।

একথা কেউ জানত না, কিন্তু বোল্টস্ সাহেব এক বিজ্ঞাপন দিয়েই তা জানিয়ে দিলেন। কৌউন্সিল হাউসের সামনে লটকানো হল বিজ্ঞাপন। আর তা থেকে জানা গেল, এই শহরে একজন খবরনবীশ আছেন বোল্টস্ সাহেব। তিনি শহরের জরুরী খবরগুলো জানাবার জন্য একখানা খবরের কাগজ বের করতে চান। যন্ত্রপাতি, হরফ সব তাঁর হেফাজতে; কিন্তু লোক নেই সেগুলি ব্যবহারের জন্য। যদি লোক মেলে তো তিনি বিলাতি কেতা-মাফিক এক ক্যালকাটা নিউজ বের করে বসবেন।

কিন্তু যতদিন না তিনি তা বের করতে পারেন, ততদিন তাঁর খবরখানায় এসে যে কেউ ক্যালকাটার খবর জানতে পারেন, নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন। সেখান থেকে খবর টুকে নিয়ে যেতে পারেন, আরও পাঁচজনকে জানাতেও পারেন। তবে যখন-তখন গেলে হবে না। বেলা দশটা থেকে বারোটার মধ্যে যেতে হবে। বিজ্ঞাপনটি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লটকে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে সাহেব-বিবিরা বোল্টস্ সাহেবকে চিনেছেন। তাঁকে তাঁরা এড়িয়েও চলেন। কি কেচ্ছা গাইবেন বোল্টস্ সাহেব তার ঠিক কি!

তাই কোন ট্যাভার্ণে বোল্টস্ সাহেব ঢুকলে সবাই তটস্থ হয়ে যান। বিবিরা বনেট নামিয়ে দিয়ে চোখ ঢাকেন। সাহেবরা হ্যাট ট্যারচা করে বাঁকিয়ে দেন। চোখ ঢাকবার সেও এক প্রচেষ্টা। জোড়া জোড়া সাহেব-বিবি বলনাচের পাঁয়তাড়া কষতে কষতে ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়ান। পিয়ানো থেমে যায়, নৃত্য শিক্ষক কোন সুন্দরীকে হাল ফ্যাসানি স্কচ স্টেপ শেখাতে শেখাতে হঠাৎ অজান্তেই স্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু কি হোটেলে, নাচের আসরে, বারাসতের বাগানবাড়ীতে ও আলীপুরে খোদ্ নবাব-গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের হুইস্‌ট খেলার আসরে বোল্টস্ সাহেবকে 'ঘুসনে মত দেনা' বলে বারণ আছে। সেখানকার খবরও তিনি পান। কি করে পান—একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

নইলে তসবীরওয়ালা ইমহফের বিবির সঙ্গে যে নবাব বাহাদুরের আশনাই—এ-খবর কি করে পেলেন সবাই! নবাব-বাহাদুর জাহাজেই রং লাগিয়ে এসেছেন—একথাই বা কে জানত।

নবাব-বাহাদুর যখন রাইটার ছিলেন, তখন ফৌজী বুকাননের বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন। সে বৌকে খেয়েছেন, বৌয়ের পেটের মেয়েটাকে অবধি খেয়েছেন, একথাই বা কে জানত। কে জানত যে, তাদের কবরের উপরের সমাধিটি আছে কাশীমবাজারের আংরেজের গোরস্থানে।

কেই বা জানত বিবি ইমহফের ভাতার কশিটোলার ছবির দোকানে বসে তাঁর জেণ্টু সরকার রামলোচনের সঙ্গে এই নিয়ে শলাপরামর্শ করেন। বিবি ইমহফও রামলোচন ঘোষকে সালিশ খাড়া করেছেন, যাতে শুভেলাভে বিবাহ-বিচ্ছেদটা হয়ে যায়।

কেইবা জানে যে, ইমহফের বিবির প্রেমে যখন বিগলিত, তখন খোদ গভর্নর-বাহাদুর সুখচর আর আলীপুরে বসান তাঁর জলসার আসর। সেখানে রঙ্গিলা বিবিদের আমদানী হয়, আবার রঙ্গিলা দিশি বাঈরাও এসে দেখা দেয়।

কেই বা জানত, নবাব-বাহাদুরের টাকা যোগান ব্যবসায়ীরা, বোনয়ানেরা, রাজা-মহারাজারা।

শ্রীনন্দেব নন্দন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ নন্দকুমার। তিনি খোদ গভর্নর বাহাদুরকে এসে এর-ওর-তার জন্যে সুপারিশ করেন। আর সুপারিশের জন্যে অমন লাখ লাখ টাকার তোড়া দেন। নিজের ছেলের দেওয়ানি মঞ্জুর করান লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে।

আবার মহারাজ নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের উপরে টেক্কা মারতে যান। তিনি কোম্পানীর পলিটিক্যাল বেনিয়ান হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। তিনি একে-তাকে মারহাট্টার গোয়েন্দা বলে ধরিয়ে দেন।

বোল্টস্ সাহেবের এসব খবর নখদর্পণে। এই নিষিদ্ধ খবরের ব্যবসা করেন বলে তাঁর উপরে আংরেজমহল খাপ্পা। তাঁরা তাঁকে কোথাও ঢুকতে দেন না, বরং এদেশ থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচেন। আবার নন্দকুমার-নবকৃষ্ণেরাও তাঁর উপরে সদয় নন। আর সবচেয়ে নির্দয় তো শ্রীশ্রীযুত গভর্নর জেনারেল বাহাদুর স্বয়ং। তিনি তাঁকে শহর থেকে তাড়াবার তোড়জোড় করছেন।

কিন্তু খবর কি বোল্টস্ সাহেবকে তাড়ালেই চাপা পড়বে। আর একজন সেই খবরের খবরদারির ভার নেবেন। আর হয়তো সত্যই আংরেজী কেতায় এক অখবার বের করে বসবেন। সেখানে ছাপার হরফে গুজব থাকবে, খোশ খবর থাকবে, আবার আসল খবরও বাদ যাবে না।

হয়তো বোল্টস্ সাহেবের পরে আর-এক বোল্টস্ আসবেন যিনি নবাব-গভর্নরবাহাদুরকে ভয় পাবেন না। তিনি হয়তো ছাপার হরফেই লিখে বসবেন—

আমার বিশ্বাস, ভাগ্য আমাকে এই নির্দেশই দিয়েছিল, ভারতে কুশাসক কুপুরুষদের তাড়নার দণ্ড হিসাবেই আমাকে আসতে হবে। কোম্পানীর সম্পত্তির যারা রক্ষণাবেক্ষণ করছে, যারা ব্রিটিশ পতাকার

অবমাননা করছে, ইংরেজের নামে যারা কলঙ্কে কালিমা লেপে দিচ্ছে, আমি তাদের দণ্ড হয়েই এসেছি।

তার জীবন যদি বিপন্ন হয়, তবুও তিনি লিখবেন, আমার ধ্বংসের জন্য বার বার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তবু তো দ্বিগুণ বিশ্বাসে আমি আমার কাজ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছি। অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী শাসককুলের ভ্রুকুটি দেখে আমি তো ভীত হব না।

তারপরেই তিনি হয়তো খোদ নবাব-গভর্নর জেনারেল বাহাদুরকে নিয়ে এক মুখোস নাটিকার অবতারণা করবেন। হয়তো অবতারণা করবেন বিয়োগান্ত নাটকের—কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুবে—

কোর্ট হাউসের নিকট দি নিউ থিয়েটারে একটি ট্রাজেডীর মহলা চলিতেছে। ট্রাজেডীখানার নাম—

উৎপীড়ন বিকাশ নাটক (Tyranny in the Bloom
Or
The Devil to Pay)

অথবা

শয়তানের দণ্ড

আর তৎসঙ্গে থাকিবে রংদার প্রহসন

সকলের ভুল

কুশীলবগণ	অভিনেতাগণ
স্যার এফ্ রংহেড	গ্রাণ্ড টার্ক
জজ জেফ্রিস	ভেনবেল পুলবাণ্ডি
স্যার লিম্বার	স্যার ভিনার প্লায়ান্ট
জষ্টিস্ ব্যালান্স	ক্রাম টার্কি
ইত্যাদি	ইত্যাদি

অভিনেতাদের আসল নামগুলিও মানুষ জানবে। গ্রাণ্ড টার্ক স্বয়ং গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংস, ভেনবেল পুলবাণ্ডি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে। স্যার ভিনার প্লায়ান্ট সুপ্রিম কোর্টের

বিচারপতি মিঃ হাইড। আরও বহু চরিত্র থাকবেন, যাঁরা কলকাতা সাহেব-মহলে কেউকেটা। তাঁরা এখনো আছেন, কিন্তু ইংরেজী কাগজ এখনো বেরোয় নি। এখনো আসেন নি সেই আদর্শবাদী মিঃ জেমস্ অগস্টাস হিকী। তিনি এখন লণ্ডন শহরে কোম্পানীর ছাপাখানার কাজ ছেড়ে ব্যবসার সন্ধানে জাহাজে জাহাজে ঘুরছেন। এখনো 'বেঙ্গল গেজেট' খোলার সময় হয় নি। জান কবুল করে গভর্নর বাহাদুরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তোড়জোড় শুরু হয় নি। খুনের ভয়, জখমির ভয় এখনো তাই দেখা দেয় নি। আর তাঁর কাগজ পোস্টাফিসের মারফত বিলি হবে না, তা বাজেয়াপ্ত হবে, তাঁকে জেলে পাঠাতে হবে—এ ভাবনা এখনো গভর্নর বাহাদুরের স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু এই আদিম ধরনের সংবাদ প্রচারেই খালকাটার খোদ নবাব-বাহাদুর ভীতিগ্রস্ত। বোল্টস্ সাহেবদের চোরাকারবারী বলে নির্বাসন দেবার তালে আছেন।

এতো গেল সাহেব-বিবিদের সমাচার, জেণ্টুদের, মুরদের গুজগুজ ফুসফুসানির কথা কে ভাবে?

সেগুলি এখনো মুসাফিরখানার চার দেওয়ালেই বদ্ধ থাকে, সেখান থেকে উড়ে এলেও কোন জেণ্টুর মনে জুড়ে বসে না। সাহেবদের গায়ে তো লাগেই না। মুখের অখবার ও জিভের অখবার যেদিন কাগুজে অখবার হবে, সেদিন তা সম্ভব হবে। সেদিন ছেনি দিয়ে কাঠ কেটে হরফ তৈরি হবে, আর সেই হরফে উর্দু-ফারসী-আরবী খোঁচ দেওয়া বাঙ্গালা সমাচারের দর্পণ বেরুবে। সে আরশিতে আংরেজী কেচ্ছা হয়তো বেরুবে না, কিন্তু মুরদের, জেণ্টুদের কালা-বাবুদের কেচ্ছা বেরুবে, আমীর লোকদের কেচ্ছা বেরুবে; আবার শিক্ষা, সমাজ, ধর্মের খবরও থাকবে।

হয়তো আজকের দিনের গুজবনবীশের কোন বংশধর সেদিন টিপ্পনি লিখবেন—

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবানেরা রত আছেন, তেঁহ অনুমান করিয়াছেন, যে কলিকাতায় অনেক গভীর নরদামা রহিয়াছে, তাহাতে কোন দ্রব্য পতিত হইলে তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অতএব সে সকল নরদামা বন্ধ করা যাউক।

তাহাতে সেই নরদামা বাসি উন্দুরেরা এই আরজ-নিবেদনে জানাইতে

রহিয়াছে যে ঐ নরদামা বন্ধ করাতে তোমাদের লাভ আছে বটে কিন্তু আমাদের মরণ। সত্যই এক রসিক লোক কৌতুকী হইয়া এইরূপ দরখাস্ত শ্রীশ্রীযুত নবাব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট চালিয়াছে।

কেউ বা শোনাবেন বাবু-ভায়াদের কিসসা। লিখবেন, বাবুগণ বাক্য-বিন্যাসে অতি পটু, যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিতেছে, সেখানে কহেন—বাঃ কি হদ্দ মজা করিয়াছে। নিয়ে যাও—তাহার স্থানে কহেন—লিএজা।···বিদ্যা গোটা কতক বিলায়তী হরফ লিখিতে শিখেন আর আংরেজী কথা প্রায় দুই-তিনশত শিখেন। নোটের নাম লোট, বডিগার্ডের নাম বেনিগারদ—ইহা কহেন।

আবার কেউ বা হয়ত বলবেন শিক্ষার কথা। সমাজের নানা কথা। চুরি, ডাকাতি, ছেনতাই, রাহাজানি কিছুই বাদ যাবে না।

আবার মানুষ নানা বিষয়ে পত্রও পাঠাবে সেই সমাচার দর্পণে।

কোন পণ্ডিত অতিশয় খেদান্বিত হয়ে শ্লোক লিখে পাঠাবেন।

> বিদ্যা কল্প বৃক্ষ ছিল মন্দাকিনী তীরে।
> কুলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে।
> ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোর।
> রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর।
> ··· ··· ···
> মনে খেদ করে বেদ হইল হতাশ।
> গৌড়ভূমি পরিহরি করে কাশীবাস॥

বেদ-অধ্যয়নের অবনতি দেখে পণ্ডিতরা কাশীবাসে যাবেন, আবার ইংরেজী শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবে খালকাটা। সেখানে স্ত্রীশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেন মানুষ। লিখবেন সমাচার :—

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানীং বিদ্যাভ্যাস করেন না, কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই।···ইদানীন্তন মহারানী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী—ইহারা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতি তৎপরা হইয়া অতি সুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যা শিক্ষাতে তাহার দিগের কোন অংশে মানত্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এমনি নানা সমাচারই ঝলসে উঠবে সে-দর্পণে। সেদিন সাহেবরাও বাংলা শিখে প্রস্তাব লিখবেন। কিস্‌সা শুরু করে দেবেন। লিখবেন—

ঘটক মহাশয় আমার বড় পুত্রতির বিবাহ দিব। আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আসুন বিস্তর দিবস গৌন না হয়। ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেক্ কি।…কুলীন-গ্রামে হরহরি বসুর একটি কন্যা আছে সিটি উপযুক্তা।

আবার ফার্সিনবীশ কোন মুন্সী ইতিহাসের লুপ্তরত্ন উদ্ধার করে ফাঁদবেন পুথি। লিখবেন—

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র

যিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে

একবর বাদশাহের আমলে।

আবার কেউ বা ভুষণ্ডীকাকের মতো খালকাটার পুরা কথা শোনাতে বসবেন—এই মহানগর কলিকাতা পূর্বেতে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই শহরকে খালকাটা বলিত।…জব্ চার্ণক সাহেব ইংরাজ কোম্পানির অধ্যক্ষ হইয়া হুগলী হইতে কুঠি উঠাইয়া ১৬৮৯।৯০ সালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং শত বৎসর গত না হইতে এই স্থান এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল। জব চার্নক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ই জানুয়ারীতে পরলোক গত হয়েন।

দর্পণে সব সমাচারই ঝলসে উঠবে, সবাই পড়ে সবজান্তা হবেন, আবার প্রতিবাদ করে লিখবেন পত্র। কিন্তু আজ তো সেদিন নয়।

আজ বোল্টস সাহেবের যন্ত্রপাতি আছে তো লোক অভাবে তা বিকল। সেখানে আংরেজী হরফ পাতা হয় না, ছেপে ওঠে না। তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটান। নিজে গুজব লেখেন, নিজেই পড়েন, আবার দু-একজনকে শোনান। আর সে-সব তো আংরেজী সাহেব-বিবির কেচ্ছা। বাবু-ভায়াদের কেচ্ছা নেই, খালকাটার নীচুতলার মানুষদের কেচ্ছা নেই।

তাই আজ খবর আছে, অথচ অখবার নেই।

আজ কত ইংরেজী সাল ?

কত হিজরি সাল ?

কত বাঙ্গালা সাল ?

আজ ১৭৭৫ ইংরেজী সাল।

হিজরী সালের হিসেব তো এখন বাতিল।

তবে বাঙ্গালা সালের হিসেব আছে বটে।

আজ বাঙ্গালা সাল ১১৮১।

কত তারিখ ?

ইংরেজী তারিখ—৬ই মে।

বাঙ্গালা তারিখ—২৪শে বৈশাখ।

খালকাটায় ভোর হল। কলকাতায় ভোর হল।

নামাজের হাঁক দিলেন মুয়াজ্জিন। মন্দিরে কাঁসর-ঘন্টা বেজে উঠল। সারি সারি নরনারী চলল গঙ্গাস্নানে। বড় বড় পালকি বড়ঘরের পর্দানশিন জেনানাদের নিয়ে ছুটল। আবার পালকিতে চড়ে রাজা মহা-রাজারা, বেনিয়ানেরাও এলেন গঙ্গার ঘাটে। স্নান হতে শ্লোক আওড়াতে-আওড়াতে বাড়ি ফিরে চললেন ওড়িয়া কাহারদের কাঁধে চড়ে। ভোর হল।

কিন্তু সাহেব-বিবিদের ভোর তো হল না। উষার আলো যখন রক্তরঙিন চোখ থেকে নাটা চোখের আলো হল, যখন বেলা বাড়ল, তখন তাদের ভোর হল। তাদের ভোর হল প্রায় বেলা নটায়।

তাঁরা তবু বললেন, এই তো ভোর! এই তো ঈস্টের গোল্ডেন সানরাইজ—এই তো স্বর্ণসূর্যোদয়। কেউ বা তখনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বাগবাজারে, কি নিমতলায় হাওয়া খেতে চললেন; কেউবা ছোট-হাজিরিতে বসে গেলেন। ছোটহাজিরি নামেই। এ এক মস্ত ভোজ। গাণ্ডেপিণ্ডে গিললেন। বিবিরা এবার ক্রহাম-বারোষ হুকুম দিলেন। সকালের আলোয় বেড়াতে যাবেন, ভোরাই হাওয়া গায়ে লাগাবেন। সাহেবরা কাজে মন দিলেন, বা খিদমৎগারকে ধমকাতে লাগলেন। চারজন মানুষের জন্যে একশো-দশটা খিদমৎগার—এই তো সাহেবি কেতা, ধলাদের চাল।

এখন গ্রীষ্মের দিন। নটা বাজতেই অফিস, সাহেবরা চললেন অফিসে। সেখানে নটা থেকে বারোটা কাজ করলেন। আবার কাজ সেই বিকেলে সাড়ে সাতটা থেকে রাত নটা। শীতের দিনে দশটা থেকে দেড়টা। বিকেলের

সময়টা ঠিকই থাকে। ইংলণ্ডে ডেস্‌প্যাচ পাঠাতে হলে সেদিনটা আর সময়ের হিসেব থাকে না।

নটা বেজে গেল, দশটা বেজে গেল, দুপুর হল।

খালকাটার নীচুতলা দুপুরের রোদে কাজে ব্যস্ত। ঘাম ঝরছে দরদর করে। উঁচুতলার কেউ বা পুজো সেরে কাছারিতে গিয়ে বসেছেন, আরজি শুনছেন। সালিশি করছেন। তাঁদের বৌয়েরা, রাঁধুনিরা রাঁধছেন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ; কোন খাঁ-সাহেবের বেগম পান-দোক্তার বাটা নিয়ে বসেছেন। কিন্তু সাহেব-বিবিদের সমাচার রকমফের। মশা আর মাছির জ্বালায় তাঁরা অস্থির। আপিসে, হাত-পাখা দুলছে, কুঠিতে দুলছে, খিদমৎগারদের হাত চলছে।

দুটো বাজল। কাছারি থেকে উঠলেন বাবু। আমলারা উঠল। গিয়ে বসলেন ভোজনে। গৃহিণী-হাতপাখা নিয়ে বসলেন। আর নীচুতলার নাস্তাও শুরু হয়ে গেল। কেউ বা ছাতু মাখলে, কেউ বা ভাতের সানকি সামনে নিয়ে বসল। মাছি হাত দিয়ে তাড়ায় কি না তাড়ায়, গরাস গরাস খায়। দুটো বাজল গীর্জার ঘড়িঘরে। সাহেবরা অনেক আগেই ফিরেছেন, বিবিরা বাতিল রেশমের কাপড় কাব্রাডুলের সবুজ মশারীর ভিতর থেকে বেরুলেন। ডিনারের সময় হল। সুপ বা সুরুয়া হাজির, ভাজা কুঁকড়োও আছে, আছে ঝোল-ভাত, ভেড়ার ঠ্যাং আর ফলের পুডিং ; পনীর আর চমৎকার ম্যাডেইরা। আবার এখন আমের কাল, এই সময়ে হুগলী নদীতে তপসে মাছও মেলে। সাহেব-বিবিদের প্রিয় খাদ্য। আমের কালে মেলে বলে তারা বলেন—ম্যাঙ্গো ফিস ; আবার কেউ বা বলেন—তপসী মচ্ছি। চার তঙ্কায় শ—আর সেই মাছ ভাজা হয়ে টেবিলে বিরাজ করে। মদের সঙ্গে চাট জমায়। মদ আবার আধ আউন্স এক আউন্স নয়, নয় ছোটা পেগ বা বড়া পেগ। বোতল চাই। এক বোতল হলে বিবিদের দিন যায়, সাহেবদের অন্তত চার-চারটি বোতল চাই।

খাওয়া-দাওয়া হল, বাবু ঘুমলেন, গৃহিণীরা ঘুমলেন। যে যেখানে ছিল একটু ভাত-ঘুম দিলে। বাজারে তেজ-মন্দি খেলা চলতে চলতে ঘুমে জড়িয়ে এল দালাল আর ক্রেতাদের চোখ, শেঠ-শেঠিয়ারা তুলার ভাও বাতলাতে-বাতলাতে ঢুলে পড়লেন গদির গেদ্দায় ঠেস দিয়ে। ইটের পাঁজা

টানতে টানতে কিল্লার কামলা ইটের পাঁজা নামিয়ে রেখে একটু বুঝি বা চোখ বুজল। চোখ বুজল গঙ্গার ঘাটের মাল্লা-মাঝিরা। সবাই ঘুম-চোখ, ঘুমের চুমায় মধু-চোখ। সাহেব বিবিরাও ঢুলে পড়লেন কৌচে। পোষাক-আষাক ধড়াচুড়া সব খুলে ফেললেন, উদোম হয়ে গিয়ে শুলেন।

বেলা শেষ হল ঘুমে ঘুমে, ঘুমের কামে, খাটা-খাটনিতে বেলা শেষ হল। সূর্যের লাল চোখ, এখন কটা চোখ। সে চোখে আবার রং লেগেছে। ভোরাই রং নয়, সে তো জাগনিয়া রং। জাগানিয়া রং। এখন ঘুমানিয়া রং, ঘুমের মাতালে রং।

এবার বাবু জাগলেন, চাকরদাসীরা জাগল। হারেমে জাগলেন, সেরাই মহলে জাগলেন বেগমেরা, বান্দাবান্দীরা। আর যারা ঘুমোয় নি, নীচু তলায় সেই মেহনতী মানুষের মনেও সাড়া জাগল। তাদের ছুটির সাড়া। দিন-ফুরানের সাড়া।

বাবুর বাড়ি নাপতিনী এল, নোখ কেটে দিলে, ঝামা দিয়ে পা ঘষে আলতা পরালে, গিন্নীরা ফরাশডাঙ্গার পাছাপাড় উলঙ্গ-বাহার শাড়ি পরলেন। বাবুরা রক্তআঁখি মেলে তাকালেন। তাঁরা শরবত খেলেন। তারপর বেশভূষায় মন দিলেন। বাড়ির জলসাঘরে বসবেন, নয় তো বাগানবাড়িতে যাবেন। রইস আদমী শেঠ-শেঠিয়া, মুঘলদেরও ঐ একই দশা। সাহেব-বিবিরাও ঘুম থেকে উঠলেন। বড় বড় বিবিদের মাইনে-করা ফেরঙ্গ নাপতিনীরা এল। তারা এসেই গজ পমেটমের কৌটো আর ফেদার নিয়ে বসে গেল চুলের কেয়ারী করে দিতে।

খালকাটায় সূর্য অস্ত গেলেন। খালকাটা জেগে উঠল। মন্দিরে মন্দিরে কাসর-ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং ঢং ঢং। মুয়াজ্জিন আর এক ওয়াক্ত নামাজের হাঁক পাড়লেন মোসলমানদের কাছে। গীর্জার পেটা-ঘড়িতেও প্রার্থনার সময়ের ঝংকার দিলে।

সাহেব-বিবিরা এবার হাওয়া খেতে বেরুলেন। কেউ বা ব্রুহাম-রথে। কেউ বা ফীটনে। যাঁদের তা জোটে নি, গাছতলায় ঝোপেঝাড়ে, লালদীঘির ধারে হাওয়া খেতে লাগলেন। কেউ বা আবার পুরানো কেল্লার পাঁচিলে চড়লেন। কেউবা ময়ূর-পঙ্খী পিনিসে ভাসলেন গঙ্গার জলে। সঙ্গে বিবি তো রইলেনই, আবার দু-একটি কাফ্রি বান্দা-বান্দীও রইল। তারা

ফরাসী শিঙা বাজাবে দাঁড়ের তালে তালে। আর সাহেব-বিবি তারই তালে মাথা দোলাবেন, গাইবেন।

রাত হল। লা-গেলেইস আর হার্মনিকায় এখন পান-ভোজনের আসর বসেছে। ছোটখাটো ট্যাভার্ণগুলোও বাদ যায় নি। আবার আর্মানী বিবিদের মুসাফিরখানাও জমজমাট। সেখানেও পানের আসর। তবে সে নিতান্তই মুর আর জেন্টুদের ভিড়, লা-গেলেইসের সাহেব-নবাবদের ভিড নেই। বাবুদের বাগানবাড়ি, খাঁ-খানানদের বাগিচাও এখন বিলকুল সরগরম। সাহেব-বিবিরা কফি পানের পরে এ ওর বাড়ি যাচ্ছেন সামাজিক দেখা সারতে, আবার কেউ বা অতিথির আসার আশায় বসে আছেন। কেউ টুপি পরে আসছেন, টুপি মাথা থেকে না খুলেই দুদণ্ড আলাপ করছেন, আবার বিদায়ও নিচ্ছেন। কাউকে বা গৃহস্বামী বা স্বামিনী টুপি খুলতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। টুপি খুলে রাখছেন অভ্যাগত। তিনি জানলেন রাতের খাবার নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল।

এবার কেউ বা গেলেন হোটেলে, ট্যাভার্ণে—সেখানে গিয়ে নাচলেন, পান করলেন, কেউবা সুর ভাঁজলেন; কেউবা শুধু শুধুই বসে রইলেন। যাঁরা বাইরে গেলেন না, তাঁরা বাড়িতেই তাসের আসর, গানের জলসা বসালেন। আবার কৌন্সিলর ফ্রান্সিস, জেনারেল ক্লেভারিং জুটলেন হয়তো বারওয়েলের বারাসতের শিকার-ভবনে। সেখানে তেরো তাসের আজব খেল্ হুইস্টখেলায় আসর বসল। সে খেলে এক-একবারের বাজী পাঁচ মোহর। যে জন পার লুটে পুটে নাও। ফ্রান্সিস সাহেব তো খুব লুটলেন। তাঁর তাসের পয় খুব। কেউবা ছুটলেন পার্টিতে। খোদ শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব-গভর্নরের বাড়ির পার্টি হলে তো ভালই। সেখানে রূপসী বিবিদের মেলা। সাজ-পোষাক-ফ্যাসানের পসরার হাট। ঐ তসবীরওয়ালার বিবি, যাঁর জন্যে নবাব-বাহাদুর বিরহে নীল, যাঁর জন্যে কৃশতনু, সেই তিনিও আসেন। এখনো তসবীরওয়ালার তাল্লাক দেয় নি, কিন্তু তবু কি দেমাকী! কারো দিকে তাকান না, নিজের রূপে নিজে মশগুল। কারো দিকে তাকালেন, তো তাকে ধন্য করলেন। নিজের গলায় পায়রার ডিমের মতো মুক্তোর মালা নাড়েন-চাড়েন আর আরশিতে নিজের রূপ দেখেন। আর বাঙ্গালী কবি না দেখেও বলেন, নয়তো এক লহমার দেখা দেখেই বলেন—

কি বা শোভে মুক্তাহার শ্বেতাঙ্গার গলে!

কিন্তু এ-হার ছড়ার হয়তো ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস কি জানেন কবি? হয়তো ওটি খোদ নবাব বাহাদুরেরই দান। কিন্তু নবাব-বাহাদুর অতো দামী মালা পাবেন কোথায়? বেতন তো তেমন নয়। তবে কি লোকে যা বলে তা ঠিক! তবে কি আর কারো ঘুষের দান! তা হবে—নবাবী করতে গেলে ঘুষঘাস তো চাই। ঘুষঘাস না হলে বৃথাই গভর্নর বাহাদুর বাঙ্গলার গভর্নর-জেনারেল বাহাদুর হয়েছেন। বৃথাই তাঁর সাদাসিদে জীবন যাপনের ভড়ং। এই ভড়ং দেখিয়েই তিনি নিজে সাধু সাজেন আর পকেট ভরেন। অথচ নিজে তো হাড়-কঞ্জুস। বোন ইংলণ্ডে বসে সেলাই করে দেন জামাজোড়া, তাই পরেন। আর দেখান তিনি ফকির।

যাহোক, সাহেব বিবিদের মাইফেল চলুক, বাবু-ভায়াদের মাইফেল চলুক। তাঁদের গিন্নিরা মখমলের শেজ পেতে রেখে মেঝয় আঁচল পেতে ঘুমোন। আর মেহনতী মানুষরা ঘুমোক প্রশান্ত ঘুমের কোলে। নগরে এখন রাত হল। দশটা তো বাজল।

আজ ৬ই মে, আজ রাতের ঘড়িতে দশটা বাজল। আজ ২৪ বৈশাখ—বৈশাখের সন্ধ্যায় কালবেশেখী বয়ে যায় নি। তাই ঠাণ্ডা হয় নি খালকাটা—কালীরথান কলকাতা। জুড়োয় নি। বট-অশথের পাতায় লাগে নি জলের ঝাপটা, ঝড়ের ঝাপটা। চেকনাই তার নেই। আজ বৈশাখ, তবু কালবোশেখা বয় নি।

কিন্তু কাল বোশেখী না বইলেও ঝড়ের ঝাপটায় যেন তছনছ হয়ে গেছেন হাকিম সাহেব শ্রীশ্রীযুক্ত লামেস্টার। তিনি এখানকার ফৌজদারি আদালতের হাকিম। সিটিং ম্যাজিস্ট্রেট, যাকে দেশি মানুষ বলে—ম্যাজিস্তর। তাঁর বন্ধু মিঃ জাষ্টিস হাইডের দশাও একই রকম। এ-আইনের কেতাব ঘাঁটছেন, ও-কেতাব ঘাঁটছেন। টেবিলের উপরে, কৌচের উপরে, কেতাবের গাদা। সেগুলির পাশে লাল শরাবের বোতল আর গেলাস। আবার সাদা জলও আছে। তাতে বরফের কুচি। এই বরফ জমানো হয় হুগলীতে। হুগলীর বরফখোলা বা আইসফিল্ড থেকে তা আসে ক্যালকাটায়। আবার রয়েছে বিরাট ফরসি, তাতে সোনালী নল ঝকঝক করছে সাপের মতো। কিন্তু মুখ দেবারও ফুরসত নেই।

লামেস্টার এবার কেতাব সরিয়ে রেখে কৌচে গা এলিয়ে দিলেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ফরসির নলটা তুলে নিলেন। আগুন নেই কলকেয়। ডাকলেন হুঁকাবরদারকে, কোঈ হ্যায় !

হুঁকাবরদার বাইরেই ছিল, ছুটে এল।

আগ্ আউট-নিভ গয়া ! ছিলিম পাল্‌টাও ! হাকিমসাহেব হুকুম দিলেন। পালটে ছিলিম সেজে দিলে হুঁকাবরদার, সাহেবের হাতে নলটি তুলে দিলে। সাহেব ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

ওঃ হোয়াট এ টায়ারিং ডে ! কি মেহনটীর ডিবস !

জাষ্টিস হাইড এতক্ষণ কি লিখছিলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, উই হ্যাভ ওয়ার্কড্ দি হোল ডে ! সারাডিবস কাম করিয়াছে, নাউ ইট ইজ টেন !

বাট—মিঃ জাষ্টিস—সণ্ডেহ কি নাই ? ইজ দেয়ার নো ডাউট ?

নো ডাউট—কুছ সণ্ডেহ নাই। হাউড্ মাথা নাড়লেন। সুপ্রিমকোর্টে যখন বিচারাসনে বসেন, তখন এমনি মাথা দোলান। পরচুলা দুলে দুলে ওঠে।

ক্রাউনের এ সম্পর্কে সণ্ডেহ নাই ?

না, মিঃ লামেস্টার, আপনি টো ডেখিলেন।

আই থিঙ্ক সো ! হামারও ইহাই মনে হয়।

টাহা হইলে গ্রেফটারি পরোয়ানা অড্যই পাঠাইয়া দিন, বিচারক হাউড বললেন।

হাকিম লামেস্টার এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, বাট্—বুলাকিডসের ডকুমেণ্টটি কি একজামিন করিয়াছেন ?

হাঁ, উহা পাকা নহে, এ ফোর্জড ডকুমেণ্ট।

কিন্তু ফোর্জারার কে টাহা জানেন তো ?

জানি, সে গভর্নর জেনারেলের শট্রু—এনিমি—দুশমন্।

টাইটো সাবঢানের আশ্রয় লইটে হইবে।

সাবঢান আবার কি ! ব্রিটিশ আইন হামাডিগের পক্ষে। ফোর্জারী মিন্স ডেথ। জালিয়াতির দণ্ড মৃত্যু !

বাট—ইহা ইংলিশ সয়েল—ব্রিটিশ মাটি নহে।

হ্যাঙ্গ ইট ! যে সয়েলই হোক, বেঙ্গাল। ইংলণ্ডের মাটি—ইহা ইংলিশ আইন-মাফিক চলিবে।

টাহা হইলে গ্রেফটারী পরোয়ানা লিখিয়া ফেলা যাউক। ওয়ারাণ্ট অফ্ য়্যারেষ্ট প্রষ্টুট করিয়া ফেলি।

হামি প্রষ্টুট করিয়াছে। হিয়ার ইট ইজ—এই তো—

To

The Sheriff of the Town of Calcutta and Factory of Fort William in Bengal, and to the keeper of His Mafesty's prison at Calcutta,

Receive into your custody the body of···here with sent you, charges before us upon the oaths of so...so, with feloniously uttering as true a false and counterfeit writing obligatory, knowing the same to be false and counterfiet, in order to defraud the executors of so & so, deceased, and him safely keep until he shall be discharged by due course of law.

কলিকাতা নগরী এবং বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়াম ফ্যাক্টরীর শ্রীশ্রীযুত শেরিফ মহোদয় এবং মহারাজাধিরাজ ইংলণ্ডাধিপতির কলিকাতার কারাধক্ষ্য বরাবরেষু—

আপনাদিগের হেফাজতে অমুকের দেহটি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে প্রেরিত হইল। অমুকের হলফ করায় তেহ অতিযুক্ত হইলেক, তেহ একটি জাল দলিল পাপ উচ্চারণে সত্য বলিয়া উক্তি করিয়াছে, তেঁহ জানিত যে এ মিথ্যা এবং জাল, তাহা জানিয়াও অমুকের ওয়ারিশানদিগরে প্রতারিত করিবার জন্য খত করিয়াছে ও এমতবিধায় তেহকে নিরাপদে রক্ষণের নিমিত্ত আপনাদের নিকটে প্রেরণ করা হইল। যে পর্যন্ত আদালতে আইনের দ্বারা খালাস না হইবেক, সেই পর্যন্ত তেহকে আপনাদিগর নিকট নিরাপদে আবদ্ধ রাখিতে হইবেক।

পরোয়ানা একসেলেণ্ট হইয়াছে, লামেস্টার বললেন, বাট—দি নেমস্ আর টু বি মেনশনড—নাম বসাইয়া ডিতে হইবেক।

দ্যাটস ফর ইউ—হাইড হাসলেন।

বাট—জাষ্টিস চেম্বার্স কি বলিবেন? টিনি তো উহার এগেইনষ্টে ডাডাইবেন—ফিলিপ ফ্রান্সিস কি বলিবেন?

ফ্রান্সিস বি ব্লোন! আর ঐ আইননবীশ—ছাট ল-ইয়ার ফেলো চেম্বার্স—গো টো হেল! হামরা যাহারা আইন জানে না, টাহারা আইনকে ঘায়েল করিয়া ডিবে! জাহান্নামে যাউক ফ্রান্সিস! উই আর গভর্নর জেনারেলস-মেন—হামরা টাহার আদমী।

আর উই হিজ হ্যাঙ্‌মেন? হামরা কি উহার জহ্লাড?

দেন ডু হোয়াট ইউ থিংক—আপনার যাহা বিবেচনা টাহাই করুন। ব্রিটিশ জাষ্টিসের, ব্রিটিশ আইনের অমর্যাডা করিবেন না!

হামি করিবে না! লামেস্টার বলে উঠলেন। ব্রিটিশ জাষ্টিস শুড হ্যাভ টু বি আপ্‌হেলড। ব্রিটিশ আইন, ব্রিটিশের বিচার বজায় রাখিটেই হইবে। বাট—উহা কি এখানে চলিবে?

চলিবে। হাইড আবার মাথা নাড়লেন। বেঙ্গালা তো দোসরা ইংল্যাণ্ড। আপনি নাম বসাইয়া অড্য রজনীতেই পরোয়ানা পাঠাইয়া দিন। গুড নাইট! টুপি তুলে নিয়ে শুভ রাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন মিঃ জাষ্টিস হাইড।

লামেস্টার ফরসির নলটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর টেবিল থেকে লাল পানীয়ের গেলাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন। আবার নলটা তুলে নিয়ে বললেন,

ইট ইজ য়্যান ইল উইণ্ড, দুষ্ট বাতাস বহিল, উহাটে কাহারো ভালাই নাই!

মুখোস-নাচ চলছে, মাস্ক-বল।

নানাবর্ণী গাউন আর ফ্রককোট নাচছে জোড়ায় জোড়ায়। বুকে বুকের ছোঁয়া, উরুতে উরুর ছোঁয়া। মুখ মুখের কাছে এসে থেমে যাচ্ছে, মুখোসের ভিতর দিয়ে চোখ চোখের দিকে তাকাচ্ছে।

কারো চোখ দেখে চিনতে পারলে ভাল, না পারলেও ক্ষতি নেই। দুটো মিঠে কথা বললেই চুকে গেল। হয়তো বলছে এক মুখোস আর-এক মুখোসকে; এক গাউন আর-এক ফ্রককোটকে আবার ফ্রককোট গাউনকে—

যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে চোখ দুটি!

ঐ স্বরও তো চেনা চেনা লাগছে!

স্বর না চিনলে ক্ষতি কি!

ক্ষতি কি চোখ না চিনলে!

ক্ষতি নেই, কিন্তু সর্বনাশ তো আছে।

সর্বনাশ! অবাক চোখে তাকাচ্ছে গাউন।

সর্বনাশ তো বটেই, বিশখানা তলোয়ারের চেয়েও সর্বনাশ ঐ চোখে। ফ্রককোট উত্তর দিচ্ছে।

হা ঈশ্বর! গাউনও অভিনয় করছে।

ব্যাণ্ড বাজছে, কথা ডুবে যাচ্ছে ব্যাণ্ডের বাজনায়। আবার বুকে বুক হাতে হাত, পায়ের জুতোয় জুতোয় বাজছে তাল। কাঠের মেঝের উপর যেন বৃষ্টি ধারার মতো পড়ছে। টিপ, টিপ, টপ টপ, টপর-টপর। টুপুর টপর, টাপুর টুপুর। প্যাট প্যাট প্যাটার প্যাটার!

সবারই মুখে মুখোস, পায়ে নাচ। কারো কারো জুড়ি জোটে নি: পুরুষের জোটে নি মেয়ে, মেয়ের জোটে নি পুরুষ। তারা এখানে-ওখানে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মুখোসের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আর এক পালার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দেয়ালের ফুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজী কেতায় যাকে বলে—ওয়াল-ফ্লাওয়ার। কেউ বা চকস্ কি বাগাণ্ডীর বোতল নিয়ে বসে গেছে নাচের আসরের হদ্দার বাইরে। কেউবা একপালা সেরে জিরুচ্ছে। ওদিকে নাচ চলছে; যেন বর্ষা, যেন বর্ষাবরষনধারা, যেন ঝরনাঝরনধারা, বরষনঝরনধারা।

ওয়াল-ফ্লাওয়ার হয়ে দেয়ালের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল মুখোসধারিণী একটি মেয়ে। গাউন আর ফ্রক-কোটের দোদুল্যমান সমারোহ সে দেখছিল। এবার ব্যাণ্ড থেমে গেল। জোড়া জোড়া পা নাচতে-নাচতে স্তব্ধ হয়ে গেল। হাত থেকে হাত শিথিল হয়ে খসে পড়ল, বুক থেকে বুক আল্‌গা হয়ে এল; চোখ তখনো চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। দীঘল চোখের দীর্ঘায়ত দৃষ্টি। হয়তো সে-দৃষ্টির জের চলবে হলঘরের বাইরে নিভৃত কোণে, হয়তো বা বাগানে, যেখানে মৌসুমী ফুলের সঙ্গে দিশি ফুলের মিলন ঘটেছে।

মুখোসধারিণী এবার ধীরে ধীরে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে,-এমন সময়

আর-একটি মুখোসধারিণী তার কাছে এল। সে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে—

কে গো, যেন চিনি-চিনি! লেডী ডে নাকি?

মেয়েটি বললে, না।

তাহলে কে? লেডী য়্যান? কিন্তু তিনি তো ওয়াল-ফ্লাওয়ার হতে রাজী নন।

আমি কিন্তু ওয়াল-ফ্লাওয়ার হতেই রাজী, প্রথমা বললে।

দ্বিতীয় মুখোসধারিণী হেসে উঠল, দায়ে পড়ে—তাই না?

তা যা মনে কর! এই বলে প্রথমা চলে যাচ্ছিল।

দ্বিতীয়া বাধা দিয়ে বললে, তুমি লেডী য়্যান নও, বেনেডিটা রামুস্‌ও নও, তুমি—কে?

আমার পরিচয় জেনে তোমার লাভ কি?

লাভ নেই, কিন্তু নাবাবেসদের ভিতরে নিচুতলার কথার টান পেলে একটু অবাক লাগে।

তা তোমার কথার টানেও তো উঁচুতলার আভাস নেই।

তা নেই-ই তো।

তাহলে আমারও নেই।

দ্বিতীয়া টান মেরে প্রথমার মুখোসটা খুলে ফেলে বলে উঠল, আরে মেরী যে!

সারা, তুমি এখানে!

আমিও তো তোমাকে শুধাই, দ্বিতীয়া বললে, কোন্ হাওয়া তোমাকে এখানে বয়ে নিয়ে এল? আমাকে এনেছে এক জাহাজী লস্কর। তোমাকে?

আমার হাওয়াটি লস্কর নয়, এক পাদরী।

তারপরে পাদরীর পাদরিণী হয়েই আছ?

না, এখন একেবারে স্বাধীন জেনানা, তবে আসল জিনিসের ফেরি করিনে। গজের পিরামিড, ফিতে, পালক, পমেটম, পাউডার নিয়ে আমার কারবার, মেরী বললে।

ম্যান্সভার-এর ওখানে কাজ কর বুঝি? ঐ যে হার্মনিকা ট্যাভার্ণের পেছনে। কই সেখানে চুলের কেয়ারী করাতে গিয়ে তো তোমাকে দেখি নি।

না, ম্যালভার নয়, লালবাজারে আমার ডেরা। সেখানেই আমার নিজের সেলুন।

তাহলে আছ ভাল?

ভাল আর কই? একটা মনের মানুষ জোটাতে পারলাম না!

তা দেখে নাও না, ঢের আছে!

তুমি বুঝি নিয়েছ?

নিই নি—লস্করকে নিয়েই থাকব বুঝি! সেটা তো কলের মানুষ। সাধের মানুষ ধরব না? নবাব ধরব না?

নবাবটি কে?

সেরা নবাব—দেখবে চল!

মেরীকে টেনে নিয়ে চলল সারা।

হলঘর ছাড়িয়ে ওরা বারান্দা পার হয়ে আর এক ঘরে এসে ঢুকল।

সারি সারি টেবিল পাতা। আর সেই টেবিলে, কোথাও বা দুজন, কোথাও বা তিনজন; কোথাও বা চারজন গোল হয়ে বসেছে। কারো বা সুমুখে দাবার ছক; কারো বা তাসের প্যাকেট। পুরুষ-মেয়ে দুই-ই আছে। কারো মুখেই এখন আর মুখোস নেই।

তাস ভাঁজছে; বিলি করছে। কোথাও তিন তাসের ট্রাডেলি, কোথাও বা পুট, কোথাও বা পাঁচ তাসের লু; আবার কোথাও বা সর্ট আর লং হুইস্ট। ডুপ্লিকেট হুইস্ট। হুইস্টের আসরই সরগরম। তেরো তাস বেঁটে বেঁটে নিচ্ছে চারজন খেলোয়াড়। দুজনে দুজনে জুটি। এক-এক রাব বা বাজী চলছে বহুক্ষণ ধরে; আবার ডুপ্লিকেট খেলায়—দুপক্ষ দুপক্ষের হাত বদলে নিচ্ছে! পয়েণ্ট লেখা হচ্ছে, আবার রাবটি হয়ে গেলে পয়েণ্ট-প্রতি এক মোহর থেকে দশ মোহর গুনাগার দিতে হচ্ছে হেরো পার্টিকে। যত বেশি বাজী, তত জবর খেলা।

একটা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল মেরীকে নিয়ে সারা।

টেবিলে চারজন খেলছে। দুটি পুরুষ আর দুটি মেয়ে। একটি পুরুষ একটি মেয়ে জুড়ি।

সারা ফিসফিস করে বললে, ঐ যে উনি, ঐ যে লম্বা সুন্দর চেহারা, ফ্রককোট-পরা পুরুষ—ওঁকে চেন?

পুরুষ ঢের চিনেছি, এখন মেয়েদের নিয়ে আমার কারবার, মেরী বললে।

সারা বললে, ঢের পুরুষ চিনলেও ওঁকে দেখে অরুচি হয় না, উনি পুরুষের মধ্যে জেম। তবে জেমটি ওঁর স্ত্রীর হেফাজতে। তিনি সাতসাগরের পাড় থেকে খপরদারি করেন।

আর উনি সেই খপরদারি মানেন? মেরী হেসে শুধালে।

মানেন কি না, এখনো পরখ করে দেখা হয় নি।

আর উনি? আর একটি দীর্ঘদেহ পুরুষকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল মেরী।

উনি রিচার্ড বারওয়েল, উনি নবাবকেও নবাবিতে হার মানান। জুয়োর রাজা।

আর তোমার কে? হেসে শুধালে মেরী।

শুনেছ বোধহয়, ফিক্ করে হাসলে সারা—আমি নবাবের রঙের বিবি।

কিন্তু টেক্কাটি কে?

টেক্কাটি—ঐ যে যিনি বসে আছেন, সারা একটি রূপসীকে দেখিয়ে দিলে ঐ যে মিস ক্লেভারিং। ওঁকে নাকি বিয়ে করছেন নবাব—বাজারে সেই গুজব।

আর উনি? চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে মেরী।

উনি লেডী য়্যান মনসন, বয়সে ছুঁড়ী নন, কিন্তু পাকা খেলুড়ে। আর রসিকাও খুব। উনি বলেন খোদ গভর্নর জেনারেল নাকি ওঁর বাপের বাজার-সরকারের বাস্টার্ড—জারজ সন্তান।

তাই নাকি? মেরী আবার হাসল।

ওরা খেলার টেবিলে গিয়ে দাঁড়াল। খেলুড়েদের কোন দিকে দৃষ্টি নেই। ওদের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার খেলায় মেতে উঠল।

একটা রাব হয়ে গেছে, ফ্রান্সিস আর শ্রীমতী য়্যান বহু টাকা জিতেছেন। ফ্রান্সিস বলে উঠলেন,

হেল্লো নবাব, কি হল! আজ যে শুধু রাবের পর রাব হারছ! কোন মতলব নেই তো? ফ্রান্সিস হাসলেন।

মতলব? বারওয়েল একবার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

ঘুস দিচ্ছ না তো?

ঘুষ কেন দেব ?

মুখ বন্ধ করার জন্যে।

লেডী য়্যান হেসে উঠে বললেন, ফ্রান্সিস ঠিক কথাই বলেছেন। মিঃ বারওয়েল হয়তো খোদ গভর্নরের সঙ্গে যোগসাজসে আজ বাজীর পর বাজী হারছেন।

বারওয়েল বলে উঠলেন, বারওয়েল চিরদিনই হারেন। তাঁর মতলব নেই। টাকা চাও, বারওয়েলের কাছে এস, বারওয়েল টাকা দেবেন।

দেবে ? ফ্রান্সিস বলে উঠলেন—সত্যি নবাব—কত দেবে ? আমি টাকা চাই, আমি টাকা ভালবাসি। আই উইল হ্যাভ্ মনি।

টাকা তো নিচ্ছই ফ্রান্সিস। রোজই তো নিচ্ছ, বারওয়েল বললেন।

ফ্রান্সিস বললেন, কিন্তু আজ যেন কেমন লাগছে।

কিন্তু এ তো চৌদ্দই মার্চ নয়। চৌদ্দই মার্চ হুঁশিয়ার। বিওয়ার অফ দি আইড্স্ অফ্ মার্চ! সেকথা তো বলতে পারবে না—আজ ৬ই মে! বারওয়েল বললেন।

৬ই মের কি হুঁশিয়ারী নেই ? ফ্রান্সিস শুধালেন।

কেন—কেন ?

জানি না—আজ রাতে কি ঘটবে—কে জানে! হু নোস হোয়াট মে হ্যাপেন টু নাইট।

নাথিং! বারওয়েল হেসে উঠলেন, নাথিং। শুধু তোমার কয়েক শ পাউণ্ড বাড়বে।

বাড়বে ?

হ্যাঁ, বারাসেটের হান্টিংলজ-এ বেড়েছে, আজ বারওয়েলের আলীপুরের বাগানবাড়ীতে বাড়বে।

কিন্তু আজ যেন শুধু শুধু জিতিয়ে দিচ্ছ বারওয়েল ?

হা হা করে হেসে উঠলেন বারওয়েল। শুধু শুধু কেউ টাকা দেয় ?

তোমার লামেস্টার কোথায় ?

হাকিম লামেস্টার তার টাকা উসুল করে নিয়েছে, আর আসে না। তার মিসেসের বারণ।

ফ্রান্সিস হাসলেন, ভারি মিসেস-নিষ্ঠ তো! আর জাষ্টিস হাইড ?

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন বারওয়েল, তাঁর কথা কেন?

তোমরা তো একই পালকের পাখী!

নাও তাস ভাঁজ তো! জুড়িয়ে যাচ্ছে—বারওয়েল বলে উঠলেন।

রাইটও! এবারেও তুমি হারবে। ফ্রান্সিস তাস ভাঁজতে লাগলেন।

তাস বিলি করা শুরু হল। চার ভাগে তাস জমে উঠেছে। হঠা একখানা তাস উলটে গেল।

লেডী য়্যান সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মাই গড্! এ তো এস অব স্পেডস—ইসকাবনের টেক্কা।

ফ্রান্সিস হেসে শুধালেন—কার ভাগে পড়ল?

বারওয়েল বলে উঠলেন—আর কার ভাগে পড়বে! আমার ভাগে আমার লাকই এমনি।

ফ্রান্সিস বলে উঠলেন—ইউ আর এ হেঞ্চ-ম্যান, ইউ উইল বি এ হ্যা ম্যান। তুমি ছিলে দাস, হবে জল্লাদ!

কার?

অফ দি গ্রেট নবাব—গ্রেট মুঘল—সেই বিরাট নবাবের, বিখ্যাত মুঘলের গভর্নর-জেনারেলের।

কার উপরে জল্লাদের খড়্গ পড়বে? মিস ক্লেভারিং কৃত্রিম ভ বলে উঠলেন। আমার উপরে তো নয়!

নো-নো! বারওয়েল হাসলেন।

তাহলে আমার উপরে—না, কোন জেন্টু কি মুরের উপরে? ফ্রান্সি বলে উঠলেন।

হয়তো তাই, নাও ডাক!

মেরী আর সারা আর এক টেবিলের দিকে এগিয়ে চলল।

লাল বাজারের হার্মনিকা ট্যাভার্ণ এখন জমজমাট, লণ্ডন ট্যাভার্ণেও ভি গিসগিস করছে; লা-গেলেইসের ট্যাভার্ণের তো কথাই নেই। এখন স রাত দশটা, রাত এখনো তরুণ। তারুণ্য ঘুচতে এখনো তার ঢের দেরি এগারোটা, বারোটায়, একটায়ও সে-যৌবন থাকবে, তারপরে সে হ জরতী নারী। কিন্তু তার এখনো ঢের বাকি।

কিন্তু কশিটোলার এই মুসাফিরখানায় রাতের সে-যৌবন নেই। সে যেন সুরতগ্লানি-কাতরা নারীর মতো। জড়িয়ে আসছে তার চোখ, টিমটিমে বাতিতে তার পরিচয়। ফাঁকা ঘরে তার পরিচয়। এ টেবিলে, ও-টেবিলে দু-একজন ছাড়া-ছাড়া মানুষে তার পরিচয়। এখনো আভাস আছে জাগরণের, কিন্তু আর থাকবে না। যে-কোন মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়বে।

ঐ যে পাখের কলমে খাতা লিখে চলেছে হিসেব-নবীশ, সেও তার খাতা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে। তারপর কশিটোলা থেকে পাড়ি দেবে। হয়তো যাবে বহুবাজারের ডেরায়, নয় তো মচ্ছি-বাজার পার হয়ে যেখানে শিমুল ফুল ফোটে লালে লাল হয়ে—সেই শিমুলিয়ায় ; নয় তো যেখানে ছিল হিন্তাল বা হেতাল বন—সেই হিন্তালী-ইটলীতে ! কিন্তু এখনো সময় হয় নি, সন্তজনের গীর্জায়, সন্ত য়্যানের গীর্জায় এখনো পেটা ঘণ্টা বাজে নি, কাছে-পিঠের আর্মানী গীর্জায়ও প্রার্থনার ঘোষণা বেজে উঠে নি।

তাই পিসপাসের হিসেব লিখছে হিসেবনবীশ, পেলাউয়ের জাফরানের হিসেব টুকছে, আরবী হালুয়ার চিনি আর মেওয়ার খরচ জমা করে নিচ্ছে ; আবার খদ্দের কি খেয়ে গেল, ক পেয়ালা কাফি—তারও তুলছে হিসেব। মাঝে মাঝে দাড়িগোঁফে ভরা মুখে হাত বুলোচ্ছে, আঙুল বুলোচ্ছে।

একটা ফেরঙ্গ ছোকরা দাম মিটিয়ে দিতে এল। কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল হিসেবনবীশ। তার অলস চোখ জ্বলে উঠল।

ছোকরা ফিরিস্তি দিলে খাবারের, সে দাঁতে দাঁত চেপে শান্ত সুরে বললে, পাঁচ সিক্কা।

ছোকরা ঝনাৎ করে সিক্কা ফেলে দিয়ে চলে গেল। একটা কাঠের বাক্স, ওপরটা ফুটো, তার মধ্যে গলিয়ে ফেলে দিলে সিক্কা। একবার থুতু ফেললে, তারপরে বললে,

হার্মাদ ! জালিম !

আবার হিসেব নিয়ে পড়ল। এখনো খদ্দের বিদেয় হয় নি, তাদের খাবার দাম‍ও নিতে হবে।

সে একবার চারিদিকে তাকালে। রুথ মালিকানীর মেয়ে। রুথকে কোথাও দেখতে পেল না। এমনি তাকে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু

এই সময়ে রোজ আসে। এসে হিসেবনবীশের কাছে দাঁড়ায়। সুর্মা আঁকা চোখ ঘুরিয়ে বলে, কেমন আছ?

হিসেবনবীশ বিড়বিড় করে, কথা বলে না।

আবার রুথ বলে, আজ যাবে?

হিসাবনবীশ বলে, আমার জরুরী কাজ।

তোমার তো রোজই কাজ, আজ আসতেই হবে।

আমায় কটা টাকা দাওনা বিবি! ফস করে বলে ফেলে হিসাবনবীশ।

রুথ তাম্বুল-দোক্তা-চর্চিত দন্ত বের করে বলে, সব দেব, আগে আসে বল?

রোজই এমনি হয়। যায় না, টাকাও পায় না। সে চারিদিকে তাকিয়ে রুথকে আজ দেখতে পেলে না। অথচ টাকার তার দরকার। মাইনে তিন তঙ্কা আজ ক'মাস ধরেই বাকি। বিবি টাকা চাইলেই রুথকে দেখিয়ে দেয় রুথ দেখায় কলা!

ঐ যে কোণে জানালার ধারের টেবিলটা, ওখানে জাঁকিয়ে বসে আছে তিনজন। একজনের গায়ে ফিনফিনে মলমলের কলিদার পাঞ্জাবি, মাথায় বাঁকা করে পরা নক্সীদার টুপি। আর দুজনের পরনে আচকান আর আমামা পাগড়ী। ওদের কথা কান পাতলে শোনা যায়, না-পাতলেও শোনা যায়। বেশ জোরালো স্বরে কথা বলছে। হিসেব করতে-করতেও শুনতে পাচ্ছে হিসেবনবীশ।

কলিদার পাঞ্জাবির নাম বোধহয় কামাল, তাকে ডাকলে কালো আচকান আর পাগড়ী-পরা বেঁটে মতো লোকটা।

আরে দোস্ত, ইয়ার, ফ্রেণ্ড কামাল, একদম, কামাল কর দিয়া!

অংরেজীর খোঁচ দিয়ে অদ্ভুত ধরনে কথা কয় লোকটা।

কামাল বললে, মোহন, তুমি আচ্ছা আদমী, কি করে পুরানো দফতর থেকে ঐ গয়নার খতাখানা বের করলে?

আই নো, আমি না, মোহন বললে, গয়না-বণ্ড প্যাপস দি ভ্যাপ্‌স্‌, পচা গন্ধ ছাড়ছিল, মাই লাড আর স্যারেরাস দ্যাট পিক ডু, আমার লার্ড আর স্যারেরা সেটি তুলে আনলেন।

মোহন, এখন কি হবে?

কেস গো, সুপ্রিম আদালতে কেস গো। মামলা চলবে।

আচকান্‌-পরা ঢ্যাঙা লোকটা শুধালে, মোহন, ক্যাস তো গো, ক্যাস তো জরেছ ভাল ?

আই হোয়াই ? আমি কেন ? মাই লাড ডু, টম্নি ডু, হাকিম ডু। ই বুলাকিদাস আম মোক্তার—আই কেবল নালিশ ডু। আর সব দে ডু।

আর যার নামে মামলা সে কি বসে থাকবে, বসে থাকবেন ফ্রান্সিস সাহেব আর ক্লেভারিং ?

মোহন হেসে উঠল, দে সীট ডু, খানা ইট, ড্যান্স ডু, দে নো ডু—সিদিকে চুঁচু।

আরে আসল ব্যাপারটা কি ?

কামাল বললে,

বুলাকিদাস শেঠের তো পাত্তা জান, ঐ মুখসুদাবাদ মোকামে গদি ছিল। ওর কাছে রঘুনাথ রাওজীও এসে একছড়া কুলাগা বা মুক্তোর মালা, একখানা কল্কা, একটা শেরপেঁচ আর চার-চারটে হীরের আংটি অমুকের নামে জমা রাখেন। বলেন, এগুলি বেচে যেন টাকা দেয়। টাকার ভারি দরকার! এরই মধ্যে নবাব মীরকাসেম আলী খাঁর সঙ্গে আংরেজের বাদ শুরু হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশে লুটতরাজ শুরু হল। বুলাকির কুঠি লুট হল, মালও তার সঙ্গে চলে গেল। এবার অমুক দাবি করলেন তাঁর জিনিস। দাবি করতে সেই মালের দাম অনুপাতে এক খতা লিখে দিলে বুলাকি। তাতে ঈশাদী রইল সহাব রায়-ওগয়রহ। বুলাকিও কোক বলে নিজের নামে সই মারল। বুলাকি মারা যেতে তার ওয়ারিসদের ঠেঙে সেই তঙ্কা সুদে আসলে অমুক আদায় করে নিলেন। তারা এখন কোম্পানীর কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকারও বেশী খেসারত পেয়েছে। তা থেকেই টাকা শুধে দিলে আর অমুক খতাখানার উপর দিকটা ছিঁড়ে দিলেন।

তা চুকে তো গেল, আবার ক্যাস কিসের ? ঢ্যাঙা বললে।

মোহন হেসে উত্তর দিলে, ঐ তো মজা! বুলে বুলে ওয়ার বী, উলু খাগড়াজ লাইফ গো! আই বুলাকিদাসের আম মোক্তার, আই—

কামাল বাধা দিয়ে বললে, এখন খোদ সাহেবের সঙ্গে ফ্রান্সিস সাহেবানের

খটাখটি, আর অমুক ইদিকে সেই খটাখটিতে নিজের কাম হাসিল করতে লাগলেন।

অমুক ম্যান ভেরী পাজী!

হ্যাঁ পাজী বলে পাজী, রেজা খাঁর নামে নালিশ করলে লোক পাঠিয়ে বিলায়েতে, আবার ফ্রান্সিস সাহেবকে হাত করেছে।

মোহন বলে উঠল, হাত বলে হাত, একেবারে হাণ্ড পোরাস। হাতে পুরেছে।

কিন্তু ক্যাসটা কিসে হবে?

কামাল দাড়িতে আঙুল চালাতে-চালাতে বললে, আরে আরজিতে তোমার নাম আছে, তুমি জান না?

মোহনও হাসলে, হুজ ম্যারেজ, হুজ মন নো, পাড়াপড়শীজ স্লীপ নো।

আমার নাম আছে?

হ্যাঁ, ঐ খতা অমুক জাল করেছে, বুলাকির ওয়ারিশানদের কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছে—তারই মামলা। তুমি-আমি-মোহন-ওগয়রহ আড়ালের ফরিয়াদী, আসল ফরিয়াদী খোদ আংরেজ মুলুকের রাজা আর অমুক হচ্ছেন আসামী।

জাল নাকি?

আরে চিল্লাও মত্‌! কেউ শুনবে।

মোহন আবার বললে, দেয়ালস্‌ কান হাজ!

ঢ্যাঙা লোকটি আর কামাল চারদিকে তাকালে।

হিসেবনবীশ হিসেব করছে খাতার উপরে ঝুঁকে পড়ে। ওদিকে বিবি বেগরাম বসে বসে ঢুলছে কেদারায়।

কামাল বললে, না, কেউ নেই। বিবি ঢুলছে, আর খাজাঞ্চি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হিসেব লিখছে।

তাহলে জাল মামলায় ফাঁসল? ঢ্যাঙা বললে।

হ্যাঁ, ফাঁসল বলে ফাঁসল। একেবারে ফাঁসি।

ফাঁসি?

কেন—সেই জমিদার গোবিন্দরাম মিত্তিরের পুত রাধাচরণের মোকদ্দমায় দশ বছর আগে তার ফাঁসিই হয়েছিল।

আরে তা ফাঁসি তো হয় নি। রাজা মকুব করে দিলেন। রাধাচরণ তো এখনো আছে। পালকি চেপে বেড়াচ্ছে।

মোহন বললে, এবারে সে গুড়ে স্যাণ্ড, এবার ফাঁসি। মহারাজ এবার নেকে দড়ি হ্যাঙ্গিং।

হিসেবনবীশ একবার মুখ তুলে তাকালে, আবার খাতায় মন-মুখ গুঁজলে।

সন অফ—এবার গন! মোহন বলে উঠল।

মুখ তুলল না হিসেবনবীশ, কিন্তু আড়চোখে তাকালে।

চল, এবার বেরিয়ে পড়া যাক! কামাল বললে।

ওরা দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হিসেবনবীশও খাতাপত্র বুজিয়ে রেখে উঠে পড়ল। বিবির কাছে এসে বললে, এবার যাই। আমার ক'টা তঙ্কা? বিবি ঢুলতে ঢুলতে সোজা হয়ে বললে, কাল। হিসেবনবীশ বেরিয়ে এল।

সে গলির মোড়ে এসে পড়ল।

সামনেই পোদ্দারের দোকান। এখনো আধ-ভেজানো দরজা, প্রদীপ জ্বলছে। সে গেঁজে খুলে বের করল একটি আঙটি। তারপর ঢুকে পড়ল পোদ্দারের দোকানে।

পোদ্দার হাসল, তারপর ঝুঁকে পড়ে কষ্টিপাথরে কষে দেখতে লাগল সোনা। খানিকক্ষণ পরে বললে, মরা সোনা, এর কি আর দাম! তিন সিক্কা নিয়ে যান!

তাই-ই দাও, হাত পাতল হিসেবনবীশ।

কিন্তু নাম লিখে দিতে হবে রোকায়, পত্তা লিখে দিতে হবে। এ কোম্পানীর মুলুক, বড় হাঙ্গামা, বড় হুজ্জুত!

আচ্ছা, তাই দেব।

একখানা বাদামী রঙের চিরকুট হাতে দিলে পোদ্দার, খাগের কলমটা এগিয়ে দিলে। আর হিসেবনবীশ লিখলে—জয়রাম। কি যেন ভেবে সেটা কেটে দিয়ে লিখলে—মকরন্দ গুহ। তারপর সিক্কা ক'টা নিয়ে বেরিয়ে এল।

মনে তার আর তোলপাড় ওঠে না, সব শেষ করে দিয়েছে বহুদিন আগে।

এখন সে আর মকরন্দ গুহ নয়, জয়রাম সেহানবীশ। বিবি বেগরামের এই মুসাফিরখানায় খাতা লেখে। মাইনে পায় তিন তঙ্কা। কিন্তু সে নামেই, আদায় হয় এক তঙ্কা, বড় জোর দেড় তঙ্কা। বিবির মেয়ের রুথ বিবির জার হলে হয় তো বেশিই পেত। কিন্তু জয়রামের খোলসটাই সে পরেছে, তার ভিতরটায় এখনো মকরন্দ গুহ আছে। তাই পারে না, রাই-এর কথা মনে পড়ে। শেষ দিনের কথা মনে পড়ে। পারে না। থাকে সে শিমুলিয়ায় : থাকার মতো থাকা নয়, না-থাকার মতো থাকা। কিন্তু তবু আজ যেন জয়রামের খোলসটা ছুঁড়ে ফেলতে সাধ যাচ্ছে। এক মিথ্যা মামলার কথা শুনেছে, তাতে খোদ সাহেব আছে, আর সে-মামলায় আসামী মহারাজ—কে তিনি ?

সন অফ্—শুধু সে নামের ঐটুকু শুনেছে।

কে তিনি ?

মহারাজ তো অনেক আছেন, মহারাজ নবকৃষ্ণ, মহারাজ তমুক—মহারাজ—

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মকরন্দ। কি যেন সন অফ্—কি যেন ?

তাঁকে হয়তো সে চিনেছে, কিন্তু তাঁর দেউড়ির দরোয়ান এত রাতে কি ঢুকতে দেবে ? না হয়, ঢোকাও গেল, গিয়ে কি বলবে ? কিছুই তো সে জানে না। শুধু আবছা-আবছা শুনেছে। কি বলবে ? তা ছাড়া রাজা-মহারাজা তার তো কেউ নয়। সে জয়রাম সেহানবীশ, তার রাজা রাজড়ার খবরে দরকার কি।

মকরন্দ মনকে বোঝালে, তারপরে শিমুলিয়ার পথ ধরল।

কুলির বাজার এখন নিঝুম। মা-গঙ্গার সাড়াশব্দ নেই। কিল্লার পাঁচিলের ওপর হাওয়া খাচ্ছেন না সাহেব-বিবিরা। এখন সেখানে লাল-মুখো গোরা টহলদারি ফৌজ ঘুরছে। বুরুজের তোপের পাশে পাশে তাদের কায়াময় ছায়া দেখা যাচ্ছে, আবার কায়ার ছায়া দীর্ঘ হয়ে হয়ে পড়ছে যেখানে অসমাপ্ত কিল্লার কাজ চলছে, সেখানে : পরিখার জলেও বুঝি গিয়ে ডুব দিচ্ছে। তাছাড়া কিল্লাও নিঝুম। সব নিঝুম। এমন কি দূরে গোকুল

ঘোষালের সেই খিদিরপুরের কাশীতেও এখন মন্দির নীরব, কাঁসর-ঘণ্টা নীরব। রসাল দুন্দুভি, সানী বাজিছে সুন্দর—সেও আজ শেষ আরতির সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেছে। তবু কুলির বাজারের এক টেরে এক কুঠরিতে জ্বলছে আলো।

এ-কুঠি ফারসীনবীশের। ফারসীনবীশের এ এলাকায় নামডাক আছে। বছর চারেক হল এসে বসেছে এ-গের্দে, কিন্তু এরই মধ্যে আরজি লিখে নাম কিনেছে। আরজি লেখায় দোরস্ত হাত। একটু শুনে নেবে কান পেতে তারপর গোটা গোটা হরফে লিখে যাবে :

মহামহিম দেওয়ানি আদালতের শ্রীযুত সাহেব বরাবরেষু।

আরজি শ্রীরামকান্ত চাকী, সাং বরিষা

আসামী শ্রীমানিক রায় তথা সাং বেহালা মকদ্দমা ইহার স্থানে আমার এক কিত্যা তমস্থ দিয়া টং ৫০০ পাঁচশত টাকা আর চটা বাবুদ পঞ্চাশ তঙ্কা একুনে ৫৫০৲ তঙ্কা সরবতি করি দেয় না, এ কারণে নালিশ। সাহেব ধর্ম-অবতার হক আদালত করিয়া আসামী আদালতকে হুকুম করিয়া আমার টাকা দেলাইয়া দিয়াতে হুকুম হইবেক। আমি গরিব, সাহেব-ধর্ম-অবতার আমার পানে নেকনজর করিয়া দেলাইয়া দিআইবেন, এই আরজ নিবেদন করিলাম।

এতো দেওয়ানি, ফৌজদরি আদালতের আরজি লেখায়ও সে হুনর।

আরজ নিবেদন আমার এই মোকামের অমুক দাস স্থানে মূল দশ তঙ্কা পানা ছিল, তাহতে আমি আসামী মজুকুরে স্থানে টাকা চাইতে গেয়াছিলাম, তাহাতে আমাকে টাকা দিলাক না। দুই চারি বদ জবান গালি দিলাক। এ কারণ নালিশ আসামী মজুকুরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হএ। আমি গরিব প্রজা সাহেব-ধর্ম-অবতার আমা বারে যেমত হুকুম হএ এতদর্থে আরজ নিবেদন লিখিয়া দিলাম। ইতি ৭ সেবন।

গরীব-গুরবোর আরজিই লেখে ফারসীনবীশ, টাকাটা সিকেটাই পায়। দু-একজন বড় মানুষও মুখে মুখে নাম শুনে আসেন। আদালতে তাঁদের গোটাকয়েক মামলা এক সঙ্গে না চললে তাঁদের বাবুগিরির থাকে না। তাই আরজি রাত জেগে ফারসীনবীশকে লিখতে হয়। আজ কিন্তু রেড়ির তেলের বাতি জ্বালিয়ে আরজি লিখছে না। খাগের কলম, সিয়াইভরা দোয়াত পড়ে আছে। খাতাও খোলা।

কি যেন ভাবছে ফারসীনবীশ। এক গেলাস সিদ্ধির শরবত সুমুখে। তার চাকর কেল্টুন আচ্ছা শরবত তৈরি করে। সে জাতে রাজবংশী গিয়েছিল ভুটান যুদ্ধে। এই লড়াইয়ের নেশায় এসেছে কোম্পানীর শহরে, এসে লড়াই পায় নি, তাকে পেয়েছে। কিন্তু কেল্টুনের হাতের অমন তরিবত করে তৈরি শরবত আজ খাচ্ছে না। খেলে সব ঘুলিয়ে যাবে, তার আগে ভেবে নিচ্ছে।

পরশু ফজরে এসেছিল দুজন আদমী। ফীটনে চড়ে আসে নি, এসেছিল পালকিতে। এসে আরজি লিখিয়ে নিয়ে গেছে। মজুরি দিয়েছে দুটি মোহর। কিন্তু আরজির ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন। একটা জাল-জুয়াচুরি যেন লুকিয়ে আছে, চোরা-গোপ্তা ঘা হানবে। তাই মনটা খারাপ। তাই রোজ-নামচার খাতাটা পরশু রাত থেকেই ফাঁকা। সাদায় কালি চড়ে নি, আঁচড় পড়ে নি। সিদ্ধিও বিলকুল ভুলিয়ে দিতে পারে নি। শুধু বার বার ঐ আদমী দুটোর কথা মনে পড়ছে। ওরা যেন সেই কেরেস্তানি কিস্‌সার— দুম্বার খোলসে নেকড়ে।

ফারসীনবীশ আর ভাবে না। সে গেলাসটা তুলে নিলে। আজ রোজনামচা লিখবেই। ফিরোজা আসমান দেখে ফিরোজা হুরীর কথা লিখবে!—নয়তো ভাববে শাজাদী জেবুন্নিসার সঙ্গে। নয়তো নিজেই লিখবে গজল কি রুবাই।

গেলাসে চুমুক দিলে। সিদ্ধির শরবত তামা-ঘষা জলে মিশে নেশার চমক দেবে এবার। উত্তেজনা আসবে না, শুধু নিস্তেজ করে দেবে, হাসাবে তো হাসবে, কাঁদাবে তো কাঁদবে।

গেলাস নামিয়ে রাখল ফারসীনবীশ।

এবার কানে শোনার পালা আর নেই, এখন সে মগজে শুনবে। কেল্টুন এসে চিল্লালেও শুনবে না। কান তার নিষ্ক্রিয়, শুধু মগজ সক্রিয়।

কে যেন ডাকছে—হামার আজা!

কে যেন ডাকছে— মেরা লাল!

কে যেন ডাকছে—আমার লালী।

আমার লাডলী!

চমকে উঠল ফারসীনবীশ। রক্তচোখ তুলে তাকাল চারিদিকে।

মগজে ধ্বনি উঠছে, স্মৃতি হাতছানি দিচ্ছে।

সে কলমটা মুঠো করে চেপে ধরল।

লাডলী দুদিন লেখে নি, আজ লিখবে। তার মগজে তামার বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সে লিখবে।

কিন্তু লিখতে পারলে না, কলম খসে পড়ল। সে জাজিমের উপর এলিয়ে পড়ল।

সভাবাজার এখন নিরিবিলি। নবকৃষ্ণের বাড়ির নাটমন্দির নিঝুম, বেলোয়ারি ঝাড় লণ্ঠনের মোম খাস মহালে, জলসাঘরে নিবে নিবে গেছে। আর সেই সভাবাজার—শোভাবাজারের এক টেরে খড়ো ঘরে জ্বলছে রেড়ির তেলের আলো।

বাণেশ্বর শর্মার মেজাজ আজ শরিফ।

বাতির পলতেটার বুক পুড়ছিল চড়চড় করে। সে পলতেটা উসকে দিলে, মাটির ভাঁড় থেকে খানিকটা তেল ঢেলে দিলে। এবার একখানা পুথি নিয়ে বসল।

বাণেশ্বরের পিতা ছিলেন পরম পণ্ডিত। বাণেশ্বরও শুধু আর্ক ফলার ঘটা দেখায় না। সেও ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত, ভট্টপল্লী থেকে উপাধি পেয়েছে, কিন্তু আজ ন্যায়ের কূটতর্কে তার মন নেই। তাল ঢিপ করে পড়ে, কি পড়ে ঢিপ করে—সেকথা ভেবে শিরপীড়া বাড়াচ্ছে না। সে খুলে বসেছে কালি-দাসের বিক্রমোর্বশীয়ম।

রাজা বিক্রম উর্বশীর দেখা পেয়েছেন, কিন্তু উর্বশী তো তাঁর হলেন না। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা। তিনি বিদায়ের সময় শুধু রাজার দিকে চেয়ে আপন মনে বললেন--

অবি ণাম পুণো বি উঅআরিণং এদং পেকখিস্সম—আবার কি এমন উপকারী মিত্রের দেখা পাব?

উর্বশী চলে গেলেন। রথ আকাশে উড়ল।

রাজা উর্বশীর পথের দিকে চেয়ে বললেন, অহো দুর্লভাভিলাষী মদন!

হায়, মদন যে দুর্লভের অভিলাষী।

বাণেশ্বর পুথি থেকে মুখ তুলে তাকাল।

দরজায় অবগুণ্ঠিতা বধূ।

তাকে ভিতরে নিয়ে এল বাণেশ্বর, ঘোমটা খসিয়ে বললে, অয়ি উর্বশী, কোথায় ছিলে? আমি যে মদনকে শাপান্ত করছিলাম।

বধূ ঘোমটা একটু তুলে বললে, রঙ্গ রাখুন, আপনি এখন শোক করছিলেন।

সত্য, শোক তো তোমারই কারণ, তুমি রাজহংসী যে আমার মনরূপী মৃণালকে খণ্ডিত করে তার সূত্রগুলি কেড়ে নিয়েছ।

আমি মুখ্যু, অতো কি জানি! বধূ ঘোমটা না তুলেই বললে।

মূর্খ হলে কি বাণেশ্বরের প্রিয়া হতে? মাথা দুলিয়ে টিকি নেড়ে বলে উঠল বাণেশ্বর।

পিয়া কোথায় গো, কেনা বাঁদী।

আহা-হা, প্রিয়ে মানময়ী, তোমার কথার শ্লেষ যেন অলঙ্কার।

কই—অলঙ্কার দেবেন বলেছিলেন যে?

অলঙ্কার দেব বই কি—দেখ আজ কি এনেছি! বাণেশ্বর একটা শালপাতার মোড়ক বের করলে। মোড়কের ভেতরে দুখানি সন্দেশ আর প্রসাদী ফুল।

বধূ তাকিয়ে দেখে ঘোমটার ভিতর থেকেই তাচ্ছিল্যভরে বললে, ওমা—এই!

এই কি—যোগমায়া, এযে মা-কালীর প্রসাদ! প্রসাদ তো কণিকামাত্রই হয়।

ও-কণিকায় আমার পেট ভরবে না গো, আমি ও-প্রসাদ নেব না!

ছিঃ ছিঃ—মার প্রসাদকে ওকথা বলতে নেই! বাণেশ্বর মোড়কটি মাথায় ঠেকালে। মা আমার জাগ্রতা। জাগ্রতা মার কাছে যে যা বর চায়, তাই পায়। মহারাজ নবকৃষ্ণ চেয়েছিলেন শত্রু নিধন, তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল। তিনি তাই স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়ে আজ পূজা দিলেন। শালদোশালা—দক্ষিণা ও প্রণামী বহু ব্রাহ্মণ পেয়েছে, কাঙালীরা পেয়েছে বস্ত্র, কড়ি।

আপনি কি পেয়েছেন? বধূ শুধালে। শুধু ঐ পেসাদ?

পেসাদ কেন পাব, আমি মহারাজের আশ্রিত ব্রাহ্মণ, শাল পেয়েছি, শাটী পেয়েছি, প্রণামী পেয়েছি।

সেগুলো কোথা গেল ?

মার কাছে।

সেগুলি তিনি জটিলে-কুটীলেদের পরাবেন—আর আমাকে ফুল-পেসাদী দিয়েই তুষ্ট করতে চান ?

ছিঃ—যোগমায়া, তুমি বড় মুখরা !

আমি যোগমায়া নই, বধূ ঘোমটা খুলে ফেলে দিলে টান মেরে। আমি তোমার কালীর পেসাদ চাইনে গো, চাইনে !

বধূর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল বাণেশ্বর, কথা যোগাল না মুখে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বধূ আবার বললে, আমি চাঁপালতা। ভরা থেকে কুলীন বামুনের মেয়ে বলে কিনে আনলে কুড়ি তঙ্কা দিয়ে। তখন তো রূপ দেখে মজলে ! আসলে আমি তো বামুন নই, সহুজে।

সহুজে ?

হ্যাঁ, সহুজে। সহুজে যারা ঢলে পড়ে, সহজে পীবিত করে, আবার সহজে পীরিতের শিকলি ছেঁড়ে !

চুপ, চুপ ! বাণেশ্বর শিউরে উঠল। ও বাক্য নয় ! ওতে যে আমার কুল ধ্বংস হবে।

কেন চুপ করব গা ! চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব—চাঁপালতা বলে উঠল।

চুপ, চুপ, তোমার পদতলে পড়ি, চুপ কর !

পড, আগে পায়ে পড, পায়ে ধর। তবে তো ! চাঁপালতা লীলাভরে পা বাড়িয়ে দিল।

বাণেশ্বরর এসে সেই পা কোলে তুলে নিলে, মাথায় রাখলে।

চাঁপালতা হিহি করে হেসে উঠল, কেমন জব্দ ! কি যেন ভেবে আবার হাসলে। তারপর মুখভঙ্গী করে বললে, বামনা, কেমন জব্দ !

তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে সবাই। লালদীঘিও তন্দ্রাগত। তার পারের ঝোপেঝাড়ে সাহেব-বিবিদের অস্ফুট স্বর শোনা যায় না, বাবালোকেরা কলহাস্য তুলে ছুটে বেড়ায় না।

এখন লালদীঘির তীর নিঝুম, লালদীঘিও নিঝুম। লালদীঘির গা ঘেঁষে লালবাজারও নিঝুম। আবার চীনা বাজারের গলিটা তার সঙ্গে মিশেছে, সেটারও যেন সাড়া নেই।

শুধু দু-একটা পথের কুকুর আর দু-একজন পথচারী চলছে, কিন্তু তারা সাড়া জাগাতে পারছে না। সাড়া জাগবে যখন রেঁাদে বেরুবেন পুলিস-সুপার প্লেডেল সাহেব। কিন্তু এখনো তিনি রেঁাদে বেরোন নি। এখন হয়তো চার বোতল হকৃস্ টেনে বেসামাল হয়ে আছেন। আর হীরে-জহরতের স্বপ্ন দেখছেন। ছিলেন হীরে-জহরতের ব্যাপারী, খোদ নবাব-গভর্নর বাহাদুরের কৃপায় হয়েছেন খালকাটার পুলিসের কর্তা। আইন জানেন না, কানুন জানেন না, শুধু লাল মুখ খিঁচিয়ে ঘোঁতঘোঁত করেন। র‍্যাটানের শপ্‌শপা-শপ বাড়ি মারেন—আর তাতেই কাজ হয়। ওতেই জেভ ভরতি হয়ে ওঠে, আবার তাতেও কুলোয় না, দেনা করেন দু হাতে। সেই তিনিও এখন বেহুঁশ। আর বেহুঁশ দেউড়ির দারোয়ান, বেহুঁশ মুটেমজুর, বেহুঁশ সবাই—বেহুঁশ খালকাটা, ক্যালকাটা—কলিকাতা।

শুধু লাল সেবকরামই বুঝি জেগে আছেন।

বিজাপুরী ব্রাহ্মণ, বেঁটেখাটো মানুষটি। নাকটি খড়্গবৎ, মুখে বুদ্ধির জৌলুস। সুপুরুষ নন, কিন্তু পুরুষালি চেহারা।

তিনি বসে বসে পোবাড়া পড়ছিলেন—সুর করে। এ পোবাড়ার জন্ম বিজাপুরের পাহাড় আর বনে ঘেরা গাঁয়ে। এর উপজীব্য—দেশাই—দেশাইনদের কথা! সুরগুন্দের কিল্লার হাতিয়ারের ঝঙ্কার এতে শোনা যায়, শোনা যায় লড়াইয়ের জিগির। আর শোনা যায় কৃষ্ণা নদীর জলধারার উপল-ব্যথিত গতি। বনে বনে কালিয়র হরিণের পাল ঘোরে, নরগুলোর রং কালো, মাদীগুলোর রং পাটকিলে। শুকনো ঝোরা ধরে গুড়ি মেরে পাহাড়ের মাথায় যদি চলে যাও তো দেখবে তাদের। কখনো বা তারা এ-ওর গা লেহন করে; কখনো বা বড় পাথরের চাঙড়ের আড়ালে শিঙে শিঙ আটকে লড়াই করে। সেসবও পোবাড়ায় ধরা দেয়।

লাল সেবকরাম পড়েন আর ফিরে ফিরে যান তাঁর গাঁয়ে। কোম্পানীর সঙ্গে রাজনীতির ঘুড্ডির প্যাঁচ খেলা ভুলে যান, ভুলে যান ষড়যন্ত্রের জাল

বোনা। ভুলে যান, তিনি লাল সেবকরাম—মরাঠাদের উকিল, আংরেজী কথায় যাকে বলে—ভকিল।

দরজায় শব্দ হতেই কিন্তু আবার কল্পনা মিলিয়ে যায়, আবার রুক্ষ বাস্তব। ঠিক তাঁর পাহাড়িয়া দেশের মতো রুক্ষ, বন্ধুর।

আজও ঘা পড়ল। ঘা নয় করাঘাত, আঘাত নয়, টুকটুক, ঠুকঠুক।

তাঁর আরদালী এসে ঢুকল। জাতে বেডর। মিশ কালো রং, ভাটার মতো চোখ, চওড়া ছিনা, লম্বা লম্বা হাত।

সে দণ্ডবৎ করে জানালে, দত্তবাবু হাজির।

এত রাতে? লাল সেবকরাম একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আচ্ছা, নিয়ে এস!

খানিকক্ষণ পরেই ঘরে এসে ঢুকল দুটি লোক। একজন প্রৌঢ়, আর একজন যুবক। মেঝেয় কোঙ্কানী চাদর পাতা, সেই চাদরের উপর তাঁদের বসতে বললেন। তাঁরা বসলেন।

প্রৌঢ়কে উদ্দেশ্য করে সেবকরাম শুধালেন, এত রাতে যে দত্ত, খবর আছে?

রাতে ছাড়া তো আপনার এখানে আসাই হয় না, প্রৌঢ় হেসে বললেন, আমাদের রাজা নবকেষ্ট যে-ফেউ লাগিয়েছে, দেখে-শুনে আসতে হয়।

ফেউ? অবাক হয়ে তাকালেন লাল সেবকরাম।

হ্যাঁ, গোয়েন্দা লেলিয়ে দিয়েছে। ফরাশডাঙা থেকেই লেগে থাকে।

শিভালু সাহেবের তবিয়ৎ আচ্ছা তো? সেবকরাম যুবকের দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করলেন।

হ্যাঁ, ভাল বলে ভাল! আর ওঁর কথা বলছেন, উনি আমাদের লোক। ব্রাহ্মণ। ওঁর সামনে সব কথা বলতে পারেন।

লাল সেবকরাম বললেন, শিভালু সাহেব কেমন মালপত্র কিনছেন জগমোহন? আপনারা তো তাঁর পাইকার।

জগমোহন হেসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, মোকাম বীরভূমের পদ্মনাভ রায়ের বেটার কাছে খবর পাঠিয়েছেন। ওদিকে বাদশার সঙ্গেও যোগাযোগ চলছে।

লাল সেবকরামের ভ্রূ কুঁচকে গেল, তিনি বললেন, ঐ পাতিশাকে

দিয়ে হবে না। ও তো মাস-মাহিনার তঙ্কাখোর কোম্পানীর বান্দা। নোকো, নোকো! না, হবে না।

জগমোহন বললেন, আপনারা মরাঠীরা বাদশাহকে দুশমন ভাবেন, আমরা ভাবি না!

সেবকরাম বললেন, ভাবি বই কি, আংরেজশাহী গেলে হিন্দুরাজ তো কায়েম হবে না। ঐ পাতিশাই করতে দেবে না।

যুবকটি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল কথা, সে বললে, আমি মাফ চাইছি। একটা কথা বলতে চাই—আপনারা দেখছি সব পিঠে ভাগের তালে আছেন। কেউ আসল জিনিসটা চাইছেন না।

আসল জিনিসটা কি? জগমোহন আর লাল সেবকরাম তাকালেন যুবকের দিকে।

আসল জিনিস হচ্ছে সেই রাজ্য, যেখানে মানুষ সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। বাদশাহী নয়, মরাঠাশাহী নয়, ফরাসীশাহী নয়।

সেবকরাম বলে উঠলেন, এ পাগলের মতো কথা কোথায় শিখলেন জী? একটা না একটা শাহী তো হতেই হবে।

যুবক উত্তর দিলে, তা যদি হয়, তাহলে আমাদের রাণী-মা যা বলেন, আমরা চাই মহাভারতের সেই রাজ্য, যেখানে দণ্ড নেই, দণ্ডিক নেই।

রাণী-মা!—আপনাদের রাণী-মা কে? আপনি কে? লাল সেবকরাম বিস্ময়ে শুধালেন।

যুবক জগমোহনকে দেখিয়ে বললে, উনি সব জানেন। আমি ওঁর কাছে সব বলেছি। আপনারা যে পদ্মনাভ রায়ের ছেলের নাম করলেন, তাঁর দুয়ারেও ধরণা দিয়েছি। কিন্তু সবাই এক-একটা নিজের শাহী চান, কেউ নিজেদের শাহী চান না! আমি দত্তবাবুকে সেকথা বলেছিলাম। উনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন।

লাল সেবকরাম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি যা চান শিবা-মহারাজ তাই ভেবেছিলেন, তাই ভেবেছিলেন বাজীরাও, বালাজী বিশ্বনাথ।

আর তাই ভাবেন নাটোরের রাণী-মা ভবানী, আর ভাবে তাঁরই দীন প্রজা হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী।

আপনি রাণী ভবানীর লোক? লাল সেবকরাম বললেন।

হ্যাঁ, আমি তাঁর লোক, আমি আমার হিন্দুস্তানের লোক।

আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, সেবকরাম বললেন, হিন্দুরাজই সেই রাজ্য।

হরানন্দ বললে, সে রাজ্য তো মোচলমানেরও বাজ, তাকে তো বাদ দিলে চলবে না। সে তো হিন্দুস্থানের আর এক চোখ।

তাই তো পাতিশাকে পদ্মনাভ রায়ের ছেলে দলে ভিড়িয়ে নিতে চান, জগমোহন বললেন।

তিনি তা নিজের স্বার্থে চান। যা চান আপনার মনিব ফরাসীরা, যা চান মরাঠীরা। না—আপনাদের দিয়ে হবে না।

কাকে দিয়ে হবে?

জানি না! হয়তো নাড়া লাগবে, ধাক্কা পড়বে, মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে নিজের শাহী কায়েম করবে। —আসি।

ভেজানো দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল হরানন্দ।

রামসেবক বললেন, এ বাউরাটাকে কোথায় পেলে দত্ত?

চীনাবাজারে এক দশকর্মের দোকানে, জগমোহন উত্তর দিলেন। কথা শুনে মনে হয়েছিল, আমাদের কাজে লাগবে।

না, না, ওদের দিয়ে কাজ হবে না, ওরা কথার ফানুষ, ওরা কি চায় জানে না। দরকার হয়তো ওকে কোম্পানীর হাতে ধরিয়ে দিতে হবে।

সে কি.! জগমোহন শিউরিয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ, বলেছি তো ওরা আদর্শবাদী, ওরা কূটরাজনীতির বড়ে হতে চায় না, পিল হতে চায় না। যাও দত্তবাবু, শিভালুকে আমার সেলাম জানিয়ো। আর পদ্মনাভ রায়ের বেটাকে দলে ভিড়িয়ে নাও, আংরেজশাহী ফতে করতে হবে।

জগমোহন বেরিয়ে গেলেন নিঃশব্দে, লাল সেবকরাম কোম্পানী জাজিমের উপর নিজের তুলোর কোর্তাটা খুলে রাখলেন। বাঘনখটি বের করে নিয়ে একবার দেখলেন, তারপরে সেটি সন্তর্পণে শিয়রে রেখে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম করে গা এলিয়ে দিলেন।

চাঁদ হেলে-হেলে পড়ে।

ঘুমায় ধরমতলা, কাশিটোলা, লালবাজার—বাগবাজার। ঘুমায় চিৎপুর।

মা-গঙ্গা ঘুমান, চিৎপুরে মুর্শিদাবাদ থেকে মনিবেগমের সৎ ছেলে বিব্বে বেগমের আপনা ছেলে, সতেরো বছর উমেরের বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা নবাব নাজিম মবারকউদ্দৌলা এসেছেন কলকাতায়। তাঁর সম্মানে একুশবার তোপ দেগেছে কিল্লা থেকে—সেই নবাব নাজিম ঘুমান সোনার পালঙ্ক সেরাই মহলে। তাঁর কিস্সাদার হাজার দাস্তাঁকে বুলবুলের কিস্স শুনতে-শুনতে ঘুমান তিনি, আর ঘুমায় তাঁর হাবসী খোজার দল ঘুমায় চিত্রপুর থেকে বাগবাজার, শোভাবাজার, ঘুমায় সবাই ; শুধু ঘুমায় ন রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডা। আড্ডাধারীরা ইট পেতে বসে বসে গাঁজার কলকে হরদম টান দেয় আর রাজা-উজীর মারে। আর ঘুমায় না যাদের মগজে বদমায়েসির সতরঞ্চ খেলার ছক।

আর ঘুমায় না চিত্রপুর থেকে মচ্ছিবাজার হয়ে এই লালবাজার লালবাজারের এই ফ্ল্যাগ স্ট্রীট। সারি সারি নিশান পথে, আর সেই নিশানে নিশানা ধরে লস্কর আর গুণ্ডাদের দলে ভিড়ে চলতে চলতে যেখানে এ শুরু হয়েছে একতলা কুঠির সার, সেই সারের পহেলা কুঠিতে ঘুম নেই উরসু বিবির চোখে। উরসুল বিবিকে এ-এলাকার লোক বলে উরসুল্লাবিবি আরশুলা বিবি। জেণ্টুরা বলে, মুরেরা বলে, আর্মানীরাও বলে।

ওলন্দা বিবিও তাকে বলে কেউ কেউ। ওলন্দাজরা গিয়ে যখন মালয়দ্বীপে কুঠি গড়ে, তখন সঙ্গে জরু নিয়ে যায় নি। সেই জরু হয়েছিল দিশি মলো মেয়েরা। তাদেরই গর্ভে আর ও-হ্যানদের ঔরসে তাদের জন্ম। তাদে বলে 'মসেস'। যেমন আংরেজদের দোঁ-আঁশলাদের বলে 'ফেরঙ্গ'। চুঁচড়োয় এ ওলন্দাজদের দো-আঁশলা মসেস্-বিবিদের ঘাঁটি, সেখানেই থাকে; বরাহনগরে তাদের জমজমাট ব্যবসা। আবার বরাহনগর থেকে দু-একজন ছিটে এসে পড়ে কোম্পানীর শহরে। এই ফ্ল্যাগ স্ট্রীটে। সেখানেও আসর জমায়।

উরসুল বা আরশুলা বিবিও আসর জমিয়ে বসেছে ফ্ল্যাগ স্ট্রীটে-লালবাজারে। উরসুল বিবি চোখেমুখে কথা কয়। হিন্দি-উর্দু জবানে খৈ ফোটে, আবার দু-একটা ওলন্দা কথার খোঁচ দেয়। বিবি সুরসিক গাইতে-বাজাতে জানে, ওলন্দা মেয়েদের মতো আলুথালু বেশে থাকে না বেশ ছিমছাম চেহারা, ছিমছাম বেশভূষা। কত বয়েস কেউ ঠিক কে

বলতে পারে না। মনে হয়, পচিশ, কিন্তু যারা জানে, তারা মুখ মচকে হাসে, মুচকি হাসে।

বিবির আসর আজ ফাঁকা। নাচ-গাওনা নেই, শরাবের ফোয়ারা ছোটে নি, কি যেন সে লিখছে।

এমন সময় সদর দরজায় খুটখুট শব্দ হল।

বিবি কান পেতে রইল।

আবার খুট খুট শব্দ। ঘরে নয়, সদর দরজায়।

কাগজপত্র লুকিয়ে ফেললে। তারপর হার্পটা টেনে নিলে। হার্পে আঙুল দিয়ে ঘা মারতে লাগল। মিষ্টি টুংটাং বোল ঝরে পড়ছে।

এমন সময় ভেজানো দরজা ঠেলে দুজন লোক এসে দাঁড়াল দোর-গোড়ায়। একজন হাবসী, কোঁকড়া চুল, গায়ে জামা-জোড়া আগরা, পরনে ঢিলা পায়জামা, পায়ে দিল্লীর নাগরা। তার পেছনে ঢিলা আচকান, আর পাগড়ীপরা একটি বাঙ্গালী যুবক।

উরসুল বিবি, কোঁকড়া-চুল হাবসীকে দেখে বললে, আরে গুঙ্গা আমান সাহেবান যে, তারপর কি মনে করে? এতদিনে মনে পড়ল?

আর বিবি, সব কামই এখন দোমনা! ভাবি আসব, আসা আর হয় না, গুঙ্গা দাঁত বের করে হেসে বললে।

কোথায় ছিলে! মুখসুদাবাদে নাকি?

মুখসুদাবাদ কবে ছেড়েছি, দিল্লীতে ছিলাম।

সেখানে কি বাদশার দরবারে ওমরা হয়ে ছিলে?

তা বলতে পার, পঞ্জাবের মাল নিয়ে সেখানে সোলতানি করে এসেছি।

মীনাবাজারে কত মোহর খসালে? উরসুল বিবি শুধালে।

এক পাই সিক্কাও না, গুঙ্গা হাসলে।

সাচ্চা জবান?

সাচ্চা-সাচ্চা, ইয়ে ঝুট নেহী। কসম তুমহারা শীরকা, কসম খোদাকী, কসম কলমুল্লাকী!

আর অত কসম খেয়ো না, এবার বোস! উরসুল বিবি হাসলে।

দুজনেই এসে গালিচার উপর বসল।

উনি কে? যুবকের দিকে তাকালে উরসুল বিবি।

উনি আমীর লোক, হামারা দোস্ত, লিয়ে এয়েছি।

ভাল, ভাল! তা পান তো চলে?

বিবি পরাতের থেকে পানের খিলি নিয়ে এগিয়ে দিলে। জোড়হাত করে যুবক বললে, গোস্তাকী মাফ্ হয়, আমি দুপুর রাতে ও-নেশা করিনে।

পিচ করে রূপোর পিকদানে পিক ফেলে বিবি বললে, তবে শরাব হুকুম হোক্!

না, না।

এ কেয়া তাজ্জব! আমীরলোগ শরাব খায় না!

শরাবের তো সময় এটা নয়, যুবক হেসে বললে।

শরাবের সময়-অসময় নেই, গুঙ্গা আমান হাসলে। শরাব তো পিওবে. এখন কামের কথায় আসি। পাটনাই মালের কেতনা ভাও?

ভাও শুনে কি হবে, টিকস কিনবে? বিবি হাসলে।

টিকস কিনবে না তো এল কেন? গুঙ্গা হাসলে' আমীরচাঁদের বেটাকে সেই দফা নিয়ে এল, এবার এই—

যুবকটি বাধা দিয়ে বললে, বিবি, আমি আমীরলোক নই, আমিরি ছিল. ফতে হয়ে গেছে। আবার সেই আমিরি কায়েম করতে চাই। তাই তেজমন্দির হাটে ঘুরছি।

তেজমন্দীর এই তো সেরা হাট, বিবি হাসলে। তুলোয় আর মুনাফা নেই, এখন এই মৌতাতই সেরা চিজ। এরই মৌতাতে লেগে যান!

সেই জন্যেই তো আপনার দরবারে হাজির, মেহেরবানি করুন! যুবক মৃদু হাসলে।

বিবির চোখ চকচক করে উঠল, সে বললে, মোকাম পাটনা থেকে সওয়া হাজার মণ মাল যাচ্ছে ব্যাটেভিয়ায়। তার মধ্যে দশ বাক্স আমাদের. বাকি ওলন্দা কোম্পানীর। সেই দশ বাক্সের ফি-বাক্সে আছে চৌষট্টি মণ মৌতাত। পড়তা পড়ছে ছয়শো টাকা, আমরা হাজার টাকা করে টিকস করেছি।

যুবক বললে, হাজার টাকা, দশবাক্সে দশহাজার টাকা!

হ্যাঁ, বিবি তার চোখের দিকে চেয়ে বললে, জনাব, এই মাল ব্যাটেভিয়ায় গেলে দেড় হাজার-দু'হাজার তঙ্কায় বিকোবে, মলুইরা কিনবে, চীনারা

কিনবে, আপনি তো মোটে হাজার টাকা দিচ্ছেন। তাতে ফি-হাজারে হাজার বেশি পাবেন। ওলন্দা কোম্পানীও এত টাকা মুনাফা করে না।

আমার কাছে তো তঙ্কা নেই, যুবক বললে।

তঙ্কা না আছে, জিনিস বন্দকী দিন, ঐ কালা মৌতাত আফিম কিনুন।

বন্দক! যুবক আপন মনে বললে।

হ্যাঁ, শেরপেঁচ দিন, দোনর দিন, বাজুবন্ধ দিন, কুলাগা দিন—সব জমা হবে। তঙ্কা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

আমার কাছে ওসব কিছু নেই, যুবক বললে, শুধু আছে এক নীলা। নীল পাথর, ব্লু সাফায়ার।

উরসুল বিবির চোখ চকচক করে উঠল। বললে, দেখি—দেখি!

যুবক গলা থেকে খুলে ফেলল নীলার কণ্ঠী। গেলাসঝাড়ের মোমের আলোয় ঝলমল করে উঠল বিবির চোখ; গুঙ্গা আমানের চোখের গোভার্ত আলো এসে পড়ল তার উপরে! যেন নীলার নীল দ্যুতি আরও বাড়িয়ে দিলে।

বিবি বলে উঠল, চমৎকার! এতেই হবে। আপনার নামে দশ বাক্স খরিদ হল। আপনি তঙ্কা দিয়ে মাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

বিবি একখানা চিরকুট টেনে নিয়ে উর্দুতে কি লিখলে। তারপরে বললে, নাম কি জনাবের?

নাম—নাম? যুবক উত্তর দিলে, নীলাম্বর পানি।

জামিনদার কে?

গুঙ্গা হেসে ওঠল, উনি আমীরলোগ—ওঁর আবার জামিনদার! আরগুল্লা বিবির যত কথা।

বিবি শুধু বললে, বলুন—আপনি এ শহরে কাকে চেনেন?

চিনি—অনেককেই চিনি—মহারাজ তাঁর একজন।

মহারাজ কে?

মহারাজ বলতে একজনকেই বোঝায় এ-শহরে। যেমন নবাব বলতে বোঝায় নবাব-নাজিমকে, নীলাম্বর বললে।

তিনি কে? বিবি মুখ তুলে বললে।

তিনি—তিনি আমার বাপজানের খরিদ্দার ছিলেন। আমার শ্বশুরেরও

ছিলেন। তাঁদের জামিনদার হতেন। আমারও হবেন। কিন্তু থাক তাঁর নাম।

বিবি মুখ তুলে তাকালে।

নীলাম্বর বললে, আমার জামিনদার নেই।

গুঙ্গা বললে, নীলাই তো সেরা জামিন।

বিবি লিখে চলল।

রুমালে মুখ ঢাকা লাশটা ঝুলছে দড়িতে। আর কারা যেন গুন্‌গুন করে গাইছে গান।

...রে...রে...যে
তোর রাজপাট জমিদারি কারে দিলিরে
...রায় ছিল বাংলার অধিকারী।
...সাহেব এলো জান্ করিবারে বারি ॥
...মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা জোড়াডিঙি বেয়ে।
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফোহারাতে হাঁস
যোডবাংলায় কাঁদে সোনার গুলতে বাঁশ
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণী গো দিদি
সিঁতে ছিল কড়া সিঁদুর বঞ্চিত করলেন বিধি ॥

গুনগুনানি গান, গান নয় গুণগুনিয়ে কান্না। ঐ রুমাল ঢাকা লাশটা ঝুলছে, দুলছে। হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় রুমাল উড়ে গেল। কালো রুমাল কালো পাখা মেলে উড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে জনতার আর্তনাদ—

আয় বাপরে! আই বাপরে!

ঘরে পালঙ্ক, পালঙ্কে নেতের মশারি খাটানো। মশারি খোঁটাসুদ্ধ খসে পড়ল। ভিতরে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল্।

খোঁটা-ছেঁড়া মশারি তাল-গোল পাকিয়ে গেছে, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কে-একজন।

সে চকমকি ঠুকে প্রদীপ জ্বাললো। নীলাভ ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

এবার দেখা গেল তাকে। রমণী নয়, এক দীর্ঘদেহ পুরুষ। বৃদ্ধ, সত্তর বছর বয়েস হবে। বলশালী পুরুষ। রজতগিরিনিভ রূপ। চুল চাঁদির তারের মতো সাদা, ঘাড় অবধি বাবরি। কপালে ঘাম, বুকে সাদা চুলে ঘাম জমে আছে। বৃদ্ধ, কিন্তু এ যেন বৃদ্ধ সিংহ, এখনো সিংহবিক্রম আছে।

তিনি উঠে এসে যুক্ত করে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। মুখে কেমন যেন উদ্বেগ, বুঝি বা ভীতি। তাই পৈতে আঙুলে ধরে অস্ফুট স্বরে তারকব্রহ্মনাম জপ করতে লাগলেন। ভয়ে-ভাবনায় এইনাম জপই বিধান। ভয় তিনি পেয়েছেন, দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন।

তারকব্রহ্মনাম জপতে-জপতে এগিয়ে এলেন জানালার কাছে। শেষ রাতের হাওয়া এসে সাদা চুলে স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। মন্ত্র শেষ হতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপরে ডাকলেন—এই, কে আছিস!

কোন সাড়া নেই। আবার ডাকলেন—

কিছুক্ষণ কেটে গেল, এবার দারোয়াজার কিংখাবের পর্দা নড়ে উঠল। তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়লেন—কৌন হ্যায়? কে?

একটি লোক এসে ঢুকল ঘরে, পায়ের ধুলো নিতে গেল, তিনি বারণ করলেন।

তুই কে রে বান্দা?

আমি পিতু? লোকটি মৃদু স্বরে বললে।

কোন পিতু?

জলামুঠার—

ব্যস! হাত তুলে নিরস্ত করলেন। এখুনি তুই কাহারদের খবর দে! আমার পালকি সাজাক তারা। আমি গঙ্গাস্নানে যাব।

পিতু চলে গেল।

তিনি আবার পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে, বললেন, ভোরের স্বপ্ন সফল হয়। কে জানে—কেন এ দুঃস্বপ্ন দেখা দিল! তর্করত্নকে যাবার সময় তুলে নিয়ে যাব, তিনি কাশ্যপ গোত্র—কাশ্যপের সন্তানের কাছে স্বপ্ন বলাই তো রীতি। তাহলে আর দুঃস্বপ্ন ফলবে না, নিষ্ফল হয়ে যাবে।

তিনি আবার ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। তারপর কি ভেবে হাতীর দাঁতের খড়ম পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

জেনানা মহল ঘুমে, তিনি সে মহল পেরিয়ে চলে এলেন বাহির বাড়িতে দেউড়ীতে। দেউড়ীর ফটক এখনো বন্ধ। ঢালী, নগদী বরকন্দাজ-সবাই উঠে পড়েছে। আর-একটু পরেই ফটক হাঁ করে খুলে যাবে। সে-ফটক আবার বন্ধ হবে রাত বারোটায়।

তিনি বসে পড়লেন একটি পাথরের বেদীর উপর। গঙ্গা কাছেই মচ্ছীবাজারের এখানে গঙ্গার হাওয়া বয়ে আসে। এইখানে এসে স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়। আজও হাওয়া লাগছে। আপন মনে কি যেন ভাবছেন। বোধহয় দুঃস্বপ্নের কথা।

তাঁর ভৃত্য পিতু এসে জানাল, পালকি তৈযার মহারাজ। তার হাতে পাট-করা তসরের কাপড়, তসরের উড়ুনি।

তিনি উঠে পড়লেন। খট্‌খটাখট্‌ বেজে উঠল হাতীর দাঁতের খড়ম ফটকে দারোয়ানেরা উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল। দরজা খোলা। পালকি থেমে আছে। কাহারেরা তৈরী। তিনি পালকিতে ওঠার জন্য পা বাড়িয়ে দিলেন, এমন সময় পেছন থেকে কে ডেকে উঠল।

ইওর একসেলেন্সী!

তিনি পেছন ফিরে তাকালেন।

ক'জন সিপাই আর লালমুখো এক সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

কি খবর? তিনি হাসিমুখে শুধালেন।

একখানা সীলমোহর করা কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে সাহেব বললে, ইন দি নেম অফ্ হিজ ম্যাজেষ্টি দি কিং অফ্ ইংলণ্ড, আই য়্যারেস্ট ইউ মহারাজ!

বৃদ্ধের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, তিনি বললেন, ভোরের স্বপ্ন তাহলে সফল হল। এই তো তকদির—এই তো নিয়তি! তারপরে সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তৈয়ার। চল সাহেব। কি ভেবে আবার বললেন, একবার বাড়ির ভেতরে···না থাক!

পিতু তসরের জোড় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বললেন, তুই আমার সঙ্গে আয়।

সাহেবের আনা পালকিতেই উঠে বসলেন মহারাজ। কাহারেরা ছুটল। সাহেব আর সিপাইরা ছুটল ঘোড়সওয়ার হয়ে। পিতুও ছুটল।

ভোর হয় নি। সাহেব তবু জেগে উঠেছেন।

তিনিও স্বপ্ন দেখেছেন। দুঃস্বপ্ন নয়, সুখস্বপ্ন। মেরিয়ান বিবি যেন তাঁর কাছে এসেছেন। বলছেন—আর তো ফিরে যাব না। এবার তোমার ঘর করব। স্বপ্নে তাঁকে আলিঙ্গন করছেন সাহেব, তাঁর চুলের কেয়ারী হাত দিয়ে ভেঙে দিয়েছেন, চুল বুকে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই চুলে চুমু খেয়েছেন, দাঁত দিয়ে কামড়ে দিয়েছেন। মেরিয়ান হেসেছেন। তারপরে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সাহেব এখনো সেই স্বপ্নের ছেঁড়াখোড়া সুতোর জের টানছেন। স্বপ্নে তো কখনো দেখেন নি মেরিয়ানকে। আজ প্রথম দেখলেন। আচ্ছা, গাউন পরে এল কেন মেরিয়ান? শুধু চুল এলিয়ে দিয়ে তো আসতে পারত। সাগরের ঢেউয়ের মতো চুলের ঢেউ ঘিরে থাকত। তাতে আফ্রোদিতের মতো দেখাত তাকে। সেই যে আফ্রোদিতে—ঢেউয়ের ভিতর থেকে ঢেউয়ের ফণা গায়ে সাপটে উঠে এলেন।

সাহেব পাখের কলমটা তুলে নিলেন; পদ্য লিখবেন। আফ্রোদিতে আর মেরিয়ানকে মিলিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু স্যামের মতো তো তাঁর কলম নয়, যে যা লিখতে চাইবেন, তাই-ই ঝরে পড়বে। সাহেবকে লিখতে গেলে আবাহন করতে হবে মহাকবি হোমারকে, হোরেসকে। তাঁরা অনুপ্রেরণা দিলে তবে তিনি লিখবেন। তিনি তো কবি নন। আর কবি যদি হন তো নীরব কবি। কিন্তু আজ যেন কলম চলতে চাইছে—তিনি কাগজের উপর কলম ধরলেন।

The restless thought and wayward will,
And discontent attend him still
Not quit him while he lives
At sea care follows in the wind,
At land it mounts the pad behind,

চঞ্চল ভাবনা, বিপথগামী ইচ্ছা;
আর আছে অসন্তোষ, সে তো তার এখনো সাথী।
আর সে তো জীবন অবধি সঙ্গ ছাড়বে না।
সাগরে ভাবনা ছড়িয়ে দেয় হাওয়া,
আর ভূমিতে তো সে ভাবনা স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে।

সাহেব একবার পড়লেন, দুবার পড়লেন। এতো সুখস্বপ্ন থেকে অনুপ্রেরণা পায় নি, এযে বিদায়ের গাথা। যখন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে জাহাজ চলবে, তখন ডেকে ডেক-চেয়ারে বসে, দুলতে-দুলতে এ-গাথা লিখবেন। এখন তো হা-হুতাশ নয়, দীর্ঘশ্বাস নয়, এখন তো আনন্দ। আর সে আনন্দ আজ তো আরও ঘন হয়ে উঠেছে। দপ্তরে মরে-পচে ছিল কাগজ, সেই কাগজ তুরুপের তাস হয়ে এসেছে—আর নওলা, দওলা নয়, একেবারে টেক্কা—ইস্কাবনের টেক্কা। কার কাছে ইস্কাবনের টেক্কা?

কেন ঐ মহারাজের কাছে।

সাহেবের কাছে তো হরতনের টেক্কা।

সাহেব কলমটা নামিয়ে রাখলেন। লেখা পাতাটা ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলতে গেলেন।

না, থাক, এটুকু নষ্ট করলে চলবে না। হয়ত একদিন সব ক'টা পংক্তি লেখা হয়ে যাবে, তখন স্যামকে পাঠিয়ে দেবেন। চাই কি, লণ্ডনের কোন কাগজে ছাপা হয়ে যাবে। ছাপার অক্ষরে নাম দেখতে কার না সাধ যায়।

সাহেব সযত্নে পংক্তিটি টুকলেন তাঁর খাতায়, নিচে স্বাক্ষর করলেন নিজের নাম—ডবলিউ, এইচ।

মেরিয়ানকে চিঠি লিখতে গিয়ে নামের ঐ দুটি আদ্য অক্ষর ব্যবহার করেন। আবার কখনো বা পুরো নামটাও লেখেন। লেখেন—ওয়ারেন হেষ্টিংস।

কিন্তু একি পদ্য কলম থেকে বেরুল! এযে বিদায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভরা। তিনি তো এখনো মেরিয়ানকে পান নি; এখনো নীড় তাঁর তৈরি হয় নি। এখনো এই হিন্দুস্থান থেকে নীড় বাঁধবার রসদ যোগাড় হয় নি। মন এমন কুডাক ডাকলে কেন? তবে কি এ-বিবেকের দংশন? কিন্তু বিবেক তো তিনি পকেটে পুরে রেখেছেন। সে-বিবেক আবার সেখান থেকে ছাড়া পেল কি করে?

শ্রীশ্রীযুত নবাব-গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস চোখ মুদে বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকলেন।

৯

৯ই মার্চ, ১৭৭৫ ঃ ২৮শে বৈশাখ, ১৮৮১ সাল।

নয়া কিল্লা ছাড়িয়ে এসপ্লানেড রোডে এসেই সারি সারি বাড়ি। এই বাড়িগুলোর মাঝখানে কাউন্সিল হাউস। কাউন্সিল হাউসে বসেছে সভা। জরুরি সভা। খোদ গভর্নর জেনারেল বাহাদুর আছেন, ফ্রান্সিস, বারওয়েল, ক্লেভারিং—কেই বা নেই।

বিষয়—মহারাজের গ্রেপ্তার। মহারাজ কে? মহারাজ নন্দকুমার। পদ্মনাভ রায়ের পুত্র। আগে ছিলেন বাপের তাঁবে আমিন, তারপর হয়েছিলেন নবাব মীরজাফরের দেওয়ান। আংরেজের ভজনা করতেন; কিন্তু আংরেজরা তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তাঁকে দিয়ে কাজ হত বলে তাঁকে বড় পদে বসাতেন। ভান্সিটার্টও বসিয়েছেন, আবার ভান্সিটার্টের কেরানী এখন যিনি গভর্নর জেনারেল—তিনিও বসিয়েছেন। কিন্তু তবু শত্রুতা সাধতে দু' পক্ষই কম যায় না। মহারাজ গভর্নর হেষ্টিংসের নামে নালিশ করেন কৌন্সিলের কাছে, গভর্নর আবার পাল্টা নালিশ করেন। সে মামলাও ঝুলছে। জামিনে আছেন মহারাজ। এমন সময় আবার এই মামলা রুজু হল। নন্দকুমার গ্রেপ্তার হয়েছেন, অত বড় আমির লোক হয়েও জামিন পান নি। নিজের কোন বাড়িতেও তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয় নি। তাঁর য়্যাটর্ণি জারেট সে-আরজি পেশ করেছিলেন, কিন্তু প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত ইলাইজা ইম্পে তা বাতিল করে দিয়েছেন। হুকুম হয়েছে লর্ড চিফ জাষ্টিসের, সাধারণ জেলখানায় সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গেই তাঁকে থাকতে হবে। শনিবারে জেলে ঢুকেছেন, গতকাল সোমবারে নিজের মুন্সীকে দিয়ে আরজি পাঠিয়েছিলেন, তিনি গারদে খেতে পারছেন না, জল গ্রহণ করতে পারছেন না, স্নানেরও তাঁর অসুবিধে। যা করতে যাবেন, তাতেই জাত যাবে। ইলাইজা ইম্পে জানতে চেয়েছিলেন,

তিনি কেমন বন্দোবস্ত চান। মহারাজ জানিয়েছিলেন, আমাকে এমন বাড়িতে রাখা হোক, যেখানে কেরেস্তান বা অন্য বিধর্মী কখনো থাকে নি, অথবা ঢুকবে না। আর আমি প্রত্যহ একবার গঙ্গায় স্নান করতে চাই। কিন্তু এ-দাবি মেটানো সম্ভব হয় নি। কারাধ্যক্ষ তাঁকে নিজের দুখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তবু জলস্পর্শ করেন নি।

জেনারেল ক্লেভারিং সেই কথা সভাকে জানাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ৬ই তিনি গ্রেফতার হয়েছেন, সাতই-আটই চলে গেছে, আজ ৯ই মার্চ—সোমবার। ডিহী বির্জির জেলে পচছেন মহারাজা। আজ তিনদিন জলস্পর্শ করেন নি। একে বৃদ্ধ, তায় উপবাসী—তিনি হয়তো আর এক-দিনও বাঁচবেন না। এইমাত্র খবর নিয়ে এসেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ জোসেফ ফুকে। তিনি বলেন, মহারাজার গলা শুকিয়ে গেছে, জিভ শুষ্ক, কিন্তু এখনো সহাস্য মুখ, এখনো দৃঢ় তাঁর মন। ফুকেকে তিনি বলেছেন, আমার কথা ভেবে বিব্রত হবেন না! ঈশ্বরের যা ইচ্ছা, তাই হবে। আমি নিরাপরাধ।

জেনারেল শেষ কথাগুলো জোর দিয়ে বললেন, তাঁর স্বর উদাত্ত হয়ে উঠল, কাউন্সিল গৃহের চারিদিকে আছড়ে পড়ল, প্রতিধ্বনি তুলল।

খোদ গভর্নর জেনারেল বাহাদুর নিশ্চলনিথর, প্রতিমূর্তির মতো বসে আছেন। সে স্বর তাঁর কানে ঢুকল কিনা বোঝা গেল না।

স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস উঠলেন এবার। তিনি বললেন, তিনি নিরাপরাধ কি না আইন তাঁর বিচার করবেন, দণ্ডবিধিধারায় তাঁর বিচার হবে। কিন্তু তিনি জামিন পেলেন না কেন—সেকথা কাউন্সিল শুধাতে পারেন। কোন কাউন্সিলরের মনে একথা উদয় হতে পারে বই কি! তিনি তো এ গ্রেট বেঙ্গলী। তার উপরে তিনি ব্রামিন। আবার ব্রামিন সমাজের তিনি লীডার—নেতা। মুঘল এম্পারর তাঁকে মহারাজ খেতাব এমনি-এমনি দেন নি। তিনি জামিন পেলেন না কেন? আই সে—হোয়াই হি ওয়াজ ডিনায়েড বেইল?

ফ্রান্সিস একবার চারিদিকে তাকালেন। কাউন্সিলরেরা অধোবদন: গভর্নর জেনারেল বাহাদুর মুখ নীচু করে কি যেন লিখছেন।

এবার বারওয়েল বলে উঠলেন, সেকথা লর্ড চীফ জাস্টিস জানেন।

তিনিই জানুন, স্যার ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, কিন্তু এই যে একজন ব্রামিন জল বিনা মারা যেতে বসেছেন, এতে কি ব্রিটিশ জাষ্টিসের কলঙ্ক হবে না? আমি বলি, লর্ড চীফ জাষ্টিসকে এর বিহিত করতে জানানো হোক।

হ্যাঁ, হোক, উইগ নেড়ে সমর্থন করলেন জেনারেল ক্লেভারিং।

বারওয়েল বললেন, চীফ জাষ্টিস জানিয়েছেন, পণ্ডিতেরা বিধি দিয়েছেন, জেলে বসে খেলে জাত যায় বটে, আবার প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে ওঠা যায়। কিন্তু এ বিধি তিনি মানতে রাজী নন। সো দি লর্ড চীফ জাষ্টিস ইজ হেল্পলেস! তিনি নিরুপায়।

তাঁকে কি কোন ডাক্তার দেখছেন? ফ্রান্সিস আবার শুধালেন।

ডাক্তার—জানি না।

আপনি না জানতে পারেন, কৌন্সিলর বারওয়েল, কিন্তু খোদ গভর্নর জেনারেল নিশ্চয়ই জানেন।

গভর্নর জেনারেল মুখ নীচু করে লিখেই চলেছেন, তিনি মাথা নাড়লেন।

ফ্রান্সিস অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে পড়লেন।

ঘণ্টা পড়ল, কাউন্সিলের অধিবেশন শেষ হল।

বাণেশ্বর শর্মা এসে দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরে ঢুকে মেঝেয় ধপাস করে বসে পড়ল। চাঁপালতা গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজ সারছিল, সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

বাণেশ্বর বললে, গৃহিণী সচিব সখী, এক পাত্র জল দাও তো।

ওমা—জল খাবেন কি, আগে জিরোন, হাত-মুখ ধোন, সন্ধ্যে-আহ্নিক করুন, তবে তো জল খাবেন।

প্রাণ যে ওষ্ঠাগত, উদক ছাড়া যে বাঁচে না।

কেন—এমন কি রাজ কাজ করে এলেন?

রাজ কাজই বটে—প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে এলাম, বাণেশ্বর গম্ভীর স্বরে বললে।

অন্যের প্রাচিত্তিরের বিধান দেন—নিজের প্রাচিত্তিরের কি হবে!

চুপ, চুপ! সভয়ে বলে উঠল বাণেশ্বর। গৃহিণী, প্রাচীরেরও কর্ণ আছে।

থাক কর্ণ, আমি বলব বই কি !

না, না, যোগমায়ে ! ওতে আমার সর্বনাশ সমুৎপন্ন হবে।

তাহলে চুপ করলাম, কিন্তু আজ কার পেরাচিত্তিরের বিধান দিয়ে এলেন পণ্ডিত মশাই ?

তাহলে শোন, মহারাজ নন্দকুমার এখন কারাকক্ষে, তিনি আজ তিন রাত্রি জলস্পর্শ করেন নি। তাই বড় হাকিম ইম্পে সাহেব পাঁতি দিতে ডেকেছিলেন।

আর বামুন পেলেন না ! চাঁপালতা মুখভঙ্গী করলে। কাশীঠাকুর চিঁড়ে খেয়ে যাও !

তা বই কি ! এমন ফুলিয়ার মুখুটি কোথা পাবেন। আর ভট্টপল্লীর শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের ছাত্র আমি।

থাক, চাঁপালতা বললে, এখন পণ্ডিত মশাই কি পাঁতি দিলেন বলুন।

তুমি কি বুঝবে—চার ব্রাহ্মণ আমরা—কৃষ্ণজীবন, বাণেশ্বর, কৃষ্ণগোপাল আর গৌরীকান্ত শর্মণগণ বললাম, যদি যবনগৃহে কি যবন সংস্পর্শদোষদুষ্ট গৃহে কোন ব্রাহ্মণ জল গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁকে চান্দ্রায়ন ব্রত করতে হবে। কিন্তু চান্দ্রায়ন এক মাসকাল দীর্ঘ ব্রত। মহারাজ বৃদ্ধ, তাঁর পক্ষে এ ব্রত দুঃসাধ্য—তাই তাঁকে অষ্টসংখ্যক দুগ্ধবতী স-বৎসা গাভী প্রদানে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বাঃ খাসা, চাঁপালতা বলে উঠল, বামুনকে দিলেই সব দোষ চলে গেল ! মোদের বাপু ওসব নেই।

বাণেশ্বর বলতে লাগল, তারপরে শোন, আর এক পাঁতি দিলাম, কোন ব্রাহ্মণ যদি গঙ্গাজলে পক্ক দ্রব্য খান আর বাহকদ্বারা আনীত গঙ্গাজলে স্নান করেন—সর্ব দোষ হরেৎ গঙ্গা !

যেমন আমার দোষ হরে নিয়েছেন, মুখে আঁচল চাপা দিলে চাঁপালতা।

গৃহিণী, তুমি বড় বাচালিকা—

বেশ তো, বাচাল আছি—আছি—মুখ ভার করলে চাঁপালতা।

শোন, মান করে না, মানভঞ্জনের জন্য কি এনেছি দেখ !

ট্যাক থেকে একটি মোহর বের করে সুমুখে ফেলে দিলে বাণেশ্বর।

চাঁপালতা ছোঁ মেরে তুলে নিলে মোহর।

বাণেশ্বর হেসে বললে, মুখ বন্ধ হল তো ?

চাঁপালতা উত্তর দিলে, হল, হল, হল। এই বলে বাণেশ্বরের ঠোঁটে একটা চুমু খেলে।

আঃ কেউ দেখে ফেলবে ! তা ছাড়া তুমি তো শুদ্ধ হয়ে আস নি ? আজ কি বার তাও দেখতে হবে।

চাঁপালতা বলে উঠল, মর মিনসে মুখে আগুন ! অমনি পাঁজির তালাস পড়ল ! আমরা জাত বোষ্টম, ওসব দেখাদেখি মানিনে।

আঃ চুপ, চুপ ! কেউ শুনলে জাত যাবে যে ! হাত চেপে ধরলে বাণেশ্বর।

চাঁপালতা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, উঃ ভারি আমার জাত রে ! সায়েবের ঘুষ খেয়ে বামুনের জাত মারতে বাধে না তার আবার জাতের দেমাক ! জাত থাকে তো ঐ নন্দকুমারের আছে, তোমাদের নেই। আর দেখগে, তিনি উপোস করে আছেন বলে, তোমার ঘরে বুড়ো মা উপোসী হয়ে আছেন। জাত আছে তাঁর, জাত তোমার নেই। আমি তোমার জাত খাই নি, জাত খুইয়েছ তুমি নিজে।

চাঁপালতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মোহরখানা আঁচলে বেঁধে নিতে ভুলল না।

লাডলী রোজনামচার খাতাখানা খুলে বসেছিল। পুরোনো খাতা, পাঁচ বছর আগেকার খাতা। ২৭শে বৈশাখ তারিখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আজ সাতাশে বৈশাখ। সেদিনও তাই ছিল। দুলদুল ঘাড় বেঁকিয়ে ছুটছিল। সব শেষ করে দিয়ে সেও ছুটছিল তারই পিঠে সওয়ার হয়ে। তখন মনে শুধু ঘৃণা। মনে পড়ছে।—খোকা এখন কি করে ? জয়নগরের মেয়ে মথুরাপুরের বৌ এখন কি করে ? দূর হোক গে ! লাডলী ভাববে না। সে এখানেই ডেরা পাতবে। পদ্য লিখবে, গজল লিখবে, রুবাই লিখবে, তার দিন কাটবে।

এমন সময় ঝলঝলে উর্দি আর পাগড়ী পরে একটা কিম্ভূত চেহারার লোক ঢুকল ঘরে।

সে এসে ফৌজী কেতায় সেলাম ঠুকে বললে, হুজুর, বিষ্টো ঠাকুর নামবে নি, কিন্তু ঠাঠা ঝিলকায়!

তার মানে?

তার মানে, মহারাজ ফতে, জেহলে গয়া!

জেহল গয়া? অবাক হয়ে তাকাল লাডলী। সে কি রে, কোন্ মহারাজ?

মহারাজ নান্দকুঁয়ার। চারদিকে সরগরম, হুজুর জানে না?

না—হুজুরের জানার দরকার নেই?

জানার দরকার নেই কি! গোরালোগ জানলে, বিবিলোগ জানলে, হামি কেল্টুন ভুটানের লড়াইয়ের ফেরতা, হামি জানলে!

জানলে তো জানলে—তোর এত ফুর্তি কিসের? লাডলী বললে।

ফুর্তি হবে না! এবার লড়াই বাধল। আজ্ঞা ফরাসের লোক, বাদশার লোক—তারা আংরেজের সাথে লড়াই বাধাবে না! আর লড়াই হলে হামি আগু বাড়বে, কদম কদম যাবে!

ফৌজ হয়ে যাবি না, খিদমৎগার?

হামি কোচরাজার প্রজা, হামি ভুটান লড়াই ফতে করেছি—হামি যাবে নি?

যাঃ—পালা!

কেল্টুন বিরস বদনে চলে গেল। লাডলী আবার খাতা খুলে বসল।

এবার নয়া খাতা।

সে লিখলে—

আর্জি লিখে দিয়ে দু মোহর মজুরি পেয়েছি। আর সেই আর্জির জোরে মহারাজা জেলে। মহারাজা জেলে যাক—আমার কি! আমার তো মোহর মিলল। আমি এই মোহর পুঁতে মোহরের গাছ গজাব। সেই গাছে ঘন ঘন মোহর ফলবে। আবার নয়া খাঁ বংশের পত্তন হবে এই মোকাম খিদিরপুরে। রাজা যাক, আমরাই হব রাজা।

হরানন্দ মাচাঙের উপর শুয়ে ছিল। সে উঠে বসল।

সেও শুনেছে খবর।

সে আপন মনে বললে, মহারাজা আমার কেউ নয়। মহারাজা আমাদেরও কেউ নয়। শুনেছি নিজের স্বার্থসিদ্ধি তিনি করতেন, হষ্টিনের সঙ্গে দোস্তি ছিল। সে দোস্তি ভণ্ডুল করে দিলে রেজা খাঁ-নবকৃষ্ণের দল। তাই হষ্টিন এই চাল চেলেছে। রাজা যাক না, আমার কি! আমি রাজাশাহী চাইনে, আমি গণশাহী চাই! জগমোহন তা চায় না, মারাঠী লাল সেবকরাম তা চায় না। দেখি—কতদূর গড়ায় এই শ্রাদ্ধ!

বিবি বেগরামের মুসাফিরখানা।

মকরন্দ তার জায়গায় বসে খাতা লিখছিল।

বিবির মেয়ে রুথ এসে বললে, শুনেছ মুহুরের, আজব খবর।

মকরন্দ খাতা থেকে মুখ তুলে তাকালে।

শুনেছ—নন্‌কুমার জেলে, বিজির জেলে!

মকরন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রুথের দিকে।

রুথ একটু কটাক্ষ হেনে বললে, তুমি কিছু সমঝাও না! কোন দিকে নজর নেই! তুমি কি কানা?

না তো!

তুমি কানাই, হেসে উঠল রুথ বিবি। তুমি কিছু জান না! নন্‌কুমারের গারদ হল, আমাদের ভাল হল। আর্মানীদের ব্যবসা ও মাটি করেছে, তাদের এ মুলুক থেকে তাডাতে চায়। বেত্তমিজ—বদবখ্‌ত নন্‌কুমার।

এত রাগ কেন? মকরন্দ একটু হাসলে।

রাগ হবে না? হিন্দুরা শয়তান!

তাহলে আমিও শয়তান!

তুমি তো শয়তানই। আমার দিল কা শয়তান, হমারে দিলকা চুর?

এই বলে মকরন্দের দাড়িভরা চিবুক নেড়ে দিলে। তারপর ফিসফিস করে বললে, আজ এসো, হামার কুঠরীতে।

মকরন্দ নিজের অজান্তেই হাসল।

খদ্দের এসেছে, রুথ বিবি তাদের আপ্যায়ন করতে চলে গেল। মকরন্দ তার খাতা বুজিয়ে রাখলে।

নন্দকুমার ! নাম সে শুনেছে ! পালকিতে যেতে দেখেছে পথে। ষোলো কাহার বয়ে নিয়ে গেছে তাঁর পালকি। আসাসোটাধারী চোপদার রয়েছে সঙ্গে। তারা পথ সাফ করতে করতে চলেছে। পথের লোক রুপোর সোটার বাড়ির ভয়ে সরে গেছে। সেও সরে গেছে। তার সঙ্গে তো ঐটুকু সম্বন্ধ নন্দকুমারের সঙ্গে। তার বেশি তো নয়। তবু কেমন যেন খটকা লাগল রুথ বিবির কথায়। নন্দকুমার তাদের দুশমন কেমন করে হলেন ?

মকরন্দ ভেবে পেল না। রুথ বিবির কটাক্ষের কথা মনে হল। শ্বেতা-বাজারের কসবীর মতো ওর ঢঙঢাঙ। ঐ কসবী রোজই তাকে ডাকে রাই যার ধ্যানজ্ঞান, তাকে ডাকে ! কিন্তু রাইয়ের স্মৃতিও তো ফিকে হয়ে এল। মকরন্দ চমকে উঠল। শিউরিয়ে উঠল। তারপরে আবার কলমটা তুলে নিলে।

কর্নেল মনসনের কুঠি।

বিকেলের নিদ্রার পরে মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন কর্নেলের বিবি লেডী য়্যান।

এমন সময় মেরী সাজসরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে হাজির।

সে এ-কুঠিতে মাসে দুটি মোহরে বৈকালিক চুলের কেয়ারী করে দেয় প্রসাধন করে দেয়।

লেডী য়্যান কেদারায় বসেছিলেন, তিনি মেরীকে দেখে শুধালেন, ওই যে তুমি আলীপুরের বাগানে ছিলে না ?

হ্যাঁ, মেরী উত্তর দিলে।

কেমন দেখলে ?

যেমন হয়, তেমনি।

না, না, বারওয়েলকে দেখেছে তো ? ও পাঁচশো পাউণ্ড সেদিন হেরেছে।

পাঁচশো !

হ্যাঁ,—ফ্রান্সিসকে ঘুষ দিয়েছে, আর সেইদিনই কালা কর্নেলের গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরিয়েছে।

কালা কর্নেল ? মেরী অবাক হয়ে তাকাল।

হঁ্যা, ঐ ওঁর নাম! মহারাজার নাম। আহা পুওর সোল! ফ্রান্সিস আগে জানলে ঠেকালেও ঠেকাতে পারতেন। লেডী য়্যান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

এখন কি কোন উপায় নেই ? মেরী শুধালে।

ঐ বাস্টার্ডটা কোন উপায়ই রাখে নি। ব্ল্যাক কর্নেলকে বাইরে বরুবার হুকুম পর্যন্ত দেবে না! লামেস্টারকে বারণ করে দিয়েছে।

কেন ?

কেন—মানে ডেভিল্‌রী, নিছক শয়তানি। এ-শয়তানি আরও কত দেখতে হবে! নাও—আজ কুঈন এলিজাবেথের মতো যেন কেয়ারীটা হয়।

এলিজাবেথ তো পুরানো, এখন ফরাসী কেতা এসেছে।

না, না, ফরাসী নয়—আমরা সাবেকী—সাবেকী মতেই বাঁধো!

মেরী গজ ফিতে আর পালক নিয়ে তৈরি হল। চুল বাঁধতে-বাঁধতে বললে, ফ্রাউ ইমহফের মতো চুল দেখা যায় না!

তোমারও ঐ কথা! ওটাও বাস্টার্ড, ওর হাজব্যাণ্ডটা সোয়াইন! আর জুটেছেও একটা বাস্টার্ডের সঙ্গে! নাও, হাত চালাও! জান—কালা কর্নেল কত টাকা ঐ বাস্টার্ডটাকে পাইয়ে দিয়েছে? আজ বনিবনাও হচ্ছে না, কালার উপরে অপ্রেশনের খবর ইংলণ্ডে পাঠাচ্ছে বলে এই ড্যামন প্লট তৈরি করেছে! ও সব পারে।

অপ্রেশনের খবর দিয়েছেন রাজা ?

হঁ্যা, হঁ্যা, তুমি হাত চালাও তো! আহা, পুওর সোল্! পুওর রাজা! পুওর কর্নেল!

নীলাম্বরও শুনেছে খবর।

মহারাজ তাঁর চেনা, অতি চেনা। মুখসুদাবাদে নবাবনাজিম মীরজাফরের তিনি যখন দেওয়ান, তখন থেকেই পরিচয়, তাঁর কুঞ্জঘাটার বাড়িতে সে বহুবার গেছে। তিনি তাঁকে ভাল করেই চেনেন। এখানে এসে সে তাঁর বাড়িতে যায় নি। ভেবেছে, শেষ চেষ্টা করে দেখবে, তার পরে তো

আছেনই মহারাজ। তাই সেদিন উরসুল বিবির ওখানে জামিনদার হিসেবে মহারাজার নাম বলতে গিয়েও বলে নি। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, মহারাজা তখন গ্রেফতার হতে চলেছেন!

মহারাজকে শেষ দেখা সে দেখেছে মুখসুদাবাদে। চুল পেকে গেছে তখন, মুখে বলিরেখা কিন্তু তবু তিনি সুন্দর। বৃদ্ধই সবচেয়ে সুন্দর, একথা সেদিন তার বার বার মনে হয়েছিল। অথচ অকুস্থল তো তখন বিষাদে ঘেরা। মুখসুদাবাদের পোদ্দার বুলাকিদাসের জীবন তখন নিবু নিবু। পোদ্দারের বন্ধুরা এসেছেন, দু-একজন জ্ঞাতি এসেছেন। সেও ছিল সেখানে। মহারাজ শিয়রে বসে মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজল ফোঁটা ফোঁটা দিচ্ছিলেন। দু-এক ফোঁটা পান করছেন বুলাকিদাস, আবার দু-এক ফোঁটা গালের দুকষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। দীপ নির্বাণের আগে জ্বলে উঠল শেষবারের মতো। বুলাকিদাস মহারাজার দিকে তাকালেন, আর একবার পায়ের কাছে রোরুদ্যমানা স্ত্রী আর কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়ল। এবার বললেন, এই আমার পরিবার, এই আমার মেয়ে। আপনার হেফাজতে আমি এদের রেখে গেলাম। আমাকে যেমন দেখেছেন, এদেরও তেমনি দেখবেন মহারাজ!

মহারাজ বললেন, এখন ওকথা থাক! হরি হরি বল পোদ্দার!

পোদ্দার হরি নাম জপ করলেন তারপরে আবার ক্ষীণ স্বরে বললেন, আপনার টাকা—আপনার সেই খত······একটু জ-অ-অ-ল···

মহারাজ আবার জল দিলেন মুখে, দুকষ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

সেকথা তার মনে আছে, মনে হয় যেন আজকের ঘটনা। এই মিথ্যা জালিয়াতির মামলার কথা শুনে সে পাগলের মতো ছুটেছিল। কিন্তু মহারাজার বন্ধ দেউড়ী দেখে ফিরে এসেছে। আর কারো কাছে যাবার সাহস হয় নি। তাই হাঁটতে হাঁটতে এসেছে এই ডিহী বির্জিতে। এ পাশে পার্ক স্ট্রীট, ওপাশে ভবানীপুর, তারই প্রান্তসীমায় এই বির্জি জেল। এখানে মহারাজের অনুচর কারো দেখা পেলে, সে বলবে, সেও জানে। আর স্বয়ং মহারাজের দেখা পেলে ভালই হয়।

এসেছে সন্ধ্যেয়, এখন রাত দশটা। বহু লোক আনাগোনা করছে, বহু পালকি এসে দাঁড়াল, চলে গেল। কিন্তু কাউকে বলা হয় নি।

বলার ফুরসত পায় নি। টুপ্ করে তারা নেমেছে গাড়ি থেকে, চট করে ঢুকে গেছে। তা ছাড়া তারও দ্বিধা আছে। সে পালকি হাঁকিয়ে আসে নি, চোবদার তার সঙ্গে নেই। তবু সে বসে আছে ; যায় নি।

একখানা ফীটন এসে থামল ফটকে। ফীটন থেকে নামলেন দুজন সাহেব।

নীলাম্বর এগিয়ে এসে বললে, আপনারা কি মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন ?

সবিস্ময়ে দুজনে তাকালেন তার দিকে।

নীলাম্বর আবার বললে, আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিঃ ম্যাথু ইয়াণ্ডেল জেলার, তাঁর হুকুম চাই, একজন সাহেব জানালেন।

আপনারা হুকুম করিয়ে দিন।

হুকুম লর্ড চীফ জাষ্টিস দিতে পারেন, আমরা নই। আর-একজন বললেন।

তাহলে কি দেখা হবে না ? হতাশ হয়ে বলল নীলাম্বর।

না। কিন্তু আপনার কি কাজ—আপনি বলতে পারেন। আমি মহারাজের য়্যাটর্নি জ্যারেট আর ইনি কৌন্সলী মিঃ ফারের।

আমি জানি, এ মিথ্যা মামলা, নীলাম্বর বলে উঠল। আমি ঐ মৃত্যু-শয্যায় ছিলাম, বুলাকিদাস বলেছিলেন ঐ খতের কথা।

ফারের সোৎসাহে বলে উঠলেন, আর কে ছিলেন সেখানে ?

মহারাজ স্বয়ং। নীলাম্বর উত্তর দিলেন।

আর কেউ ? মিঃ জারেট শুধালেন।

ছিলেন বুলাকিদাসের মেয়ে আর বৌ। কিন্তু তাঁরা কাঁদছিলেন। শুনতে পেয়েছিলেন কিনা কে জানে !

মাথা নাড়লেন ফারের, বাবু, এ তো এভিডেন্স হবে না।

তবে আর কি এভিডেন্স চাই ? নীলাম্বর শুধালে।

সেন্টিমেন্ট এভিডেন্স নয়। তবে আমরা তোমাকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে হয়তো দিতে পারি।

বেশ, আমি রাজী।

তোমার নাম কি বাবু ?

নীলাম্বর পানি, নীলাম্বর উত্তর দিলে।

আমার চেম্বারে দেখা করো—মিঃ ফারের টোকবই থেকে একখানা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে কি লিখে তার হাতে দিলেন। তারপর লম্বা পা ফেলে দুই সাহেব এগিয়ে চললেন জেলের ফটকের দিকে।

নীলাম্বর চিরকুট হাতে নিয়ে বিপরীত দিকে চলতে লাগল।

ডিহী বির্জি নিঝুম। ডিহী বির্জির জেলখানা নিঝুম নয়। সেখানে বন্ধ ডিগরীর সামনে পায়চারি করছে সান্ত্রী, পায়চারি করছে ফটকে। জেলর মিঃ ইয়েণ্ডেলও জেগে আছেন।

জেলখানার পাঁচিলের ভিতরে আউট হাউস, তার ছাদে তাঁবু খাটানো। সেখানে জেগে আছেন মহারাজ।

আজ বহুলোক সকাল থেকেই আনাগোনা করেছেন। য়্যাটর্নী, কৌন্সলীরা তো এসেছেনই, তাছাড়া তাঁর স্বপক্ষের সাক্ষীরাও এসে দেখা করে গেছেন। জেনারেল ক্লেভারিং, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁদের সেক্রেটারীদের পাঠিয়েছিলেন। ফ্রুকে নিজে এসেছিলেন। জেনারেল ক্লেভারিংএর পরিবারের সবাই আর লেডী য়্যান মনসন দুঃখ জানিয়ে পত্রও দিয়েছেন।

পত্রের উত্তর দেবার এতক্ষণ ফুরসত হয় নি। স্বায়ংসন্ধ্যা সারবার পর থেকেই লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। এবার আহারের পরে সেগুলির উত্তর দিয়েছেন। এখন তিনি আউট হাউসে আছেন, জলগ্রহণ করতে বাধা নেই। ক'দিন পরে গঙ্গাজল পান ও অন্নগ্রহণ করেছেন। একটু তিনি সুস্থ, কতগুলি পত্রের উত্তর নিজের হাতে দিয়েছেন। আবার বলে গেছেন, তাঁর আংরেজীনবীশ মুন্সী লিখে নিয়েছে। নানা উপদেশ দিয়ে পত্র লিখছেন তাঁর পুত্র গুরুদাসকে। লিখতে-লিখতে তাঁর মনে পড়ছে কত ঘটনা। মুখসুদাবাদের সেই জীবন। সেই আমিনীর কাজে পিতা পদ্মনাভ রায়ের সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘোরা। আবার নিমক-মহালের দেওয়ান হয়ে হিজলী, মহিষাদলে, জলামুঠায় ভ্রমণ।

মানুষ বলে, জীবন তাঁর সুখে কেটেছে, তিনি ব্রাহ্মণকুলতিলক, দিল্লীর বাদশাহ দ্বারা মহারাজ খেতাবে বিভূষিত। কিন্তু বিপর্যয় তাঁর জীবনে

বহু গেছে। এই তো তখনো হেষ্টিংস তখতে বসেন নি, তখন এক খত লিখেছিলেন, প্রাণাধিক শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ রায়-ভায়াকে। সে পত্রের বয়ান আজও মনে পড়ে···সংপ্রতি যদি আমার প্রাণরক্ষা করা থাকে, তবে···সকলে যাইবা শ্রীযুত···জিউকে তাহার লিখন করিয়া পাঠাবা এই ধারাতে···যদি এরূপ লিখন নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পোঁছে, তবে যে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে। নতুবা ব্যজ হইলে এ জন্মের মত বিদায় ইহা নিশ্চয় জানিবা।

সে-বিপদ থেকেও উদ্ধার পেয়েছিলেন। কয়েক মাস আগে হেষ্টিংস যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিলেন তাঁর আর ফুক-এর বিরুদ্ধে, তখন তাঁরা জামিন পেয়েছিলেন। আজ জামিন পেলেন না। এও তাঁরই ইচ্ছা।

মা-গুহ্যকালী, বাবা গৌরীশংকর—তোমারই ইচ্ছা! তিনি বলে উঠলেন। তারপরে লেখা চিঠিগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। আরও কাউকে লেখা যায়। সন্ন্যাসী আছে, বড় মেয়ে। কিন্তু তাঁর বড় জামাই তো মানুষ নয়। সে ঈর্ষান্বিত; গুরুদাসকে নিজামতের দেওয়ান করে দিয়েছেন বলে জামাতা কুপিত। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কুচক্র করছেন। তাই আর লেখা হল না।

তিনি একবার আশেপাশে তাকালেন, চিঠি আঁটবার আঠা নেই, সীল-মোহর নেই। তিনি ডাকলেন,

এই কে আছিস?

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল পিতু, সে এসে ঢুকে হাতজোড় করে দাঁড়ালে।

গোন্দ আন্, মহর আন্!

পিতু প্রণাম করে চলে গেল, খানিকক্ষণ পরে নিয়ে এল সরঞ্জাম।

পিতু আবার প্রণাম করে চলে যাচ্ছিল, তাকে ডাকলেন।

তুই কে রে!

আমি পিতু।

কোথাকার পিতু?

জলামুঠার।

জলামুঠা! এখন খালাড়ীতে সেখানে কেমন কাজ হয় রে?

কাম ভাল।

ভাল! হাসলেন মহারাজ, তাহলে খালাড়ীর কাম ছেড়ে এখানে এলি কেন? ওহো—তুই তো বলেছিলি—তুই ফেরারী!

পিতু মাথা নাড়লে।

ফেরারীরা এসে আমার কাছে জুটিস কেন?

মোদের আজা আপনি! পিতু মৃদু স্বরে উত্তর দিলে।

আজা! হাসলেন নন্দকুমার, আজা আমি নই। একদিন মীরজাফর আলির দেওয়ানি করে, বাদশার শেরপেঁচ মাথায় পরে নিজেকে রাজা মনে হত! ক্ষমতাও ছিল। রেজা খাঁকে গ্রেফতার করিয়েছি, কিন্তু আজ নিজেকে গ্রেফতার হতে হল। আজ বুঝেছি, আমি রাজা নই—রাজা ঐ হষ্টিন সাহেব। আমি বিলায়তে লোক পাঠিয়ে তাকে গ্রেফতার করাতে পারি নে, কিন্তু সে আমাকে এইখানে বসে তার নগ্‌দী দিয়ে গ্রেফতার করালে! তার পরেও তুই আজা বলবি!

পিতু চুপ করে রইল।

কি রে চুপ করে আছিস কেন? বল্—তোর খালাড়ীর গল্প শুনি! তোর ফেরারী হবার গল্প শুনি।

ঢং ঢং ঢং করে গির্জার ঘণ্টার শব্দ এসে আছড়ে পড়ল ঘরে।

মহারাজ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা তুই এখন যা! আমি এগুলো গোন্ধ দিয়ে বন্ধ করে মুহর করে রাখব।

পিতু নীরবে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল।

আবার খাগের কলম তুলে নিলেন মহারাজ।

কুঞ্জঘাটায় চিঠি লিখবেন ভাবছেন।...কাকে লিখবেন?

সন্মানীকেই লিখবেন। তাঁর আদরের দুলালী বড় মেয়ে। জামাই যা-ই-ই হোক, মেয়ে তো তাঁর আদরের। তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন—

১১৮২ সাল

২৭শে বৈশাখের খত শ্রীশ্রীহরিঃ শরনং

প্রাণপ্রতিমাসু পরমশুভাশীর্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্বদা বাসনাকরনক...অত্র...

১৬ই জুন, ৩রা আষাঢ়

এসপ্লানেডে নয়া আদালতের বাড়ি সবে উঠছে, সেখানে বিচার চলে না। তাই সেই পুরানো মেয়রের আদালতেই সুপ্রিম কোর্ট বসে।

একতলা বাড়ি। একটা মস্ত ঘর আছে, সেখানেই বিচার হয়।

মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বর বনাম নন্দকুমারের বিচারও সেখানেই শুরু হল।

বেলা সাতটা। বালু-ঘড়িতেও সাতটা, সূর্য-ঘড়িতেও সাতটা; গির্জার পেটা ঘড়িতেও সাতটা।

এখনো গ্রীষ্মের হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি। কালিকাটা শহরের সাহেব-বিবিরা এখনো ঘুমে। বাবু-ভায়ারা গঙ্গা স্নান করে ফিরেছেন। খাঁ-খানানেরা এক উয়াক্ত নমাজ সেরেছেন।

জোয়ারের জলের মতো মানুষ চলেছে পথে, মেয়রের আদালতের বাহির প্রাঙ্গণ ভরে উঠছে।

কৌতূহলী দর্শকেরই ভিড়। আর মহারাজের দরদী বন্ধুদের ভিড়। কিন্তু এরা উঁচুতলার কেউ নয়, সবাই নীচুতলার মানুষ। কেউ বা দান পেয়েছে মহারাজার কাছে, কৃতজ্ঞতা দেখাতে এসেছে। আবার তামাশাগিরেরও অভাব নেই। দেখতে-দেখতে প্রাঙ্গণ ভরে উঠল।

বেলা সাতটা আটটায় গড়িয়ে পড়ল।

এবার ব্রুহাম আর ফীটন সারি সারি এসে থামতে লাগল আদালতের বাইরে। সিপাহীরা 'হঠ যাও', 'হঠ যাও' করে পথ করে দিতে লাগল। জনতা সভয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। প্রথমে এলেন বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে। ইনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান হাকিম—লর্ড চীফ জাষ্টিস। তারপরে আর আর বিচারপতিরা। মিঃ জাষ্টিস হাইড, মিঃ জাষ্টিস চেম্বার্স। মিঃ জাষ্টিস লামাস্টার। তারপরে জুরিরা একে একে আসতে লাগলেন। এঁরাও সবাই সাহেব। জনকয়েক দো-আঁশলা ইউরেশিয়ান আছেন মাত্র। জুরিদের মধ্যে জন রবিনসন হচ্ছেন মুখপাত্র বা ফোরম্যান। তিনিই জুরিদের কি মতামত তা জানাবেন। আছেন এডওয়ার্ড স্কট, রবার্ট ম্যাকফারলেন, জন ফার্গুসন, আর্থার আডি এবং আরও অনেকে। বিশ জনকে সমন দিয়ে আনা হয়েছে, এদের মধ্যে বারোজন থাকবেন, বাকি ক'জন বাতিল হবেন। সরকারের পক্ষের কৌঁসুলি মিঃ এইচ ডারহাম এলেন,

আসামীর কৌঁসুলি ফারের তাঁর সহকারী মিঃ ব্রিক্সকে নিয়ে দেখা দিলেন। তারপরে এলেন মিঃ আলেকজাণ্ডার এলিয়ট। ইনি খোদ গভর্নর-জেনারেলের বন্ধু, ইনি হবেন দোভাষী। সঙ্গে সহকারীরাও আছেন।

আটটা বাজল।

আদালত ঘরে লাল জোব্বা আর পরচুল পরে হাতে ন্যায়াধীশের দণ্ড নিয়ে চীফ জাষ্টিস আসীন হলেন। আর-আর জাষ্টিসরাও বসলেন। আমলারা, দোভাষীরা বসলেন। জুরিরা বসলেন।

কাঠগড়া এখনো শূন্য, অপরাধীর এখনো দেখা নেই।

চীফ জাষ্টিস আসামীকে আনবার হুকুম দিলেন। জেল থেকে তাঁকে আনা হয়েছে, তিনি এখনো অন্য কক্ষে বসে আছেন।

মিঃ ফারের উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মি লর্ড, আমার মক্কেল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোয় আমাদের আপত্তি আছে। আমাদের প্রার্থনা, তিনি তাঁর কৌন্সলীদের কাছে বসবেন। যখন হাজিরায় তাঁর নাম ডাকা হবে, তখন তিনি শুধু হাত তুলবেন না—তিনি যেন বলতে পারেন—আমি আসামী অমুক এখানো হাজির আছি!

স্যার ইলাইজা ইম্পে মিঃ জাষ্টিস হাইডকে কি বললেন, তারপর গম্ভীর স্বরে জানালেন, আসামী পক্ষের কৌঁসুলির এ-প্রার্থনা আদালত মঞ্জুর করতে না পেরে দুঃখিত।

এবার আসামীকে আনা হল। শৃঙ্খলে আবদ্ধ নন তিনি। সৌম্য শান্ত পুরুষ এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন।

স্তব্ধ সভাগৃহ। সবাই তাকিয়ে আছে আসামীর দিকে।

আসামী হাজির? সিপাই চিৎকার করে উঠল।

আসামী হাত তুললেন। একখানা শুভ্র গৌরবর্ণ হাত উঠে এল। দীর্ঘ হাত। সে-হাত আদালত গৃহ দেখল, তার দরজায় দণ্ডায়মান জনতা দেখতে পেল।

এবার জুরিদের নাম পড়া হল। এই জুরিদের মধ্যে কারো সম্পর্কে আপত্তি থাকলে আসামীকে জানাতে হবে। যাঁদের সম্বন্ধে আপত্তি, তাঁরা বাতিল হবেন।

আসামীকে কাঠগড়ায় বিশটি নামলেখা একখানি চিরকুট দেওয়া হল, তিনি বিশটি নামের মধ্যে আঠারোটি সম্পর্কেই আপত্তি তুললেন।

তাঁর এ-আপত্তি টিকলো না, এরই ভিতর থেকে বারোজন জুরি নির্বাচিত হলেন।

জুরিদের এবার শপথ গ্রহণ করানো হল।

সবাই পবিত্র বাইবেল স্পর্শ করে শপথ করলেন, তাঁরা ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করবেন।

আসামীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বুঝি ব্যঙ্গের হাসি।

এবার ফারের উঠে জানালেন, যিনি এ মামলায় দোভাষীর কাজ করবেন, তাঁকে আমার মক্কেলের শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই মনে করা হয়।

দোভাষী আলেকজাণ্ডার এলিয়ট বসেছিলেন, তিনি মুখ নীচু করলেন।

চীফ জাষ্টিস বিচারকগণ এবং জুরিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কি মনে করেন সহকারীদের দিয়ে কাজ চলবে?

জুরিরা সমস্বরে বলে উঠলেন, না, তা সম্ভব হবে না।

চীফ জাষ্টিস আবার বললেন, মিঃ এলিয়ট জেণ্টু আর মুরের ভাষা হিন্দুস্তানী আর ফারসিতে পণ্ডিত, তাঁর চরিত্রের বিরুদ্ধে এ অপবাদ তো মর্মান্তিক।

এলিয়ট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মি লর্ড, আমি এ মামলায় দোভাষীর কাজ করতে অনিচ্ছুক।

চীফ জাষ্টিস উত্তর দিলেন, কিন্তু আমরা পেড়াপীড়ি করছি, আপনিই দোভাষীর কাজ করবেন। আপনি এ অপবাদের উর্ধ্বে। আপনার ভাষার উপরে দখল, আপনার সরলতা এই বিচারশালাকে প্রমাণ করে দেবে— আপনার বিরুদ্ধে এ কলঙ্ক মিথ্যা।

ফারের উঠে বললেন, আশা করি মিঃ এলিয়ট ভাবছেন না যে, এ আপত্তি আমি তুলেছি। আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চীফ জাষ্টিস বললেন, কে এই নির্দেশ দিয়েছেন?

আমি তাঁর নাম জানাবার অনুমতি পাইনি।

জুরিরা বলে উঠলেন, আমরা কিন্তু প্রধান দোভাষী হিসেবে মিঃ এলিয়টকেই চাই।

ফারের বললেন, আমার উক্তি আমি ফিরিয়ে নিলাম, আমিও তাঁকে এই পদে বরণ করছি। তিনি যেন…

মিঃ ফারের হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন—তাঁর বন্ধু গভর্নর-জেনারেল বাহাদুরের মুখ চেয়ে তিনি যেন দোভাষীর কাজে অন্যায় না করেন। কিন্তু আদালতের অবমাননা হবে বলে আর কিছু বললেন না।

দোভাষীর কাজ পেলেন মিঃ এলিয়ট।

এবার সরকারের য়্যাডভোকেট মিঃ এইচ ডারহাম অপরাধের বিবৃতি দিলেন—

ব্রিটিশ উপনিবেশ এই কলিকাতায় এক মহা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে-অপরাধ করেছেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর কাছে মৃত্যুর সময় এক পোদ্দার স্ত্রী-কন্যাদের সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে এক জাল হাত-চিঠায় তাঁদের যথাসর্বস্ব হরণ করে নিয়েছেন।

চীফ জাষ্টিস এবং অন্যান্য জজেরা এবার অভিযোগটি পড়লেন। মিঃ জাষ্টিস চেম্বার্স অভিযোগটি পড়ে জানালেন,

জালিয়াতি এক ভীষণ অপরাধ, এবং তার কঠোর দণ্ডবিধি ইংলণ্ডে দ্বিতীয় জর্জের আমলে সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র ইংলণ্ডের জন্যই এ-আইন, আর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপারেই এ-আইন প্রযোজ্য। কিন্তু বেঙ্গালায় এ আইন খাটে না বলেই আমার মনে হয়। বেঙ্গালা তো ইংলণ্ডের সমপর্যায়ে নয়। তাই আমি আদালতের বিচারকগণের কাছে প্রস্তাব করি যে, এই অপরাধের অভিযোগ স্খালন করা হোক এবং ফরিয়াদীকে নূতন অভিযোগ আনয়ন করতে স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

চীফ জাষ্টিস জাষ্টিস চেম্বার্সকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি এ সম্পর্কে যে মত পোষণ করি তা মিঃ জাষ্টিস চেম্বার্সের মতের সঙ্গে আদৌ মেলে না। আমি এই অপরাধে ইংলণ্ডীয় দণ্ডবিধির ধারা অনুসারে বিচারের পক্ষে।

আর দুজন জাষ্টিসও তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন, আমরাও মহামান্য চীফ জাষ্টিসের সঙ্গেই একমত।

চেম্বার্স আরক্ত হয়ে উঠলেন অপমানে। কিন্তু কোন কথা বললেন না।

চীফ জাষ্টিস বললেন, তাহলে এবার বিচার শুরু হোক!

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার, তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—

বল আসামী—তুমি দোষী না নির্দোষ?

আসামী স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি নির্দোষ?

এবার চীফ জাষ্টিস শুধালেন, কারা তোমার বিচারক হবেন—তোমার কি ইচ্ছা?

অনুবাদ করে শোনালেন দোভাষী, নন্দকুমার বললেন, আমার ইচ্ছা ঈশ্বর আর আমার সমকক্ষ ব্যক্তিগণ আমার বিচার করুন।

কারা তোমার সমকক্ষ? আবার প্রশ্ন হল।

ফারের উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আদালতের বিবেচনার উপর আমার মক্কেল এ-প্রশ্ন ছেড়ে দিচ্ছেন।

চীফ জাষ্টিস বললেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিচার যখন ইংলণ্ডের আদালতে হয়, তখন সাধারণ জুরির দ্বারাই তার বিচার হয়। আইন অনুসারে ক্যালকাটাবাসীদের দ্বারা আসামীর বিচার হবে—কেননা সে ব্রিটিশের প্রজা। এই গহনার খত—এটি প্রকৃত কিনা—এই নিয়েই আদালত বিচার করবেন। যদি সে-খত জাল হয়ে থাকে, আসামী তা যে জানত—সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

চীফ জাষ্টিসের বক্তব্য শেষ হতে এবার সরকারপক্ষ আর আসামীপক্ষে লড়াই শুরু হয়ে গেল। সরকারপক্ষ চাইলেন প্রমাণ প্রয়োগে খতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আর আসামীপক্ষ তাকে সত্য বলে অভিহিত করতে চাইলেন। এবার তার জন্যে চাই সাক্ষী। সাক্ষীদের তলব দেওয়া হল।

৮ই জুন সকাল আটটায় শুরু হয়েছিল আদালত, ভাঙল সেই রাত দুটোয়। এর মধ্যে শুধু ডিনারের আর সাপারের বিরতিই ছিল। ৮ই থেকে আটদিন চলল মামলা। রবিবারও বাদ গেল না। মামলা মুলতুবী রইল না। তার নিয়মও ছিল না। সবাই না থাকুন, একজন জজকে থাকতে হল আদালতে। জুরিরা রইলেন সবাই। তাঁদের ভোজন আর বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। লা গেলেইস থেকে এল চোব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। কিন্তু সরকার তার ব্যয় বহন করলেন না, ব্যয় বহন কে করল কেউ জানে না। এক বছর পরে আদালতে এক মামলায় তা ফাঁস হয়ে গেল। লা গেলেইস ট্যাভার্ণের মালিক বুলাকিদাসের আমমোক্তার মোহনপ্রসাদের বিরুদ্ধে মামলা আনলেন। আটটি ডিনার আর ৯টি সাপার বা রাত্রির ভোজের জন্য তাকে ছশো উনত্রিশটি তঙ্কা দিতে হবে।

দারুণ গ্রীষ্ম। আদালত গৃহের বাইরে দণ্ডায়মান জনতা। ভিতরে কৌঁসুলি, জজ, জুরি, দোভাষী আর আমলাদের ভিড়। বাইরে যদি উত্তাপ হয় বিরানব্বুই ডিগ্রী তো এখানে একশো-দুই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে সবার। লালদীঘির গরম জলে সেই তৃষ্ণা নিবারণ করতে হচ্ছে। জজদের পিছনে পিছনে আছে পাঙ্খাবরদার, ময়ূরপুচ্ছের পাখা দোলাচ্ছে। কিন্তু সে-পাখার হাওয়ায় নিজেদের পদমর্যাদার গরমই বাড়ে, শরীর তো শীতল হয় না। জজেরা লাল জোব্বা আর পরচুলে গলদঘর্ম, ঘামে ভিজে-জবজবে তাঁদের পোষাক, ঘাম দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে, হাতের আঙুল থেকে ঘাম চোয়াচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা অন্তরই তাঁরা পোষাক বদলাচ্ছেন। দোভাষী, আমলা, আসামী, কৌন্সলীদের দশাও ভাল নয়।

দ্বিতীয় দিনেই আসামী পক্ষের কৌন্সলী জানালেন, মহারাজ অসুস্থ। আদালতে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অমনি আদালত দুজন ডাক্তারকে পাঠালেন। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। অসুস্থ বৃদ্ধকে আসতে হল আদালতে।

তারপরে কয়েকদিন ধরে চলল জেরা। আইনের তর্কে মিথ্যার ধুলো উড়ল, সত্য চাপা পড়ে গেল। বৃদ্ধ মহারাজ অসুস্থ, করুণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। সাক্ষী হয়ে এল তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল, তারই অনুগতের দল। লালা ডোমন সিংকে দেখে চমকে উঠলেন মহারাজ। তিনি বিড়বিড় করে বললেন,

তুমি—তুমিও এলে!

চারিদিকে ষড়যন্ত্রের উর্ণাজাল তাঁকে জড়িয়ে ধরছে। তাঁর বিরোধী সাক্ষীর প্রতি হাকিমেরা সদয়, তাঁর পক্ষের সাক্ষী মির আসাদ আলি, শেখ ইয়ার মহম্মদ আর কৃষ্ণজীবন দাসের উপর তাঁরা বিরূপ। তাই আঁধার দেখলেন চোখে, বুকে হতাশা।

সেদিন আদালত বসতেই ফারের চীফ জাষ্টিসকে জানালেন, আমার মক্কেল কাঠগড়া থেকে নেমে এসে গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

স্যার ইলাইজা ইম্পে তাকালেন অন্যান্য জজদের দিকে, জজরা তাকালেন জুরিদের দিকে। জুরিরা তাকালেন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ক্লান্ত অসুস্থ বৃদ্ধের দিকে। কেন যেন মঞ্জুরি মিলল।

কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন মহারাজ। আদালত গৃহের একপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফারের এলেন, সঙ্গে দোভাষী। কেউ কারো কথা বোঝেন না, দোভাষী বুঝিয়ে দিলে।

মহারাজ বললেন, আমার রক্ষার জন্য যথেষ্ট করেছেন, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন উকিল সাহেব। আপনার ফজিয়তই সার হল, কাজ তো হল না।

ফারের শুধালেন, কেন মহারাজ?

কেন—শুনবেন? নন্দকুমার হেসে বললেন, এই আদালত আমার দুশমন, তাই তো ব্যর্থ হবে আপনার এই চেষ্টা।

আদালত দুশমন?

হ্যাঁ, ওদের মুখ যে কথা বলছে, যে আইন আওড়াচ্ছে, সে তো ওদের নিজের কথা নয়, সে আর একজনের কথা। সেই তো নাটের গুরু, ওরা তার বান্দা। তাই স্থির করেছি, আর আমি আপনাকে কষ্ট দেব না। আজ থেকে আমি আমার ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম। যা করেন হরি, তাই-ই হবে।

ফারের বলে উঠলেন, না, না, আপনার এ ধারণা ভুল। আড়ালে যেই থাকুক, ব্রিটিশ জাষ্টিস তো কলুষিত হতে পারবে না—আমরা তা দেখব!

জাষ্টিস! নন্দকুমার হাসলেন। ব্রিটিশের ন্যায়-বিচারে আমিও বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু আর তো নই।

না, না, আপনি দেখতে পাবেন!

আমার মৃত্যুর পর হয়তো দেখা যাবে। নন্দকুমারের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে কাঠগড়ার দিকে ফিরে চললেন। ফারের দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে।

দুটো বাজতেই আদালতে বিশ্রামের ঘণ্টা পড়ল। ফারের কোনরকমে ডিনার সেরে জজদের ভোজনকক্ষে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলে গেল।

জজেরা খেতে বসেছেন। লা গেলেইসের খানসামারা থরে থরে সাজিয়ে দিচ্ছে খাবার। তাঁরা লাল জোব্বা আর পরচুলা খুলে রেখেছেন, তবু ঘামছেন। কিন্তু খেতে বাধা নেই। স্যার ইলাইজা ইম্পে একটা আস্ত মুরগীর রোস্ট মুখে পুরে দিয়ে চিবুচ্ছেন, কামড়াচ্ছেন। মিঃ জাষ্টিস হাইড

আর ল্যামেস্টারও খাবারে খাবারে ঠোক্কর মেরে চলেছেন। চেম্বার্স‌ও খাচ্ছেন, কিন্তু ঔদরিক তিনি নন। তাই পরিমিত ভোজন করছেন। ভোজন শেষে ম্যাডেইরা, ক্লারেট আর হকস্-এ গলা পাখলাবার এবার পালা। যে যাঁর বোতলগুলো করতলগত করলেন। তারপর গলায় ঢেলে দিলেন।

এই সময়ে এলেন ফারের।

ফারের জানালেন, লর্ডশিপের কাছে আমি এক আর্জি নিয়ে এসেছি। আমার মক্কেল মনে করেন, সমস্ত আদালতই তাঁর দুশমন। এখানে তিনি চরম দণ্ডই পাবেন। তাঁর পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করতে গিয়ে আদালত তাঁদের অযথা উৎপীড়নই করেছেন।

স্যার ইলাইজা ইম্পে বলে উঠলেন, ফারের, তোমার মক্কেলটির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে।

যাই-ই ঘটুক, ফারের উত্তর দিলেন, আদালত সম্পর্কে এ ধারণা তো আসামীর হওয়া উচিত নয়।

আসামী যদি ভাবে, হাইড বললেন, আমরা কি করতে পারি।

ফারের একবার মিঃ জাস্টিস চেম্বার্সের দিকে তাকালেন। চোখে চোখে কি কথা হল।

ফারের বাউ ঠুকে বেরিয়ে আসতেই তিনিও সঙ্গে সঙ্গে এলেন। এক নিরিবিলি কোণে নিয়ে গিয়ে বললেন, মিঃ ফারের, আপনার মক্কেলের কথাই হয়তো সত্য। কিন্তু তবু ব্রিটিশ জাস্টিসের সম্মান আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করব। আপনি আপনার মক্কেলকে বলবেন, এখন থেকে মিঃ চেম্বার্স মহারাজার সাক্ষীদের উচিত প্রশ্নই করবেন।

কিন্তু তাতে মহারাজার সন্দেহ তো যাবে না—ফারের বললেন।

মিঃ জাস্টিস চেম্বার্স হতাশভাবে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন।

সাক্ষীদের জেরা চলল আরও পাঁচদিন ধরে। ১৫ই জুন এসে গেল। আষাঢ়ের বর্ষণ শুরু হয়েছে। খালকাটার গাছের পাতায় নেমেছে শ্যাম-স্নিগ্ধ আভা, জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। উষ্ণতা কমে গেছে। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু স্বস্তি তো নেই আদালত-ঘরে। সেখানে বাইরে জমে উঠেছে জনতা, তারা চঞ্চল। ভিতরে জজেরা চঞ্চল, কৌন্সলী, অ্যাটর্ণিরা চঞ্চল। শুধু স্থির হয়ে আছেন কাঠগড়ার মানুষটি। তাঁর চোখ

দুটি যেন গভীর ধ্যানে নিমীলিত। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে শান্তির প্রসন্নতা।

সকাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল বিচারের ধারা। জেরা আর জেরা। বিচারকেরা কড়া হয়ে উঠলেন, সাক্ষীদের প্রাণান্ত হল। কিন্তু ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার হদিস মিলল না। রাত বারোটার ঘণ্টা পড়ল। ফারেল্ সাক্ষীদের জেরা করা শেষ করলেন। তিনি ক্লান্ত। ধীরে ধীরে আদালত ছেড়ে চলে গেলেন। ক'দিন চোখে ঘুম নেই, ঘুমোতে হবে। তাঁর সহকারী মিঃ ব্রিক্স রইলেন আদালতে।

কিন্তু তাঁরও কিছু করবার নেই। এইসব গুরুতর মামলায় আসামীর কৌন্সলী জুরিদের সম্বোধন করে বক্তৃতা দিতে পারেন না—এই নিয়মই বলবৎ আছে। শুধু আসামী নিজের স্বপক্ষে জুরিদের কাছে আবেদন করতে পারেন।

মহারাজকে চীফ জাষ্টিস শুধালেন আসামী, তোমার কিছু বলবার আছে?

মহারাজ হেসে মাথা নাড়লেন।

নিয়তি এগিয়ে আসছে, তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

তেলের বাতি জ্বলছে আদালত-ঘরে। শেষ রাতের তরল আঁধার বাইরে। কিন্তু ঘন মেঘে রুদ্ধশ্বাস আকাশের অন্ধকারে মিশে সেও যেন ঘন আর গাঢ় হয়ে উঠেছে। আদালত ঘরে তার ছায়া নেমেছে। আদালত ঘরের বাইরের দিকে পাঁচ-মিশেলি জনতার মুখে সেই ছায়া। আদালত-ঘরে কি হচ্ছে তারা শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে পেলেও বুঝতে পারছে না। সবাই আধ-ঘুমে বোজা চোখ, সবাই ক্লান্ত।' কিন্তু হঠাৎ যেন বোজা চোখ খুলে গেল। রক্ত আঁখি মেলে ফ্যালফ্যাল করে তারা তাকালে। কেউ বা চোখ রগড়ে নিলে। চঞ্চলতা নেই, অধীরতা নেই। এশিয়াবাসী তো চঞ্চল হয় না, উত্তেজনায় সাড়া দেয় না। দেয় হয়তো আরব মরুভূমির বেদুইনরা, দেয় হয়তো সমরকন্দের দুর্ধর্ষ তাতারেরা; কিন্তু হিন্দুস্থানের মানুষ তো উত্তেজনায় সাড়া দিতে জানে না, পারে না। তবু যেন নাটকের পরিণতি তাদেরও চঞ্চল করে তুলেছে। তারাও বুঝতে পারছে, নিয়তি তার ছায়া ফেলেছে মেঘান্ধকার ছায়াঘন এই আদালত ঘরে। সে অলক্ষ্যে এসে ঢুকে পড়বে। কৃষ্ণবর্ণ তার বসন যদি না হয়, গেরুয়ার নির্লিপ্ততা তাকে

ঢেকে দেবে। সে তো রক্ত পট্টাম্বরে কালী হয়ে দেখা দেবে না। সে নির্লিপ্ত, নিয়ে গ্রাস করবে হতভাগ্য শিকারকে। তাইতো হিন্দুস্থানের মানুষের বুকে সাড়া জাগে না নিয়তির আগমনে। তারা জানে নিয়তি কারো বাধ্য নয়। নিয়তি আসবে, টেনে নেবে তার কোলে। সব শেষ হয়ে যাবে। সব জুড়োবে কিন্তু তবু তো প্রতীক্ষা।

নিয়তির অনুচর ঐ লর্ড চীফ জাষ্টিস স্যার ইলাইজা ইম্পে পরচুলটা ঠিক করে নিলেন, লাল জোব্বা কুঁচকে ছিল, হাত দিয়ে মসৃণ করে নিলেন। এবার জুরিদের সম্বোধন করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু হল।

তিনি মহারাজের পদমর্যাদার কথা, বুলাকিদাসের তাঁর প্রতি আনুগত্যের কথা বললেন। টাকাও যে সামান্য, সেকথাও বলতে ভুললেন না। তবে কি তিনি জুরিদের বোঝাতে চাইলেন, মহারাজ নন্দকুমার শরণাগতকে সর্বস্বান্ত করেছেন, তাঁর অপরিমেয় ঐশ্বর্য, তিনি সেই ঐশ্বর্য থাকতেও সামান্য অর্থের জন্য জাল করেছেন খত?

হয়তো তাই।

ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার প্রতিনিধি লর্ড চীফ জাষ্টিস তবু ধরতাই বুলি দিয়েই শেষ করলেন তাঁর বক্তৃতা—

হে জুরিগণ, আপনাদের ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা, আপনাদের অনুভূতি বন্দীকে দোষী করতে যদি না চায় তো ভাল কথা। আপনাদের বিবেক যদি তার অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন না হয়, তাহলে তা করবেন না। তখন আপনারা যে রায় দেবেন, মানবতার আবেদনেই সে-রায় দেওয়া হবে। কিন্তু আপনাদের বিবেক যদি পূর্ণভাবে আসামীর দোষ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়, তখন তো অন্য কোনো বিবেচনা আপনাদের রায়কে সংক্রামিত করতে পারবে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনারা যে শপথ গ্রহণ করেছেন, সেই শপথের মান রাখবেন।

জুরিরা শপথের মান রাখলেন। তাঁরা আদালত-গৃহের বাইরে গিয়ে কি পরামর্শ করলেন, তারপর ফিরে এলেন।

জুরিদের ফোরম্যান বা মুখপাত্র জন রবিনসন, কোম্পানীর কেরানী। কোম্পানী আর কোম্পানীর খোদকর্তার মান রাখলেন। তিনি জানালেন, আমরা সবাই একমত, আসামী দোষী।

কোলাহল জাগল না আদালত-ঘরে। তৈলপ্রদীপ নিবে গেল না। শুধু নিয়তির নির্লিপ্ততা এসে বাসা বেঁধেছে আসামীর ভ্রূতে, চোখে। তিনি জেনেছেন, প্রাণদণ্ডে তিনি দণ্ডিত।

বাইরের জনতাও স্তব্ধ, তারা যেন সারি সারি পাষাণ মূর্তি। চোখ মেলে চেয়ে আছে। কিন্তু চোখের মণিতে নেই দৃষ্টির বিদ্যুৎ, বুকে নেই সম্বিৎ। পাথরের জোড়া জোড়া চোখ যেন তাকিয়ে আছে অপলকে।

১০

১৬ই জুন

বৃষ্টি নেমেছে ঝুপ-ঝুপিয়ে।

পাথরের চোখ নিয়ে নীলাম্বর এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল আদালতে, এবার সে বেরিয়ে এল, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলল।

বাজপড়া মানুষের মতো সে হতচেতন। অথচ বাইরে তা বোঝার উপায় নেই।

সে সাক্ষী দিতে পারে নি আদালতে। সাক্ষীর হলপ পড়ে নি। কৌন্সলী ফারের-এর সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি সব শুনে বললেন, বাবু, তোমার সাক্ষ্য তো আদালত নেবে না।

নীলাম্বর বলেছিল, আমি তো নিজের কানে শুনেছি সাহেব।

সেটা কানে শোনাই, এভিডেন্স নয়। কোর্ট তা মানবেন না। সরি!

সে চলে এসেছিল। তারপর রোজই গেছে আদালতে। সকালে উঠেই গেছে, দুপুরে পুঁটলিতে বাঁধা শুকনো চিঁড়ে আর গুড় খেয়েছে, সারাদিন সারারাত রয়েছে বাইরে দাঁড়িয়ে। ওলন্দা বিবি উরস্থলের কাছে আফিমের খবর করতেও যায় নি, গুন্না আমানের সঙ্গে দেখাও হয় নি। আজ সব শেষ হয়ে গেল।

বৃষ্টি ঝুপঝুপিয়ে পড়ছে। সে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বাজ-পড়া মানুষের তো চেতনা নেই। নিজের অজান্তেই দাঁড়াল।

আপন মনে বললে, এখনো আশা আছে। ব্রিটিশ আইন এমন নিষ্ঠুর তো হতে পারে না। জোরে জোরেই নিজের ভাবনা প্রকাশ করলে।

কার যেন হাসি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল ভাবনার উপর। হাসি তো নয় যেন কশাঘাত, আকাশের বিদ্যুতের খরতর বক্রহাসি। সে চমকে ফিরে তাকাল।

আর একটি পুরুষ গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ের চাদর নিঙড়ে নিয়ে মাথা মুছছে, গা মুছছে। গলার সাদা ধবধবে পৈতে বৃষ্টির জলে বুকে লেপটে আছে।

নীলাম্বর তার দিকে তাকিয়ে রইল। একে সে দেখেছে জনতার ভিড়ে, এই আদালতে। দিনের পর দিন তার নিজের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব মুখে। কেমন যেন মূর্তিমান বিদ্রোহ।

নীলাম্বর বললে, আপনাকে ক'দিন দেখেছি। আপনি কে?

লেপটানো নেতানো সাপের মতো যজ্ঞোপবীত দেখিয়ে দিয়ে হেসে বললে, দেখছ না আমি ব্রাহ্মণ। তবে কি জানো, কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ। আবার হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, তুমি?

সুবর্ণবণিক, নাম নীলাম্বর পানি।

আর আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আমার নাম হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী।

আমার কথা শুনে হাসলেন যে? নীলাম্বর শুধালে।

হেসেছি, ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতার কথা শুনে। হরানন্দ উত্তর দিলে।

কিন্তু তার কি ন্যায়পরায়ণতা নেই?

দেখতে তো পাইনে।

দেখবেন—মহারাজের এ প্রাণদণ্ড হবে না! খ্রীষ্টান রাজা মোকুব করে দেবেন। এই শহরেই তা হয়েছে।

ভাল, হরানন্দ বাঁকা হাসি হাসলে। তুমি কালা বণিক বলেই এই সাদা বণিকদের বিশ্বাস কর!

আপনি করেন না?

না। আমি এদের কীর্তি দেখেছি।

আর আমি এদের ইতিহাস পড়েছি।

ইতিহাস পড়েছ? হরানন্দ বিস্ময়ে অবাক।

হ্যাঁ, আমি আংরেজী জানি, নীলাম্বর বললে। আমি জানি, এরা রাজাকে দিয়ে একদিন জোর করে সই করিয়ে নিয়েছিল তাদের আজাদীর সনন্দ। তারা আর-এক রাজাকে হত্যাও করেছিল তাঁর অত্যাচারের জন্য।

তুমি জান, আমাকে বলবে? আমি জানব, শুনব। হরানন্দ ব্যগ্র স্বরে বলে উঠল।

হ্যাঁ, বলব। কিন্তু মহারাজের কি কষ্ট!

রাজা-মহারাজা হলে অমন কষ্ট পেতেই হয়।

আপনি কি মহারাজার পক্ষে নন?

কেন আমি পক্ষে হব? মহারাজা আমার কে?

তবে এখানে এলেন কেন?

আংরেজের বিচার দেখতে।

বিচার দেখলেন?

হ্যাঁ, দেখলাম। কিন্তু কি দরকার ছিল এ-প্রহসনের। ঐ নন্দকুমারকে ধরে এনে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি লটকে দিলেই হত। এর চেয়ে কাজীর বিচার ভাল।

না, না, ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতার কথা আপনি জানেন না! নীলাম্বর বলে উঠল। আমি জানি।

আর আমি জানি না বলেই তোমার কাছে জানব। হরানন্দ বললে, তোমার পাত্তা কোথায়?

পাত্তা তো নেই! নীলাম্বর হাসলে।

হরানন্দ হেসে উঠল, পাত্তা নেই? শয়নং যত্রতত্র ভোজনং হট্টমন্দিরে! বাঃ আমারই মতো। তাহলে তো আমরা মাণিকজোড়। হরানন্দ হাত ধরল নীলাম্বরের।

তাকে টেনে নিয়ে বৃষ্টির ভিতরে চলতে লাগল।

এখন বেলা নটা বাজে।

য়্যাডভোকেট ফারের জেগে উঠলেন।

এতদিনের অনিদ্রার পর আজ খুবই ঘুমিয়েছেন। সেই তিনটের সময় এসে গাউন না খুলেই শুয়ে পড়েছিলেন, আর এই উঠলেন। মাঝখানে য়্যাটর্ণি জ্যারেট বুঝি এসেছিলেন। কি যেন বলে গেলেন, কাব্রাডুলের সবজে রঙের মশারির ফাঁক দিয়ে মুখও বাড়ান নি। মশারির ভিতরে বসেই হাঁ-হাঁ করেছিলেন। কি বলে গেলেন জ্যারেট—মনেও নেই। হয়তো চিঠি লিখে গেছেন। ফারের মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। শরীরটা এখনো চাঙ্গা হয় নি, এখনো যেন চুরি-করা জামার মতো ঢলঢল করছে। তিনি এসে টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন। একটা পাথরের কাগজ-চাপা দিয়ে চাপা রয়েছে চিঠিখানি। কাগজ-চাপা সরিয়ে চিঠিখানি তুলে নিয়ে পড়লেন।

তাঁর সহকারী মিঃ ব্রিক্‌স লিখেছেন, রাজা জুরিদের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আর সরকার পক্ষ থেকে রাজার পক্ষের তিনজন সাক্ষীকে সোপরদ্দ করা হয়েছে। তারপরে দুঃখ জানিয়েছেন রাজার জন্যে।

মিঃ ফারের চিঠিখানি রেখে দিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এমন হবে, তা তিনি জানতেন। রাজা ঠিকই বলেছিলেন, চারিদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে, অব্যহতি তাঁর নেই। পুওর রাজা! বেচারা!

বসে বসে ভাবলেন য়্যাডভোকেট ফারের, তারপরে বলে উঠলেন, এখনো উপায় আছে, শেষ উপায়। লাস্ট চ্যান্স! এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করব, রাজার কাছে বন্দীর প্রাণভিক্ষা চাইব। এই-ই শেষ উপায়। তিনি অমনি কলম তুলে নিলেন, মুসাবিদা করতে বসে গেলেন। মুসাবিদা করা হয়ে গেলে ফারের বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি আশান্বিত। দশবছর আগে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর স্পেন্সরের আমলে রাধাচরণ মিত্রের প্রাণদণ্ড মোকুব করবার জন্যে জেণ্টু আর মুরেরা দরখাস্ত করেছিল। সেই দরখাস্তে অনুমোদন জানিয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন জুরিরা। আর তাতে ফলও হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজা সেদিন প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর মক্কেল নগণ্য রাধাচরণ নয়, তিনি মহারাজ নন্দকুমার। ইংলণ্ডের মানুষও তাঁকে চেনে। তাঁর নাম জানে। তিনি কি ক্ষমা পাবেন না? কিন্তু সন্দেহ আছে, সংশয় আছে। রাধাচরণ কলকাতার সামান্য জমিদারের ছেলে, তাই তার শত্রুও তেমন ছিল না। মহারাজ

নবকৃষ্ণ থেকে শুরু করে বড় বড় লোক সবাই স্বাক্ষর করেছিলেন সে-দরখাস্তে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও হতে পারে।

তবু তিনি জুরীদের ফোরম্যানের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন।

রবিনসন অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ম্যাডভোকেট ফারেরকে দেখে বিস্মিত হলেন।

ক'দিনের ধকলের পর আজ এত সকালে উঠেছেন মিঃ ফারের?

আপনিও তো উঠেছেন, ফারের উত্তর দিলেন।

আমরা কোম্পানীর কর্মী, কোম্পানীর কাজ তো পড়ে থাকতে পারে না। তারপর এমন অসময়ে যে?

আমাদের সময়-অসময় নেই—ফারের বললেন। আমি এক আর্জি নিয়ে এসেছি।

কি আর্জি? কার আর্জি?

আইনের এক হতভাগ্য শিকার—তারই আর্জি। আপনি নিজেই পড়ে দেখুন, বিচার করুন। কাগজখানা এগিয়ে দিলেন ফারের।

ও আমি দেখতে চাইনে মিঃ ফারের, রবিনসন বলে উঠলেন।

কেন? আপনি কি তাঁকে আইনের হতভাগ্য শিকার বলে মনে করেন না?

না। আইনজ্ঞ হয়ে আপনি আইনকে অপমান করছেন।

তাই নাকি! ফারের হাসলেন। আইন থাক, আপনার বিবেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাকে এই আর্জিতে সহি করতে হবে।

আমার বিবেক আমার! তাকে আপনি আঘাত করছেন মিঃ ম্যাডভোকেট!

না, আপনার বিবেকের কাছে আমি দয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দয়া! রবিনসন অবাক হলেন।

হ্যাঁ, জানেন না দয়ার কথা! যাকে দয়া করা হয়, সে তো আশীর্বাদ পেল, যে দয়া করে সেও তো বঞ্চিত হল না।

আপনার দেখছি এখনো স্কুলের গন্ধ গা থেকে যায় নি! রবিনসন বিদ্রূপ করলেন। মহাকবিকে মনে রেখেছেন?

আর তাই আমার বিবেক এখনো ঠিক আছে, মিঃ ফারের উত্তর দিলেন। কারো কাছে তাকে বাঁধা রাখি নি।

আপনি আমাকে অপমান করছেন মিঃ ফারের, দপ্ করে জ্বলে উঠলেঃ মিঃ রবিনসন।

না, অপমান করি নি। তবে অপমান করার ইচ্ছা ছিল, মিঃ ফারের এই বলে চলে গেলেন।

রবিনসনের অফিস যাওয়া হল না। তিনি লর্ড চীফ জাষ্টিসের কা... এক চিঠি লিখতে বসলেন।

তিনি লিখলেন, মিঃ ফারের বাজাকে বলেছেন আইনের হতভা... শিকার। আইনের তিনি অবমাননা করেছেন। আমার মনে আঘা... লেগেছে। যে-আদালত ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতাকে বজায় রাখছেন এই কা... জেণ্টু আর মুরের দেশে—তিনি সেই ন্যায়পরায়ণতাকে আঘাত করেছেন তিনি চীফ জাষ্টিস ও জজদের সমস্ত বেঞ্চকে অপমান করেছেন।

রবিনসন চিঠি লিখতে লাগলেন, এদিকে আর্জি নিয়ে ঘুরতে লাগলেন য়্যাডভোকেট ফারের।

কিন্তু জুরাদের মধ্যে ক'জন রাজী হলেন না। বাকি ক'জনের কাছে আর গেলেন না। ফারের হতাশ হয়ে আদালতে গেলেন।

লর্ড চীফ জাষ্টিস তখনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন,

মিঃ য়্যাডভোকেট, আপনি মিঃ রবিনসনের কাছে আর্জি নি... গিছলেন?

হ্যাঁ, মি লর্ড। ফারের উত্তর দিলেন

আর্জিতে আইনের হতভাগ্য শিকার—আনহ্যাপী ভিক্টিম—একথা ছিল?

হ্যাঁ, মি লর্ড।

আপনার ব্যবহার য়্যাডভোকেটের মত হয় নি। আপনি আদালতের অবমাননা করেছেন। আইনের হতভাগ্য শিকার—একথার মানে কি? লর্ড চীফ জাষ্টিস রুক্ষস্বরে শুধালেন।

ফারের বললেন, একে তো এ-আইন ব্রিটিশের, একজন জেণ্টু এ-আইনে অপরাধী হতে পারে না। তার উপরে তিনি বৃদ্ধ। তাই আমি তাঁকে আইনের হতভাগ্য শিকার বলেছি।

কিন্তু সেটা বেআইনী হয়েছে। ব্রিটিশ আইন পদদলিত করেছেন।

ফারের বলতে গেলেন, তা যদি পদদলিত করে থাকি, তাহলে অমন আইনের ঐ দশা হওয়াই ভাল। কিন্তু তা বললেন না, চুপ করে রইলেন।

মিঃ জাষ্টিস চেম্বার্স ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন।

ফারের চলে এলেন ক্ষুণ্ণ মনে। আর কিছু করবার তো উপায় নেই।

আদালতে সেদিন আব কোনো কাজে মন বসল না। তিনি ফিরে এসে চুপ করে বসে আছেন, এমন সময় পালকি এসে থামল।

ফারের মুখ তুলে তাকালেন। কে-একজন পালকি থেকে নামছেন। কালা নয়, একজন শ্বেতাঙ্গ।

ভৃত্য এসে খবর দিলে, তিনি তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন।

শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এসে ঢুকেই বললেন, গুড ডে মিঃ ফারের, আমাকে চিনতে পারছেন?

ফারের তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন, আপনার মুখ মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

আদালতে এই ক'দিন দেখেছেন, তবু চিনতে পারলেন না। আমার নাম এডওয়ার্ড এলারিংটন। আমি রাজার মামলার একজন জুরী। আপনার আর্জিতে কি কেউ সই দিয়েছে?

কেউ না। আপনি দেবেন? ফারের তাকালেন তাঁর দিকে

হ্যাঁ, দেব বলেই তো এসেছি।

সত্যি! তাহলে মানুষ এখনো আছে?

সবাই তো পশু নয়, হাসলেন এডওয়াড এলারিংটন। দিন—আর্জি দিন, সই করে দিচ্ছি।

অনাদৃত আর্জিখানা এগিয়ে দিলেন মিঃ ফারের, এডওয়ার্ড এলারিংটন সই করে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, এবার আসি! টুপি তুলে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

আবার ফারের গা-ঝাড়া দিলেন। এখনো বিবেক-বুদ্ধি মানুষের আছে। আর সেই তো আশা। তিনি আর্জিখানা আবার হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বিকেল হয়ে এসেছে।

আর কতক্ষণ পরেই সাহেব-বিবিরা ডিনার-ঘুম থেকে জেগে উঠবেন কাত্রাডুলের মশারি থেকে বেরিয়ে আসবেন। তারপরেই সাজগোজ শুরু হবে। মেরী তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলে। এবার সে রওনা হবে। তাকে যেতে হবে অনেক দূর। তবে ভাবনা নেই, ফীটন কি ব্রুহাম আসবে তাকে নিতে। লেডী য়্যানের সেদিকে খেয়াল আছে।

সে তৈরী হয়ে বসে আছে, এমন সময় কে যেন শিস দিতে-দিতে এসে ঢুকল ঘরে।

মেরী তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঢিলে-ঢালা জোব্বাপরা লোকটা, চিবুকে একটু গোটী—ছাগুলে দাড়ি।

লোকটা দাঁত বের করে হেসে উঠল, হেল্লো ডিয়ারী, চিনতে পারছ না?

মেরী এবার চিনলে, বললে—হ্যারী—কোন হাওয়া তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে এল?

বসন্তের হাওয়া, হ্যারী বললে।

এই ভরা গ্রীষ্মে, বসন্ত?

না হয় নাই বা হল বসন্ত। ভরগ্রীষ্মেও তো স্বপ্ন জাগে।

বাবাঃ—এই গরমে কবিত্ব! মেরী আঁতকে ওঠার অভিনয় করলে।

যাক—কাজের কথায় আসি। ব্যবসা কেমন চলছে? হ্যারী শুধালে।

কোনরকম। তুমি তো আর খোঁজ-খবর নাও না—মেরী বললে।

খোঁজ-খবর নেব কি, তুমি পুরানো পিরীত ভুলে গেছ!

সাধে কি ভুলি, তুমিই ভোলালে হ্যারী।

যাক—হ্যারী বললে, পিরীত-টিরীত নয়—একটা দাঁও আছে।

কি—?

নাবাবেস হবে?

তোমার নাবাবেসরা তো ফ্ল্যাগ স্ট্রীটের বাসিন্দে। তাদের মতো হতে চাইনে।

কিন্তু লস্করের পয়সায় একসময়ে বেঁচে ছিলে. তা মনে আছে?

তোমাদের মতো লোকের পাল্লায় পড়ে বাঁচার আর উপায় ছিল না বলে।

যাহোক, হ্যারী বললে, তাহলে ফ্লুসের তোমার দরকার নেই, এই বলে আঙুলে তুড়ি বাজালে।

কেন থাকবে না? কাকে চামড়া বিক্রি করতে হবে বল!

যদি বলি—খোদ—

নো!

কেন?

তিনি তঙ্কা পকেটে পুরতে জানেন, বিলোতে জানেন না। তার উপরে ফ্রাউ ইমহফ্ আছেন।

আচ্ছা তিনি না হন, বারওয়েল তো আছেন। কেমন, পছন্দ হয়?

ওঁর তো গোটা হারেম! মিস ক্লেভারিংকে বিয়ে করবেন, এদিকে দারার মতো আর পাঁচটাকেও রেখেছেন।

পাঁচটা কেন—উনি কি যে-সে লোক, অন্তত পঁচিশটি আছে ওঁর হারেমে। তোমাকে সেদিন দেখেই পছন্দ করেছেন।

টাকা বায়না এনেছ?

হ্যাঁ, এই বলে পকেটে হাত দিয়ে বাজালে।

হঠাৎ বায়না যে?

তোমাকে কাজ করতে হবে, তুমি তো মনসন-ক্লেভারিংদের বাড়িতে যাও—ওদের মতিগতি কি জানতে হবে।

হ্যারী—শেষে পাদরীগিরি ছেড়ে গোয়েন্দাগিরি ধরলে! মেরী বলে উঠল।

পাদরীগিরিও কাজ, গোয়েন্দাগিরিও কাজ। আমাদের টাকা পেলেই হল। রুপেয়ায় রাজার ছাপ ছাড়া অন্য ছাপ তো নেই।

আচ্ছা—বায়নাটা রেখে যাও! দেখি—কতদূর কি করতে পারি।

সে কি—তোমার সঙ্গে কি শুধু টাকার সম্পর্ক। একটু বসতেও বললে না মেরী!

কেন বসতে বলব—তুমি আমার কে?

হেসে উঠল হ্যারী, তোমার প্রথম প্রণয়ী—ফার্স্ট লভ—তোমার ছেলের বাপদের একজন।

মেরী জ্বলে উঠল, দাঁতে দাত চেপে বললে, দেখো হ্যারী, কাজ পেতে হলে চটিয়ো না।

তাহলে কাজটা করবে?

করব। টাকা পেলেই করব। টাকার জন্যে সব করেছি, আর এটা করব না!

তাহলে শোন, খুলেই বলি। কালা কর্ণেলের ফাঁসির হুকুম হয়েছে. তা তো জানো। ঐ মনসন-ক্লেভারিং-ফ্রান্সিস—ওদের কি মতলব তা জানতে হবে।

আচ্ছা, তা জানব, মেরী বললে। কিন্তু একজন কালাকে ফাঁসিতে লটকাবার জন্য তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

পথে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। মেরী বলে উঠল, আমি বুঝতেও চাইনে। আমার টাকা হলেই হল। বারওয়েলকে বোলো, আমি টাকা চাই—আর কিছু চাইনে।

আমাকেও না? হ্যারী হাসল।

টাকা দিতে পারলে তুমি কেন জেণ্টু-মুর সবাই আমার আপন। টাকা না পেলে আমি কারো নই। এখন যাও, আমার গাড়ি এল।

হ্যারী চলে গেল, মেরী গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

কর্ণেল মনসনের বাড়িতে বৈঠক বসেছে।

জেনারেল ক্লেভারিং, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, কর্ণেল মনসন ও লেডী য়্যান আছেন।

ফ্রান্সিস বললেন, আপনারা কি কালা কর্ণেলের ব্যাপারে চুপ করে থাকবেন? ব্রিটিশ জাষ্টিসকে কি আপনারা কলঙ্কিত করতে দেবেন?

জেনারেল বললেন, আমি এ-ব্যাপারে থাকতে চাইনে স্যার ফিলিপ।

থাকতে না চান, কিন্তু কি করে রাজাকে ভুলে গেলেন? তিনি তো আমাদের বন্ধু।

বন্ধু বটেন, কিন্তু তাঁর জন্যে কিছু করা সম্ভব নয়। তিনি রুবিকান পার হয়ে গেছেন—কর্ণেল মনসন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু এখনো রাজার কাছে মার্সি-পিটিশন করা যায়, স্যার ফিলিপ বললেন।

তাতে ফল হবে না—ক্লেভারিং জানালেন।

সেকথা সত্য। এইমাত্র আমার হেয়ার-ড্রেসার মেরী বলে গেল, তারা নাকি আমাদের মনের কথা জানতে চাইছে, লেডী য়্যান বললেন।

আমাদের মনের কথা তো ব্ল্যাক কর্ণেলকে রক্ষা করা, ফ্রান্সিস টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন। আমাদের আগেই নবাব-নাজিম কৌন্সিলের কাছে আর্জি পেশ করেছেন। এই শহরের যাঁরা গণ্যমান্য—তাঁরাও করেছেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বোধহয় তাঁদের ভিতরে নেই? কর্ণেল মনসন শুধালেন।

হেষ্টিংসের গোয়েন্দা!—ফ্রান্সিস ঘৃণাভরে বললেন।

কিন্তু আমি এর ভিতরে নেই—জেনারেল মাথা নেড়ে বললেন।

আমিও নেই—কর্ণেল মনসন সায় দিলেন।

তাহলে আপনারা হেষ্টিংস-জুজুর ভয়ে অস্থির! লেডী য়্যানের কণ্ঠে ধ্বনিত বিদ্রূপের ঝলক।

যদি তাই-ই হই তো ক্ষতি কি! রোমে বাস করে তো পোপের সঙ্গে বিবাদ চলে না, গম্ভীর স্বর ঝরে পড়ল কর্ণেলের।

লেডী য়্যান শুধু বললেন, জেনারেলের মেয়ে না হয় বারওয়েলের বিবি হবেন, তোমার কি স্বার্থ মনসন?

তুমি উয়োম্যান, রাজনীতির কি বোঝ? মনসন গম্ভীর স্বরে বললেন।

অমন রাজনীতির গলায় দড়ি! হ্যাঙ্ ইট, আমি বুঝতেও চাইনে!

জেনারেল বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ফ্রান্সিস শুধু বলে উঠলেন, ব্রিটিশ জাষ্টিস তাহলে কিছু নয়? ঐ হেষ্টিংসের স্বেচ্ছাচারিতাই সব! সব? আমি তো তা সইব না!

স্যার ফিলিপ, আমিও তা সইব না—লেডী য়্যান বলে উঠলেন। তিনি টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর চলে গেলেন।

কর্ণেল মনসন সেদিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন, না সয়ে উপায় নেই। সে এখন সর্বশক্তিমান। হি ইজ অল পাওয়ারফুল!

ফ্রান্সিস কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

লাডলীর কাছে মহারাজার বিচারের খবর নিয়ে এসেছিল কেল্টুন। সে শুনেও শোনে নি। মহারাজার ফাঁসি হবে তো তার কি! তার দরখাস্ত লেখার কাজ আছে, তার রোজনামচা আছে। সেখানে সে উর্দু-ফারসী কবির কবিতা লেখে; আবার নিজের কবিতারও মক্স করে। আর আছে সিদ্ধির শরবত। সিদ্ধি খেয়ে নীল অপরাজিতার ধ্যান করে, আবার থাকমণি আর খোকনের মুখও উঁকি-ঝুঁকি মারে। সিদ্ধির নেশায় তারপর সব তালগোল পাকিয়ে যায়। সকালে ঘুম ভেঙেও খোকনের মুখখানা জেগে থাকে। নিজেকে নিয়েই সে মত্ত। কার কি হল, কে কি করল —সে ভাবে না।

সেদিন সকালে উঠে সে বসেছিল, এমন সময় একখানা পালকি এসে থামল দরজায়। সে একবার তাকিয়ে দেখলে। ষোলো কাহারের পালকি এ-পথে বড় আসে না। এলেও থামে না। আসাসোঁটাধারী চোবদারের এমন বাহারে পোষাকও পথে-ঘাটে দেখা যায় না। তাই তাকিয়ে দেখতে হল।

কিন্তু তাকিয়ে থাকবার ফুরসত মিলল না, এত্তেলা না দিয়েই ঘরে এসে ঢুকলেন দুজন পাগড়ীধারী মানুষ। আচকান পরনে, মাথায় দামী শেরপেঁচ। দুজনেই প্রৌঢ়, একজনের বয়েস একটু বেশি, আর-একজন কিছু কম। দুজনের বেশভূষাই দামী।

তাঁদের দেখে নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়াল লাডলী।

সে বললে, আসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক!

বয়স্ক যিনি, তিনি চৌকি টেনে নিয়ে বললেন, বসতে আসি নি, কাজে এসেছি।

হ্যাঁ, কাজটি করে দিতে হবে, কমবয়স্কটি বললেন।

কাজটা কি? লাডলী শুধালে।

বয়স্ক বললেন, আপনার আর্জির নাম শুনেই এসেছি। এমন কম বয়সে এমন আর্জি ক'জন লিখতে পারে! এক আর্জিতেই সব ফতে করে দিয়েছেন!

আবার কাকে ফতে করবার আরজি লিখতে হবে? লাডলী শুধালে। দু মোহরের কমে কিন্তু হবে না।

দু মোহর কেন, দশ মোহর দেব, বিশ মোহর দেব! বয়স্ক লোকটি বললেন।

এত! অবাক চোখে তাকিয়ে রইল লাডলী।

হ্যাঁ, আমাদের প্রধান আদালত বরাবরেষু একখানা আর্জি লিখতে হবে, আর সে-আর্জিতে মহারাজের দণ্ডের আদেশে আমরা মোকাম খালকাটার বাসিন্দেরা যে কত সুখী হয়েছি, তিনি যে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করেছেন—এইজন্য তাঁকে শত-সহস্রবার সেলাম জানাতে হবে।

আবার সেই একই আর্জি!—লাডলী বললে। এক আর্জি লিখেছি, তাতে মহারাজের ফাঁসির হুকুম হল। আবার আর্জি কেন?

দু মোহরের আর্জিনবীশকে সে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে কমবয়স্ক লোকটি।

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে লাডলী, কৈফিয়ত না দিলে ভাগো হিঁয়াসে, নিকাল যাও!

বয়স্ক লোকটি এবার মাঝখানে পড়ে বললেন, না, ওঁর তেরিয়া মেজাজ, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। আমি নিজেও তো মুহুরী ছিলাম, সেকথা নয়। মহারাজ বাঙালী, মহারাজ ব্রাহ্মণ, তিনি আমাদের পর হলেন কেন? তার কারণ, তিনি সকলের সর্বনাশ করতে চান। এই তো এই ... এঁকে দেখছেন—ইনি মহারাজের বড জামাই জগৎচন্দ্র—ইনি মানী পুরুষ। কিন্তু মহারাজ এঁর ভাল তো করেনই নি, বরং এঁর সর্বনাশ করতেই চেয়েছেন। ইনি যে-পদের জন্য দাঁড়িয়েছেন, তাতেই বাগড়া দিয়েছেন।

আর ইনি কে জানেন? জগৎচন্দ্র বললেন। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ। এঁর সর্বনাশ করবার জন্য তো সর্বদাই তাঁর চেষ্টা। ব্রাহ্মণের বিধবাকে টাকা খাইয়ে শ্লীলতা হানির মামলা পর্যন্ত আনিয়েছেন।

না, না, ওসব কথা থাক—মহারাজ নবকৃষ্ণ বললেন, কিন্তু যিনিই উন্নতি, তাঁরই সর্বনাশ তিনি চান। আর দেখলেন তো, বুলাকিদাস নিজের স্ত্রীকন্যাকে মরণের সময় ওঁর হাতে দিয়ে গেলেন, উনি কিনা জাল করে তাঁদেরই সর্বনাশ করলেন। উনি ছাড়া পেলে আপনারও সর্বনাশ করতে পারেন।

আমার আর কি সর্বনাশ করবেন? হেসে উঠল লাডলী। তাছাড়া ছাড়া পাবার ভরসা আছে নাকি!

নেই?—ওঁর দোস্তরা চেষ্টা করছেন—রাজার কাছে আর্জি পাঠাবেন। নবকৃষ্ণ বললেন।

সে আর্জি আর পাঠাতে হবে না। জগৎচন্দ্র বললেন! আর সে আর্জি যে লিখবে তার সর্বনাশ করে তবে ছাড়ব।

মোহর পেলে আমিই লিখব।—লাডলী আবার হেসে বললে।

লিখবেন বই কি, ঐ আপনার পেশা! মহারাজা হাসলেন। আপনার নামটা তো জানলাম না? আপনার নিবাসই বা কোথায়?

লাডলী বললে, দু মোহরের মুহুরীর নামধামে মহারাজের কি দরকার?

না, না, আপনার চেহারা দেখেই মনে হয়, আপনি বড় ঘরের ছেলে।

আমার নাম লাডলী মোহন বসু, মথুরাপুরে আমার বাড়ি।

কোন মথুরাপুর—শিয়াখালা—?

লাডলী মাথা নাড়লে।

আমাদের কায়স্থকুলের শিরোমণি আপনারা! জানেন তো আমিও কায়স্থ। ব্রাহ্মণ আমাদের নমস্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি অব্রাহ্মণের কাজ করেন, তাহলে আমরা তাঁকে কেন পূজা করব? আমরা কায়স্থরা ব্রাহ্মণদের দাস হয়ে এলেও আসলে ছিলাম রক্ষক। তাঁরা স্বধর্মচ্যুত হলে তাঁদের কেন রক্ষা করব? তাই আমি আপনাকে বলছি—আপনি অব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এই কাজ করুন! আপনি মহাকুলীন খাঁ বংশ, আসুন আমরা এই অব্রাহ্মণকে সরিয়ে দিই।

তাতে আপনার লাভ আছে, লাডলী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, কিন্তু আমার কি ফয়দা?

আছে, লাভ আছে, কোম্পানী হিন্দু আইনের ফারসী তরজমা চাইছেন, আপনি সে কাজটি পেতে পারেন।

পারি, পেতে পারি?

হ্যাঁ, কায়স্থ আমি, কায়স্থকে যদি না দেখি কে দেখবে!

তারপর মহারাজের আর্জি লিখে দিয়েছে লাডলী আর সেই আর্জি নিয়ে সই আদায় করতেও তাকে ঘুরতে হচ্ছে।

আজও পালকি করে সে ঘুরেছে, সঙ্গে লোকও আছে, সই আদায় করতে বেগ পেতে হয় নি। গণ্যমান্য যাঁর কাছে গেছে, তিনিই সই দিয়েছেন। তার আর্জির বয়ান দেখে কেউ না বলতে পারেন নি। শতাবধি সই পড়েছে। কি বয়ান—যুগপৎ আনন্দ ও বিশ্বাস আমাদিগর হৃদয়ে সমুত্থিত হইল। আমাদিগর এ বিশ্বাস বলবৎ হইল যে রাজ্যের শুভ নিশ্চিত। দুষ্টের দণ্ড হইল শিষ্ট পালিত হইল।

একশতটি সই চাই। লাডলীর মজাই লাগছিল। ক'টা আব দিন তর সইল না। রাজা ফাঁসি গেলে না হয় করতিস! তবে তার কিছু যায় আসে না। সে ভাড়াটে মানুষ। তার স্বাক্ষরের দাম থাকলে সে তা দিত না।

শত স্বাক্ষরের আর একটি বাকি আছে। লাডলী বাড়ি ফিরছিল। বাড়ির দরজায় একখানা জমকালো পালকি থেমে থাকতে দেখে থমকে দাঁডাল। কে আবার এল—কে জানে! কিছুদিন থেকে তাব বাড়িতে পালকির আনাগোনা শুরু হয়েছে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। মহারাজ কায়স্থ, কায়স্থকে কায়স্থ না রাখলে কে রাখবে—একথা তিনি মানেন। তাই আর্জি লেখাবার লোকের আনাগোনায় কুলির বাজারের এই গলি সরগরম। আজও হয়তো অমনি কোন মক্কেল এসে বসে আছেন। লাডলী ঢুকে পডল বাড়িতে।

ফরাসের উপরে তাকিযা ঠেস দিয়ে কে একজন এলিয়ে পড়ে ছিলেন, ওকে দেখেই উঠে বসে বললেন, এসো বাবাজী এসো!

লাডলী চমকে উঠল, এযে তার শ্বশুরমশাই!

শ্বশুরমশাই জযনগরের মিত্রজা বললেন, বাবাজী, এমনি করে কি আমাদের ত্যাগ করতে হয়। আজ প্রায় ছ'বছর ঘর ছাড়া। বাপেব সঙ্গে ঝগডা হয়েছিল-হয়েছিল—তাই বলে কি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হয়? আর কটা বছর কাটলে—কি সর্বনাশ হত! মেয়েকে আমার শাঁখা ভাঙতে হত, সিন্দুর মুছতে হত। আহা, ছেলেটার জন্যেও মন পোড়ে না!

লাডলী শ্বশুরমশায়ের কথার তোড়ে হকচকিয়ে গেল। শ্বশুরমশাই বললেন, আমি তো মহারাজের কাছে শুনলাম তোমার কথা, তারপরে খোঁজ করে এলাম। তা—মথুরাপুরে তো একবার যেতে হয় বাবাজী।

না, সেখানে আর যাব না।

আরে তোমার বাবা মারা গেছেন। এখন আর যেতে বাধা কি ?

কোন মুখে যাব ?

বাবাজীর যেমন কথা ! হেঁ হেঁ হেঁ ! ওসব বেটাছেলের একটু হয়েই থাকে—সে কি আমার মেয়ে মনে রেখেছে ? সে তো মাছভাত খায়, শাঁখা-শাড়ী পরে আর কাঁদে। কবে সব ঘুচে যাবে তাই তার অহর্নিশির ভাবনা।

লাড়লী হ্যাঁ, না কিছু বললে না। শ্বশুরমশাই এবার উঠলেন।

লাডলীর হঠাৎ কি মনে পড়ল। সে আঙিখানা বাড়িয়ে দিলে।

শ্বশুর খুশি মনে সই করে পালকিতে গিয়ে উঠলেন।

রাত দশটা। মুসাফিরখানা ফাঁকা।

বিবি বেগরাম নেই, রুথ নেই। খদ্দেরও নেই। শুধু মসলচী বসে পিসপাস আর মোরগ মসল্লমের মসলা পিষছে।

মরকন্দ উঠে পড়ল।

সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। কিন্তু শিমুলিয়ার পথ ধরল না।

একটু ঘুরে বাড়ির পিছনে এসে দাঁড়াল। তারপর একটা ঢিল ছুড়ে মারল দরজার উপর।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ।

এবার ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল।

এক ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে।

কে—নিকোলাই ?—না, আবদুস ?

মরকন্দ কথা বললে না।

ছায়া এগিয়ে এল।

কে—তুই ?

মরকন্দ উত্তর দিলে, আমি বিবি—আমি।

তুমি !

হ্যাঁ, আমি আজ এলাম।

তার হাত ধরে রুথ তাকে টেনে নিয়ে চলল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

রুথ বললে, আজ আমার কি বরাত তুমি এলে! জান, আজ খোশ খবরের রোজ। পহেলা আমাদের দুশমন রাজার কাল ফাঁসি। আমাদের আমানীরা হাকিমের কাছে খত পাঠিয়েছে, তাতে তেতাল্লিশ জন রইস আদমি সই দিয়েছেন।

মকরন্দ বললে, রাজা তোমাদের দুশমন কেন বুঝতে পারি নে।

রাজা আমাদের ব্যবসা মাটি করে দেবে, আমাদের তাড়াতে চায়।

রাজা তো চায না, চায় তোমার কোম্পানী।

তুমি জান না—রাজাই চায়। যাগ গে, তুমি এসেছ—পিয়ো, শরাব পিয়ো, মজা লোট!

হ্যাঁ, মজা লুটতেই এসেছি।

তবে দাঁড়িয়ে কেন? ছিনে পর লুটো।

লুটবো বই কি—মকরন্দ হাসল। কিন্তু রাজা আমার জাত তো জানো?

ইবলিস তোমার জাত-ভাই! হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল রুথ।

হ্যাঁ, ইবলিস!

তুমিও তাহলে ইবলিস! তা ইবলিসই তো আমি চাই। নাও, পিয়ো! আরও শয়তান হয়ে ওঠ!

এই বলে এক পাত্র শরাব এনে ধরল তার মুখের কাছে রুথ। শরাব পান করে মাতাল হয়ে উঠল মরকন্দ। মরকন্দ তাকে জড়িয়ে ধরে জড়িত স্বরে বললে,

ইবলিসে রাইকে ছোবল দিয়েছিল তাই তো আমি ইবলিস, রাজাকে ছোবল দিতে চলেছে—তাই তো আমি ইবলিস।

রুথ স্খলিত স্বরে বলে উঠল, লে, ইবলিস—লে, মুঝে লিয়ে লে! হামাকে ছোঁবল দে!

মকরন্দ বিড়বিড় করে বললে,—কিন্তু ভালবেসে তো দেব না, ঘৃণা করে দেব! আমরা যে ইবলিস—ভালবাসতে তো আমরা জানি নে!

মকরন্দ আর এক পাত্র ঢেলে নিয়ে পান করলে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রুথের উপর। কামনা তার বুঝি নেই। শুধু ঘৃণা। ঘৃণাই কামনা হল, কামনা ঘৃণা।

বাণেশ্বর উঠে বসল। একবার চারিদিকে তাকালে।

চাঁপালতা ঘুমিয়ে আছে।

সে এবার বালিশের তলায় হাত চালিয়ে দিলে।

গেঁজেটা নেই।

বুক কেঁপে উঠল। এ ক'দিনে পাঁতি দিয়ে, নারায়ণের পায়ে তুলসী দিয়ে তার রোজগার কম হয় নি। আবার কাল ক'জন বামুন চাই। রাজা নবকৃষ্ণের দরকার। তার মধ্যে সেও একজন। পাঁচ মোহরের কাজ, দু মোহর বায়না পেয়েছে। কিন্তু সবই যে লোপাট। অথচ গেঁজেটা সে তো খুলেই রেখেছিল, নস্যের শামুকটাও রেখেছিল সঙ্গে। শামুক আছে, গেঁজে নেই।

চাঁপালতা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তাকে একটা ঠেলা মারলে।

উঃ বলে চাঁপালতা আবার পাশ ফিরে শুলে।

বাণেশ্বর এবার আর ঠেলা দিলে না, জোরে নাড়া দিলে। চাঁপালতা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললে, কি হয়েছে?

বৌ—বাণেশ্বর মাথা চাপড়ে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার গেঁজেটা পাচ্ছি না।

ও-বালাই গেছে, বেশ হয়েছে, চাঁপালতা হাসলে।

তুই হাসছিস পাপিষ্ঠা! বাণেশ্বর চিৎকার করে উঠল, আমার মহাসর্বনাশ হয়ে গেল। তাহলে তুই-ই নিয়েছিস!

বারে, আমি নিতে গেলাম কেন? পাপের তঙ্কা নিলে তো আমারই পাপ হবে।

পাপ—পাপের তঙ্কা! বাণেশ্বর গর্জে উঠল।

তাছাড়া কি! পাপ ওতে মাখানো!

খুব যে লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস!

শিখব না, চাঁপা হেসে বললে। আমি যে পণ্ডিতের বৌ।

ওসব রাখ্! বাণেশ্বর গর্জে উঠল, টাকা বের করে দে!

দেব না!

তবে রে! বাণেশ্বর তার চুলের মুঠি ধরলে।

উঃ ছাড় বলছি! আমি সব ফাঁস করে দেব।

বাণেশ্বর যেন একেবারে নিবে গেল। বললে, আচ্ছা, সব না দিস, কিছু দে না!

না, একটাও পাবে না। এ-পাপের টাকা আমি ঘরে রাখতে দেব না! আমি এ-দিয়ে ঠাকুরের ভোগ লাগাব। মচ্ছব দেব।

মচ্ছব দেওয়া বের করছি। চাঁপালতাকে জড়িয়ে ধরে বাণেশ্বর তার পেট-কাপড় খসিয়ে ফেলল, গেঁজেটা পড়ে গেল। সেটা বাজের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিলে।

চাঁপালতা হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে বললে, ভাল হবে না। আমার পেটে যেটা আসছে, তাকে আমি নুন খাইয়ে মেরে ফেলব!

মারিস—তোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে আর-একটা নিয়ে আসব।

তার আগে তোমার কুলে কালি দিয়ে যাব।

বাণেশ্বর তাকে ছেড়ে দিয়ে মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

মশারির ভিতরে চাপালতা কাঁদছে না। ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। বাণেশ্বর একবারও সেদিকে তাকালে না, খিল খুলে খড়ম পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডিহী বিক্রির জেলখানা নিঝুম।

সান্ত্রীরা ঢুলছে জেলখানার ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে, ঢুলছে ফটকে।

তাঁবুঘেরা ছাদের বাইরে ঢুলছে অনুচরের দল।

শুধু মহারাজা তাঁবুর মধ্যে মৃগচর্মের আসনে বসে গীতা পাঠ করছেন।

আজ ৪ঠা আগস্ট। কাল সেই নিয়তি আসবে। তাই সারাদিনই লোক এসেছে। রাত দশটা পর্যন্ত শুধু লোকের পর লোক। দুঃখ জানিয়ে পত্রও দিয়েছেন সাহেব-মহলের কেউ কেউ। আবার দূর হিজলী, দূর জাহাঙ্গীরনগর থেকেও পত্র এসেছে। স্বাক্ষরকারীদের নাম তিনি জানেন না। চেনেন না। কিন্তু তারাও জানিয়েছে তাদের সহানুভূতি। মহারাজা ভেবেছেন, তাদের জন্য তো কিছু করেন নি, তারা লিখলে কেন?…তবে কি নিজের জন্য করতে গিয়ে ওদের জন্যও কিছু করে ফেলেছি!…

সারাদিন ধরেই শুধু দেখাশুনো আর আলাপ চলে নি, তিনি জমিদারি সংক্রান্ত, ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্মও সেরেছেন। দুঃখ জ্ঞাপন করে যাঁরা

পত্র পাঠিয়েছেন, তারও উত্তর দিয়েছেন। সাহেবরা কেউ আসেন নি, শুধু সন্ধ্যার দিকে যাঁর উপরে দণ্ডাদেশ পালন করবার ভার সেই শেরিফ আলেকজাণ্ডার ম্যাকরাবি এসেছিলেন।

সাহেব যেন খুবই দুঃখিত, লজ্জিত। দোভাষী নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে। তিনি এসেই বললেন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না। আপনার নিজের পালকিতে, নিজের অনুচরদের নিয়েই যেতে পারবেন।

মহারাজ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। সাহেব, আপনি শুধু জেনারেল, কর্ণেল মনসন আর ফ্রান্সিস সাহেবকে বলবেন, তাঁরা যেন রাজা গুরুদাসকে দেখেন। গুরুদাসই এখন ব্রাহ্মণ-কুলের নেতা।

ভয় তিনি পান নি। জীর্ণবাস ত্যাগ করে নতুন বাস পরবেন মৃত্যুর পরে—তার চেয়ে তো বেশি কিছু নয়।

সাহেব বলেছিলেন, আটটার পরেই সময়। কিন্তু যখন সুবিধে হবে আসবেন। যখন সময় আসবে, আপনিই সংকেতে জানাবেন।

তিনি রাজী হয়েছিলেন।

সাহেব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ভীতির লেশমাত্র নেই মুখে। সোমা সহাস মুখ। কেমন করে তা সম্ভব!

মহারাজ বুঝেছিলেন তাঁর মনের কথা, কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি। সাহেব তো বুঝবেন না, হিন্দুধর্মের মর্মকথা। হিন্দু নিয়তির কাছে সঁপে দিতে পারে নিজেকে। সে পরজন্মের কথা ভাবে। আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় আত্মার কথা ভাবে। হিন্দু তো মরে না, অনাবিষ্কৃত মৃত্যুর গহ্বরে লীন হয়ে যায় না। সে মৃত্যু থেকেই অমৃতের স্বাদ পায়।

সাহেব চলে গিয়েছিলেন। তারপরও ভাবনা উঁকি মেরেছে। ভেসে উঠেছে সন্ন্যাসীর মুখ। তাঁর জামাই রাধিকা রায় দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু জগৎচন্দ্র আসে নি। সে নাকি তাঁরই বিরুদ্ধে আর্জিতে সই করেছে। করুক, তিনি তো আর ভাববেন না। তাই গীতা পাঠ করতে বসেছেন। মাঝে মাঝে সংসারের কত মুখ এসে উদয় হয়েছে শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে, কিন্তু তাদের দাবিয়ে রেখেছেন। সংসারী মানুষের মায়া কি যায়? তাই

শেষ মুহূর্তে যখন প্রাণশক্তি নির্বাণোন্মুখ, তখনো চোখ জলে ভরে যায়। তাঁরও হয়তো যাবে। যাবে কি? তিনি তন্ময় হয়ে গেছেন। আবার গীতার পরমপুরুষের বিশ্বরূপ ধ্যান করেছেন। সে-রূপ তো তাঁর ভদ্রপুরের গুহ্যকালীর সঙ্গে মিলে যায়, ভদ্রেশ্বর শিবের সঙ্গে মিলে যায়। আবাব কি নদীয়ার গোরাচাঁদের সঙ্গে মেলে? পরম বৈষ্ণব রাধারমণ তো বলেন—যায়। কাশীমবাজারের কুঞ্জঘাটার বাড়িতে আছে নদীয়াচন্দ্রের পট—সে-পটও যেন এক। আবার একে বহু, বহুতে এক।

তেলের বাতি হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে নিবে গেল। মহারাজ একবার চারিদিকে তাকালেন।

উষার তরল আঁধার তরল আলোর এক পোঁচড়া লেপে দিয়েছে। আর কিছু পরেই উষার উদয় হবে। ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা, তাকেই তো বলে শ্রীউষা। এবার বেদমাতা গায়ত্রীর ধ্যানে মগ্ন হবেন। রক্তবর্ণা, হংসবাহিনী, দ্বিভুজা, যজ্ঞোপবীত ও কমণ্ডলুধারিণী ব্রাহ্মণী এসে উদয় হবেন, তাঁকে ভূর্ভুবঃ স্বঃ—পদ থেকে মস্তক ধ্যান করবেন। কিন্তু গায়ত্রীর মধ্যাহ্ন আর সায়ংকালের রূপ তো আর দেখতে পাবেন না। শ্বেতবর্ণা বেদমাতা তো আর দেখা দেবেন না!

মহারাজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর ডাকলেন, পিতু!

খানিকক্ষণের স্তব্ধতা। পর্দা নড়ে উঠল। পিতু এসে দাঁড়াল।

আমার সন্ধ্যার আয়োজন করে দে। আজ শেষ সন্ধ্যা!

পিতু দাঁড়িয়ে আছে।

কি রে, কি হয়েছে তোর?

পিতু নীরব।

কাঁদছিস! ছিঃ কাঁদে না! কেন আমাকে ভালবাসলি? আমি তো নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসি নি। যা, সবাইকে তুলে দে!

পিতু চলে গেল।

মহারাজ আবার গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

১১

পাঁচই আগস্ট, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ

কুলির বাজার।

আজ তার নাম নেই, বাজার হারিয়ে গেছে। সেখানে এখন রেসকোর্সের খোলা ময়দান; আর আছে গোল্ডমোহরের গাছ। আর হয়তো তারই একান্তে একটি পাথরের উপর লিপি আছে। তাও ছিল না, হালে হয়েছে। তাতে মহাবাজের নাম শহরের পৌরসভা দেগে রেখেছে। হেষ্টিংস ব্রীজ শুধু সাক্ষী হয়ে আছে, আর আছে দূরে কিল্লা। আর কিছুই নেই। মেকলে একদিন এরই সন্ধান করেছেন, বাষ্টীড সাহেব এরই সন্ধানে উনবিংশ শতাব্দীতে বহুদিন ব্যয় করেছেন। কিন্তু কোন্ জায়গা কেউ বলতে পারে নি সঠিক করে। ব্রাহ্মণকুলতিলকের মৃত্যুর স্থানের কথা ব্রাহ্মণেরা বলতে পারেন নি; ব্রাহ্মণেতরেরা বলতে পারেন নি; সাহেবেরাও বলতে পারেন নি। তবু রেভারেণ্ড লং সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারেই আজ স্মারকস্তম্ভ উঠেছে। আর সে স্থান ডিহী বির্জির জেলখানার কাছেই। সেদিন তার নাম ছিল কাউন্টি জেল, আজ প্রেসিডেন্সী জেল।

সেই আজকের নামহীন কুলির বাজার, অস্তিত্বহীন কুলির বাজার।

সকাল থেকেই এসে জমায়েত হয়েছে জনতা। আর সে-জনতার সার গঙ্গার ধার অবধি গিয়ে পৌঁছেছে। গাছের ডালে ডালে মানুষ, কিল্লার র‍্যামপার্টের উপরে মানুষ। এখানে-ওখানে ময়দান জুড়ে শুধু মানুষ

আর মানুষ। শুধু কালো মাথা আর মাথা। তাদের মাঝখানে তৈরি হয়েছে এক কাষ্ঠমঞ্চ, তার নীচে গভীর গহ্বর। সেইখানেই মহারাজের জীবনের সমাপ্তি হবে।

সন্তজনের গীর্জায় আটটা বাজল। জমিদারের বাগানবাড়ির বালুঘড়িতে আটটা বাজল, দেয়াল-ঘড়িতে আটটা বাজল; সাহেব-সুবের ঘড়িতে আটটা বাজল। মিঃ ম্যাকরাবীর ঘড়িতেও আটটা। তিনি ডিহী বিজির জেলখানায় জেলার ইয়াঙেলের ঘরে বসেছিলেন। মহারাজ তৈরী হয়ে আসতেই উঠে দাঁড়ালেন।

কাঁটায় কাঁটায় আটটা ছিল, এখন আটটা এক মিনিট।

মহারাজ প্রস্তুত। ফটকের সম্মুখে পালকি তৈরী। সেই পালকিতে গিয়ে উঠলেন।

পালকি চলতে লাগল। পেছনে আর এক পালকিতে চললেন ম্যাকরাবী! শেরিফ ম্যাকরাবী আর ডেপুটি শেরিফ।

আটটা-পাঁচ।

জনতার সাগর। কিন্তু সাগরে দোলা নেই, ঝড় ওঠে না। শান্ত হতচেতন যেন সাগর। মেঘে-মেঘে খিলানো আকাশের নীচে যেন ফ্রেমে-আটা সাগর। উত্তাল হতে পারে, কিন্তু হয় না।

আটটা আট মিনিটে পালকি এসে হাজির হল বধ্যভূমিতে।

জনতা সরে গেল, কাহারেরাও হুমহাম করছে না। নিঃশব্দে পালকি এনে থামাল মঞ্চের কাছে।

মহারাজ পালকির খোলা দরজা দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। প্রশান্ত তাঁর মুখ, চোখে পড়ে নি ভীতির ছায়া। মঞ্চটির দিকে তাকালেন।

শেরিফের পালকি এসেও থামল।

মহারাজ দোভাষীর সাহায্যে জানালেন, ব্রাহ্মণদের তো দেখছিনে! তাঁরা আসার আগে যদি সব শেষ হয়ে যায়!

শেরিফ ম্যাকরাবী জানালেন, আপনার আশংকা নেই। আপনার সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করব।

আটটা দশ। ব্রাহ্মণেরা এলেন।

ম্যাকরাবী অফিসারদের নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, মহারাজ জানালেন, গোপনীয় কিছু নেই। আপনারা থাকুন!

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা আমাকে মেনে চলেছেন, গুরুদাসকেও মেনে চলবেন। আজ থেকে তিনি আপনাদের নেতা।

তারপর ম্যাকরাবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার দেহ এঁরাই স্পর্শ করবেন। তামশাগীর কেউ যেন স্পর্শ না করে। আমি এবার তৈরী!

ম্যাকরাবী সাহেব জানালেন, তাই-হবে। কিন্তু আপনার কি এমন কোন বন্ধু নেই, যাঁকে এই সময়ে দেখতে চান?

রাজা হাসলেন—বন্ধু আমার অনেক। কিন্তু তাঁদের খোঁজ করার এ তো স্থান নয়, কালও নয়।

তবু ম্যাকরাবী বললেন, যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি জনতার চাপে এগিয়ে আসতে পারছেন না।

তিনি কি ভেবে বললেন, ডাকুন—রাধারমণ ভট্টাচার্যের নাম ধরে ডাকুন। তিনি আমার গুরু।

নিস্তব্ধ জনতা গুঞ্জন তুলছে, আর সেই গুঞ্জনই তুমুল কোলাহলে পরিণত। সেই শব্দ সমুদ্রের মধ্যে নকীব চিৎকার করে উঠল—রাধারমণ ভটাচারী হাজির হ্যায়!

জনতার কোলাহল তার উত্তর দিলে।

মহারাজ হেসে বললেন, জানি—তিনি আসবেন না—এতো স্থান নয়, কাল নয়। যাক্ গে!

তারপরে ম্যাকরাবীকে বললেন, জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন আর মিঃ ফ্রান্সিসকে বলবেন, তাঁরা যেন তাদের কালা কর্ণেলকে মনে রাখেন। আর কিছু নয়।

তিনি পালকির ভিতরে শুয়ে পড়লেন। নাম জপ করতে লাগলেন।

ম্যাকরাবীর ঘড়ির কাঁটা ডায়ালে আটটা দশ ছাড়িয়ে পনেরোর ঘরে এসে থামল। ম্যাকরাবী ঘড়ি দেখলেন, বললেন, মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনার হাত বাঁধতে হবে।

কেন? তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

যদি আপনি কোনরকমে বাধা দিতে চান।

বাধা দেব! হাসলেন আবার মহারাজ। বাধা কেন দেব সাহেব?

কিন্তু এই নিয়ম। আপনি পা দিয়ে সংকেত জানাবেন।

আচ্ছা, তাই-ই হবে।

পালকি এবারে মঞ্চের কাছে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন ম্যাকরাবী, কিন্তু মহারাজ হাত তুলে নিষেধ করলেন।

তিনি বেরিয়ে এলেন পালকি থেকে। দীর্ঘদেহ, সৌম্য শান্ত পুরুষ নেমে পড়লেন। তিনি একবার জনতার দিকে তাকালেন।

স্তব্ধ জনতা, স্তব্ধ গুঞ্জন। যেন নিস্তব্ধ শস্যের ছড়া। দুলতে পারে, কিন্তু দুলছে না। নড়ছে না। নিস্পন্দ হয়ে আছে।

তিনি এবার দীর্ঘ পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর মাথা যেন জনতার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। এ-মাথা অবনত হয়েছে, অনেক সেলাম ঠুকেছে; কিন্তু আজ তো মুক্তিস্পর্শে উত্তুঙ্গে উঠেছে। চির উন্নত বলে মনে হচ্ছে।

মঞ্চের কাছে এসে হাত দুখানি পেছনে রাখলেন। একজন সিপাই অলক্ষ্যে এসে পিছন থেকে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলে। মহারাজের যেন খেয়াল নেই।

এবার ম্যাকরাবী জানালেন, রাজা, মুখ বাঁধতে হবে কালো রুমালে। আমি একজন ব্রাহ্মণ সেপাইকে ডেকে দিচ্ছি।

না, মহারাজ বললেন, না! তারপর তাকালেন পেছনে।

পিতু তার দীর্ঘদেহ নিয়ে পেছনে পেছনে আসছিল, তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন তুই পারবি নে?

আমি তো বেরাম্ভন নই, পিতু মৃদুস্বরে বললে।

নাই বা হলি, তুই আমার শেষ সময়ের মিতে। নে, বেঁধে দে। দেখিস শক্ত করে বাঁধিস!

পিতু মহারাজকে প্রণাম করে বেঁধে দিতে গেল তাঁর মুখখানি। মহারাজ একবার সকলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে শেষ বিদায় নিলেন।

মুখ ঢাকা পড়ল। সৌম্য সহাস মুখ আর দেখা যায় না, সেখানে কালো রুমালের অভিশাপ নিয়তির মতো এসে গ্রাস করেছে। যেন রাহু গ্রাস করেছে পূর্ণ সূর্যকে। তিনি আর পেছন ফিরলেন না, ধীরে

ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন মঞ্চে। চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, তাই অনুভব করে করে উঠছেন। এবার মঞ্চে এসে গেছেন। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখের বাঁধন ঠিক আছে কিনা ভাল করে দেখে নিলেন শেরিফ।

শেরিফ ধীরে ধীরে নেমে গেলেন। ব্রাহ্মণেরা মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন, পিতু লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। জনতা স্থির চোখে দেখছে! সিপাইদের ভয়ে গুঞ্জন স্তব্ধ। না, গুঞ্জন তোলবার মতো শক্তিও বুঝি জনতার নেই। তারা নিস্পন্দ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

শেরিফ তাঁর পালকিতে এসে বসে আছেন, তাঁর পকেটঘড়ি টেনে বের করলেন। সময় এসে গেছে।

হঠাৎ মঞ্চের উপর পদাঘাতের শব্দ হল। ঐ তো সংকেত। এক বিষম পদাঘাত—এক বিদ্রোহ।

তারপরে এক নিমিষে সরে গেল মঞ্চের পাটাতন।

ম্যাকরাবী দেখছেন না, চোখ মুদে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন বুকে। ব্রাহ্মণেরা জপ করছেন গায়ত্রী মন্ত্র। তাঁরা চোখ মুদে আছেন। পিতুরও চোখ বোজা। দেখছে কি তাহলে জনতা? না দেখছে না, চোখের মণিতে ছায়া পড়েছে; তবু দেখছে না। তারা হতচেতন।

এক মুহূর্ত। এখন আটটা বাইশ—সব শেষ।

ম্যাকারবী টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন পালকি থেকে।

মঞ্চের নিচে গহ্বর হাঁ করে আছে। আর সেই গহ্বরে ঝুলছে দেহ। ঝুলছে! মুখে কালো রুমাল বাঁধা। ঝুলছে! জনতা দেখছে, হয়তো দেখছে না।

ব্রাহ্মণেরা ফাঁসির দড়ি কেটে নামালেন তাঁরই হুকুমে। তিনি দেখে চমকে উঠলেন, মুখখানি বিকৃত হয়নি। তেমনি মুখ, তেমনি প্রসন্ন দৃষ্টি! শিউরে উঠলেন ম্যাকরাবী। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কথাই মনে পড়ল। গলগোথায় সেদিন এমনি হয়েছিল। সেদিন তো যীশুর মুখে সুন্দর হাসি ছিল। ঈশ্বরের পুত্রের মুখের সে-হাসি কি করে পেলেন এই রাজা? আবার ক্রুশ আঁকলেন বুকে ম্যাকরাবী।

জনতা এখনো নিথর, নিস্তব্ধ। পাথরের চোখ তার, পাথর-কোঁদা চোখ তার।

সারে আটটা বাজল।

ব্রাহ্মণেরা ধরাধরি করে নামালেন দেহ, মুখের রুমাল খসে পড়েছে। বৃদ্ধের সিংহ-কেশর সকালের রোদে চাঁদির তাঁবের মতো ঝলসে উঠছে। মুখে নেই ব্যথা। সহাস মুখ, শুধু ঠোঁটের কোণে একটু কুঞ্চন। আর নীল শিরা যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে বনিয়াদি নীল ঘরানার পরিচয় দিতে। আর কোথাও তো নেই মৃত্যুর নীল বিষ। যেন ঘুমন্ত মুখ, প্রশান্ত মুখ।

জনতা দেখছে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে ম্যাকরাবী সাহেব দেখছেন, মঞ্চের কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সিপাইরা। আর দেখছেন যাঁরা স্পর্শ করে আছেন সেই ব্রাহ্মণেরা।

পিতু এতক্ষণ লুটিয়ে পড়ে ছিল, সে উঠে বসল। সেও দেখছে। দৃষ্টি বুঝি তার এখনও সজাগ হয় নি। সে তাই চোখ রগড়ে নিলে, তারপর তাকালে। সারা দেহে কি যেন একটা বয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াল। মুখে শুধু একটা আর্তনাদ ঝরে পড়ল—

আই বাপরে!

ভাষা বুঝি নয়, একটি ধ্বনি। এ-ধ্বনিতে যত ব্যথা, যত ভীতি, যত হতাশা, যত সর্বনাশ। এ ধ্বনি হিন্দুর নিজস্ব, হিন্দুস্থানের মানুষের নিজস্ব—এইতো হিন্দুস্থানের আর্তনাদ। যখন তার ঘর দাউদাউ করে পুড়ে যায়, যখন তার সুমুখে তার সন্তানকে কেউ হত্যা করে, তখন তো এই ধ্বনি উৎসারিত হয়ে পড়ে। তার মনে হয় সে কলুষিত। এ-কলুষ মা-গঙ্গায় ধুয়ে না ফেললে যাবে না।

এতক্ষণ স্তব্ধ ছিল জনতা। রাজার মৃত্যু দেখতে তারা এসেছে। অবিশ্বাস নিয়েই এসেছে। আর সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারই ঘটে গেল। তাই তারা হতচেতন হয়ে ছিল। তারা যেন না-ধর্মী তড়িৎশক্তি। ধ্বনি-তরঙ্গ তাদের ছুঁয়ে দিলে। না-ধর্মী শক্তির সঙ্গে মিলন হল হাঁ-ধর্মী তড়িৎশক্তির। তারা দুলে উঠল, কেঁপে উঠল। কেউবা মুখ ঢাকলে উত্তরীয়ে, কেউবা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, কেউবা ছুটে পালাল; কেউবা পালাতে পালাতে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শুধু মুখে তাদের সেই চিরন্তন আর্তনাদ।

আয় বাপরে! আই বাপরে!

এক ধ্বনি ছিল, শত-শহস্র ধ্বনি হয়ে জেগে উঠল, কুলির বাজারের বধ্যভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলল। গঙ্গার ধারায় ভেসে চলল! গঙ্গা-পদ্মা-জলঙ্গী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, আবার সাগরে ভেসে গেল। মহাসাগরে গিয়ে মিশল। বাঙ্গালার মানুষের ক্রন্দন তাতে রূপ পেল। কিন্তু শুধুই কি ক্রন্দন? তাতে কি একটু উষ্মা নেই—একটু জ্বালা নেই? কে জানে!

এখনো পাঁচই আগস্ট শেষ হয় নি। সবে সন্ধ্যে।

গঙ্গার ধারে চিতা হয়তো এখন নিবে গেছে। ব্রাহ্মণেরা দাহ সেরে গঙ্গায় নেমেছেন। আর ব্রহ্মহত্যায় কলুষিত নগরীর ত্রিসীমা ছেড়ে গা ভাসিয়ে চলেছেন বালির দিকে। শালখিয়ার দিকে। সেখানে বন কেটে বসত গড়বেন। আর এ পাপ নগরীতে আসবেন না। চিৎপুরের রাজবাড়িতেও বুঝি কাঁদছেন রাণীরা আর রাজকুমারীরা—কাঁদছেন সারা জেনানা। গুরুদাস বুঝি এখন কাছা গলায় দিয়ে বসে আছেন নিজের ঘরে মৃগচর্মের আসনে। বুঝি সান্ত্বনার কথা কারো মুখে আসছে না। আর কোম্পানীর শহরে এসপ্লানেডে এখন মশালচীরা ছুটছে আঁধারের বুক রন্ধ্র রন্ধ্র করে দিয়ে। ফীটন চলেছে সাহেব-বিবিদের নিয়ে। লা-গ্যেলেইসে সরগরম হয়ে উঠেছে নাচগানের আসর। শুধু আর্তনাদের জের টেনে হয়তো চলেছে ভিখারীরা, গরীব-গুরবোরা। তাও হয়তো নয়। তারা রাতের খাবার, রাতের ডেরার কথা ভাবছে। আর ব্রাহ্মণদের ঘরে ঘরে হয় তো অরন্ধনের পালা চলেছে, উনুন ধরেনি।

পাঁচই আগস্ট এখনো ফুরোয় নি। সবে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা আর মেঘের অন্ধকার মিশে ফাঁসি-মঞ্চের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তারই নীচে কালো অন্ধকারভরা গহ্বর হা করে আছে।

সেই গহ্বরের পাশে শুয়ে আছে কে একজন। ঘন অন্ধকারে তাকে দেখা যায় না। যদি বা দেখা যায়, চেনা যায় না।

আর-একজন ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল সেখানে।

যে শুয়েছিল, সে অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল, আই বাপরে!

আই বাপরে! যে এসেছিল, সেও বলে উঠল। এক আর্তনাদ আর এক র্তনাদে মিশে গেল, সম্ভাষণ হয়ে ঝরে পড়ল।

কে—? শোষা মানুষটি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

তুমি কে?

আমি···

যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে কাছে এগিয়ে এল দাঁড়াল, বললে, কে—নীলাম্বর!

হ্যাঁ! আর তুমি তো হরানন্দ?

হ্যাঁ, আমি হরানন্দ। তারপর এখান শুয়ে কেন? শ্মশানে যাও নি? শ্মশানে গিয়ে কি হবে?

কেন কৌটো ভরে রাজার ছাই রাখতে পারতে। অস্থি রাখতে পারতে। নন্দের স্বরে যেন বিদ্রূপ।

ছাই রেখে কি হবে? নীলাম্বর অবাক হয়ে শুধালে।

কি হবে? দেখবে আর শোক করবে। বুক চাপড়াবে আর কাঁদবে।

তুমি এখানে কেন এলে? নীলাম্বর শুধালে।

আমি? আমি ফাঁসির দড়ির একটা টুকরো খুঁজতে এসেছি, হরানন্দ বলে

দড়ির টুকরো দিয়ে কি করবে?

গলায় দড়ি দেব।

তুমি ঠাট্টা করছ হরানন্দ!

ঠাট্টা না করে উপায় কি বন্ধু। হরানন্দের গম্ভীর স্বর ঝরে পড়ল. চগুলো লোক এসে জমায়েত হল, তাদের তখনো বিশ্বাস—রাজাকে বতারা রক্ষা করবেন।

আমারও সে বিশ্বাস ছিল ভাই।—নীলাম্বর বললে।

কেন এ বিশ্বাস?

দেবতার কথা ভাবি নি, নীলাম্বর বললে, আমার বিশ্বাস ছিল আংরেজের রতায়। আমার বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমা-সুন্দর চোখ কে দয়া ঝরে পড়বে।

এ-তোমার বেশি-বেশি ভাবা নীলাম্বর।

বেশি ভাবা কেন? আমি ওদের ইতিহাস জানি। ওরা রাজাকে দি আজাদীর খতে জোর করে সই করিয়ে নেয়। ওরাই অত্যাচারী রাজা হত্যা করে—ওরা তাই তো উদার। ওদের বিচারে সবৎ-জঙ্গ-ক্লাইভ অব্যাহতি পান নি।

তোমার কাছে আমি সব শুনেছি, হরানন্দ ধীরে ধীরে বললে, আংরে উদার একথা আমিও মানি, কিন্তু উদার তো নয় শাসক। তুমিই বলে সবৎজঙ্গের বিচার হয়েছিল, কিন্তু সে মুক্তি পায়। তেমনি রাজ হত্যার অপরাধে তোমার ঐ জাঁদরেল সাহেবেরও হয়তো বিচার হবে, কি সেও মুক্তি পাবে।

একথা আমি মানি না। তুমি দেখবে! নীলাম্বর বলে উঠল।

হ্যাঁ, দেখব। শুধু আমি কেন, আমরা সবাই দেখব, পাব আংরেজে উদারতার পরিচয়। আর সেই মৌতাতে আমরা ঢুলে পড়ব। আংরেজ-নবাব আমাদের বুকের উপর চেপে বসবে, চুষবে, শুষবে।

হরানন্দ, নীলাম্বর বলে উঠল, তুমি আংরেজকে চেন না!

আমি আংরেজকে না চিনি, এই যে শাসক তাকে বোধ হয় চিনি। যা গে, এবার এসো, ফাঁসির দড়ি খুঁজে দেখি!

কিন্তু মহারাজ তোমার কে যে, ফাঁসির দড়ি খুঁজছ! ঐ দড়ি দিয়ে করবে?

হরানন্দ হাসলে, ওতে পয় আছে। ঐ দড়ি কবচ করে গলায় পরব।

গলায় পরবে! কেন?

মহারাজ আমার কেউ ছিলেন না। মহারাজ আর দেবীসিংহ নবকৃষ্ণে আমি তফাত খুঁজে পাইনি। কিন্তু আংরেজের ফাঁসিকাঠে তিনি অমর হয়েছেন। তাই ফাঁসির দড়ি আমি গলায় পরব, আর সবাই মনে হবে, আমার গলায় ফাঁসি দিচ্ছে ঐ আংরেজ শাসক। আ ঘৃণা বাড়বে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নীলাম্বর।

হরানন্দ তার হাত ধরে বললে, চল যাই, খুঁজে দেখি!

১২

কুঠিয়াল চার্ণক সাহেব বাতিল কিল্লার সন্তজনের গীর্জার কবরের তলায় স্বপ্নে বিভোর। তাঁর নামহীন খালকাটা এখন বাঙ্গালার কেন্দ্র-বিন্দু। বেঙ্গালা রাজ্যের রাজধানী। হুগলী নদীর এ-মোহনায় যে গলি গড়েছিল, স-গলিতে যে একদিন ইংলণ্ডের উপনিবেশ গড়ে উঠবে, কেউ তা ভাবতে পারে নি। হয়তো বা ভেবেছিল বণিক কোম্পানী, কিন্তু সে-ভাবনা ছিল নীহারিকার আকারে। তাকে রূপ দেবে তার ফৌজ, তার ইংলিশ মাস্কেট আর তোপ—আর তা একশো বছরের মধ্যেই—এতো তখন ভাবনারও অতীত। কিম্বা সে-ভাবনা ছিল নিষ্ক্রিয় মগজের নিষ্ফল বিলাস। তাকে তিনিই রূপ দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। আমদানির কথা ভাবেন নি, এখান থেকে রপ্তানি করে গেছেন পাকা আর কাঁচা মাল। অভিজাত সম্প্রদায় প্রথম সে-মাল নিয়ে ব্যবসার খেল খেলেছে য়ুরোপের বাজারে। তারপরে নতুন এক শ্রেণী উঠেছে, তারা কল গড়েছে; তারাও ফাটকা খেলেছে। তাইত এখন বেঙ্গালা, সোনার বেঙ্গালা, এল দোরাদো—কোম্পানীর কিংডম। আর তার কুঠিয়াল সাহেবের উপাধি এখন গভর্নর জেনারেল অফ্ বেঙ্গল। চার্ণক যা হতে চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে তাঁর আত্মার আত্মীয়, তাঁরই স্বদেশবাসী একজন। শুধু বেঙ্গালা কেন, হিন্দুস্তানের গভর্নর জেনারেল হওয়াই বা বিচিত্র কি! ব্রিটিশ কূটনীতি তো সে-জাল বিস্তার করে বসে আছে। কর্ণাটে দুই যুদ্ধমান ওয়ারিশকে সাহায্য করেছিল ইংরেজ আর ফরাসীরা। ফরাসীর হার হয়েছে। কিন্তু তারা একেবারে মরেনি, এখনো তাদের ঘাঁটি আছে। আছে ওলন্দাজরাও। কিন্তু ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে না। তাদের গর্জনে ভয়ে ছুটে পালাতে হবে। চার্ণক বুঝি নড়েচড়ে উঠলেন, তাঁর মুখে হাসি খেলে গেল।

সে হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঢেউয়ের মত। সন্তজনের গীর্জা পার হয়ে আলীপুরের প্রাসাদে আর-এক সাহেবের ঠোঁটও বুঝি ভিজিয়ে দিলে।

সাহেব পায়চারি করছিলেন, গম্ভীর তাঁর মুখ। তিনিও জাগর স্বপ্নে বিভোর। হঠাৎ মুখে লাগল হাসির ছোঁয়া। শীর্ণ মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সাহেব ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এলেন। চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

পালকের কলম তুলে নিলেন হাতে। শুভ্র পালক রাজহাঁসের। লেক ডিস্ট্রিক্টে এ-রাজহাঁসদের বুঝি সাঁতার কাটতে দেখা যায়—তিনিও দেখেছেন কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, কামড়াচ্ছেন; কি লিখবেন ভাবছেন। হঠাৎ অনুপ্রেরণা এল। সাহেব লিখতে লাগলেন—

ফাঁসির মঞ্চ তোলা হয়েছে, ব্রিটিশ ন্যায় তার দড়ি বেঁধে দিয়েছে কালার গলায় আর টানছে। গড়িয়ে পড়ছে কালার দেহ। শুধু কি দেহ? ব্রিটিশ বণিক শুষে নিচ্ছে তার কাঁচা মাল। তার কিছুই থাকবে না, তারই পথে পড়ছে। কিন্তু এখনো আছে মারহাট্টা ব্যাণ্ডিটের দল। এখনো আছে হায়দর আলী। তাদের সরিয়ে দিতে হবে। তবে তো হিন্দুস্তান হবে আমাদের। আর তা হতে হলে ভেদবুদ্ধি চালাতে হবে অবাধে। কালা নবাবদের ভাণ্ডার লুটে নিতে হবে, তাদের বেগমদের স্ত্রীধন কেড়ে নিয়ে বাড়াতে হবে ব্রিটিশ পুঁজি। রোহিলাদের বিধ্বস্ত করতে হবে, তবে তো হিন্দুস্তানে এম্পায়ার গড়ে উঠবে। আমার জন্মে তো আমি এসব চাইনে। আমি চাই ব্রিটিশের স্বার্থে। আমি আমার যুগ্ম সিংহের খিদমৎগার, তাদেরই খাদ্য যোগাচ্ছি। তারা যদি টুকরো-টাক্‌রা ফেলে রেখে দেয়, তাই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তাই নিয়েই আমার নীড় গড়ব। মেরিয়ান থাকবেন আমার পাশে। আর কিছু নয়। দীর্ঘ জীবনও আমার কাম্য নয়। ক্লাইভ তো দীর্ঘ জীবন চেয়েছিলেন।

To ripen'd age clive liv'd renowned.
With lac enriched, with honour crowned.
His valour's well-earned meed.
'To long, alas! he liv'd, to hate

His envied lot, and died too late
From life's oppression freed
ক্লাইভ পরিণত বয়েস অবধি ছিলেন বেঁচে ;
পেয়েছিলেন যশ, লাখো লাখো রূপেয়া আর সম্মানে সমৃদ্ধ জীবন ;
সে তো তাঁর বীরত্বেই অর্জিত, বীরত্বেরই প্রাপ্য।
কিন্তু হায় সে যে বড় দীর্ঘ জীবন।
তিনি তাঁর ঈর্ষিত ভাগ্যকে ঘৃণাই করলেন,
বিলম্বে তাঁর হল মৃত্যু ;
জীবনের উৎপীড়ন থেকে পেলেন মুক্তি।
শিউরে উঠলেন সাহেব। ক্লাইভের নিয়তি তো তিনি চান না।
নি চান—
For me, O shore, I only claim
To merit, not to seek for fame,
A state above the fear of want ;
Domestic Love, Heaven's choicest grant ;
Health, Leisure, Peace and Ease.
হে ভারতের তীর—আমার দাবি,
যশের সন্ধান তো নয়।
অভাবের ভীতি থেকে উর্ধ্বে থাকতে চাই, চাই পারিবারিক
ালবাসা।
স্বর্গের সেরা আশিস্
স্বাস্থ্য, অবসর, শান্তি, আরাম।
সাহেব নিজেকে নিজে শুধালেন, এই কি আমার কামনা ? আর কিছু
নই ?
তিনি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললেন কাগজখানা। না, এ কাগজ ইংলণ্ডে
াউকে পাঠানো চলে না। ইংলণ্ডের শাসক আর মানুষ আলাদা। মানুষ
া মূর্খ, উদারতা তাদের বাই। নইলে ক্লাইভের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ
ানে! তাঁর বিরুদ্ধেও হয়তো আনতে পারে। আর এই ক'ছত্র লেখাই
য়তো তখন তাদের হাতে দলিল হয়ে দেখা দেবে।

কুচিগুলো ছড়িয়ে দিলেন ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। তারপর হাসলেন ওরা মূর্খ, ওরা জানেনা—ঐ উদারনীতি সর্বনাশা জিনিস। ঐ উদার নীতির সাহায্য শাসকগোষ্ঠী নিতে জানেন। তাঁরা ঐ উদারনীতির মুখো নিজেদের স্বরূপ ঢেকে রাখবেন, ইংরেজের উদারতার সাহায্যে কা করবেন এ-দেশে শোষণের উপনিবেশ। আর এ-দেশ সেই শোষণে টেরটিও পাবেনা, তারাও উদারনীতির ধুয়ো ধরে নিজেদের কালা ইংর করে গড়ে তুলবে। হ্যাঁ, সেই কালা ইংরাজ গড়ার কারখানা গড়তে শাসকগোষ্ঠীকে—গড়তে হবে কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব। ছেয়ে ফেল হবে। আর সেই কারখানায় তৈরি কালা ইংরাজ হবে শাসন আর শোষণে যন্ত্র। যন্ত্র বেগড়াতে চাইলে সেখানে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে চালাতে হ ভেদনীতি, উদারতার জয়ধ্বজাও তাদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

সাহেব হাসলেন:

কিন্তু ও-কথা তো স্যামকে লেখা যায় না, তার নিচে সই করা যায় ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর নিজের নাম। তাই স্যামকে লিখতে হবে ফার ভাষার ব্যাকরণের কথা, লিখতে হবে হেব্রেডিসে ভ্রমণের স্মৃতি; আ হিন্দুস্তানের সমৃদ্ধির ফিরিস্তিও দিতে হবে।

সাদা পাতার উপর আবার কলম ধরলেন গভর্নর জেনারেল ওয়া হেষ্টিংস।

এমন সময় পাখী ডেকে উঠল। ভোরের আবছা আলো এসে ডোরা কে দিলে সাদা পাতার উপর; গভর্নর জেনারেল কলমটা রেখে দিলেন। অ আর হবে না। দুদিন পরেই না হয় লিখবেন। স্যামকে আরও ও জানানো যাবে। এখন তো কাজ। আবার সেই ফাঁসির মঞ্চ তোলার কা আবার সেই ফাঁসির মঞ্চ আড়াল করে রাখার জন্য ব্রিটিশ উদারতার চুনকা তারই উপর করে দিতে হবে। তাতে খুশি হবে তাঁর দেশের মূর্খ উদার তিকের দল, আর খুশি হবে এই কালারা—কালা রঙের গোরা গোরা কালার হাট জমবে ভাল!

সাহেব আবার হেসে উঠলেন।